সুন্দরবনের ইতিহাস: পরিবেশ, জনজীবন ও রাজনৈতিক-অর্থনীতি

সুরাইয়া আক্তার

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জানুয়ারি ২০২৪

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দরবনের ইতিহাস: পরিবেশ, জনজীবন ও রাজনৈতিক-অর্থনীতি

শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল. (M.Phil) ডিগ্রি অর্জনের জন্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে উপস্থাপন করা হলো।

সুরাইয়া আক্তার
এম.ফিল. গবেষক
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৫১
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮
যোগদানের তারিখ ঃ ১৯/০৪/২০১৮

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মেসবাহ কামাল
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **সুন্দরবনের ইতিহাসঃ পরিবেশ, জনজীবন ও রাজনৈতিক-অর্থনীতি** শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক গবেষণা কর্ম। এই অভিসন্দর্ভটি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত তথ্য, উদ্ধৃত আলোচ্য ও উপাত্ত ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থের অনুসরণে রচনা করা হয়নি। এই গবেষণা বা এর অংশবিশেষ পূর্বে প্রকাশিত হয়নি বা ডিগ্রি অর্জনের জন্য অন্য কোথাও আমি উপস্থাপন করিনি।

গবেষক

তারিখঃ

সুরাইয়া আক্তার

এম.ফিল. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়ন পত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল ডিগ্রির উদ্দেশ্যে সুরাইয়া আক্তার'র দাখিলকৃত **সুন্দরবনের ইতিহাসঃ পরিবেশ, জনজীবন ও রাজনৈতিক-অর্থনীতি** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া হয়নি। অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটি আমি পাঠ করেছি এবং তা এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য জমা দেওয়ার সুপারিশ করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

তারিখঃ

ড. মেসবাহ কামাল
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয়

পিতা

জনাব মোহাম্মদ আলী খোকন

ও

মাতা

মিসেস নাজমা আক্তার

যাঁরা তাদের কন্যাসন্তানকে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে মানুষ করেছেন এবং শিশুকাল থেকে সকল প্রতিবন্ধকতা পাশ কাটিয়ে, ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে জ্ঞানার্জন করে, মানবিক সত্তা নিয়ে গড়ে উঠতে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং

আমার জীবনসঙ্গী

মো: মনিরুল ইসলাম

যিনি আমাকে সর্বদা জ্ঞানার্জনের ধারাবাহিতা বজায় রাখা এবং নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন।

কৃতজ্ঞতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে **সুন্দরবনের ইতিহাসঃ পরিবেশ, জনজীবন ও রাজনৈতিক-অর্থনীতি** শীর্ষক আমার এম.ফিল. গবেষণা যাঁর নিরন্তর তত্ত্বাবধান, দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মেসবাহ কামাল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জনইতিহাসবিদ অধ্যাপক মেসবাহ কামাল আমাকে এম.ফিল. গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণে উৎসাহিত করেছেন, দেখিয়েছেন জ্ঞানের জগতে নতুন কিছু আনয়নের স্বপ্ন। পাশাপাশি জনমানুষের অবদান ও জনমানুষের সংগ্রামের ইতিহাস লিখনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। গবেষণার প্রথম পর্যায়ে উৎস পর্যালোচনা, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং গবেষণাবিধি সম্পর্কিত সাপ্তাহিক ক্লাস নেয়ার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক ও মাসিক অগ্রগতি রিপোর্ট নিয়েছেন। তাঁর বিচক্ষণ পরামর্শ ও অনিঃশেষ সহযোগিতা ও তাগিদ আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে গতি যুগিয়েছে। এমনকি তিনি দেশ এবং দেশের বাহিরে থেকে আমার জন্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে, বিভিন্ন সংস্থার সাথে পরিচিত করিয়ে আমার গবেষণাকর্ম সফলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমার গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁর প্রতি। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও একাগ্রতা না থাকলে আমার এই গবেষণা কর্মটি অসমাপ্ত রয়ে যেত। তাই পরম শ্রদ্ধেয় এই তত্ত্বাবধায়কের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

কয়েকটি উদ্দেশ্য ও তাগিদ থেকে গবেষণার বিষয় হিসেবে সুন্দরবনকে বেছে নিয়েছি। বাংলাদেশের পরিবেশ, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে সুন্দরবনের গুরুত্ব ও বর্তমান অবস্থা তুলে ধরাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। দেশের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে সুন্দরবন এবং মানুষের সাথে সুন্দরবনের নিবিড় সম্পর্ক তুলে ধরা আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য। পাশাপাশি এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো সুন্দরবন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে নিয়ে আসা এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অধিকাংশ সময় দেখা যায় এই অঞ্চলের মানুষ সরকারি বিভিন্ন জরিপ গণনারও বাইরে থাকেন। তাই তাদের সংগ্রাম, বেঁচে থাকা, প্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় তাদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা এই গবেষণার অন্যতম একটি লক্ষ্য।

দেখা যায় যে, পাঠ হিসেবে ইতিহাসের শাখা-প্রশাখাও ব্যাপক এবং ক্রমান্বয়ে এর পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলের ইতিহাস, নভোমণ্ডলের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস, অভিবাসন ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস, শিল্পকলার ইতিহাস, মনোবৈজ্ঞানিক ইতিহাস ও প্রামাণিক ইতিহাস প্রভৃতি শাখায় ইতিহাসের চর্চা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ইতিহাসের মূল কাজ হলো অতীতকে উৎস ও তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক বর্ণনার মাধ্যমে বর্তমানের সামনে উপস্থাপন করা। আর ইতিহাসের জ্ঞানের ভিত্তিতে বর্তমানের সংকটাপূর্ণ অবস্থার সমাধানের পথও নির্দেশিত থাকে। এক্ষেত্রে দেখা যায় বর্তমান বিশ্বের অতি

উদ্বেগপূর্ণ ও দুর্বিষহ বিষয় হলো বৈশ্বিক প্রাকৃতিক পরিস্থিতি। বর্তমান বৈশ্বিক আবহাওয়া ও পরিবেশের পরিবর্তন বিশ্বের জাতি-রাষ্ট্র ও সংগঠনগুলোকে ভাবিয়ে চলেছে অবিরত। বছরব্যাপী আবহাওয়ার বিরূপ পরিস্থিতি, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, আকস্মিক ও নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার ভয়াবহতা, সাগর-মহাসাগরের পরিবর্তনশীল বিরূপ বৈশিষ্ট্য, মানব কর্মকাণ্ডে নদী-পাহাড়-পর্বত ও বনাঞ্চল বিলীন এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের ভাবিয়ে তুলেছে নিরন্তর। এই বৈশ্বিক দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বর্তমানে যথাযথ পন্থা অনুসরণে পরিবেশ ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আন্তঃজ্ঞানকাণ্ডীয় ইতিহাসের এই শাখাটি অতি সাম্প্রতিক হলেও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র। আর এই পরিবেশ ইতিহাস চর্চার অংশ হিসেবেই সুন্দরবনের উপর গবেষণা। পাশাপাশি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা সাধারণ জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকেই সুন্দরবনের বনজীবী মানুষের লোকবিশ্বাস, জীবন সংগ্রাম, আবাস, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস ও জীবিকার যাবতীয় উপস্থাপন করার নৈতিক তাগিদ থেকেই এই বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাথমিক উৎস, বনজীবীদের সাক্ষাৎকার, সংবাদ ও গণমাধ্যমের প্রতিবেদন, পরিবেশ ইতিহাসের তাত্ত্বিক কাঠামো, পরিবেশ ও আবহাওয়া অধিদপ্তরের বার্ষিক রিপোর্ট, জার্নাল, বিশ্ব পরিবেশ সংগঠনসমূহের প্রতিবেদন এবং দ্বৈতীয়িক উৎসসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় কয়েকজন শিক্ষক আমাকে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রফেসর ড. রাণা রাজ্জাক, ড. নুরুল হুদা আবুল মনসুর, ড. আশা ইসলাম নাঈম, ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী, ড. আকসাদুল আলম ও ড. সানিয়া সিতারা, মিজ মৃত্তিকা সহিতা, মিজ মাহমুদা আক্তার পলি প্রমুখ। এছাড়া বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় সাবেক উপাচার্য মৃত্তিকা ও পরিবেশ বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এস এম ইমামুল হক, বর্তমান মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ছাদেকুল আরেফিন, মাননীয় ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোঃ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া, ইতিহাস বিভাগের ড. মোহাম্মদ আবদুল বাতেন চৌধুরীসহ আমার সকল সহকর্মীদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে ধন্য করেছেন সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক মোঃ ইদ্রিস আলী ও খুলনার ইতিহাস ও সভ্যতা ডিসিপ্লিনের সহকারী অধ্যাপক উম্মে হাবিবা ইয়াসমিন। পশ্চিমবঙ্গ ভারত থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহ ও তথ্য পাঠিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী সঞ্জীব বিশ্বাস ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক জনাব আকরুর সরকার। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে এলাকা পরিচিতি ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী সাতক্ষীরা শ্যামনগরের অধিবাসী আসাদুল্লাহ আসাদ, আরিফ ইসতিয়াক পাভেল ও খুলনার কয়রার অধিবাসী অনিমেশ সরকার। পরম স্নেহ, কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা তাদের প্রতি।

গবেষণা কাজে পরিবারের উৎসাহ না থাকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি আমার পিতা জনাব মোহাম্মদ আলী খোকনকে যিনি সব সময় স্বপ্ন দেখেন আমাকে নিয়ে, তাঁর প্রশান্তির সবটুকু প্রাপ্তি আসে আমার সাফল্যে। সেইসাথে আমার মাতা মিসেস নাজমা আক্তার যিনি নিজের সাফল্য খুঁজে পান আমার সাফল্যে। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে গর্বিত মাতা হিসেবে নিজের প্রাপ্তি পান। আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ আমার পিতা মাতার প্রতি যাঁরা প্রতিনিয়ত আমার স্বাস্থ্য, মানসিক অবস্থা, আমার পরিবার ও সন্তানসহ সকল দিক তত্ত্বাবধান করেছেন এবং প্রেরণা যুগিয়েছেন। এছাড়া আমার বড় বোন, মেজো ও সেজো বোন এবং আত্মীয়-স্বজন সব সময় আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন। আমি তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমার জীবনসঙ্গী মো: মনিরুল ইসলাম আমাকে সংসারের সকল কাজে সহযোগিতার পাশাপাশি এই অভিসন্দর্ভটি রচনায় সার্বিকভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি সর্বদা আমার গবেষণা কর্মের খোঁজ খবর নিয়ে বিভিন্ন তথ্য মুদ্রণে সহায়তা এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিভিন্ন ভ্রমণে সঙ্গী হয়ে গভীরভাবে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাছাড়াও আমার কন্যা সন্তান রুফাইদা ইসলাম ফেরিহা গর্ভকালীন এবং নবজাতক হিসেবে আমার এই গবেষণার ব্যস্ততার কারণে মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু তার আবির্ভাব ও ভালোবাসা আমাকে শক্তি যুগিয়েছে গবেষণাটি যথাসময়ে সম্পন্ন করতে। পারিবারিক, সাংসারিক ও সন্তান লালনে ব্যঘাত হওয়ার ভাবনা থেকে অনেকটাই নির্ভার রেখেছে এবং গবেষণাকাজে নির্বিঘ্নে মত্ত থাকতে সহায়তা করেছে আমার স্নেহের ছোটবোন মেহেরুননেছা রুপু, ইফাত আরা ইফা, ভাগ্নি উম্মে হাবিবা মুন ও শ্রদ্ধেয় শাশুড়ি মিসেস মর্জিনা বেগম। আজ তাঁরা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

গবেষণার তথ্য আহরণের প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শহীদ স্মৃতি পাঠাগার, বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভ্স, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বরিশাল বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC)'র ড. আবদুল গফুর রিসোর্স সেন্টার, জন-ইতিহাস চর্চা কেন্দ্র লাইব্রেরী, হেরিটেজ আর্কাইভ্স রাজশাহী, বাংলাদেশ বন ও পরিবেশ ইনসটিটিউট বরিশাল এবং National Library Calcutta, National Digital Library of India, West Bengal Govt. Press, All India History Congress Publication, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশনা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গের *শুধু সুন্দরবন চর্চা-র* প্রকাশনা কার্যালয় প্রভৃতি ব্যবহার করেছি। এসব প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের দায়িত্বে যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি অভিসন্দর্ভের বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে যারা আমাকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি বিশেষভাবে ঋণী এবং এটি রচনার ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন লেখক ও গবেষকের বই,

প্রবন্ধ, জার্নাল ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সেগুলো যথাযথভাবে উল্লেখের চেষ্টা করেছি। সংশ্লিষ্ট লেখক ও গবেষকগণের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

সুরাইয়া আক্তার

সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

সুন্দরবনের ইতিহাসঃ পরিবেশ, জনজীবন ও রাজনৈতিক-অর্থনীতি

সূচিপত্র

সারণি তালিকা	xv
মানচিত্রের তালিকা	xvi
চিত্রের তালিকা	xvii
গবেষণার সারসংক্ষেপ	xvii
প্রথম অধ্যায়- ভূমিকা	**১-৮২**
১.১ প্রারম্ভিকা	১
১.২ গবেষণার বিভিন্ন দিক	৪
১.৩ ম্যানগ্রোভ পরিচিতি	১০
১.৪ সুন্দরবন গঠন	১৩
১.৫ সুন্দরবনের নামকরণ	১৮
১.৬ সুন্দরবনের সীমানা	২৫
১.৭ সুন্দরবনের নদ-নদী	৩৩
১.৮ সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার ইতিহাস	৪৪
১.৯ উপসংহার	৮২
দ্বিতীয় অধ্যায়- পরিবেশঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলায় সুন্দরবনের ভূমিকা	**৮৩-১৩০**
২.১ প্রাককথন	১
২.২ বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাসমূহ	৮৬
২.৩ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলায় সুন্দরবনের ভূমিকা	৮৭
২.৪ সুন্দরবন যেভাবে প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা করে	৮৯
২.৫ প্রাকৃতিক দূর্যোগে সুন্দরবনের প্রতিরক্ষার আর্থিক মূল্য	৯২
২.৬ সুন্দরবন উপকূল দিয়ে আসা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সুন্দরবনের ভূমিকা	৯২

২.৭ ঘূর্ণিঝড়সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা ৯৩
২.৮ সুন্দরবনের অস্তিত্ব বিপর্যয় ১২৩
২.৯ ঘূর্ণিঝড়ের স্মৃতিচারণমূলক ঘটনা ১২৪
২.১০ উপসংহার ১২৬

তৃতীয় অধ্যায়- সুন্দরবনের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি ১৩১-২৪০

৩.১ প্রাককথন ১৩১
৩.২ সুন্দরবনের অধিবাসী ১৩২
৩.৩ সুন্দরবন সংলগ্ন বসবাসরত এলাকাসমূহ ১৩২
৩.৪ সুন্দরবনে প্রাচীন মানব বসতি ১৩৩
৩.৫ ধর্মীয় শ্রেণিবিভাজন ১৩৬
৩.৬ সুন্দরবনের শহর ১৪০
৩.৭ বাসস্থান ১৪১
৩.৮ সুন্দরবনের জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের উৎস ১৫৩
৩.৯ সুন্দরবনের মৌসুম ১৫৫
৩.১০ বাওয়ালি ১৫৫
৩.১১ মৌয়াল ১৬১
৩.১২ জেলে ১৭৪
৩.১৩ কৃষি ১৮০
৩.১৪ মহাজন ১৮৩
৩.১৫ বনবিভাগের কর্মচারী ১৮৪
৩.১৬ বনদস্যু ১৮৮
৩.১৭ সামাজিক জীবনধারা ১৮৯
৩.১৮ পরিবার ১৯৩
৩.১৯ শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯৩
৩.২০ ধর্মীয় বিশ্বাস ১৯৬
৩.২১ স্থানীয় লৌকিক আচার অনুষ্ঠান ও লোকসংস্কৃতি ১৯৯
৩.২২ ভাষা ২০০
৩.২৩ বিনোদন ও খেলাধুলা ২০১

৩.২৪ লোকচিকিৎসা ২০২

৩.২৫ বনে অবস্থানকালীন রীতিনীতি ২০৮

৩.২৬. বনবিবি ২১০

৩.২৭ সুন্দরবনের রাসমেলা ২২৪

৩.২৮ লোক সঙ্গীত, ছড়া, কবিতা ও প্রবাদ
২৩০

৩.২৯ বিধবাপল্লী ২৩২

৩.৩০ আদিবাসীদের লড়াই ও বনজীবী জনজীবনের বিপন্নতা ও অস্তিত্বের সংকট ২৩৩

চতুর্থ অধ্যায়- সুন্দরবনের রাজনৈতিক-অর্থনীতি ২৪১-২৮৫

৪.১ প্রাককথন ২৪১

৪.২ রাজনৈতিক অর্থনীতি ২৪১

৪.৩ রাজনৈতিক অর্থনীতির সংজ্ঞা ২৪২

৪.৪ রাজনৈতিক অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু ২৪৪

৪.৫ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বনায়ন খাতের গুরুত্ব ২৪৪

৪.৬ বাজার ২৫৬

৪.৭ ব্যবসা-বাণিজ্যপথ ২৫৬

৪.৮ সুন্দরবনের বনজ সম্পদ ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ২৫৭

৪.৯ সুন্দরবনে জন্ম নেয়া বিভিন্ন বৃক্ষ ও গুল্মের আর্থিক গুরুত্ব ২৬১

৪.১০ সুন্দরবনের বিভিন্ন জীব জন্তুর আর্থিক অবদান ২৭৪

৪.১১ সম্ভাবনাময় বাগদা চিংড়ি ও কাঁকড়া শিল্প ২৭৬

৪.১২ সুন্দরবনের মৎস সম্পদ ২৭৭

৪.১৩ সুন্দরবনের পর্যটনশিল্প ২৭৯

৪.১৪ সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষি ২৮৩

৪.১৫ উপসংহার ২৮৩

পঞ্চম অধ্যায়- উপসংহার ২৮৬-৩০২

৫.১ প্রাককথন ২৮৬

৫.২ সুন্দরবন সীমা হ্রাস প্রাপ্তিতে মানব সৃষ্ট কারণসমূহ ২৮৮

৫.৩ সুপারিশ: ২৯৫

৫.৪ উপসংহার ৩০১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি: ৩০৩

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১ মানচিত্র: বাংলাপ্রদেশ, ১৯০৭

পরিশিষ্ট-২ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা

পরিশিষ্ট-৩ সুন্দরবনের নিকটস্থ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ধর্মভিত্তিক বসবাসকৃত জনসংখ্যা

পরিশিষ্ট-৪ বাংলাদেশের বনভূমির আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধির (২০০০ থেকে ২০১৫) চিত্র

পরিশিষ্ট-৫ বাংলাদেশের বনভূমির আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধির (২০০০ থেকে ২০১৪) চিত্র

পরিশিষ্ট-৬ সম্প্রতি বাংলাদেশের বনভূমির আয়তন বৃদ্ধির কারণসমূহ

পরিশিষ্ট-৭ ১৯৬০-২০১৭ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়সমূহের তালিকা

সারণি তালিকা

সারণি-১ বন বিভাগের অধীন বিভিন্ন বনের বর্তমান বিস্তৃতি ও শ্রেণিবিন্যাস ৩৩

সারণি-২ ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত মোট বৃক্ষপ্রজাতির পরিমাণ ১১০

সারণি-৩ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ১২২

সারণি-৪ পশ্চিম ভারত আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ১২৩

সারণি-৫: শ্রেণি ও পেশাভিত্তিক হিন্দু জনগোষ্ঠীর তালিকা ১৩৬

সারণি-৬: শ্রেণি ও পেশাভিত্তিক মুসলমান জনগোষ্ঠীর তালিকা ১৩৮

সারণি-৭: সুন্দরবন মৌসুম ১৫৫

সারণি-৮: গ্রোথ সেন্টার, হাট-বাজার, মুরগির খামার, দুগ্ধ খামার, উদ্যান, ইট ভাটা ও ডেকোরেটর পরিসংখ্যান ১৮১

সারণি-৯: দশ বছর এবং তদুর্দ্ধ বয়সী জনসংখ্যার বৈবাহিক পরিসংখ্যান ১৯১

সারণি-১০: স্বাক্ষরতার হার ১৯৫

সারণি-১১: বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা ২৩৬

সারণি-১২: এ পর্যন্ত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমান ২৩৭

সারণি-১৩: বনজীবী পরিবার কর্তৃক প্রাথমিকভাবে সংরক্ষিত বনজ পণ্য ও পণ্য দ্রব্যের মূল্য ২৪৬

সারণি-১৪: বন থেকে সংগৃহিত কাঠ ও অকাষ্ঠ জাতীয় দ্রব্যেও আর্থিক মূল্য ২৪৭

সারণি-১৫: বন থেকে সংগৃহিত অন্যান্য সম্পদ ২৪৮

সারণি-১৬: প্রক্রিয়াজাত গাছ এবং বনজ পণ্য থেকে আয় ২৪৯

সারণি-১৭: বন এবং গাছ সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত জনসংখ্যা ২৪৯

সারণি-১৮: বন এবং গাছ সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত নারীর সংখ্যা ২৫০

সারণি-১৯: Percentage of HH receiving different services/benefits from tree and forest.২৫২

সারণি-২০: জ্বালানি কাজে ব্যবহৃত বনজ পণ্যের আর্থিক মুল্য ২৫৩

সারণি-২১: কাঠের আসবাবপত্র এবং একাজে জড়িত লোকসংখ্যা ২৫৯

সারণি-২২: কাঠমিল (স'মিল) এবং এ কাজে জড়িত লোকসংখ্যা (২০১১) ২৬১

সারণি-২৩: সুন্দরবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর তালিকা ২৭৬

সারণি-২৪: হুমকির সম্মুখীন বৃক্ষপ্রজাতির ঘনত্ব ২৮৭

মানচিত্রের তালিকা

মানচিত্র-১: নিম্ন গঙ্গা	১৪
মানচিত্র-২: গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও সুন্দরবন	১৫
মানচিত্র-৩: উনিশ শতকের গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও সুন্দরবন	১৫
মানচিত্র-৪: বাংলাদেশ সুন্দরবন	১৮
মানচিত্র-৫: ১৭৯৪ সালের বাংলা ও সুন্দরবন	২৬
মানচিত্র-৬: ১৭৯৫-১৮৬৯ সালের বাংলা ও সুন্দরবন	২৭
মানচিত্র-৭: ১৯১১ সালের বাংলা ও সুন্দরবন	২৮
মানচিত্র-৮: ১৯১২ সালের সুন্দরবন	২৯
মানচিত্র-৯: ১৯৩৭ সালের সুন্দরবন	২৯
মানচিত্র-১০: ১৯৪১ সালের সুন্দরবন	৩০
মানচিত্র-১১: ১৯৪৭ সালের সুন্দরবন	৩০
মানচিত্র-১২: গঙ্গা-পদ্মা নদী প্রণালী	৩৫
মানচিত্র-১৩: বাংলাদেশের বন আচ্ছাদিত এলাকা	৪৫
মানচিত্র-১৪: বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ	৮৭
মানচিত্র-১৫: ১৯৮৮-২০১৬ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের মোকাবেলা করা উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়	৯১

চিত্রের তালিকা

চিত্র-১: ম্যানগ্রোভ বন	১১
চিত্র-২: সুন্দরবনের শুলো	১৩
চিত্র-৩: নদী খাঁড়ির সুন্দরবন	২৩
চিত্র-৪: ইছামতি নদী	৩৭
চিত্র-৫: রায়মঙ্গল নদী	৪১
চিত্র-৬: কয়রা নদী	৪৩
চিত্র-৭: ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা নিয়ে প্রকাশিতসংবাদ	১০০
চিত্র-৮: ঘূর্ণিঝড়ে তীরে ভেসে আসা বালকের ফুলে উঠা মৃতদেহ	১০১
চিত্র-৯: সিডরে বিধ্বস্ত লোকালয়	১০৬
চিত্র-১০: সিডরে বিধ্বস্ত লোকালয়	১০৯
চিত্র-১১: আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের লোকালয়	১১২
চিত্র-১২: ঘূর্ণিঝড় বুলবুলে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের পূর্বাংশ	১১৬
চিত্র-১৩: ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন	১১৮
চিত্র-১৪: বনজীবীদের বাসস্থান	১৪২
চিত্র-১৫: মদ প্রস্তুত প্রক্রিয়া	১৪৯
চিত্র-১৬: মুণ্ডাপাড়ার অধিবাসী	১৫৩
চিত্র-১৭: সুন্দরবনে মাছ ধরার দৃশ্য	১৭৪
চিত্র-১৮: বাগদিপাড়া জেলে পল্লী	১৭৬
চিত্র-১৯: মাছ ধরতে যাওয়ার পূর্বমুহূর্ত	১৭৬
চিত্র-২০: জেলেনী কাঞ্চন সরদারের বাড়ি	১৭৯
চিত্র-২১: কাঁকড়া চাষ	১৮৩
চিত্র-২২: গরু পূজা	১৯৯
চিত্র-২৩: বনবিবির মন্দির	১৯৯
চিত্র-২৪: বনবিবির পালা	২১৪
চিত্র-২৫: মুরগী পূজা	২১৯
চিত্র-২৬: সুন্দরবনের রাসমেলা	২২৫
চিত্র-২৭: গোলপাতা বহন	২৭৩

গবেষণা সারসংক্ষেপ

পাঠ হিসেবে ইতিহাসের শাখা-প্রশাখাও ব্যাপক এবং ক্রমান্বয়ে এর পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলের ইতিহাস, নভোমণ্ডলের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস, অভিবাসন ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস, শিল্পকলার ইতিহাস, মনোবৈজ্ঞানিক ইতিহাস ও প্রামাণিক ইতিহাস প্রভৃতি শাখায় ইতিহাসের চর্চা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ইতিহাসের মূল কাজ হলো অতীতকে উৎস ও তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক বর্ণনার মাধ্যমে বর্তমানের সামনে উপস্থাপন করা। আর ইতিহাসের জ্ঞানের ভিত্তিতে বর্তমানের সংকটাপূর্ণ অবস্থার সমাধানের পথও নির্দেশিত থাকে। এক্ষেত্রে দেখা যায় বর্তমান বিশ্বের অতি উদ্বেগপূর্ণ ও দুর্বিষহ বিষয় হলো বৈশ্বিক প্রাকৃতিক পরিস্থিতি। বর্তমান বৈশ্বিক আবহাওয়া ও পরিবেশের পরিবর্তন বিশ্বের জাতি-রাষ্ট্র ও সংগঠনগুলোকে ভাবিয়ে চলেছে অবিরত। বছরব্যাপী আবহাওয়ার বিরূপ পরিস্থিতি, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, আকস্মিক ও নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার ভয়াবহতা, সাগর-মহাসাগরের পরিবর্তনশীল বিরূপ বৈশিষ্ট্য, মানব কর্মকাণ্ডে নদী-পাহাড়-পর্বত ও বনাঞ্চল বিলীন এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের ভাবিয়ে তুলেছে নিরন্তর। এই বৈশ্বিক দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বর্তমানে যথাযথ পন্থা অনুসরণে পরিবেশ ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আন্তঃজ্ঞানকাণ্ডীয় ইতিহাসের এই শাখাটি অতি সাম্প্রতিক হলেও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র। আর এই পরিবেশ ইতিহাস চর্চার অংশ হিসেবেই সুন্দরবনের উপর গবেষণা। পাশাপাশি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা সাধারণ জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকেই সুন্দরবনের বনজীবী মানুষের লোকবিশ্বাস, জীবন সংগ্রাম, আবাস, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস ও জীবিকার যাবতীয় উপস্থাপন করার নৈতিক তাগিদ থেকেই এই বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাথমিক উৎস, বনজীবীদের সাক্ষাৎকার, সংবাদ ও গণমাধ্যমের প্রতিবেদন, পরিবেশ ইতিহাসের তাত্ত্বিক কাঠামো, পরিবেশ ও আবহাওয়া অধিদপ্তরের বার্ষিক রিপোর্ট, জার্নাল, বিশ্ব পরিবেশ সংগঠনসমূহের প্রতিবেদন এবং দ্বৈতীয়িক উৎসসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণপূর্বক গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রাচীন ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় বলেন- *একদিকে সু-উচ্চ পর্বত, দুইদিকে কঠিন শৈলভূমি, আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য- ইহাই বাঙালির ভৌগোলিক ভাগ্য।.... সাম্প্রতিক বাঙলার উত্তরে তরাই বনভূমি, দক্ষিণে সুন্দরবন ও তৃণাস্তীর্ণ জলাভূমি।* এই উক্তির যথার্থতাই যেন দক্ষিণ অংশের সুন্দরবন। সুন্দরবনই বাঙালির ভৌগোলিক ভাগ্য নির্ধারণ করে চলেছে হাজার বছর ধরে। প্রাচীনকালের বঙ্গ জনপদের প্রাণকেন্দ্র গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ এলাকায় অর্থাৎ গঙ্গারিডাই অঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম জোয়ার বিধৌত গরান বনভূমি সুন্দরবন। রাষ্ট্রসীমা প্রাকৃতিক সীমাকে অবজ্ঞা করে চলার রীতিতে পরিণত হয়েছে, সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে সাতক্ষীরা, খুলনা এবং বাগেরহাট জেলার অংশবিশেষ জুড়ে

বাংলাদেশের সুন্দরবন বিস্তৃত। শাখা প্রশাখার মত ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নদী আর খালে পরিপূর্ণ সুন্দরবন প্রতিবেশ ব্যবস্থা। তাই এটি একটি স্বতন্ত্র প্রতিবেশ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। নানা ধরণের গাছপালার চমৎকার সমারোহ ও বিন্যাস এবং বন্যপ্রাণীর অনন্য সমাবেশ এই বনভূমিকে চিহ্নিত করেছে এক অপরূপ প্রাকৃতিক নিদর্শন হিসেবে যা ১৯৯৭ সালের ৭ ডিসেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

গঙ্গা, পদ্মা ও মেঘনার ব-দ্বীপে প্রায় ১০,২৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে সুগঠিত পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পরবর্তীতে এটি বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশে বিভাজিত হয়ে যায়। এই বনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা রয়েছে বাংলাদেশে, বাকিটা ভারতে। সুন্দরবনের ৬,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা বাংলাদেশের সীমানাধীন এবং ৪,২৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ভারতের সীমানাভুক্ত হয়। এর পূর্বে বলেশ্বর, পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গা, রায়মঙ্গল ও কালিন্দী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও উত্তরে বিস্তীর্ণ জনপদ।

ম্যানগ্রোভ হলো বিশেষ ধরণের লবণাক্ত সহিষ্ণু ঝোপজাতীয় লম্বা বা ছোট গাছ। আর সমুদ্র তীরবর্তী স্থানগুলো যেহেতু লবণাক্ত হয়ে থাকে তাই এসব অঞ্চলেই এই ম্যানগ্রোভ বেশি পরিমাণে দেখা যায়। এই গাছ উপকূলীয় অঞ্চলে মাটি ও পানিতে বিদ্যমান লবণের ঘনত্ব কমাতে সাহায্য করে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ গাছ কর্তৃক লবণের ঘনত্ব কমানোকে প্রাকৃতিক ফিলট্রেশন বলা হয়ে থাকে। এই গাছগুলো কম অক্সিজেন মাটিযুক্ত অঞ্চলে বৃদ্ধি পায়। যেখানে ধীর গতিতে চলমান সূক্ষ্ম পলি জমা হয়। বলা হয় শিকড়ের এই জটের দ্বারা প্রতিদিন দুবার জোয়ারের উত্থান পতনকে নিয়ন্ত্রন করে। এই শিকড়গুলো জোয়ারের গতিকেও মন্থর করে দেয়। এর ফলে জল থেকে পলিগুলো বের হয়ে আসে এবং একধরণের কর্দমাক্ত পরিবেশ তৈরি হয়। এই বন উপকূল অঞ্চলকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, স্রোত, ঢেউ এবং জোয়ার থেকে ভূমি ক্ষয় হ্রাস করে। ম্যানগ্রোভের এই মূল ব্যবস্থা বনের মাছ ও প্রাণীকে শিকারীদের কাছ থেকে নিরাপদ রাখে এবং তাদের খাদ্যের যোগানও সরবরাহ করে থাকে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রায় ৭৫ শতাংশ ম্যানগ্রোভ ১৪টির বেশি দেশে পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে এশিয়ায় ৪২ শতাংশ, আফ্রিকায় ২১ শতাংশ, উত্তর-মধ্য-আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ১৫ শতাংশ, ওশেনিয়ায় ১২ শতাংশ ও দক্ষিণ আমেরিকায় ১০ শতাংশ রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে প্রায় ১ লাখ ৪১ হাজার ৩৩৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রয়েছে।

আর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম। বাংলাদেশে প্রায় ১ হাজার ৭৭৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রায় ২ হাজার ৩১৪ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ম্যানগ্রোভ বায়োমও রয়েছে। এর মোট এলাকা ৬,০১,৭০০ হেক্টর যার মধ্যে ৪,১১,২৩৪ হেক্টর জমি এবং ১,৯০,৪৬৬ হেক্টর জল। এই ৪,১১,২৩৪ হেক্টর জমির মধ্যে ৩,৯৯,৪৭১ হেক্টরে গাছের আচ্ছাদন রয়েছে। সুন্দরবনের ১,৩৯,৭০০ হেক্টর বনভূমিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে রামসার

কনভেনশনের অধীনে। **বাংলাদেশ বন বিভাগ-এর রিপোর্ট ২০০৭** অনুযায়ী সুন্দরবনে ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং ২৬৯ প্রজাতির প্রাণী রয়েছে এবং ১২.২৬ মিলিয়ন কাঠ রয়েছে। বাংলাদেশের বনাঞ্চলগুলোর মধ্যে সুন্দরবনেই সর্বোচ্চ পরিমাণে চারা গাছের ঘনত্ব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ বনবিভাগের জরিপে বলা হয় জাতীয় পর্যায়ে চারা স্টকের প্রায় ৪৪% সুন্দরবনে। এক্ষেত্রে সুন্দরী, গেওয়া ও গরানের চারা উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবন বনভূমি গঠনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো পলি বহনকারী নদীর সুমিষ্ট জলের সাথে সমুদ্রের লোনাপানির সংমিশ্রণ। এর ফলে গড়ে উঠে এক বিশেষ প্রজাতির বৃক্ষ। তাই নদী-সীমা হ্রাস বৃদ্ধির সাথে সাথে সুন্দরবনের আয়তনও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে। একসময় যেটি ছিল গভীর অরণ্য কোন এক কালে সেটি হয়েছিল আবাসস্থল, রাজকার্য পরিচালনার স্থান কিংবা মন্দির, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র।

বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়া'য় সুন্দরবনকে 'জোয়ারভাটার প্রভাবের আওতাভুক্ত বনভূমি' বা 'জোয়ার-ধৌত বন' (Tidal Forest) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। দেশের সংরক্ষিত বন হিসেবে পরিচিত সুন্দরবনের রয়েছে ৪ টি প্রশাসনিক অঞ্চল এবং ৫৫ টি Compartment. এ বনে বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমন প্রায় ৭০ টি উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে। বনটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৩ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। বনের উচ্চতা ৫ থেকে ২০ মিটার পর্যন্ত। বনভূমির প্রায় ৭০ ভাগ ভূমি বৃক্ষাচ্ছাদিত।

বাংলা সুন্দরবন শব্দটির ইংরেজি উচ্চারণ Sundarban. সুন্দরবন নামকরণ নিয়ে নানা মত রয়েছে। ঠিক একই ভাবে *সুন্দর/সুন্দরের* উৎপত্তি নিয়েও ভিন্ন মত রয়েছে। ম্যানগ্রোভের বাংলা নাম সুন্দর sundara ("beautiful") থেকে বা Heriteria minor কখনও H. Fomes থেকে সুন্দরী sundari শব্দটি এসেছে। সুন্দরবনে সুন্দরী নামের একধরনের বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে এই বনের নাম সুন্দরবন। E.E Pargiter রচিত Revenue History of Sundarbans (1885) গ্রন্থে এবং Calcutta Revenue, Sundarbans, Vol-89-গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করা হয়। আবার বলা হয় সুন্দর শব্দটি *চন্দ্র* "moon" থেকে এসেছে। চন্দ্র chandra থেকে চন্দ্রদ্বীপবন chandradip ban. চন্দ্রদ্বীপবন নামে একটি বৃহৎ জমিদারি এস্টেটের নাম ছিল। আরো বলা হয়, ১১৩৬ খ্রিস্টাব্দের একটি তাম্রশাসনে উল্লিখিত লবণ প্রস্তুতকারকদের পূর্বের একটি উপজাতির নাম চান্দা-ভাণ্ডা chanda-bhanda. সেখান থেকে বিবর্তিত হয়ে সুন্দরবন শব্দটির প্রচলন। মূলত সুগন্ধা *Sugandha or Fragrant* নদী প্রবাহে গড়ে উঠা উর্বর ভূমির পূর্ব তীরে বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ *Bdkla-Chandradwip* (বেভেরেজের গ্রন্থে এই বানানটিই উল্লেখ আছে) এবং পশ্চিম দিকে সেলিমাবাদ বা বর্তমান বাগেরহাট *Selimjibad* (বেভেরেজের গ্রন্থে এই বানানটিই উল্লেখ আছে) অবস্থিত। তিনি বলেন সুগন্ধা নামটি সুন্দা *Sunda* নামের সংক্ষিপ্ত রূপে এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এই সুন্দা নদীর তীরকেই বলা হয় সুন্দরকূল

Sundarkul। এর পাশাপাশি বেভেরেজ সুন্দরবনের নামকরণে এই বনের ভালো কাঠের যোগান হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান বাংলাদেশের সুন্দরবন বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা এই তিনটি জেলায় সুন্দরবন বিস্তৃত। বাগেরহাটের মংলা, শরণখোলা উপজেলা, খুলনার দাকোপ ও কয়রা উপজেলা এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় এই বন বিস্তৃত। সুন্দরবনের ৬৩.২% ম্যানগ্রোভ বন দ্বারা আচ্ছাদিত আর নদী খাল রয়েছে ৩৬.৮% এলাকাজুড়ে। সুন্দরবনের সর্ব পশ্চিমের সীমানা রয়েছে রায়মঙ্গল নদী যা বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সীমানা নির্ধারন করেছে। দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ সীমান্তবর্তী সাতক্ষীরা জেলা এই ম্যানগ্রোভ বন। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত খুলনা জেলার মোট আয়তন ৪৩৮৯.১১ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ২০২৮.২২ বর্গকিলোমিটার এলাকা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত। বাগেরহাট জেলার মোট আয়তন ৩৯৫৯.০৬ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ৬০০.০৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে সুন্দরবন বিস্তৃত।

বাংলাপিডিয়ায় সুন্দরবনে ছোট বড় প্রায় ১৭৭টি নদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে । জার্মান নাগরিক হেলমুত দেনজাও ও গাক্রদ নওম্যান দেনজাও এবং অস্ট্রিয়ান নাগরিক পিটার গ্রানগর্স ১৫ বছরের গবেষণায় সুন্দরবন এটলাস শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে সুন্দরবনের নদীর সংখ্যা পঁয়ত্রিশটি। সুন্দরবনের বড় ও উল্লেখযোগ্য নদী হলো পাঁচটি। বলেশ্বর, পশুর, শিবসা, খোলপেটুয়া ও কালিন্দি নদী। এগুলোর শাখা-প্রশাখা থেকেই আরো ত্রিশটি নদী তৈরি হয়েছে।

বনভূমি ব্যবস্থাপনার আদি ইতিহাসে প্রাচীন ভারতে বন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। কারণ প্রাচীনকালে বনভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাস সম্পর্কিত উৎস খুবই কম। তবে বিভিন্ন সাহিত্যিক উৎসে কিছু তথ্যাদি পাওয়া যায়। বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আর্য সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, তারা পশুপালনের পাশাপাশি কৃষির প্রতি আগ্রহী হয় এবং বন পরিষ্কার করে বসতি নির্মাণ ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতো। মূলত প্রাচীনকালে বনভূমি ছিল মানব বসতি ও অন্যান্য চাহিদা পূরণস্থল, সাধারণ জনগণের পশুচারণক্ষেত্র ও রাজকীয় হস্তিবাহিনীর বিচরণক্ষেত্র। সম্রাট আশোক বন ও বন্যপ্রাণী খুব ভালবাসতেন এবং তিনি বন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেন। এ সময় সুন্দরবন এলাকা উত্তর ও দক্ষিণ বাংলার বনভূমি নিয়ে গঠিত Angirya-Vana-বনের অধীন ছিল। সমগ্র গুপ্ত শাসনামলে মূল রাজস্বের অন্যতম উৎস ছিল বন। এক্ষেত্রে বনভূমি তদারকির জন্য *গলমিকাস* নামক পদবীদের নিয়োগ করা হতো। কাঠ, বাঁশ, বেত জাতীয় গুল্ম ও আঁশ এবং ঔষধি লতা প্রভৃতি বন থেকে সংগ্রহ করা হত। গুপ্ত শাসনামলে পূর্ববর্তী বন ব্যবস্থাপনার অধিকাংশই বাতিল হয়ে যায়। এসময় সংরক্ষণের পরিবর্তে বনভূমির বিস্তীর্ণ অংশ চাষাবাদের জন্য পরিষ্কার করা হয়।

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় চারশত বছর বাংলা পাল সাম্রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। তাদের সময় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থাপনায় বন বিভাগ পরিচালনা করা হত। পাল ও চন্দ্র লিপিমালায় দেখা যায় রাজপুরুষদের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তালিকায় রাজন, রাজন্যক, রাণক, সামন্ত, মহাসামন্ত প্রভৃতি রাজপাদোপজীবীধারী। এমনই একজন ছিলেন অপর মন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশুর যার উপাধি ছিল **'আটবিক সামন্ত-চক্র-চূড়ামণি'**। উপাধিটিতে সংযুক্ত *আটবিক* শব্দটি মূলত বনভূমিকে নির্দেশ করছে। নীহাররঞ্জন রায় *বাঙালির আদি ইতিহাস* রচনায় বনভূমি বোঝাতে বন, অরণ্য, অটবী ও আটবিক শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। তবে এসময় অধিক পরিমাণে কাঠ সংগ্রহ, বিকল্প উৎপাদনের অভিষ্টে বনভূমি ব্যবহার, বিভিন্ন সামন্ত্রতান্ত্রিক যুদ্ধে বনে আগুন জ্বালানো এবং এসকল ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে দমনে ব্যর্থতা প্রভৃতির কারণে ব্যাপক আকারে বনভূমি ধ্বংস হয়। সেন আমলে সুন্দরবন পরিচিত ছিল খাট, খাটা, খাটিকা ও খাঁড়ি প্রভৃতি নামে। এর প্রতিটি শব্দই মূলত খাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুন্দরবনের যেহেতু অসংখ্য খাল রয়েছে তাই এটি খাড়িভূমি নামে অভিহিত ছিল। বলা হয়, যে জনপদে অনেক খাল রয়েছে সেটিই খাড়িমণ্ডল। নীহাররঞ্জন রায় এ প্রসঙ্গে বলেন **"চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশ যে খালবহুল তাহা তো সকলেই জানেন।"** তিনি তাঁর *বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব গ্রন্থে* প্রাচীন বাংলার ভূমির মাপ ও মূল্য সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করেন যে, রাজা লক্ষণসেন সুন্দরবন পট্টোলীতে দ্রোণের নিম্নতর ক্রম হচ্ছে *খাড়িকা* এবং তারপর যথারীতি *উন্মান* ও *কাকিণী*। অষ্টম শতকের পূর্বের লিপিমালাগুলোতে দেখা যায় ভূমি পরিমাপের মানদণ্ড ছিল নল। লক্ষ্মণ সেনের আনুলিয়া শাসনে উল্লেখ আছে যে, ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলে (পশ্চিম-নিম্নবঙ্গ) *বৃষভশংকর* নলমানদণ্ড প্রচলিত ছিল।

মধ্যযুগে স্থানীয় শাসকরা বিশেষ কিছু মূল্যবান দারুবৃক্ষ প্রজাতিকে 'রাজবৃক্ষ' ঘোষণা করতেন। মুসলিম প্রচারকগণ ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি কৃষির ব্যাপক চাষাবাদে গুরুত্ব দিয়েছিল। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উপমহাদেশের বনসমূহ সবাই অবাধে ব্যবহার করতে পারতো। সুলতানি আমলে সুফি, পীর বা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা ভূমি পুনরুদ্ধার ও মানব বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করা হতো। তারা জনগণের কাছে যেহেতু খুব গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাই অনাবাদী ভূমি পরিষ্কারের বিষয়টি সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠে। এ সময় সুন্দরবন ভূমি ব্যবস্থাপনা ইসলামি শাসক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গ তথা পীরদের অধীনে ছিল। খান জাহান, মুবাররা গাজী, জিন্দা গাজী, মেহের আলী ও উমর শাহ প্রমূখ সুফি সাধক ব্যক্তিবর্গ ইসলাম প্রচারে এই বনভূমি ব্যবহার করেছেন। মোগল আমলে বনভূমি পুনরুদ্ধারে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। যখনই বনের কোনো অংশ যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব উৎপাদনের জন্য পরিষ্কার করা হতো তখনই সেটি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় একীভূত হতো এবং একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে ঘোষণা করা হতো যার নাম ছিল পরগণা। এসময় স্থানীয় মোগল নেতৃবৃন্দ বন ইজারা দিতেন। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি ও বাবরের দিনলিপি থেকে জানা যায়, মোগল প্রশাসন সুবা বাংলার মধ্যে জান্নাতাবাদ, খলিফাবাদ ও বাজুহা ছিল বনভূমিপূর্ণ অঞ্চল। রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের নব

উদ্ধারকৃত ভূমিসমূহ মোগল প্রশাসনিক ইউনিট 'পরগণা'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৭৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে 'আমবারাবাদ' নামে ১৭৩৪ সালে সুন্দরবনে প্রথম পরগণা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মোগল আমলে কৃষির উপর জোর দেওয়া হয় এবং কৃষিতে রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে অধিক কৃষি কাজের জন্য অনেক বন উজাড় করা হয়।

মোগল আমলের শেষে আসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং পরে ব্রিটিশ শাসন। গোড়ার দিকে, অর্থাৎ অষ্টাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত জাহাজ নির্মাণ ও রেলের স্লিপার তৈরির জন্য ব্যাপক পরিসরে বনের কাঠের ব্যবহার শুরু হয় এবং এ সময় বন সংরক্ষণের কোন প্রচেষ্টা ছিল না। ১৮৭৯ সালে সুন্দরবনের ৪,৮৫৬ বর্গ কিলোমিটার (১৮৭৫ বর্গ মাইল) এলাকাকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ১৮৯৩ সালে হিনিং (Heining) সুন্দরবনের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ১৮৮০ সালে প্রথমবারের মতো এখানে গুলিছোঁড়া, শিকার ও মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়। অ্যাণ্ডারসন পদত্যাগ করার পর ১৮৬৭ সালে লিডস (Leeds) বন সংরক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৭২ সালে ড. শ্লিচ (Dr Schlich) বন সংরক্ষক হিসেবে যোগদানের পর ৫টি বন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় । ফরেস্ট সার্ভিসের নির্বাহী ও নিয়ন্ত্রণ শাখায় নিয়োগের জন্য ১৮৭১ থেকে ১৯০০ সালের কারিগরি শিক্ষা ও কর্মী প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১৫ শতক থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত সুন্দরবনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা জটিলতর হতে থাকে। বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ও অধিকৃত ভূমির মালিকানায় তালুকদার, জমিদার ও সরকারের লভ্যাংশের হিসাব নির্ধারনে ক্রমান্বয়ে সুন্দরবনের আয়তন সংকুচিত হতে থাকে। ১৭৬৪ সালে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রায় দুই শতাব্দী ধরে বাংলায় আধিপত্য বিস্তারকারী মোগল শক্তির উপর জয়লাভ করে। বর্ধিত চাষের আওতায় জমি আনার চিন্তাভাবনা নিয়ে, ব্রিটিশ সরকার এবং বাঙালি উভয়ই সীমান্তকে আরও দক্ষিণে ঠেলে দেওয়ার জন্য কাজ করেছিল। ১৭৭০ সালের মধ্যে, বাঙালিদের বিভিন্ন মেয়াদে জমি দেওয়া হয়েছিল যারা 'বর্জ্য জমি' (waste land) পুনরুদ্ধার করবে। যদিও তুর্কি শাসনের আগে চাষাবাদের জন্য জমি পরিষ্কার করা শুরু হয়েছিল, ব্রিটিশরা কৃষিজমিতে রূপান্তর এবং সুন্দরবনের আয়তন পরিবর্তনের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। প্রতাপাদিত্যের সময় [প্রাক-পর্তুগিজ এবং স্পষ্টতই প্রাক-ব্রিটিশ], যেখানে বদ্বীপ নির্মাণ প্রক্রিয়াগুলো পরিপক্কতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল সেখান থেকে বনগুলো পরিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামলে নিচু এলাকাগুলোও দখল করা হয়েছিল এবং বেষ্টনী বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। সুন্দরবনে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে এই দুটি শাসনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এটাই। Richards, J.F. and Flint, E.P. (1990). Long-term transformations in the Sundarbans wetlands forests of Bengal শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ আমলে ভূমি রাজস্ব এবং অন্যান্য বনজ দ্রব্যের চাহিদার পাশাপাশি, সুন্দরবনের বৃহৎ আকারের রূপান্তরের কারণটি ছিল এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে: "এটি দুর্ভেদ্য বনভূমিতে আচ্ছাদিত একটি ভূমি, জন্তু এবং সরীসৃপের সমস্ত বর্ণনার জঘন্য আস্তানা... তাই শুধু ... অরণ্য উজাড় করে বনকে ধানের জমিতে রূপান্তরিত করে উন্নত করা"। এভাবে দেখা যায় দীর্ঘ সময় ধরে বনের অবনতি ঘটেছে;

চাষের উপর এই ধরনের সক্রিয় মনোযোগের ফলে পরবর্তীতে যে প্রভাবগুলো বিকাশ লাভ করবে সে সম্পর্কে খুব কম ভাবনা ছিল। ফলে দেখা যায় গত তিনশত বছরের মধ্যে, দুই শিংওয়ালা গণ্ডার (সর্বশেষ ১৮৭০ সালে রেকর্ড করা হয়েছিল), ভারতীয় গণ্ডার, ভারতীয় চিতা, সোনার ঈগল, গোলাপী মাথার হাঁস ও বুনো মহিষ (১৮৯০ সালে শেষ দেখা যায়) সুন্দরবনে বিপন্ন হয়ে গেছে।

পারগিটারের বর্ণনামতে, ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের ধারাবাহিকতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চব্বিশ পরগণা অনুদান দেওয়ার সময় এই অঞ্চল এমনকি কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ বন জঙ্গল এবং অনাবাদী ছিল। এ প্রেক্ষিতে ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য কালেক্টর জেনারেল Mr. Claude Russell ব্যক্তি পর্যায়ে নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে জমি ইজারা অনুদান প্রদান শুরু করেন। এই বন্দোবস্ত রীতিতে ১৭৭০ থেকে ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত ইজারা দেয়া হয়। শর্তের ক্ষেত্রে বলা হয়- ইজারাদারদের সাত বছরের জন্য করমুক্ত চাষাবাদের সুযোগ দেয়া হবে। করমুক্ত সময়সীমার পর জমির অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি জরিপ পরিচালনা করা হবে এবং এর ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ের জন্য বিঘা প্রতি ধারাবাহিকভাবে ১২, ৮ ও ৬ আনা হারে খাজনা প্রদান করতে হবে। মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুনরুদ্ধারকৃত প্রথম সারির উৎকর্ষ ভূমির ক্ষেত্রে উৎপাদনের ৭৫% এবং এর পরবর্তী স্তরের ভূমির জন্য ৭০% সরকারকে খাজনা হিসেবে প্রদান করতে হবে। এভাবে প্রতি দশ বছর পর পর ভূমি পুনরুদ্ধারের পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং উদ্ধারকৃত নব ভূমি পূর্বের নির্ধারিত হারে চাষাবাদের জমির সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই ধরণের ব্যবস্থাকে বলা হতো *পতিতাবাদি তালুক বা পতিত জমির চাষ (The Cultivation of waste or fallow land)*। পরবর্তীতে ১৭৭৫-১৭৭৬ এবং ১৭৭৯-১৭৮০ মেয়াদে এই ব্যবস্থায় ভূমি যাচাই ও রাজস্ব পরিচালনা করা হয়। তবে প্রথম অবস্থাতেই এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হতে ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ সরকারের কর্মকর্তাদের মতে, যে সকল আমিনের দ্বারা জমি পরিমাপ করা হতো সেসব আমিনের পারিশ্রমিক শোধ করতেন দেশীয় তালুকদাররা। ফলে আমিনদের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যেত না এবং তারা পক্ষপাতিত্ব করতে থাকে। আমিনদের প্রতি আস্থার অভাব এবং সে সময়ে দেশে ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী পরিস্থিতি প্রভৃতির কারণে এই পদ্ধতিতে প্রকৃত পরিমাপের ব্যাপারে কোম্পানি সন্দিহান ছিল। কি পরিমাণ ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে এবং আবাদি জমির পরিমাণের জন্য ১৭৮৩ সালে একটি যথাযথ ভূমি পরিমাপ পরিচালনা করা সম্ভব হয়। এই পরিমাপের ভিত্তিতেই এই এলাকায় পরবর্তীতে ১৭৯০ সালে দশসনা বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

১৮৭৫ সালে বাংলায় পাঁচটি বন বিভাগ তৈরি হলে সুন্দরবন বন ব্যবস্থাপনার অধীনে আসে। নতুন গঠিত ফরেস্ট সার্ভিস সমগ্র উপমহাদেশে সরকারি বনাঞ্চল জরিপ এবং ম্যাপিং করার কাজে ব্যস্ত ছিল। সুন্দরবন এই নতুন শাসনের অধীনে এসেছে। ১৮৯০ সালের মধ্যে চব্বিশ পরগণায় মোট ৪,৪৮০ বর্গ কি.মি. সংরক্ষিত বন ছিল। বন বিভাগ চব্বিশ পরগণার জোয়ারের বনগুলোকে সংরক্ষিত না করে সুরক্ষিত হিসেবে মনোনীত করে। উদ্দেশ্য ছিল হয় এই জমিগুলোকে সাফ করা এবং চাষের জন্য উপযোগী করে ইজারা দেওয়া, অথবা এটি সংরক্ষিত বন

হিসাবে কাঠ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় স্থানান্তর করতে পারে। চব্বিশ পরগণা জেলার পশ্চিম সুন্দরবনের জন্য, সংরক্ষিত বন হিসাবে মনোনীত এলাকাটি ১৮৯০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ৪,৪০০ থেকে ৪,৫০০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে তুলনামূলকভাবে স্থির ছিল। বলা হয় সংরক্ষিত বা সংরক্ষিত বন হিসেবে উপাধি প্রদান ছিল মূলত একটি হস্তক্ষেপ যা সুন্দরবনের বনাঞ্চলকে জমির বাজারে শক্তি এবং পুনরুদ্ধার চাপের বিরুদ্ধে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। ফলে সুন্দরবনের বনভূমি নিম্ন বাংলায় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া শিল্প হিসেবে পরিচালিত একটি উৎপাদন ইউনিট হয়ে ওঠে এবং থেকে যায়। বন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৮৯০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে সুন্দরবনের প্রায় ৪০ শতাংশ পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। মোট ৭,৫০০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে শুধু ৩,১১৫ বর্গ কি.মি. স্বতন্ত্র মালিকদের বিভিন্ন ধরনের অনুদানে বরাদ্দ করা হয়েছিল। সংরক্ষিত বন থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঠ, বাঁশ এবং অন্যান্য পণ্য বিক্রয় করা হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে বড় আকারের জমি ছাড়পত্রের ঘটনা ঘটেছে; ফসলি জমি ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি দুটি বড় আকারের মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত করেঃ ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে তৎকালীন নবনির্মিত ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের উভয় দিকে উদ্বাস্তুদের ব্যাপক স্থানচ্যুতি। এই সময়ে চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবন এলাকার প্রায় ষাট শতাংশ বন বিভাগ দ্বারা শাসিত হয়েছিল। এটি দেশভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গ সুন্দরবন বন সংরক্ষণের ভিত্তি তৈরি করেছিল।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বঙ্গদেশ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) বিভক্ত হয়ে যায়। দক্ষিণ সার্কেলের বন বিভাগ (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ ও খুলনা জেলাধীন সুন্দরবন) পূর্ব বাংলার বনাঞ্চলভুক্ত হয়। আসামের সিলেট বিভাগও পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানে বিভাজিত হয়ে যায়। একজন বনসংরক্ষকের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের বন প্রশাসন গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে প্রথমে দুটি এবং পরে তিনটি বন সার্কেল যথা- পূর্ব সার্কেল, পশ্চিম সার্কেল ও উন্নয়ন সার্কেল গঠিত হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট পূর্ব সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুন্দরবন, ঢাকা ও ময়মনসিংহ পড়ে পশ্চিম সার্কেলে এবং কর্ম পরিকল্পনা ও ব্যবহার বিভাগ নিয়ে গঠিত হয় উন্নয়ন সার্কেল। বাংলাদেশ আমলে বিভিন্ন বন আইন, নীতি, নিরাপত্তা আইন, আদালত আইন ও ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বনায়ন, পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণে চেষ্টা করা হয়।

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগপ্রবণ দেশ। উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে উন্মুক্ত জলরাশির বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপে প্রতি বছরে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দূর্যোগ দেখা দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এখানে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি যেমন হুমকিস্বরূপ তেমনি বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং নানা মহামারী এদেশের নিত্য সঙ্গী। প্রাকৃতিক দূর্যোগে

সমগ্র দেশের পাশাপাশি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উপকূলীয় অঞ্চল। সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় এর ভূমিকা সর্বাগ্রে লক্ষণীয়। সুন্দরবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব এর সংরক্ষণমূলক ভূমিকা। এ বন উপকূলভাগের ভূমিক্ষয়রোধ করে, উপকূলীয় এলাকা পুনরুদ্ধার করে এবং নদীবাহিত পলি স্তরীভূত করে। সুন্দরবন অঞ্চলে মাটির উপরে এবং নিচের বায়োমাস কার্বন স্টকের অত্যন্ত উচ্চ ঘনত্ব রয়েছে, যার ঘনত্ব জাতীয় গড় থেকে যথাক্রমে ৩.৪ গুণ এবং ৯.৬ গুণ বেশি। বাংলাদেশ Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change,**Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, 2019**-এর তথ্যমতে সুন্দরবনের পাঁচটি কার্বন পুলের মোট কার্বন ঘনত্ব হল ৩৪৫ টন বা হেক্টর (মাটি থেকে ১ মিটার গভীরতা)। ৫০ মিটার থেকে দুই কিলোমিটার চওড়া ম্যানগ্রোভ বন জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতাকে ৪ সেন্টিমিটার থেকে ১৬.৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। আর ৫০ মিটার থেকে ১০০ মিটার চওড়া বাইন ও কেওড়ার বন ২৯ শতাংশ থেকে ৯২ শতাংশ পানির গতিবেগ হ্রাস করতে পারে।সুন্দরবনের কেওড়া, বাইন আর সুন্দরী গাছ যেকোনো উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসের গতিবেগ কমিয়ে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

ম্যানগ্রোভ বাতাসের উচ্চতা এবং শক্তি হ্রাস করে এবং তাদের মধ্য দিয়ে যাওয়া তরঙ্গ স্ফীত করে, তাদের পলি ক্ষয় করার ক্ষমতা হ্রাস করে এবং সমুদ্রে তৈরি হওয়া বাতাসের দেয়ালের মতো কাঠামোর ক্ষতি করে। এটি জলের পৃষ্ঠ জুড়ে বাতাসকেও হ্রাস করে এবং এটি তরঙ্গের বিস্তার বা পুনর্গঠনকে বাধা দেয়। বিভিন্ন বয়স এবং আকারের বিভিন্ন প্রজাতির ম্যানগ্রোভগুলি তরঙ্গের উচ্চতা কমাতে সবচেয়ে বেশি কার্যকর। ম্যানগ্রোভ মাটিক্ষয় কমায় এবং মাটিকে একত্রে আবদ্ধ করে। ম্যানগ্রোভের ঘন শিকড় মাটিকে বাঁধতে এবং গড়তে সাহায্য করে। উপরের মাটির শিকড়গুলি জলের প্রবাহকে মন্থর করে, পলি জমাতে উৎসাহিত করে এবং ক্ষয় কমায়। জটিল বায়বীয় রুট সিস্টেমগুলি জলের প্রবাহকে ধীরগতিতে সাহায্য করে, পললকে স্থির হতে দেয় এবং পললকে ক্ষয় না করে বর্ধিত হতে দেয়।

ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবন যেমন ঝড়বৃষ্টির সময় ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি কমাতে সাহায্য করে পাশাপাশি আর্থিক মূল্যের দিক দিয়ে ঝড়ের ঢেউ থেকে গৃহস্থালির সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষার মাধ্যমে এর গুরুত্ব রয়েছে। এ সংক্রান্ত গবেষণা ভারতে বেশি করা হলেও বাংলাদেশে খুবই কম। তাই বাংলাদেশের সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে পরিবারের সম্পদ এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির নির্ণয়ে Storm-Protection Function of Sundarban Mangroves in Bangladesh শীর্ষক গবেষণায় দেখানো হয় যে, মানুষের বসবাসের ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামোর পরিমাণ ম্যানগ্রোভের কাছাকাছি স্থানে কম ছিল। ঝড়ের তীব্রতা বরগুনা, বাগেরহাট, খুলনা এবং সাতক্ষীরা অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। এই গবেষণায় বলা হয় ঘূর্ণিঝড় এবং ঝড়-বৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত পারিবারিক স্তরের ক্ষতির পরিমাণ ম্যানগ্রোভের এক

কিলোমিটার প্রস্থের মধ্যে কম হয়। এছাড়াও ম্যানগ্রোভের সুরক্ষা মান রিপোর্টে দেখানো হয় যে, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ক্ষয়ক্ষতি এবং এ সংক্রান্ত খরচ বাঁধ দ্বারা সুরক্ষিত গ্রামগুলির তুলনায় অন্যান্য গ্রামে বেশি।

বাংলাদেশ সুন্দরবনের অভ্যন্তরে কোনো মানব বসতি না থাকলেও এর প্রান্তে প্রায় ৮ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। যার মধ্যে প্রায় ২৮% বন থেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রধানত নিযুক্ত রয়েছে। যেমন গোলাপাতা সংগ্রহ, কাঠ সংগ্রহ, মধু সংগ্রহ, মাছ ধরা, চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করা ও ভেষজ লতাপাতা। সুন্দরবনের যে স্থানে বনজীবী মানুষ বসবাস করছে সেই স্থানটিকে Sundarban impact zone হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এভাবে বাংলাদেশের সুন্দরবন ইমপ্যাক্ট জোনের মধ্যে বসবাসকারী জনসংখ্যার একটি বড় অংশ নির্ভরশীল প্রাকৃতিক সম্পদের উপর এবং তাদের জীবিকা জলবায়ু এবং প্রকৃতির সাথে সরাসরি যুক্ত। সুন্দরবনকে কেন্দ্র করেই তারা গড়ে তুলেছে একটি অঞ্চলের ঐতিহ্য, গড়ে তুলেছে ধর্মীয় সৌহার্দবোধ। সুন্দরবন যেন তাদের মাতৃসূত্রে গাঁথা। এই বনই তাদের জন্মান্তরের সাথী। নগরীর উন্নততর জীবন, যান্ত্রিক সভ্যতা তাদের তেমন আকৃষ্ট করতে পারে না। তাদের রয়েছে বৈচিত্রময় সামাজিক জীবনধারা। নিজস্ব ভাষা, বৈবাহিক রীতি, ধর্মীয় সম্প্রীতি, বনবিবির প্রতি অগাধ বিশ্বাস সর্বোপরি বনই তাদের বেঁচে থাকার আশ্রয়স্থল।

আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মপরিধি যত বৃদ্ধি পাচ্ছে রাজনৈতিক অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু তত সম্প্রসারিত হচ্ছে। রাজনৈতিক অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্র এবং এর জনগণ। এক্ষেত্রে জনগণের কর্মসংস্থানে সুন্দরবন হাজার বছর ধরে রেখে আসছে মুখ্য ভূমিকা। নাগরিকের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধনে সম্পদ আহরণ এবং বণ্টনের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উৎস হলো সুন্দরবন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রাজনৈতিক অর্থনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্যবিষয়। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার প্রাপ্ত সম্পদ, সামর্থ্য এবং প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনা করে বহুমুখী অভাব পূরণের প্রয়াস চালায়। তাই রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সব সময় স্থান পায় সুন্দরবন। কৃষি ও বনায়ন যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের দায়িত্বই হচ্ছে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি নানা অর্থনৈতিক ব্যাধি সরকারের উক্ত কল্যাণমূলক কাজে বাঁধার সৃষ্টি করে। কিভাবে এবং কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে উক্ত উপসর্গ দূর করে নাগরিক কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় সেক্ষেত্রে সুন্দরবন রাষ্ট্রের আলোচনায় স্থান পায়। সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটে বাজেটের মাধ্যমে। সরকারে রাজস্ব বাজেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো সুন্দরবন। রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্যে রাজনীতি, ধর্ম, আইন, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসকল দিক কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। সুন্দরবনকেন্দ্রিক সমন্বিত জীবন ব্যবস্থা, লোকসংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস, উৎসব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্র এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ঐতিহ্য হিসেবে পর্যটনকে আকর্ষণ করে থাকে ।

বনায়ন খাত দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট সহায়তা করতে সক্ষম। Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change কর্তৃক পরিচালিত **Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory** শীর্ষক রিপোর্টে বনায়নের আর্থিক গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয় বৃক্ষ ও বন নারীদের কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দেশের মোট নারী জনসংখ্যার প্রায় ৬৫% প্রাথমিক গাছ এবং বনজ পণ্য সংগ্রহের সাথে জড়িত। সংগৃহীত প্রাথমিক গাছ এবং বনজ পণ্যের মোট মূল্য হল বর্তমান মূল্যে পরিমাপ করা ২০১৭-১৮-এর জাতীয় মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) এর ৩.১১%। বাজার মূল্যে পরিমাপ করা ২০১৭-১৮-এর জাতীয় মোট জাতীয় আয়ের (GNI) ১.২৯% অবদান রাখে গাছ এবং বন। জাতীয় ফলমূল প্রাথমিক গাছ এবং বনজ পণ্যের মোট মূল্যের প্রায় ৪৭% অবদান রাখে। এক্ষেত্রে সুন্দরবন অন্যতম ভূমিকা পালন করে।

গ্রাম অঞ্চল মোট সংগৃহীত পণ্যের বেশিরভাগই সরবরাহ করে সুন্দরবনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক বন। বলা হয় জ্বালানি হিসেবে প্রায় ৮১% কাঠ এবং ৯০% পাতা সরবরাহ করে বনগুলো। বনজ সম্পদের আর্থিক গুরুত্ব নির্ণয়ে দেখা যায় বাংলাদেশে সংগৃহীত প্রাথমিক গাছ ও বনজ পণ্যের মোট মূল্য বছর প্রতি ৬,৯৯,৮৯৪ BDT/বছর, এবং গড়ে প্রতিটি পরিবার ২১,১৭১ BDT/বছর সংগ্রহ করেছে। সুন্দরবন এলাকায় পরিবার প্রতি জীবিকার ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ গড় মূল্য রয়েছে যেখানে গ্রাম অঞ্চলে সর্বোচ্চ মোট মান দেখা যায় মৎস্য পণ্য সংগ্রহে। সুন্দরবনের পরিধি এবং পার্বত্য অঞ্চলে, জ্বালানি পণ্য (যেমন জ্বালানী কাঠ, পাতা, ডালপালা, শাখা এবং অন্যান্য শক্তি পণ্য) সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে, যা জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবদানকারী খাত। বন থেকে সংগৃহীত ফল ছিল NWFP এর মোট মূল্যের ৪৯%, তারপরে বাঁশ (১৪%) এবং মধু (১১%)।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে যেমন, ঠিক তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতেও সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুন্দরবন দেশের বনজ সম্পদের একক বৃহত্তম উৎস। এই বন কাঠের ওপর নির্ভরশীল শিল্পকারখানায় কাঁচামাল জোগান দেয়। এছাড়াও কাঠ, জ্বালানি ও মণ্ডের মতো প্রথাগত বনজসম্পদের পাশাপাশি এখান থেকে নিয়মিত বিপুল পরিমাণে আহরণ করা হয় ঘর ছাওয়ার গোলপাতা, মধু, মৌচাকের মোম, মাছ, কাঁকড়া এবং শামুক-ঝিনুক। বৃক্ষরাজি পূর্ণ সুন্দরবনের এই ভূমি একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় আবাসস্থল, পুষ্টি উৎপাদক, পানি বিশুদ্ধকারক, পলি সঞ্চয়কারী, ঝড় তুফান প্রতিরোধক, উপকূল স্থিতিকারী শক্তিসম্পদের বিপুল আধার এবং দারুণ সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্র। এই বন প্রায় ৩০০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৪২৫ ধরনের প্রাণী এবং ২৯১ জাতের মাছের আবাসস্থল। প্রায় ৩৫ লাখ মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল বর্তমানে। এই বিশাল জনগোষ্ঠী বেঁচে আছে সুন্দরবনকে ঘিরে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে বিশ্বব্যাপী এক ধরনের আগ্রহ এবং চাঞ্চল্য রয়েছে। বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের একমাত্র আবাসস্থল সুন্দরবন। পর্যটন কেন্দ্রের

উপযোগিতা থেকেও সুন্দরবনের গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রতি বছর দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পর্যটক ভিড় করেন 'ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন'-এ। এখানে বিদেশি পর্যটকদের সমাগমের ফলে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রাও যোগ হয় আমাদের জাতীয় আয়ে। অবহেলার মতো অঙ্ক নয়। প্রায় ৩৫ লাখ দরিদ্র জনগোষ্ঠী জীবিকার জন্য পুরোপুরি বা আংশিকভাবে সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল। সমীক্ষা থেকে জানা যায়, সুন্দরবন ও এর আশপাশের পেশাজীবীরা প্রধানত সাতটি পণ্য বন থেকে সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তারা প্রধানত জ্বালানি কাঠ, মধু ও মোম, গোলপাতা, মাছ, চিংড়ি ও চিংড়ি পোনা, কাঁকড়া আহরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এই সাত পণ্য আহরণের মাধ্যমে এক হাজার ১৬১ কোটি টাকার সমপরিমাণ আর্থিক সম্পদ পাওয়া যায় সুন্দরবন থেকে।

সুন্দরবনের বিভিন্ন অবদানের পাশাপাশি আর্থিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করছে তার পর্যটনসেবার মাধ্যমে। বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের সৌন্দর্য দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। বন ও বন্য পশু পাখির আকর্ষণ এবং ধর্মীয় উৎসব রাসমেলা ও বন বিবির মেলা দেখতে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা সুন্দরবন ভ্রমণ করেন। বছরে সুন্দরবনের পর্যটন খাত থেকে আয় হয় ৪১৪ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা আমাদের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, দারিদ্র্য পরিস্থিতি এবং মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে জড়িত। একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রম, শিল্পায়ন, নগরায়ন, কৃষির আধুনিকায়ন, পানির অব্যবস্থাপনা ও সেচ প্রযুক্তি তথা রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নানা প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভাণ্ডারকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা-বাণিজ্য, অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্প বর্জ্য নির্গমন এবং মাত্রাতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ বাংলাদেশের পরিবেশ সমস্যাগুলোকে গভীরতর করেছে। উপযুক্ত জাতীয় নীতি, আইনের অভাব এবং এগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়কে আরও ত্বরান্বিত করেছে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত (বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, খরা, উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা তথা ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ) পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু বিপন্ন দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম করেছে। তাই সুন্দরবন অঞ্চলকে কিভাবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা যায়, বনের বৈচিত্র্য রক্ষা করে তাকে ব্যবহার করে কিভাবে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়, এ সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পরিবেশের ক্ষতি করে আয় বাড়িয়ে নয়; বরং সুন্দরবনকে রক্ষা করে আয় বাড়ানো উচিত। এক্ষেত্রে দেখা যায় বন বিভাগের কার্যকর ভূমিকা, বিদ্যমান আইন ও নীতির বাস্তবায়ন, সমন্বয় (আন্তঃবিভাগীয়, IGO, NGO, ইত্যাদি), বিকল্প জীবিকা, সুশাসন, গবেষণা ও উন্নয়ন, টেকসই বনব্যাবস্থাপনা প্রভৃতির মাধ্যমে দেশের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবনকে রক্ষা করার অন্যতম মাধ্যম ।

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ প্রারম্ভিকা:

বাংলার ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে প্রাচীন ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় বলেন- *একদিকে সু-উচ্চ পর্বত, দুইদিকে কঠিন শৈলভূমি, আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য- ইহাই বাঙালির ভৌগোলিক ভাগ্য।.... সাম্প্রতিক বাঙলার উত্তরে তরাই বনভূমি, দক্ষিণে সুন্দরবন ও তৃণাস্তীর্ণ জলাভূমি।*[১] এই উক্তির যথার্থতাই যেন দক্ষিণ অংশের সুন্দরবন। সুন্দরবনই বাঙালির ভৌগোলিক ভাগ্য নির্ধারণ করে চলেছে হাজার বছর ধরে। বাঙালির ভৌগোলিক ভাগ্যে পরম পাওয়া এই সুন্দরবন। প্রাচীনকালের বঙ্গ জনপদের প্রাণকেন্দ্র গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ এলাকায় অর্থাৎ গঙ্গারিডাই অঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম জোয়ার বিধৌত গরান বনভূমি সুন্দরবন। রাষ্ট্রসীমা প্রাকৃতিক সীমাকে অবজ্ঞা করে চলার রীতিতে পরিণত হয়েছে, সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই লক্ষ্য করা যায়।[২] বর্তমানে সাতক্ষীরা, খুলনা এবং বাগেরহাট জেলার অংশবিশেষ জুড়ে বাংলাদেশের সুন্দরবন বিস্তৃত। শাখা প্রশাখার মত ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নদী আর খালে পরিপূর্ণ সুন্দরবন প্রতিবেশ ব্যবস্থা। তাই এটি একটি স্বতন্ত্র প্রতিবেশ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।[৩] নানা ধরণের গাছপালার চমৎকার সমারোহ ও বিন্যাস এবং বন্যপ্রাণীর অনন্য সমাবেশ এই বনভূমিকে চিহ্নিত করেছে এক অপরূপ প্রাকৃতিক নিদর্শন হিসেবে যা ১৯৯৭ সালের ৭ ডিসেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।[৪] ১৮৭৬ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সুন্দরবনের কমিশনার W.W. Hunter তাঁর A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

> *The Sundarbans stretch out as one vast alluvial plain, abounding in morasses and swamps now gradually filling up, and intersected by large rivers and estuaries running from north and south. These rivers are connected with each other by a network of branches; and the latter, in their turn, with each other by innumerable smaller channels which interlace in every direction. The Sundarbans may therefore be*

---

১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১২ (৫ম সংস্করণ), পৃ. ৭১।

২. এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় বলেন, প্রাকৃতিক সীমা যেমন, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি কখনও কখনও রাষ্ট্রসীমা নির্দেশ করে সন্দেহ নাই; প্রাচীন ইতিহাসে তাহাই ছিল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু, বর্তমান কালে রাষ্ট্রসীমা অনেক সময়ই প্রাকৃতিক সীমাকে অবজ্ঞা করিয়া চলে। বর্তমান যন্ত্র-বিজ্ঞান রাষ্ট্রকে সেই অবজ্ঞার শক্তি দিয়াছে। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১২ (৫ম সংস্করণ), পৃ. ৬৭-৬৮।

৩. নিয়াজ আহমদ সিদ্দিকী, সুন্দরবন, *বাংলাপিডিয়া*, অনলাইন ভার্সন (https://bn.banglapedia.org.)

৪. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, *দূর্যোগ মোকাবিলা করছে ম্যানগ্রোভ*, কালের কণ্ঠ, ১৮ জুলাই ২০২১।

described as a tangled region of estuaries, rivers, and watercourses, enclosing a vast number of islands of various shapes and sizes"[৫]

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসেবেও বিবেচিত এই বন; এখান থেকে সংগৃহীত হয় নানা কাজে ব্যবহার উপযোগী বনবৃক্ষ, আহরিত হয় প্রচুর পরিমাণ মধু, মোম ও মাছ। এই বনকে ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের বসবাস যারা দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করতে রেখে চলেছে অসামান্য ভূমিকা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সাব-সেক্টর হিসেবে এই বনের রয়েছে অসামান্য ভূমিকা। দেশের পরিবেশ, জনজীবন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ভূমিকা পালনকারী এই বনের ঐতিহাসিক চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই গবেষণা।

গঙ্গা, পদ্মা ও মেঘনার ব-দ্বীপে প্রায় ১০,২৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে সুগঠিত পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পরবর্তীতে এটি বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশে বিভাজিত হয়ে যায়। এই বনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা রয়েছে বাংলাদেশে, বাকিটা ভারতে। সুন্দরবনের ৬,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা বাংলাদেশের সীমানাধীন এবং ৪,২৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ভারতের সীমানাভুক্ত হয়। এর পূর্বে বলেশ্বর, পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গা, রায়মঙ্গল ও কালিন্দী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও উত্তরে বিস্তীর্ণ জনপদ।[৬]

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশ। বনায়ন বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য সম্পদের একটি প্রধান খাতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা উভয় ক্ষেত্রেই এর অবদান রয়েছে। BFI (Bangladesh Forest Inventory) থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় দেশের বৃক্ষ সম্পদ Gross National (GNI)'র ১.২৯% অর্জনে অবদান রাখছে। সংগৃহীত বৃক্ষ সম্পদ এর অর্থনৈতিক মুল্য ২০১৭-১৮ সালের Gross Domestic Product'র (GDP) ৩.১১%। বৃক্ষ ও বনজ সম্পদ সামগ্রী সংগ্রহকারীদের প্রায় ৬৫% মহিলা। ৫৪% পরিবার বৃক্ষ ও বন থেকে ঔষধি উপকার পেয়েছে। সুন্দরবনের পাশে অবস্থানকারী পরিবারসমূহ অন্যান্য এলাকা থেকে অধিক আয় করে, যার অর্ধেকেরও বেশি আসে মাছ ও কাঁকড়া থেকে।[৭] বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ৪ শতাংশ এবং সমগ্র বনভূমির ৪০ শতাংশ আয়তন নিয়ে সুন্দরবন। বাংলাদেশ বনবিভাগের *Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory,* ২০১৯-এর তথ্যানুযায়ী দেশের বনাঞ্চলের প্রধান তিনটি Biomass উৎপাদনকারী বৃক্ষ প্রজাতির একটি হলো সুন্দরী। দেশের মাটির

---

৫. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol-1, Part-II, *Statistical Account of Sundarbans,* Trubner and Co. London, 1876, reprint by W. Bengal Govt. India, 1998, p. 2.

৬. সুন্দরবন ফ্লিপ চার্ট, উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা, ২০০৮।

৭. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Tree and Forest Resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, Dhaka, 2019, p-7.

উপরের বৃক্ষ সম্পদ, মাটির নিচের বৃক্ষ সম্পদ এবং মাটির মধ্যে (৩০ সেন্টিমিটার গভীরতা পর্যন্ত) সঞ্চিত কার্বনের পরিমান- ১,২৭৬ মিলিয়ন টন। এই ১,২৭৬ মিলিয়ন টন কার্বনের প্রায় ২২% বনাঞ্চলের মধ্যে, বাকিটা বন এলাকার বাহিরে অবস্থিত; ১,২৭৬ মিলিয়ন টন কার্বনের প্রায় ৫.৫% সুন্দরবনে অবস্থিত।[৮]

রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানা যায় যে, বন-জঙ্গলের সাথে অধিবাসীদের একটি সুসম্পর্ক ছিল। তারা জঙ্গলকে শুধু খাবার সংগ্রহ ও শিকারের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করতো না বরং তাদের নিরাপত্তার অন্যতম স্থল ছিল এই জঙ্গল। একারণে তারা প্রাকৃতিক এই সম্পদের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যপারে ছিল সচেতন। আর্য (৩০০০-১২০০), বৈদিক (১২০০-৫০০), মৌর্য (৩২২-১৮৫) এবং গুপ্ত (৩২০-৫৪০) খ্রিস্ট পূর্বাব্দ যুগেও জঙ্গলকে প্রাকৃতিক সম্পদের উৎসের পাশাপাশি উপাস্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। মুসলিম শাসনামলে বনকে পবিত্র হিসেবে বিবেচনা করার পাশাপাশি সম্পদ আহরণের ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্রিটিশ শাসক অন্যান্য বনাঞ্চলের ন্যায় সুন্দরবন থেকেও তাদের রাজস্ব আয়ের পথ সুগম করে। ১৭৬৫ সাল থেকে রেল যোগাযোগ ও রাজস্ব উৎপাদক জমি তৈরীর জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে জঙ্গলকাটা শুরু হয় এবং তা ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যার কারণে ২০০ বছর পূর্বেও মূল সুন্দরবনের এলাকা যেখানে ছিল প্রায় ১৬,৭০০ বর্গকিলোমিটার, বর্তমানে তা সংকুচিত হয়ে প্রকৃত আয়তনের এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছেছে যার দুই তৃতীয়াংশ পড়েছে বাংলাদেশে, বাকি অংশ ভারতে। প্রাচীনকাল থেকে মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসা এই সুন্দরবনের ঐতিহাসিক আয়তনের ভিত্তিতে বর্তমান অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণাকর্মে।

১৭৭০ সাল থেকে কালেক্টর জেনারেল ক্লড রাসেলের সময়কালে সুন্দরবনে চাষের জন্য জমি ইজারা দেয়ার প্রথা চালু হয়। এসময় দেশের জমিদারশ্রেণী অতিরিক্ত লাভের আশায় ভারতের মেদিনীপুরের ভূমিজ, ছোটনাগপুরের রাঁচি অঞ্চলের সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা ও উড়িষ্যার ময়ুরভুঞ্জ জেলার আদিবাসীসহ মাহালী, তুড়ি, গন্ধভূমিজ শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে আসেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে উৎখাত হওয়া এই মানুষগুলো সুন্দরবন অঞ্চলে ছুটে এসেছিল। এই অঞ্চলের কাঠ, মোম, মধু, লবণ লাভজনক সম্পদে পরিণত হওয়ায় সরকারি পদক্ষেপে শ্রমিকরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। এভাবে ধীরে ধীরে একদিকে যেমন বন সংকুচিত হতে থাকে অন্যদিকে জীবিকার প্রয়োজনে আশেপাশের বিভিন্ন পেশার মানুষের বনে আনাগোনা বৃদ্ধি পায়। বাওয়ালী (গোল পাতা সংগ্রহকারী), মৌয়াল (মধু সংগ্রহকারী), মালংগী (লবণ সংগ্রহকারী), ঢালি (গণ্ডারের চামড়া থেকে যুদ্ধের ঢাল প্রস্তুতকারী), ডোলাডাঙ্গা (কাঁকড়া শিকারি), শামুকখোড় (শামুক সংগ্রহকারী), জোংড়াঘুটা (গাজর আকৃতির এক ধরণের

৮. ঐ, পৃ. ৭।

শামুক ও ঝিনুক সংগ্রহকারী), মাঝি, জেলে ও কাঠসংগ্রহকারী প্রভৃতি নানা পেশাজীবী ও ধর্মের মানুষের অবস্থান এই অঞ্চলে। ঐতিহাসিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণাকর্মের মাধ্যমে।

রাজস্ব লাভের আশায় ঔপনিবেশিক সরকার ১৮২৮ সালে সুন্দরবন অঞ্চলে সর্বপ্রথম স্বত্বাধিকার লাভ করে এবং ১৮৭৫ সালে একে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে ঘোষণা করে। ১৮৭৫-৭৬ সালে বন বিভাগ ২২টি টোল স্টেশনের মাধ্যমে ৩২,৭২২ টাকার রাজস্ব আদায় করে যার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি পর্যন্ত। ঔপনিবেশিক নীতি অনুযায়ী ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই বনের কাঠ আহরণ করা হতে থাকে। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে নতুন ওয়ার্কিং প্লান অনুসারে বনের কাঠ ও রাজস্ব সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের অধীনে বন ব্যবস্থাপনায় নেয়া হয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সুন্দরবনের বনজসম্পদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্প কারখানা যেমন- খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিলস, দিয়াশলাই ও নৌকা তৈরির কারখানা। তাছাড়া এ বনভূমি জ্বালানি, ট্যানিন, ঘরের ছাউনি তৈরির উপকরণ, কাঠজাত দ্রব্য, ভেষজ উদ্ভিদ এবং পশুখাদ্যের অন্যতম যোগানদার। পাশাপাশি ভ্রমণের জন্য পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান হলো এই সুন্দরবন। অর্থনীতিতে অসামান্য ভূমিকা পালনকারী এই বনের ব্যবস্থাপনা, আর্থিক অবদানের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে সুন্দরবন যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তেমনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম একটি সাব-সেক্টর হিসেবে কাজ করেছে এই বন। নিরাপদ আশ্রয়ে যুদ্ধ করার অন্যতম কেন্দ্র ছিল এই বন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণাকর্মটিতে।

১. ২ গবেষণার বিভিন্ন দিক

১.২ (ক) গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: তথ্যের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্রের সাহায্যে বাংলাদেশের পরিবেশ, সামাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে সুন্দরবনের গুরুত্ব ও বর্তমান অবস্থা তুলে ধরাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। দেশের বনজ সম্পদ হিসেবে সুন্দরবন এবং মানুষের সাথে সুন্দরবনের নিবিড় সম্পর্ক তুলে ধরা আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য। পাশাপাশি এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো সুন্দরবন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে নিয়ে আসা এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অধিকাংশ সময় দেখা যায় এই অঞ্চলের মানুষ সরকারি বিভিন্ন জরিপ গণনারও বাইরে থাকেন। তাই তাদের সংগ্রাম, বেঁচে থাকা, প্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় তাদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা এই গবেষণার অন্যতম একটি লক্ষ্য।

১.২ (খ) সংশ্লিষ্ট গবেষণাসমূহের পর্যালোচনা: সুন্দরবনের ইতিহাস নিয়ে একক কোনো গবেষণাগ্রন্থ পাওয়া যায়নি এখন পর্যন্ত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যথা- পরিবেশ বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞানসহ সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দরবন নিয়ে বিস্তর গবেষণা হচ্ছে দেশ বিদেশে। তবে ইতিহাসের দৃষ্টিকোন থেকে সুন্দরবন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো গ্রন্থ বা গবেষণা হয়নি। ঐতিহাসিক **নীহাররঞ্জন রায়**'র ***বাঙালির ইতিহাস: আদি পর্ব*** গ্রন্থটি ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। সুন্দরবন নিয়ে বিস্তর আলোচনা না থাকলেও গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে ***বস্তুভিত্তি: ইতিহাসের গোড়ার কথা*** অংশে সুন্দরবনের গঠন প্রক্রিয়া, বাংলার ভৌগোলিক সীমা, আদি গঙ্গা, ছোট গঙ্গা, বড় গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, বাংলার খাঁড়ি, ভূ-প্রকৃতি, জলপথ ও জনপদ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে উৎস নির্ভর বিশ্লেষণ-বিচার-ব্যাখ্যা অনুযায়ী মূল উৎসের সঙ্গে গভীর, ঘনিষ্ঠ পরিচয় রেখে গভীর ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমে আলোচনা করেছেন। তবে সুন্দরবন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো আলোচনার আলোকপাত গ্রন্থটিতে নেই। **সতীশচন্দ্র মিত্র**'র দুই খণ্ডের ***যশোহর খুলনার ইতিহাস*** গ্রন্থটি ১৪১৮ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে পলিমাটি বদ্বীপ, নদী সংস্থান, বদ্বীপের প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বিশেষত্ব, সুন্দরবন, সুন্দরবনের উত্থান-পতন, সুন্দরবনের মনুষ্যাবাস, সুন্দরবনের জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, জঙ্গলা ভাষা, বঙ্গের প্রাচীনত্ব, বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসপর্ব প্রাচীনকাল থেকে পাঠান পর্ব পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, তিনি গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক ইতিহাস এবং যশোর খুলনা সংক্রান্ত আলোচনায় মূল আলোকপাত করেছেন। এখানে সুন্দরবন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গবেষণা সমূহে পরিবেশ, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এই বনের অবদান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়নি। **এ. এফ. এম, আব্দুল জলীল** সম্পাদিত ***সুন্দরবনের ইতিহাস*** গ্রন্থটি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে সুন্দরবনের ভৌগোলিক পরিচিতি, ইতিহাস, জীববৈচিত্র্য, রূপবৈচিত্র্য, ভ্রমণ বিষয়ক, শিকার-শিকারী, পর্যটন শিলালিপি ও ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মন্তব্যের বিষয় এই যে, গ্রন্থটিতে আলোকচিত্রবহুল আলোচনা রয়েছে তবে যথাযথ উৎস নির্দেশের আলোকে আলোচনা নেই। গ্রন্থটির অধিকাংশ বর্ণনা প্রত্যক্ষ নির্ভর যা পরবর্তীতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবী রাখে। তবে গ্রন্থটি মৌলিক উৎস হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **ড. দেবব্রত নস্কর**'র ***সুন্দরবন সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতির অন্বেষণ*** গ্রন্থটি কলকাতা দে'জ পাবলিশিং থেকে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে তিনি সমাজ, সংস্কৃতি, উৎসব, অনুষ্ঠান, সম্প্রদায়গত সংস্কৃতি প্রভৃতি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তবে উল্লেখ্য যে, গ্রন্থটির আলোচনা মূলত কলকাতার সুন্দরবন অংশ নিয়ে। এখানে শুধু সাংস্কৃতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে সুন্দরবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরতে গ্রন্থটি অতুলনীয়। ফলে দেখা যায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে সুন্দরবনের এ দিকগুলো আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাই এই গবেষণার মাধ্যমে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.২ (গ) গবেষণার পরিধিঃ পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, সুন্দরবন বর্তমান বিশ্বে খুবই আলোচিত বিষয় কারণ এটি বর্তমানে প্রায় বিপর্যয়কর অবস্থায় বিদ্যমান। সুন্দরবন বর্তমানে তার ঐতিহাসিক অবস্থানে নেই এবং এখনো ক্ষীয়মান অবস্থায় চলছে যা পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতির জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই এর গৌরবময় অবস্থান ও ভূমিকার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বন ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, সুলতানি, মোগল ও ব্রিটিশ আমলের সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার ইতিহাস দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই পরিধির আলোকে সুন্দরবনের পরিবেশ, জনজীবন, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক অবদানের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.২ (ঘ) গবেষণা বিষয়ের জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব ও যৌক্তিকতাঃ জাতীয় পর্যায়ে বন ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই গবেষণা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। সুন্দরবন বাংলাদেশের রক্ষাকবচ এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে এবং সুন্দরবনের প্রতি যত্নশীল হওয়ার অনুপ্রেরণা ও তাগিদ যোগাবে। পাশাপাশি বৈশ্বিক পরিবেশ বিপর্যয় রক্ষায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সহায়তাকরণ এবং বনায়ন খাতকে টেকসই করতে সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে বনজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অগ্রসর করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবস্থান তৈরিতে সহায়ক হবে। বনজীবীদের বিভিন্ন আচার-ঐতিহ্য, অনুষ্ঠান দেশের মূল ধারার সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হবে, সংস্কৃতির বিলোপ থেকে রক্ষা পাবে এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যবোধ বৃদ্ধি পাবে।

১.২ (ঙ) গবেষণা পদ্ধতিঃ গবেষণা পদ্বতির প্রথম ধাপ হিসেবে বিষয় সংশ্লিষ্ট যে সকল গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে (Secondary Literature) সেগুলো সার্ভে করা হয়। এছাড়া ব্রিটিশ শাসনামলের বন ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে বর্তমান সরকারের বন ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সরকারি নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। তবে এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারসমূহ অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সেই সাথে গবেষণা এলাকা ভ্রমণ, এলাকার জনগণের অভিমত ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সুন্দরবনের ভূমিকা, সুন্দরবনকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার নানা দিক এই গবেষণায় তুলে ধরার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

১.২ (চ) উৎস সংগ্রহ ও পর্যালোচনা

মৌলিক উৎস বা প্রামাণ্য উৎসঃ প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ, সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ, আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন পরিসংখ্যান, জনশুমারিসহ বিভিন্ন শুমারি, ভূমি রেকর্ড, বন বিভাগের বিভিন্ন রিপোর্ট, সংবাদপত্র, আইন, চুক্তি, দাপ্তরিক চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা প্রভৃতি থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎসের সঠিকতা নির্ণয়ের জন্য ***কি, কেন, কোথায়, কে, কখন, কিভাবে*** প্রভৃতি প্রশ্নের আলোকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে। তাছাড়া সুন্দরবনপ্রেমী এবং

সুন্দরবনের ইতিহাসপ্রেমী গবেষকদের বিভিন্ন সংগঠনে উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্য ও আলোকচিত্র থেকে তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে মৌলিক উৎস সংগ্রহ: সুন্দরবন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার যেমন; বনজীবী, সুবিধাভোগী গোষ্ঠী, বন বিশেষজ্ঞ, বনবিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারী, সমাজসেবী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক প্রমূখ পর্যায়ে ৯ টি কর্মশালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পুরুষ, মহিলা ও যুবক সকলের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মশালা: সুন্দরবনের সাথে জড়িত স্টেকহোল্ডারদের বিশেষভাবে বনজীবী পুরুষ এবং মহিলাসহ (১০-২০%) মোট ৫০ জনের নমুনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। কর্মশালাগুলো এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাতে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই অংশ নিতে পারে এবং মহিলাদের বিশেষভাবে কথা বলতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পরিস্থিতি বোঝার জন্য প্রতিটি কর্মশালায় প্রশ্নাবলি পরিচালিত হয়েছিল। KII পদ্ধতির মাধ্যমে মূল ব্যক্তি হিসেবে শ্রেণি, গোষ্ঠী ভিত্তিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার: বন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় গভীরভাবে বোঝার অধিকারী লোকদের অর্থাৎ বনবিভাগের কর্মকর্তা, শিক্ষক, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাসহ জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা: স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বন সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভাগুলোতে দলের একজন সদস্য একটি গ্রুপ আলোচনায় মৌখিকভাবে প্রশ্নাবলী পরিচালনা করেন। প্রাপ্ত তথ্য সামগ্রিক বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়েছে।

সরকারি বিভিন্ন এফআরএ রিপোর্ট, আইন, অনুশাসন, আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস পর্যালোচনা: এক্ষেত্রে প্রকাশিত অপ্রকাশিত বিভিন্ন সাহিত্যিক উৎস পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা: সুন্দরবন সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী, পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, জীবনীমূলক গ্রন্থ, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ: কর্মশালা, সাক্ষাৎকার এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনার তথ্যসমূহ প্রথমে ট্রান্সক্রিপ্ট করা হয়। পরবর্তীতে উৎস অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমালোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করা হয় এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত তালিকা:

পদ্ধতি	সংখ্যা	মোট
প্রশ্নমালা		৫২
KII		৩০
উন্মুক্ত আলোচনা ও কর্মশালা		৩
FGD		০৫

১.২ (ছ) গবেষণা গঠন পরিকল্পনা:

অধ্যায়-১: ভূমিকা অধ্যায়। এই অধ্যায়টিতে ম্যানগ্রোভ পরিচিতি, সুন্দরবনের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি। সুন্দরবন গঠন, সুন্দরবনের নামকরণ, সুন্দরবনের সীমানা, সুন্দরবনের নদ-নদী, সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার ইতিহাস, বন ব্যবস্থাপনা (ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত) আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায়-২: পরিবেশ: জীববৈচিত্র্য আর বাস্তুসংস্থানের অন্যতম স্থান প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। পাশাপাশি বাংলাদেশ ভারতকে প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা করে আসছে এই লোনাপানির বন। এই অধ্যায়টিতে তাই পরিবেশ নামকরণের আলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবনের ভূমিকা অন্বেষণ করাই মূখ্য উদ্দেশ্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সুন্দরবনের ভূমিকা, সুন্দরবনের বিপর্যয় ও তার প্রভাব, বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাসমূহ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় সুন্দরবনের ভূমিকা, সুন্দরবন যেভাবে প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা করে, প্রাকৃতিক দূর্যোগে সুন্দরবনের প্রতিরক্ষার আর্থিক মূল্য, সুন্দরবন উপকূল দিয়ে আসা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সুন্দরবনের ভূমিকা, ঘূর্ণিঝড় আম্পান, বুলবুল, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং পশ্চিম ভারত আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য, সুন্দরবনের অস্তিত্ব বিপর্যয়, ঘূর্ণিঝড়ের স্মৃতিচারণমূলক ঘটনা প্রভৃতি নানা বিষয় এই অধ্যায়টিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

অধ্যায়-৩: জনজীবন: সুন্দরবনে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং তাদের বর্তমান অবস্থা। সুন্দরবনের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি, সুন্দরবনের অধিবাসী, সুন্দরবন সংলগ্ন বসবাসরত এলাকাসমূহ, সুন্দরবনে প্রাচীন মানব বসতি, ধর্মীয় শ্রেণিবিভাজন, ঔপনিবেশিক আমলে সুন্দরবনে বসবাসরত শ্রেণি ও পেশাভিত্তিক হিন্দু জনগোষ্ঠী, মুসলমান জনগোষ্ঠী, শ্রেণি ও পেশাভিত্তিক মুসলমান জনগোষ্ঠী, খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী, অভিবাসী জনগণ, সুন্দরবনের শহর, বাসস্থান, মুণ্ডা, মাহাতো, সুন্দরবনের জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের উৎস, সুন্দরবনের মৌসুম, বাওয়ালি, গোলপাতা সংগ্রহ প্রক্রিয়া, মৌয়াল, সুন্দরবনে মধু সংগ্রহের সময় ও বনবিভাগের অনুমতি, বনে মধু

সংগ্রহ, মধু সংগ্রহে বাঘের আক্রমণ, মৌয়ালদের প্রশিক্ষণ, মধু সংরক্ষণে করনীয়, জেলে, পাস বন্ধকালীন জেলেদের মানবেতর জীবন, মোলঙ্গী, কাগচী, ঢালী ও সানা, বনবিভাগের কর্মচারিদের দুর্নীতি, বনদস্যু, সামাজিক জীবনধারা, বৈবাহিক পরিস্থিতি, পরিবার, শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্থানীয় লৌকিক আচার অনুষ্ঠান ও লোকসংস্কৃতি, হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত ধর্মীয় সংস্কৃতি, ভাষা, বিনোদন ও খেলাধুলা, লোকচিকিৎসা, বাঘ ও কুমির বন্দনা, বাঘরূপী দক্ষিণরায়, হরিণ শিকার, বনে অধিক মধু প্রাপ্তির স্থান নির্ণয়, বনবিবি হয়ে উঠার গল্প, বনবিবির ঘের, বনবিবির আদেশ, বনবিরি মন্ত্র, কেষ্ট দেবী, বাউলে, সুন্দরবনের রাসমেলা, রাসমেলার পটভূমিতে স্থানীয় বিশ্বাস ও ধারণা, লোকসঙ্গীত, ছড়া, কবিতা ও প্রবাদ, দৃঢ়চেতা আদিবাসী, বিধবাপল্লী ও মহাজন , বিধবাদের সংগ্রাম, বনজীবী জনজীবনের বিপন্নতা ও অস্তিত্বের সংকট এবং বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, সুন্দরবনের বনজীবীদের চিকিৎসাসেবা পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায়-৪: রাজনৈতিক অর্থনীতি: এই অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবনের সম্ভাবনা, জাতীয় অর্থনীতিতে সুন্দরবনের গুরুত্ব, পুঁজিবাদী চিন্তার আলোকে সুন্দরবনের অস্তিত্বের হুমকিস্বরূপ নানা পদক্ষেপ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায়-৫: উপসংহার: এই অধ্যায়টিতে সুন্দরবনের বর্তমান হুমকিস্বরূপ পরিস্থিতি, মন্তব্য, সুপারিশসহ সতর্কসংবলিত নানা বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

১.২ (জ) গবেষণা সীমাবদ্ধতা: সুন্দরবন সম্পর্কে বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা থাকলেও ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে খুব কম গবেষণাই হয়েছে। সে কারণে সাহিত্যিক উৎস থেকে প্রাথমিক ধারণা নিতেও বেগ পেতে হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের অভাব ও সংরক্ষণ না থাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসও ব্যবহার করা যায়নি। গবেষণা বিষয়বস্তুর পরিধি বৃহৎ হওয়ায় কিছু কিছু বিষয় গভীরভাবে আলোচনা করার সুযোগ হয়নি। পরিবেশ অধ্যায়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলতে শুধু ঘূর্ণিঝড়কেন্দ্রিক আলোচনা করা হয়েছে। যথাযথ উৎসের অভাবে সুনির্দিষ্ট সময়কালের আলোকে কিছু বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। জনজীবনের সকল দিক সমভাবে আলোচিত হয়নি। দুর্গম ও বৈরী পরিবেশের কারণে তথ্য সংগ্রহ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য ও সাক্ষাৎকারগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক সময় আঞ্চলিক ভাষা ও সুন্দরবনের নানা উপভাষা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয়েছে।

১.৩ ম্যানগ্রোভ পরিচিতি:

ম্যানগ্রোভ হলো বিশেষ ধরণের লবণাক্ত সহিষ্ণু ঝোপজাতীয় লম্বা বা ছোট গাছ। আর সমুদ্র তীরবর্তী স্থানগুলো যেহেতু লবণাক্ত হয়ে থাকে তাই এসব অঞ্চলেই এই ম্যানগ্রোভ বেশি পরিমাণে দেখা যায়। এই গাছ উপকূলীয় অঞ্চলে মাটি ও পানিতে বিদ্যমান লবণের ঘনত্ব কমাতে সাহায্য করে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ গাছ কর্তৃক লবণের ঘনত্ব কমানোকে প্রাকৃতিক ফিলট্রেশন বলা হয়ে থাকে। বিশ্বে ম্যানগ্রোভের প্রায় ১১০টি মতান্তরে ৮০টি বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে ১৬টি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৫৪টি প্রজাতির ম্যানগ্রোভ গাছ দৃশ্যমান রয়েছে। এই গাছগুলো কম অক্সিজেন মাটিযুক্ত অঞ্চলে বৃদ্ধি পায়। যেখানে ধীর গতিতে চলমান সূক্ষ্ম পলি জমা হয়।[৯] ম্যানগ্রোভ বন সাধারণত বিষুবরেখার কাছাকাছি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপক্রান্তীয় অক্ষাংশে বৃদ্ধি পায়। কারণ এই প্রজাতি হিমাঙ্কের তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না। শিকড়ের ঘন জটে এই গাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। বলা হয় শিকড়ের এই জটের দ্বারা প্রতিদিন দুবার জোয়ারের উত্থান পতনকে নিয়ন্ত্রন করে। এই শিকড়গুলো জোয়ারের গতিকেও মন্থর করে দেয়। এর ফলে জল থেকে পলিগুলো বের হয়ে আসে এবং একধরণের কর্দমাক্ত পরিবেশ তৈরি হয়। এই বন উপকূল অঞ্চলকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, স্রোত, ঢেউ এবং জোয়ার থেকে ভূমি ক্ষয় হ্রাস করে। ম্যানগ্রোভের এই মূল ব্যবস্থা বনের মাছ ও প্রাণীকে শিকারীদের কাছ থেকে নিরাপদ রাখে এবং তাদের খাদ্যের যোগানও সরবরাহ করে থাকে।[১০]

৯ . *National Oceanic and Atmospheric Administration,* Historical Maps and Charts audio podcast, National Ocean Service website (https://oceanservice.noaa.gov/podcast/july17/nop08-historical-maps-charts.html,) accessed on 8/13/17.

১০. *National Oceanic and Atmospheric Administration, ibid.*

চিত্র-১ (ক): ম্যানগ্রোভ বন

উৎস: NOAA's National Ocean Service, USA

চিত্র-১ (খ): ম্যানগ্রোভ বন, সুন্দরবন

স্থান: মুন্সীগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

বিশ্বে ১০০টির বেশি অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ গাছ জন্মায়।[১১] পৃথিবীর ৫ ডিগ্রি উত্তর এবং ৫ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে সবচেয়ে বেশি ম্যানগ্রোভ গাছ দৃশ্যমান রয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৭৫ শতাংশ ম্যানগ্রোভ ১৪টির

১১. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, *দুর্যোগ মোকাবিলা করছে ম্যানগ্রোভ*, পূর্বোক্ত। বিস্তারিত দেখুন, Jahangir Alam and Istiak Uddin Ahmed, *Mangrove*, Banglapedia (https://en.banglapedia.org/index.php/Mangrove)

বেশি দেশে পাওয়া যাচ্ছে।[১২] এর মধ্যে এশিয়ায় ৪২ শতাংশ, আফ্রিকায় ২১ শতাংশ, উত্তর-মধ্য-আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ১৫ শতাংশ, ওশেনিয়ায় ১২ শতাংশ ও দক্ষিণ আমেরিকায় ১০ শতাংশ রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে প্রায় ১ লাখ ৪১ হাজার ৩৩৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রয়েছে। বিশ্বে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের দিক থেকে শীর্ষস্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া। সেখানে প্রায় ২৩ হাজার ১৪৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে। অন্যদিকে ব্রাজিল, মালয়েশিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়া ও মেক্সিকো যথাক্রমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে। ফিলিপাইন ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের দিক থেকে রয়েছে ১০ম স্থানে। সেখানে প্রায় ২ হাজার ৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান বিশ্বে ১৫তম, যেখানে প্রায় ১ হাজার ৫৫৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে।[১৩]

বাংলাদেশের খুলনা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের এই উপকূলীয় বনগুলি (একত্রে প্রায় ৫২০,০০০ হেক্টর) বাংলাদেশের সর্বাধিক উৎপাদনশীল বনভূমি। এগুলোকে ***জোয়ারধৌত বন*** (Tidal forest) বলা হয়। প্রতিবার জোয়ারের সময় এ বনভূমি সমুদ্রের পানিতে প্লাবিত হয়। এখানকার চিরসবুজ গাছগুলোর আছে বায়ুমূল এবং বংশবিস্তার জরায়ুজ ধরনের। সুন্দরী ছাড়াও পশুর, গেওয়া, কেওড়া, কাঁকড়া, বাইন, ধুন্দল, আমুর ও ডাকুর দলবদ্ধভাবে জন্মে। উপকূলীয় পানির ঘোলাটে ভাব ও লবণাক্ততা সেখানকার প্রজাতিগুলোর বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। সুন্দরবন ছাড়াও গাঙ্গেয় বদ্বীপের অনেকগুলো চর ম্যানগ্রোভের গভীর বনে ঢাকা, নেই শুধু সুন্দরী। নদীর পলি জমে ওঠা তীর ও ফাটলেই এসব প্রজাতি দ্রুত বেড়ে ওঠে। নদী ও খালের পাড়ে ঠেসমূলীয় (rhizophoreceous) প্রজাতির প্রাধান্য দেখা যায়।[১৪]

আর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম। বাংলাদেশে প্রায় ১ হাজার ৭৭৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রায় ২ হাজার ৩১৪ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ম্যানগ্রোভ বায়োমও রয়েছে।[১৫] এর মোট এলাকা ৬,০১,৭০০ হেক্টর যার মধ্যে ৪,১১,২৩৪ হেক্টর জমি এবং ১,৯০,৪৬৬ হেক্টর জল। এই ৪,১১,২৩৪ হেক্টর জমির মধ্যে ৩,৯৯,৪৭১ হেক্টরে গাছের আচ্ছাদন রয়েছে। সুন্দরবনের ১,৩৯,৭০০ হেক্টর বনভূমিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে রামসার কনভেনশনের অধীনে। **বাংলাদেশ বন বিভাগ-এর রিপোর্ট ২০০৭** অনুযায়ী সুন্দরবনে ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং ২৬৯ প্রজাতির প্রাণী রয়েছে এবং ১২.২৬ মিলিয়ন কাঠ রয়েছে। বাংলাদেশের বনাঞ্চলগুলোর মধ্যে সুন্দরবনেই

---

১২. Jahangir Alam and Istiak Uddin Ahmed, *Mangrove*, Banglapedia, opcit.

১৩. ঐ।

১৪. Abul Khair, *Forest and Forestry*, Banglapedia (https://en.banglapedia.org/index.php/Forest_and_Forestry.)

১৫. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, *দুর্যোগ মোকাবিলা করছে ম্যানগ্রোভ*, প্রাগুক্ত।

সর্বোচ্চ পরিমাণে চারা গাছের ঘনত্ব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ বনবিভাগের জরিপে বলা হয় জাতীয় পর্যায়ে চারা স্টকের প্রায় ৪৪% সুন্দরবনে। এক্ষেত্রে সুন্দরী, গেওয়া ও গরানের চারা উল্লেখযোগ্য।[১৬]

চিত্র-২ (ক): সুন্দরবনের শুলো

স্থান: কলাগাছিয়া ইকো পার্ক সেন্টার, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

১.৪ সুন্দরবন গঠন: সুন্দরবন বনভূমি গঠনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো পলি বহনকারী নদীর সুমিষ্ট জলের সাথে সমুদ্রের লোনাপানির সংমিশ্রণ। এর ফলে গড়ে উঠে এক বিশেষ প্রজাতির বৃক্ষ। তাই নদী-সীমা হ্রাস বৃদ্ধির সাথে সাথে সুন্দরবনের আয়তনও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে। একসময় যেটি ছিল গভীর অরণ্য কোন এক কালে সেটি হয়েছিল আবাসস্থল, রাজকার্য পরিচালনার স্থান কিংবা মন্দির, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র। সুন্দরবনের গঠন প্রকৃতি নিয়ে সতীশচন্দ্র মিত্র ইতিহাসের আলোকে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

> *গঙ্গা বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া যেখানে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানেই বেলাভূমির উপরিভাগ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া সুন্দরবনে পরিণত হয়। ভগীরথআনীতা গঙ্গা পূর্ব্বকালে যেখানে সমুদ্রে পতিত হন, সেস্থান*

১৬. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, opcit, 2019, p-70.

হতে বর্ত্তমান গঙ্গা গঙ্গাসঙ্গম বহুশত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গঙ্গা হিমালয় শীর্ষ হতে অত্যাধিক পরিমাণে গৈরিক মৃত্তিকা বহন করিয়া সাগরে লইয়া যান। এই গিরিমাটী এবং পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের ভগ্ন বা ক্ষয়িত ভূমিভাগ পলিমাটীরূপে মোহানার সন্নিকটে সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ ভূভাগের সৃষ্টি করে, এবং প্রথমত; দ্বীপাকারে ও পরে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া নিবিড় বনে পরিণত হইয়া যায়। গঙ্গানীতা পলিমাটী ও সুমিষ্ট জলের সহিত সমুদ্রের লবণাক্ত জলের সংগে কতগুলি বিশেষ বিশেষ বৃক্ষগুল্মের সমুদ্ভব করে। উহাই সুন্দরবনের বিশেষত্ব।[১৭]

মানচিত্র-১: নিম্ন গঙ্গা (Lower Ganga (Ganges) Valley. The World Atlas)

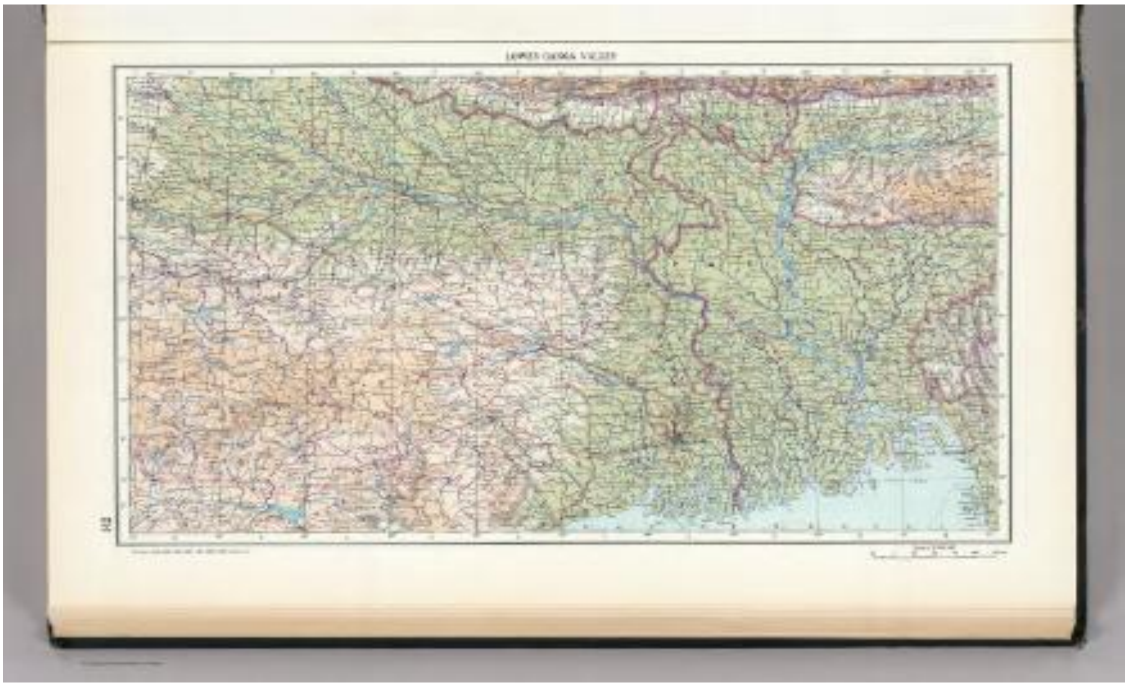

উৎস: (USSR, David Ramsey Maps Collection)

১৭. সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, খণ্ড-১, গতিধারা, ১৯১৪ (পৃথম সংস্করণ), পৃ.৫৯।

মানচিত্র-২: গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও সুন্দরবন (The Ganges Delta)

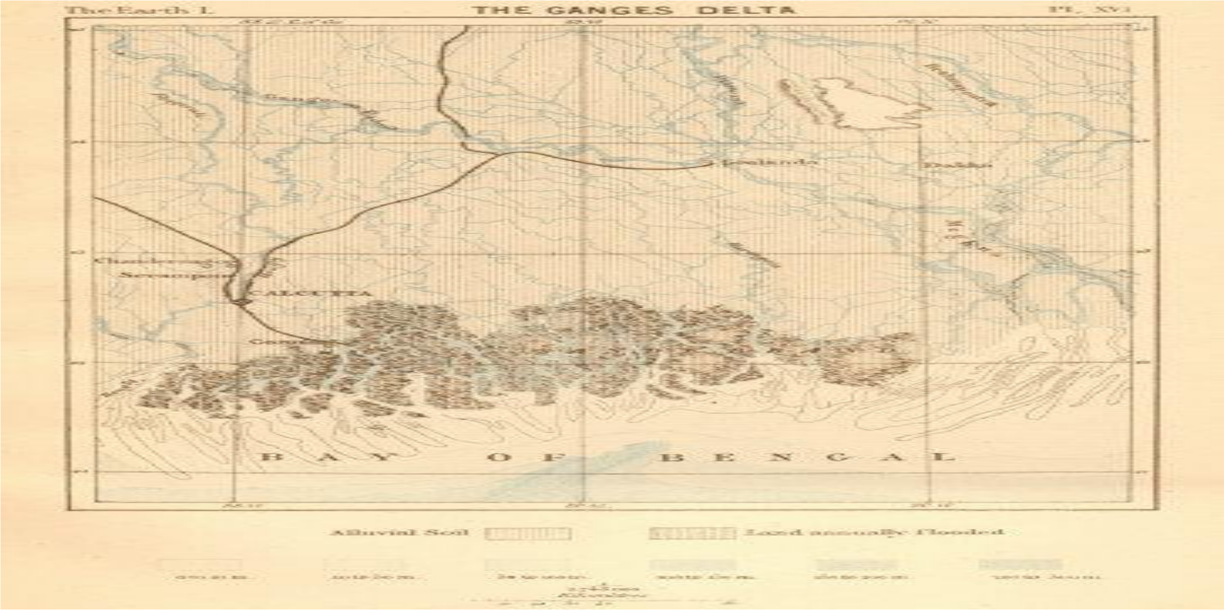

উৎস: David Ramsey Maps Collection

মানচিত্র-৩: উনিশ শতকের গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও সুন্দরবন (Map of the Ganges Delta - 19th Century)

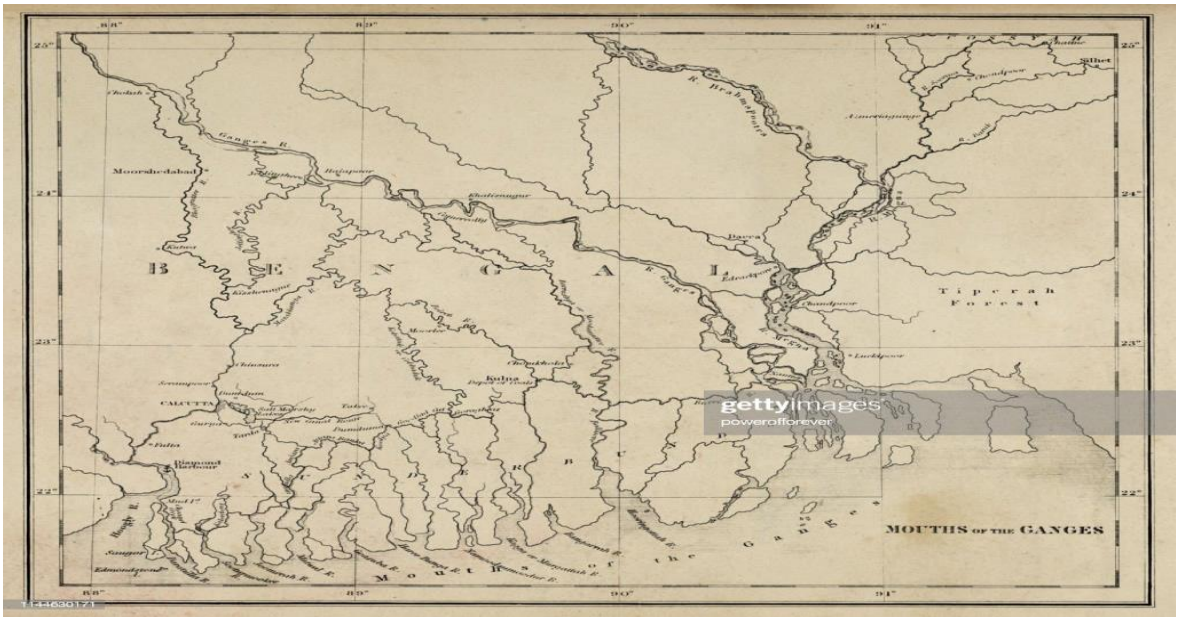

উৎস: David Ramsey Maps Collection

চৌমাথায় পলি পড়ে পড়ে প্রথমে ছোট একটা দ্বীপ দেখা দেয়। গঙ্গার ভূমিগঠন ক্ষমতা অপরিসীম। পৃথিবীতে এমন পলি-বহনকারী নদী দুর্লভ। হিমালয়ের বা হিমালয়ের পাদদেশের পলিকণা বহন করে উজাড় করে ঢেলে দেয়া অববাহিকা অঞ্চলে যেন মাতৃস্নেহে প্রলেপের পর প্রলেপ দিয়ে পলিমাটির দ্বীপ সৃষ্টি করে চলছে আবহমান

কাল ধরে। দ্বীপ দেখা দিতেই আসে পাখির দল, তারপর আসে গাছপালা। গাছপালা বলিষ্ঠ হতে না হতে আসে সুন্দরবনের হিংস্র-অহিংস্র প্রাণীরা। আসে বানর, আসে হরিণ, আসে সাপ, আসে শুয়োর, আসে বাঘ। আর সর্বশেষে আসে মানুষ, নানা সুযোগের সন্ধানে। এমনিভাবেই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সমস্ত হিংস্রতা ও মমতা নিয়েই এক-একটা দ্বীপ সুন্দরবনের সঙ্গে সংযোজিত হয়।[১৮] মাটিতে যেন আগাছা বেশি নালা জন্মাতে দেয় না। আবার পাহাড়ী বনের মতো গুরু-গম্ভীর বনও নয়। চারিদিকে নদী নালা বেয়ে স্রোতের ধারা তর্‌তর্‌ করে অনবরতই ছুটে চলেছে–কখনও বা জোয়ারের টানে, কখনও বা ভাটির টানে। যেন জীবন্ত এই বন।[১৯] এমনিতে পরিষ্কার বন। বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। শুধু দেখা যাবে, গাছের গুঁড়িগুলো সারি বেঁধে থামের মত দাঁড়িয়ে আছে। তবু হাতি এখানে চলতেই পারবে না। চারদিকে খাল ও নদীতে ভরা। প্রতি মাইলে দু-তিনটি নদী ও দশ-বারোটি খাল। তাছাড়া সুন্দরবনের প্রতিটি গাছের শিকড় থেকে মাটির উপর শুলো বেরোয়। আধ হাত বা এক হাত অন্তর বারো-তেরো ইঞ্চি দীর্ঘ শুলো সারা বনে ছড়িয়ে আছে। শুলোগুলো দেখতে বন্দুকের সঙ্গেনের মতো। গোল নয়, চ্যাপ্টা কঠিন শিকড়। ভারি শক্ত। মাথাগুলো আবার বর্শার ফলকের মত সরু। একবার এর উপর পড়লে হাড়গোড় ভেঙে যাবে। সারা বন ছড়িয়ে আছে। দূর থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হবে, যেন ভীষ্মের শরশয্যা। প্রতিটি পদক্ষেপ দেখে দেখে এই শুলোর ফাঁকে-ফাঁকে ফেলতে হয়। কাজেই হাতির সাহায্যে শিকারের স্থান নেই।[২০] বনের চত্বর মোটামুটি খট্‌খটে আর উর্ধ্বমুখী বর্শার ফলকের মতো ঘন শুলোয় প্রায় ঢাকা। শুলোগুলো আর কিছু নয়–পলিমাটির চত্বরের সামান্য নিচু দিয়ে দীর্ঘ গাছগুলোর যে শিকড়ের জাল ছড়িয়ে গেছে তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য এগুলো উর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। বেশি না, মাত্র কোনোটা মুঠো হাত, কোনোটা বা এক বিঘৎ। ভারি ছুঁচোলো ও পাতলা, কিন্তু যেন লোহার মত শক্ত। কোথাও কোথাও বেশ ঘন, কোথাও বা ফাঁকা-ফাঁকা। বনের চাতাল বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। খুব অভ্যস্ত না হলে নিচের দিকে না তাকিয়ে হাঁটা-চলা দায়।[২১]

---

১৮. শিবশঙ্কর মিত্র, *সুন্দরবন সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, ভারত, ১৯৮৮, পৃ. ৫১।

১৯ . ঐ, পৃ. ৩৩১।

২০. ঐ, পৃ. ২৩৪।

২১. ঐ, পৃ. ৪২৩।

চিত্র-২ (খ): সুন্দরবনের শুলো

চিত্র-২ (গ): সুন্দরবনের শুলো

মানচিত্র-৪: বাংলাদেশ সুন্দরবন (উৎস: বাংলাপিডিয়া)

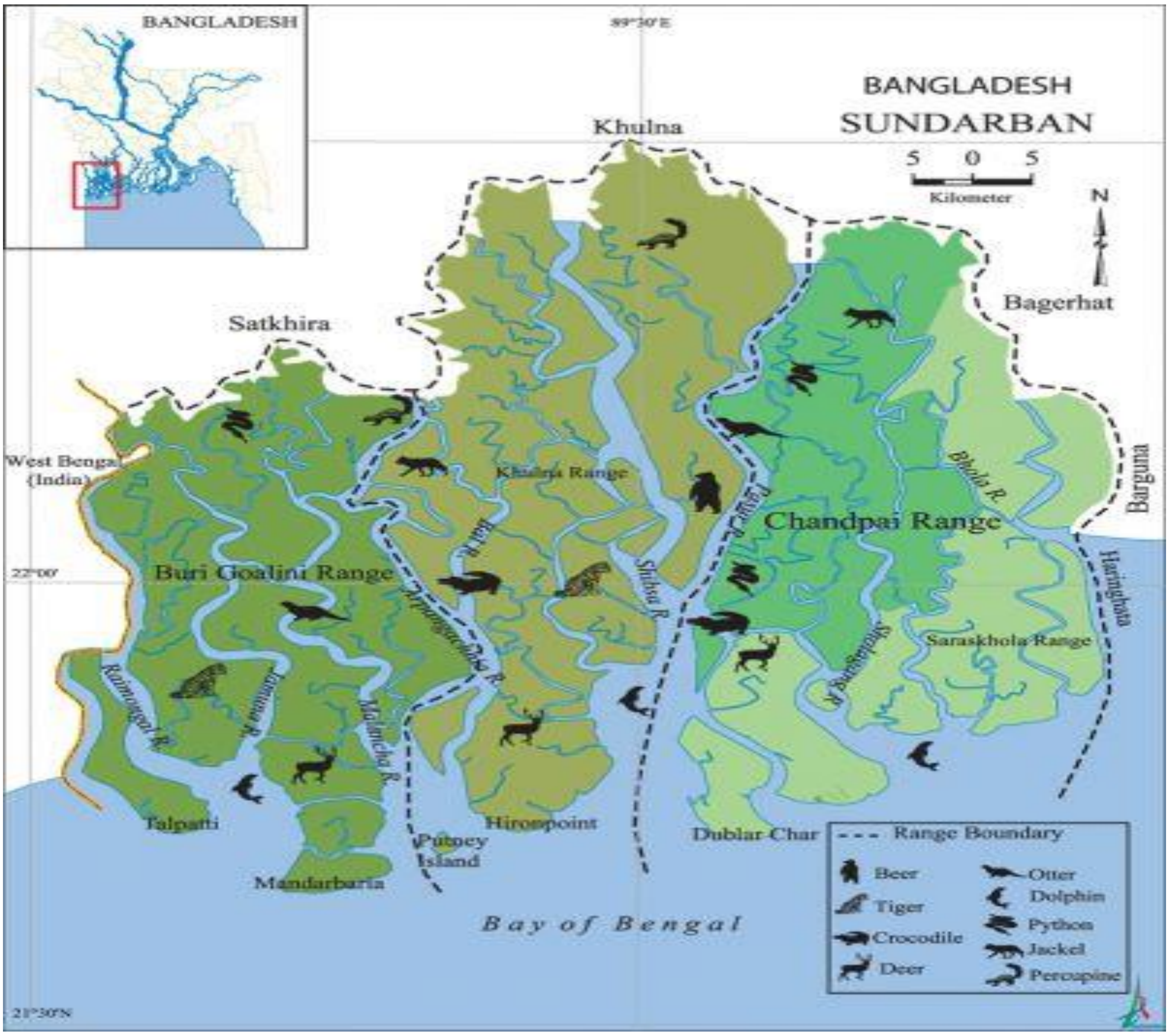

১.৫ সুন্দরবনের নামকরণ: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়া'য় সুন্দরবনকে 'জোয়ারভাটার প্রভাবের আওতাভুক্ত বনভূমি' বা 'জোয়ার-ধৌত বন' (Tidal Forest) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। দেশের সংরক্ষিত বন হিসেবে পরিচিত সুন্দরবনের রয়েছে ৪ টি প্রশাসনিক অঞ্চল এবং ৫৫ টি Compartment. এ বনে বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমন প্রায় ৭০ টি উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে। বনটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৩ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। বনের উচ্চতা ৫ থেকে ২০ মিটার পর্যন্ত। বনভূমির প্রায় ৭০ ভাগ ভূমি বৃক্ষাচ্ছাদিত।[২২]

২২. ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খণ্ড-৬, পৃ: ৩৪১।

বাংলা সুন্দরবন শব্দটির ইংরেজি উচ্চারণ Sundarban. সুন্দরবন নামকরণ নিয়ে নানা মত রয়েছে। সুন্দরবনের নামকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সামনে আসে সেটি হলো সুন্দরবনের উচ্চারণ। উচ্চারণের ভিন্নতায় ইংরেজি বানানে ভিন্নতা দেখা যায়। এই বানানের কারণে সুন্দরবনের ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নটি ভিন্ন ভিন্ন উত্তর প্রদান করে থাকে। বেভেরেজ তাঁর গ্রন্থে সুন্দরবনের বিভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো *Sunderbunds.* এখানে মূল শব্দটি *বন* বা 'forest' (ban/van) নয়। মূল শব্দটি হলো *bunds.* Yule and Burnell মনে করেন যে শব্দটি দ্বারা 'mound' or 'embankment' 'ঢিবি' বা 'বেড়িবাঁধ' বোঝানো হয়েছে। তাই সুন্দরবনের সংজ্ঞায় তারা বলেন created by tidal action and sedimentation.[২৩] ঠিক একই ভাবে *সুন্দর/সুন্দরের* উৎপত্তি নিয়েও ভিন্ন মত রয়েছে। ম্যানগ্রোভের বাংলা নাম সুন্দর sundara ("beautiful") থেকে বা Heriteria minor কখনও H. Fomes থেকে সুন্দরী sundari শব্দটি এসেছে। সুন্দরবনে সুন্দরী নামের একধরনের বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে এই বনের নাম সুন্দরবন। E.E Pargiter রচিত Revenue History of Sundarbans (1885) গ্রন্থে এবং Calcutta Revenue, Sundarbans, Vol-89-গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করা হয়।

আবার বলা হয় সুন্দর শব্দটি *চন্দ্র* "moon" থেকে এসেছে। চন্দ্র chandra থেকে চন্দ্রদ্বীপবন chandradip ban. চন্দ্রদ্বীপবন নামে একটি বৃহৎ জমিদারি এস্টেটের নাম ছিল। আরো বলা হয়, ১১৩৬ খ্রিস্টাব্দের একটি তাম্রশাসনে উল্লিখিত লবণ প্রস্তুতকারকদের পূর্বের একটি উপজাতির নাম চান্দা-ভাণ্ডা chanda-bhanda. সেখান থেকে বিবর্তিত হয়ে সুন্দরবন শব্দটির প্রচলন।

> *The "beautiful forest" notion is probably a retroformation, created by current valuations of forests under a pervasive ecological romanticism. Indigenous perceptions were closer to jungal than ban"*[২৪]

সুন্দরবনের কমিশনার Fredrick Eden Pargiter-এর বর্ণনা:

Bengal Cadre ICS Officer ও সুন্দরবনের কমিশনারের দায়িত্বপালনকারী Fredrick Eden Pargiter, B.A. এই বনের নামকরণে দুটি মতামত উল্লেখ করেছেন। একটি হলো *সুন্দরী* (সুন্দরী গাছ) এবং *বন* (Forest) থেকে এই নামটি এসেছে। সুন্দরী গাছের থেকে এই নামের উৎপত্তির ব্যাখ্যায় তিনি বলেন- এই বনে সুন্দরী গাছ

---

২৩. Yule, Henry and Burnell, A. C. Hobson-Jobson, *A Glossary of Colloquial AngloIndian Words and Phrases, and of Kindred Terms, Etymological, Historical, Geographical and Discursive*, US department of Education, USA, 1903.

২৪. Herring, R.J. *The Commons and its "Tragedy" as Analytical Framework: Understanding environmental degradation in South Asia*. In J. Seidensticker, R. Kurin, & A.K. Townsend (Eds.) *The commons in South Asia: Societal pressures and environmental integrity in the Sundarbans*, The International Centre Smithsonian Institution, Washington, D.C, 1991, pp. 112-126.

অধিক পাওয়া যায় এবং স্থানীয় অনেকের কাছে এটি *সুন্দরীবন* (*Sundariban*) নামেও পরিচিত। দ্বিতীয় মতে বলেন, *সমুন্দর (Samundar* থেকে *সমুদ্র* (Samudra) এবং তার সাথে বন যুক্ত হয়ে *সমুদ্রবন (Samudraban)* বা The Forest near the Sea. এই মতের প্রেক্ষিতে তিনি দেখিয়েছেন যে, এই বনের দক্ষিণের চট্টগ্রাম অঞ্চলে সুন্দরীগাছ খুব বেশি নেই অথবা বিরল। এছাড়া *Samudravana* শব্দ দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় সমুদ্র নিকটবর্তী বৃহৎ বনভূমিকে বোঝানো হয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তাই তিনি সুন্দরী গাছ থেকে নয় বরং *সমুদ্রবন* থেকে সুন্দরবন নামের উৎপত্তি বলে অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করেন।[২৫]

ব্রিটিশ পরিসংখ্যান অফিসের ডিরেক্টর জেনারেল W. W. Hunter- এর বর্ণনা:

সুন্দরবনে বসবাসরত বাঘের নামানুসারে বাগেরহাটের নামের অর্থমিল দেখিয়েছেন ব্রিটিশ পরিসংখ্যান অফিসের ডিরেক্টর জেনারেল W. W. Hunter. তিনি ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত *Statistical Accountant of Bengal: Districts of the 24 Parganas and Sundarbans* গ্রন্থে বাগেরহাট বলতে তিনি *Tiger-Village* কে বুঝিয়েছেন।[২৬] হান্টার সুন্দরবনের পরিচিতি তুলে ধরে বলেন-

> *a sort of drowned land, broken up by swamps, intersected by a thousand river channels and maritime backwaters, but gradually dotted, as the traveller recedes from the seaboard, with clearings and patches of rice land.*[২৭]

H. Beveridge, B. C. S - এর বর্ণনা:১৮৭৬ সালে প্রকাশিত H. Beveridge, B. C. S. তাঁর *The Districts of Bakarganj: Its History and Statistics* গ্রন্থে সুন্দরবনের ইংরেজি বানানে কয়েকটি ধরন ব্যবহার করেছেন। যেমন- *Sundarbunds, Sundarban, Sunclarbans. Jeradkhana and Muradkhana*[২৮] সুন্দরী গাছ থেকে সুন্দরবনের নামের উৎপত্তি এক্ষেত্রে বেভেরেজসহ অনেকে

---

২৫. Fredrick Eden Pargiter, *A Revenue History of Sundarbans*, Vol-I: 1765-1870, West Bengal District Gazetteers, Government of west Bengal, 2002 (1st pub. 1934), p. 1.

২৬. WW Hunter, *Statistical Account of Bengal, vol-2, Nadiya and Jessore,* 1876, London. P- 170.

২৭. W.W. Hunter, *Statistical Accountant of Bengal, Vol. I, Districts of the 24 Parganas and Sundarbans*, Truner & Co., London. 1875.

২৮. H. Beveridge, B. C. S., *The Districts of Bakarganj: Its History and Statistics*, Trubner and C0. Ludgate Hill, London,1876, p. 67-68. *In 1658 another Settlement of Bengal was made by Sultan Suja, one of the sons of Shah Jehan. In this Settlenient the Sunclarbans were included under the name of Muradkhana or Jeradkhana. Perhaps the village and river of Muradia, in the northern part of the Patuyakhali subdivision, are parts of this Muradkhana.28 Bakarganj also was in old times covered with jungle, and determinate boundaries were therefore impossible. Thus the great pargana of Buzurgumedpiir appears to have Ijeen very vaguely defined towards the south, and was considered to comprise many of the lands which are now classed as the Sundarbaus. It has been said that Jeradkhana and Muradkhana were the old names for the Sundarl) ans, but as regards tlie Bdkarganj Sunclarhans, it appears to mo that it would be more correct to say that they were included in Buzurgumedpiir.*

আপত্তি দেখিয়ে বলেন যে, বনের সকল স্থানে সুন্দরী গাছ লক্ষণীয় নয়। এক্ষেত্রে বেভেরেজ উল্লেখ করেন চর কুকরি মুকরি বা অন্যান্য স্থানে তিনি একটি বা দুটি কদাচিৎ সুন্দরী গাছ দেখেছেন। তবে পার্শ্ববর্তী মগ বা আরাকানি, পর্তুগীজদের কাছে এই গাছ বেশ মূল্যবান। উল্লেখ্য যে, বেভেরেজ বলেন বিডিকারগঞ্জ (বাকেরগঞ্জ, বেভেরেজ এখানে বিডিকারগঞ্জ উল্লেখ করেছেন) অংশে তখন দ্রুতগতিতে সুন্দরবনের বিস্তার হতে থাকে। তাই সুন্দরবনের নামকরণ হয়তো বাকেরগঞ্জের একটি ভূখণ্ড যার প্রাচীন নাম *সুন্দাকুল Sundavkul* সেখান থেকে নামকরণ করা হয়েছে। এখানে তিনি আবার বলেন বাকেরগঞ্জের সুন্দা নদীর বন হিসেবে এর নাম হয়তো সুন্দরবন " *the forest of the river Sunda*' অথবা *Sundarbund* শব্দটি দ্বারা *"the embankment of the Sunda* সুন্দা নদীর বাঁধ বোঝানো হয়েছে এবং সেখান থেকে সুন্দরবন শব্দের উৎপত্তি।[২৯] তিনি সুন্দরবনের ভূপ্রাকৃতিক পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-

> *The name Sundarbunds, or more correctly, Sundarban, is said to derive its origin from the sundari-tree [Heritiera minor), and this again is said to be called sundari, or the beautiful, on account of the red colour of its wood. Probably this etymology of the word "Sundarban" is correct; but it is a singular fact that the sundari-tree is by no means common in many parts of the Bd-karganj Sundarbans* [৩০]

মূলত সুগন্ধা *Sugandha or Fragrant* নদী প্রবাহে গড়ে উঠা উর্বর ভূমির পূর্ব তীরে বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ *Bdkla-Chandradwip* (বেভেরেজের গ্রন্থে এই বানানটিই উল্লেখ আছে) এবং পশ্চিম দিকে সেলিমাবাদ বা বর্তমান বাগেরহাট *Selimjibad* (বেভেরেজের গ্রন্থে এই বানানটিই উল্লেখ আছে) অবস্থিত। তিনি বলেন সুগন্ধা নামটি সুন্দা *Sunda* নামের সংক্ষিপ্ত রূপে এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এই সুন্দা নদীর তীরকেই বলা হয় সুন্দরকূল *Sundarkul*।[৩১] এর পাশাপাশি বেভেরেজ সুন্দরবনের নামকরণে এই বনের ভালো কাঠের যোগান হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে এই নামটি বাহ্মণদের দেওয়া বলে তিনি দাবি করেন। তিনি বলেন-

> *it makes it not so improbable after all that the word " Sundarban " may really mean beautiful wood, and may have been applied in this sense to the forests by the Brahmans. For if a poor Roman Catholic priest could see the*

---

২৯. H. Beveridge, B. C. S., *The Districts of Bakarganj: Its History and Statistics*, p. 67-68.

৩০. *Ibid*, p. 67-68.

৩১. *Ibid*, p. 26.

beauty of these woods in spite of the tigers and crocodiles, why might not a Brahman priest do so also?[৩২]

এছাড়া বলা হয়, চন্দ্রদ্বীপ Chandradwip থেকে সুন্দরবন শব্দটি এসেছে। চন্দ্রদ্বীপ বলতে চন্দ্রের দ্বীপ যেখানে চন্দ্র শব্দটি দিয়ে কোনো জাতি-গোষ্ঠী বা সাহিত্যিক দিক থেকে চাঁদ কে বোঝানো হয়েছে।[৩৩]

প্রাচীনকালে বাকেরগঞ্জের অধিকাংশই সুগন্ধা বা সুন্দা নদীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। সুগন্ধা থেকে সুন্দা নামের উৎপত্তি। জনশ্রুতি আছে যে, যখন দেবী ভগবতীকে কেটে কয়েক টুকরো করা হয় এবং সেগুলো পৃথিবীতে ছিটিয়ে ফেলা হয় তখন তাঁর নাকের অংশটুকু এই নদীতে পড়ে এবং সেখান থেকেই এর নাম সুগন্ধা। এ প্রসঙ্গে বেভেরেজ বলেন-

According to tradition, much of Bakarganj was formerly the bed of a large river called the Sugandha or Sunda and the name of Sugandha, or "the Fragrant," is, as already stated, said to be derived from the fact that when the goddess Bhagabati was cut in pieces, and the fragments scattered over the earth, her nose fell into this river. The name Sugandha is still applied, I believe, to the upper part of the Kalijiri river, and the name is perpetuated, under the abbreviated form of Sunda, in the name Sundarkul, or bank of the Sunda, which is borne[৩৪]

<u>২৪ পরগণার ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার O'Malley, L. S. S.- এর মতামত:</u>

১৯১৪ সালে ২৪ পরগণার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (O'Malley, L. S. S., Bengal District Gazetteers, 24-Parganas) গ্রন্থে সুন্দরবনকে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, *'সুন্দরবন হল জোয়ার-ভাটার নালা, নদী, খাঁড়ির নেটওয়ার্ক এবং দ্বীপপুঞ্জ।'*[৩৫] তিনি আরো বলেন, সুন্দরবন হল *'low forest and scrub wood jungle'*[৩৬] সুন্দরবনের ভূপ্রাকৃতিক পরিচয় তুলে ধরে বলেন-

---

৩২. *Ibid,* p. 26.

৩৩. *Ibid,* p. 70.

৩৪. *Ibid,* p. 70.

৩৫. O'Malley, L.S.S., Bengal District Gazetteers, 24-Parganas, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Dept., 1914, West Bengal District Gazetteers Reprinted in 1998 , Department of Higher Education, Government of West Bengal, Kolkata.

৩৬. *Ibid,* p. 14-15.

'The Sundarbans are a network of tidal channels, rivers, creeks and Islands. Some of these islands are mere swampy morasses, covered with low forest and scrub wood jungle, but those to the north, which are embanked grow rich crops of rice. As one approaches the coast, the land gradually declines to an elevation which throughout many hundred square miles is scarcely raised above high-water mark. This seaboard area is a typical specimen of new deltaic formation. It exhibits the process of Land-making in an unfinished state, and presents the last stage in the life of a great river – the stage in which it emerges through a region of half land, half water, almost imperceptibly, into the sea.' [৩৭]

চিত্র-৩: নদী খাঁড়ির সুন্দরবন

Annu Jalais ***Forest of Tigers*** গ্রন্থে সুন্দরবন শব্দটির ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহারের উল্লেখ করতে গিয়ে Henry and Burnell রচিত গ্রন্থে Hobson-Jobson: A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, and of Kindred Terms, Etymological, Historical, Geographical, and Discursive প্রকাশিত মতের উপস্থাপন করেন। সেখানে *Sunderbunds* হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। *Bunds* শব্দটি তাদের মতে বন কে নির্দেশ করে না বরং এটি দ্বারা *Embankment* বা *Mound* বাঁধ বা ঢিবি কে নিদের্শ করে।[৩৮] প্রখ্যাত গবেষক Annu Jalais তাঁর এই গ্রন্থে সুন্দরবনের আরো কিছু ব্যবহৃত অভিধা ব্যবহার করেছেন। যেমন-

৩৭. *Ibid*, p.15.

৩৮. Annu Jalais, *Forest of Tigers: People, Politics & Environment in the Sundarban*, Routledge, Delhi, 2010, p-18.

tatbhoomi যার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে *tat* শব্দটি দ্বারা নদী বা সাগরের তীর এবং *bhoomi* বলতে ভূমিকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমুদ্র তীরবর্তী ভূমি। আঞ্চলিক উপভাষায় এর মানে বুঝানো হয় *sunken land* (land of the sea cost). এছাড়া এই বনটি *আঠারো ভাটির দেশ (atharo bhatir desh)* (The land of the eighteen ebb-tides), *bhardesh, astadash, rashatal, patal, pundrabardhan, gangaridi* প্রভৃতি নামের উল্লেখ রয়েছে।[৩৯]

এছাড়া সুন্দরবনের নামকরণে সৌন্দর্যকে অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সুন্দরবনের গাছগুলো সারি সারিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় একস্থানে শুধু একই গাছের সারি। এছাড়া জোয়ার ভাটার কারণে এই বনের ভূপৃষ্ঠ এতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যা সহজেই মনে হবে যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা।[৪০] *সুন্দরবন সমগ্র* গ্রন্থের মুখবন্ধে শিবশঙ্কর মিত্র সুন্দরবনের নামকরণে সৌন্দর্যকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় ফুটে উঠা সুন্দরবনের সৌন্দর্যের উল্লেখ-

> *সুন্দরবন। নামটি লোকে সাধে দেয়নি। ভারি সুন্দর দেখতে এই বন। পাহাড়ি বনের মত বড় বড় গাছ না থাকলে কি হবে, ছোট ছোট গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। দেখলে মনে হয়, কেউ বুঝি তার এই বিশাল বাগান সাজিয়ে রেখেছে।....তাহলেও সুন্দরবন শুধু গাছের সারিতে সুন্দর নয়। অগনিত নদ ও নদী যেন জালের মত ঘিরে রেখেছে এই বনকে। বড় বড় নদীও বুঝি গুণে শেষ করা যায় না।.... সতেজ সবুজ গাছের সাজানো সারি আর নদ-নদীর তর্‌তর্‌ করে চলমান জলধারা-এই দুইয়ে মিলে করে তুলেছে এই বনকে সুন্দরবন। শুধু সুন্দর নয়। এই জল তো আটক করা বাঁধা জল নয়। বেগবতী জলধারা। জোয়ার-ভাটার টানে দিনে দুবার ছুটে যায় সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে, আবার দুবার ছুটে আসে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবার মত। তাই পাহাড়ি বনের মত এই বন গম্‌গম্‌ করে না, জীবনের সাড়া জাগিয়ে যেন তর্‌তর্‌ করে।"*[৪১]

World Bank Report –এ এই বনকে *the habitat for famous "Bengal Tigers"* বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৪২] ১৬৫৮ সালে সম্রাট শাহজাহানের অন্যতমপুত্র সুলতান সুজা (গ্রন্থে সুলতান সুজা উল্লেখ আছে) বাংলায় আরেকটি বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্তে সুন্দরবনকে মুরাদখানা ও জিরাদখানা (Muradkhana or Jeradkhana) নামে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[৪৩]

---

৩৯. *Ibid,* p-19.

৪০. রাজিব আহমেদ (সম্পা.) *সুন্দরবনের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৮১।

৪১. ঐ, পৃ. ৯২।

৪২. World Bank Report 2007, *Need assessment and detailed planning for a harmonious hydrometeorology system for the Sundarbans*, USA, 2007, p.1

৪৩. H. Beveridge, B. C. S., *The Districts of Bakarganj: Its History and Statistics*, opcit, p. 51.

এছাড়া স্থানীয়দের কাছে বনটি বাদাবন, বাদা, শুলোবন, হুলোবন, মাল ও মহাল প্রভৃতি নামে পরিচিত। বাদা নামকরণে বলা হয় যে, এই বনে জোয়ার-ভাটা হয় বলে একে বাদাবন নামে অভিহিত করা হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে সুন্দরবন ছাড়াও এই বাদাবন পরিচিত হয় মহাল নামে। মধুমহাল, গোলমহাল প্রভৃতি। স্থানীয়ভাবে বাদা নামটিকেই অধিক ব্যবহার করা হয়।[৪৪]

১.৬ সুন্দরবনের সীমানাঃ

সুন্দরবন এলাকা হল একটি বদ্বীপ জলাভূমি যা সময়ের সাথে সাথে গঙ্গা নদী প্রণালী দ্বারা পরিবাহিত পলি দ্বারা গঠিত। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ম্যানগ্রোভ বা লোনাপানির এই বন। জোয়ার-ভাটার কারণে বিভিন্ন বৃক্ষ থেকে ঝড়ে পড়া ফল আর বীজ কাদা মাটিতে পুঁতে থাকে এবং সেখানে চারা গাছ জন্মে। জোয়ারের পানিতে ভেসে ভেসে এসব বীজ বিভিন্ন স্থানে চলে যায় এবং কাদা মাটিতে ধানচি ঘাসে আটকে থাকে। ফলে দেখা যায় বনে একেক স্থানে একেক ধরনের গাছ জন্মায়। এভাবেই বনের বিস্তার ঘটে। সুন্দরবনের অধিকাংশ গাছেই জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ় মাসে ফুল হয় এবং আষাঢ় মাসে বীজ ঝরে পড়ে। শ্রাবণ থেকে ভাদ্র মাসে বনতল জুড়ে নতুন চারা দেখা যায়।[৪৫]

গঙ্গা নদীর মোহনায় গঠিত ভূ-ভাগ আর সাগরের লবণাক্ত জলের মিশ্রণে যে বিশেষ এলাকা গড়ে উঠেছে তাই সুন্দরবন। তাই সুন্দরবনের সীমানার সাথে নদীর মোহনার গভীর সংযোগ রয়েছে। গঙ্গার মোহনা যত দক্ষিণ দিকে সরেছে, সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনও তত দক্ষিণবর্তী হয়ে পড়েছে। এভাবে ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী ত্রিকোণ প্রদেশ বা সমতটের উদ্ভব। বলা হয় এই সমতটের আকার ক্ষুদ্র ছিল কিন্তু ক্রমান্বয়ে দক্ষিণভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর সাথে সাথে সুন্দরবনও সরে যাচ্ছে। ভূতাত্ত্বিক গবেষণায়ও বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। লক্ষ্ণৌ শহরের নিকট খননকালে সুন্দরবনের বৃক্ষাবশেষ পাওয়া গেছে। সুন্দরবন যে গঙ্গার মোহনার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে এটি তার প্রমাণ। খুলনা শহরের পশ্চিম পার্শ্বে এবং কলকাতায় শিয়ালদহের নিকট খননকালে অসংখ্য সুন্দরী গাছের গুঁড়ি পাওয়া যায় এবং উভয় স্থানের মাটির স্তর ছিল একই রকম। আবার ভাগীরথীর পশ্চিম পার্শ্ব বা রাঢ়ের মাটির স্তর একই ছিল না। অর্থাৎ সমতটের মাটি পলি সংযোগে গঠিত হতে হতে ক্রমেই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে।[৪৬]

জেসুইট পাদ্রী ফার্নাণ্ডিজ (Fernandus, 1598) তার বর্ণনায় হুগলী হতে শ্রীপুর হয়ে চট্টগ্রামের সমস্ত পথকেই 'ব্যাঘ্র সংকুল' বলে উল্লেখ করেছেন। তার একবছর পর ফনসেকা (Fonseca, 1599) বাকলা হতে সপ্তগ্রামের পথ বানর ও হরিণ অধ্যুষিত বনময় ভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। Ralf Fitch (1583-91) বাকলা বন্দরের সংলগ্ন

---

৪৪. পাভেল পার্থ, *বাদাবনের বিজ্ঞান*, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, ৫ মে ২০১৮, ঢাকা।

৪৫. ঐ।

৪৬. সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, খণ্ড-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।

জঙ্গলের কথা বলেছেন। যশোরের সুন্দরবন অঞ্চলেই ষোড়শ শতকে রাজা প্রতাপাদিত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৪৭]

সতীশ চন্দ্র মিত্র যশোর খুলনার ইতিহাস খুব নিখুঁতভাবে উৎসের আলোকে লেখার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণায় সুন্দরবনের ভৌগোলিক সীমার উল্লেখ করে বলেন- "প্রাচীন সমতটের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সেই লবণাক্ত পল্বলময় অসংখ্য বৃক্ষগুল্ম সমাচ্ছাদিত শ্বাপদ সঙ্কুল চরভাগ সুন্দরবন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। ইহা পশ্চিমে ভাগীরথীর মোহনা হইতে পূর্বে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত।" এর সীমা সম্পর্কে আরেকটি মতে তিনি বলেন যে, 'মেঘনার মোহনারও পূর্বে অর্থাৎ নোয়াখালী, চট্রগ্রাম প্রভৃতি জেলার এবং হাতিয়া, বর্তমান চট্রগ্রাম জেলার অধীন সন্দ্বীপ প্রভৃতির দক্ষিণভাগে অবস্থিত বনভাগ ও সুন্দরবনের অধীন। সেকালের ৩ টি জেলা যথা- চব্বিশ পরগণা, খুলনা এবং বাকেরগঞ্জ জেলার যে অংশটুকু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন ছিল তার দক্ষিণভাগে সুন্দরবন অবস্থিত। এখানে সুন্দরবনের মোট আয়তন ধরা হয়েছে বা তৎকালে সুন্দরবনের মোট আয়তন ছিল ৮,০০০ বর্গমাইল (গড়ে বিস্তৃতি ৫০ মাইল)।[৪৮]

১৮৭৬ সালে লেখা উইলিয়াম উইলসনের *Statistical Account of The Sundarbans*-এ উল্লেখিত আছে- গাঙ্গেয় বদ্বীপের সর্বদক্ষিণে সুন্দরবনের উৎপত্তি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের সাথে সাথে এর হ্রাস-বৃদ্ধি। পশ্চিমে চব্বিশ পরগণার হুগলী নদীর মোহনা, বাকেরগঞ্জের পূর্বদিকে মেঘনা নদীর মোহনা যেখান থেকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সমুদ্রে মিলেছে।[৪৯] এই নদী আর সমুদ্রের সম্মিলনে এক বিশাল বন ও জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

মানচিত্র-৫: ১৭৯৪ সালের বাংলা ও সুন্দরবন (Robert Laurie & James Whittle, 1794)

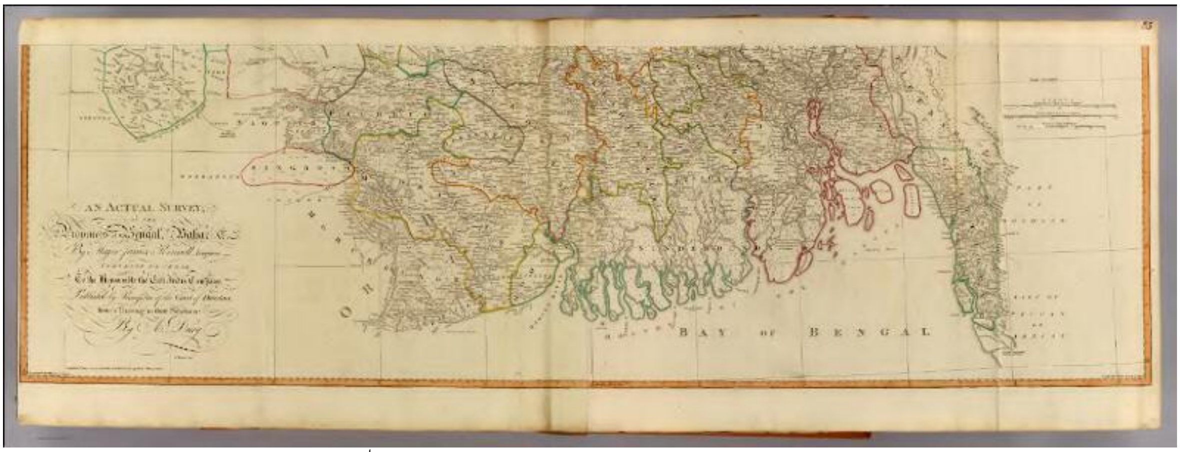

উৎস: David Ramsey Maps Collection

৪৭. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।

৪৮. সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, খণ্ড-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।

৪৯. W. W. Hunter, *Statistical Accountant of Bengal, Vol. I, Districts of the 24 Parganas and Sundarbans*, opcit, p-1.

মানচিত্র-৬: ১৭৯৫-১৮৬৯ সালের বাংলা ও সুন্দরবন (Vandermaelen, Phillippe, 1795-1869)

উৎস: (David Ramsey Maps Collection)

H. Beveridge, B. C. S., *The Districts of Bakarganj: Its History and Statistics* গ্রন্থে সুন্দরবনের বিস্তৃতি সম্পর্কে জানা যায়। বেভেরেজের মতে সম্ভবত পটুয়াখালীর উত্তরাংশ এই মুরাদখানার অন্তর্ভুক্ত।[৫০] এখানে আরো বলা হয় যে, তখন বাকেরগঞ্জ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বিধায় এর সীমানা নির্ধারণ অসম্ভব ছিল। তবে এই বাকেরগঞ্জও মুরাদখানার অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৫১] ১৮৭১ সালে এই জেগে ওঠা ভূমির ৫৫৭০ মাইল সার্ভে জেনারেলের অধীনে দেয়া হয় আর ৭৫৩২.৫ বর্গমাইল অংশ সুন্দরবন কমিশনারের অধীনে দেয়া হয় ১৮৭৩ সালে।[৫২] এই ব্যবধানের কারণে বলা হয় সার্ভে জেনারেলের অংশটুকুতে রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চব্বিশ পরগণা, বাকেরগঞ্জ ও যশোরের শুধু পরিষ্কার এবং কম-বেশি আবাদী জমিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৭২ সালের আদমশুমারীতে সুন্দরবনের জনসংখ্যার পৃথক কোনো তথ্য নেই বরং উল্লিখিত জেলাসমুহের অতিরিক্ত অংশ হিসেবে সুন্দরবনের অঞ্চলগুলোকে অধিভুক্ত করা হয়। ফলে দেখা যায় ১৮৭৬ সালের দিকে সুন্দরবনের আবাদী/অনাবাদী বা সর্বমোট আয়তন ছিল (৫৫৭০+৭৫৩২.৫) ১৩ হাজার ১০২.৫ বর্গমাইল।[৫৩] তাহলে দেখা যায় ১৮৭৬ সালে সুন্দরবনের সীমারেখা ছিল: দৈর্ঘ্য হুগলী থেকে মেঘনা পর্যন্ত প্রায় ১৬৫ মাইল এবং সর্বোচ্চ প্রস্থ উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ৮১ মাইল। এর উত্তরে চব্বিশ পরগণা, যশোর ও বাকেরগঞ্জের স্থায়ীভূমি, পূর্বে মেঘনা নদীর মোহনা

৫০. H. Beveridge, *opcit*, p. 51.

৫১. *Ibid.*

৫২. W. W. Hunter, *Statistical Accountant of Bengal, Vol. I, Districts of the 24 Parganas and Sundarbans*, opcit, p-1.

৫৩. *Ibid.*

থেকে পশ্চিমে হুগলী নদীর মোহনা পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত।[৫৪] সময়ে সময়ে সুন্দরবনের আয়তন হ্রাস পেয়েছে তার উদাহরণ হিসেবে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার নামকরণের মাধ্যমেও উপলব্ধি করা যায়। পূর্বে এই এলাকা ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কালক্রমে এই জঙ্গল কেটে আবাদী জমিতে পরিণত করে বসতি স্থাপন শুরু করা হয়। জনশ্রুতিতে জানা যায় যে, এখানকার ঝোপ-জঙ্গল দা দিয়ে কুপিয়ে নির্মূল করা হয়। তাই এখানকার নামকরণ করা হয় দাকুপী। পরবর্তীতে দাকুপী নামের কিঞ্চিত সংশোধন হয়ে দাকোপ নামে পরিণত হয়।[৫৫] অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বনভূমির আয়তন ছিল বর্তমানের দ্বিগুণ। নির্বিচারে বৃক্ষনিধন এবং জনবসতি স্থাপনের ফলে বনভূমি হ্রাস পেতে থাকে এবং ১৮৭৫ সালে সুন্দরবনকে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পরবর্তী সুন্দরবনের ৬০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা বাংলাদেশের সীমানাধীন এবং ৪২৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ভারতের সীমানাভুক্ত হয়।[৫৬]

মানচিত্র-৭: ১৯১১ সালের বাংলা ও সুন্দরবন (Survey of India, 1911)

উৎস: (David Ramsey Maps Collection)

৫৪. *Ibid.*

৫৫. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, দাকোপ, খুলনা বিভাগ, (http://dakop.khulna.gov.bd/site/page) , সাইটেশন ১৮-০২-২০২১, সাইটটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছে ৩১-১২-২০২২.

৫৬. Abul Khair, *Forest and Forestry*, Banglapedia, opcit.

মানচিত্র-৮: ১৯১২ সালের সুন্দরবন (Survey of India, 1912)

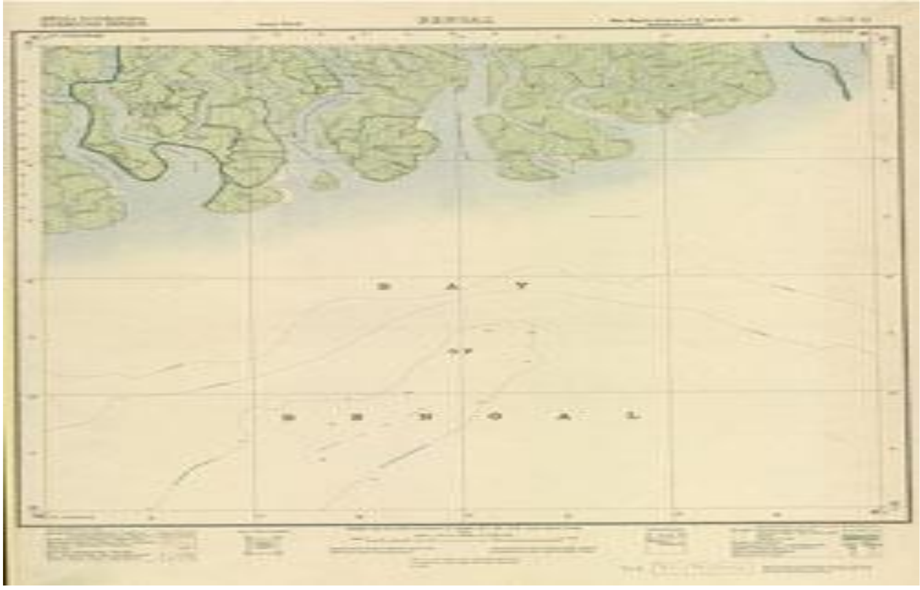

উৎস: (David Ramsey Maps Collection)

মানচিত্র-৯: ১৯৩৭ সালের সুন্দরবন

উৎস: David Ramsey Maps Collection

মানচিত্র-১০: ১৯৪১ সালের সুন্দরবন

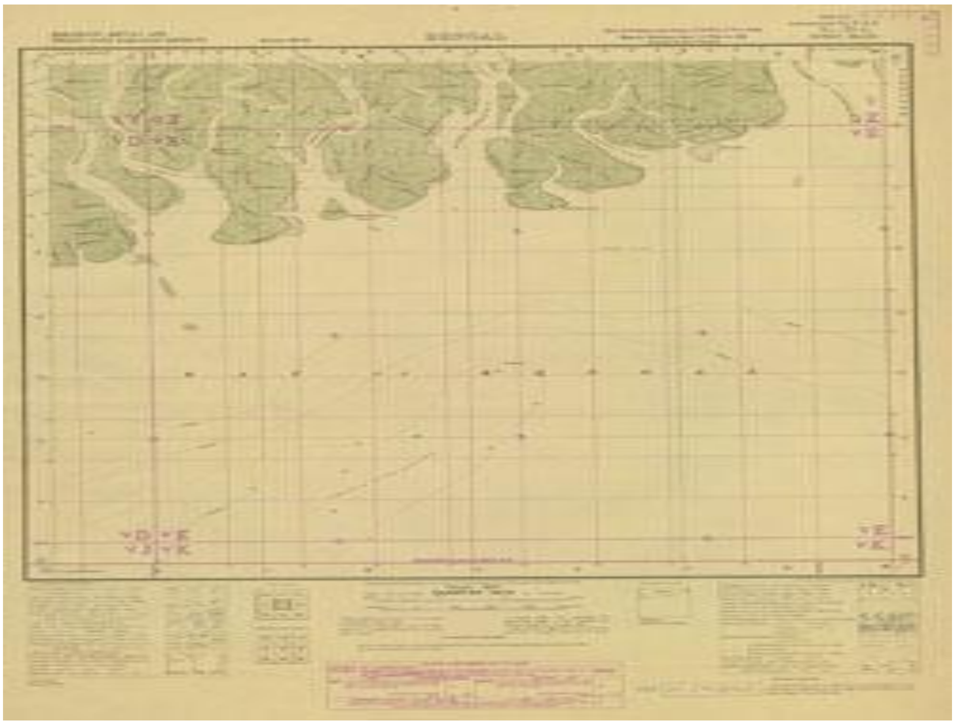

উৎস: David Ramsey Maps Collection

মানচিত্র-১১: ১৯৪৭ সালের সুন্দরবন (This range contains maps acquired by or transferred to the India office Library and Records in the FCO between 15 August 1947 and 31 December1973)

উৎস: David Ramsey Maps Collection

বর্তমান বাংলাদেশের সুন্দরবন বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা এই তিনটি জেলায় সুন্দরবন বিস্তৃত।[৫৭] বাগেরহাটের মংলা, শরণখোলা উপজেলা, খুলনার দাকোপ ও কয়রা উপজেলা এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় এই বন বিস্তৃত। সুন্দরবনের ৬৩.২% ম্যানগ্রোভ বন দ্বারা আচ্ছাদিত আর নদী খাল রয়েছে ৩৬.৮% এলাকাজুড়ে।[৫৮] সুন্দরবনের সর্ব পশ্চিমের সীমানা রয়েছে রায়মঙ্গল নদী যা বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সীমানা নির্ধারন করেছে। দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর।[৫৯] দক্ষিণ সীমান্তবর্তী সাতক্ষীরা জেলা এই ম্যানগ্রোভ বন এবং এখানে উৎপাদিত চিংড়ির জন্য সমগ্র দেশে ও বিশ্বে সুপরিচিত।[৬০] সাতক্ষীরার মোট আয়তন ৩৮১৭.২৯ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ১৫৩৪.৮৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে সংরক্ষিত সুন্দরবন। অর্থাৎ সাতক্ষীরা জেলার মোট আয়তনের ৪০.২% এলাকা, প্রায় এক-তৃতীয়াংশের অধিক আয়তন নিয়ে সুন্দরবন বিস্তৃত।[৬১] সাতক্ষীরা জেলার ৭টি উপজেলার মধ্যে একমাত্র শ্যামনগর উপজেলাতেই মোট আয়তন অর্থাৎ ১৯৬৮.২৩ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ১৫৩৪.৮৮ বর্গাকিলোমিটার আয়তন জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত।[৬২] যদিও জাতীয় তথ্যবাতায়নের সর্বশেষ হালনাগাদ ২৮-১২-২০২০ এর তথ্যানুসারে ১৯০৩ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট শ্যামনগর উপজেলার ১৪৪৮ বর্গকিলোমিটার তথা ৭৬.০১% এলাকা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত।[৬৩] দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত খুলনা জেলার মোট আয়তন ৪৩৮৯.১১ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ২০২৮.২২ বর্গকিলোমিটার এলাকা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত।[৬৪] মোট ৯টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলা যথা- দাকোপ, কয়রা ও পাইকগাছায় সুন্দরবন অবস্থিত। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত খুলনার দাকোপ উপজেলা থেকে সুন্দরবনের দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটার।[৬৫] দাকোপ উপজেলার মোট আয়তন ৯৯১.৫৬ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ৪৯৪.৬৮ বর্গকিলোমিটার, কয়রা উপজেলার মোট আয়তন ১৭৭৫.৪০ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ১৫১২.৩৬ বর্গকিলোমিটার এবং পাইকগাছা উপজেলার মোট আয়তন ৪১১.১৯ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ২১.১৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত।[৬৬] বাগেরহাট জেলার মোট আয়তন ৩৯৫৯.০৬ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ৬০০.০৪ বর্গকিলোমিটার

---

৫৭. Districts Statistics 2011: Satkhira, Districts Statistics 2011: Khulna & Districts Statistics 2011: Bagerhat, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013.

৫৮. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, 2019, p-65.

৫৯. Districts Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, opcit, p-5.

৬০. বাংলাদেশের জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সাতক্ষীরা, (http://www.satkhira.gov.bd/site/page/) সাইটেশন- ৭:৪৫, ১৬-০২-২০২১.

৬১. Districts Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, opcit, p- 3.

৬২. *ibid*, p- 17.

৬৩. বাংলাদেশের জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সাতক্ষীরা, (http://www.satkhira.gov.bd/site/page/), ১৮-০২-২০২১

৬৪. Districts Statistics 2011: Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, opcit, p- 3.

৬৫. বাংলাদেশের জাতীয় তথ্য বাতায়ন, পাইকগাছা, খুলনা, (http://paikgasa.khulna.gov.bd/site/page), সাইটেশন ১৮-০২-২০২১, সাইটটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছে ৩১-১২-২০২২।

৬৬. Districts Statistics 2011: Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, opcit, p- 17.

এলাকা জুড়ে সুন্দরবন বিস্তৃত। বাগেরহাটের মোট ৯টি উপজেলার মধ্যে শরণখোলা ও মোংলায় লোনাপানির বন গড়ে উঠেছে। শরণখোলার মোট আয়তন ৭৫৬.৬০ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ৫৯৪.৫৮ বর্গকিলোমিটার এবং মোংলা উপজেলার ১৪৬১.২০ বর্গকিলোমিটার মোট আয়তনের মধ্যে ৫.৪৬ বর্গকিলোমিটার এলাকায় সুন্দরবন অবস্থিত।[৬৭] যদিও বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নের তথ্যানুযায়ী শরণখোলার মোট আয়তন ১৫১.২৩ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ৫৯.৪৮৪ হেক্টর এলাকা জুড়ে সুন্দরবন।[৬৮] শরণখোলা উপজেলা বলেশ্বর নদীর তীরবর্তী ও সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে অবস্থিত। প্রাকৃতিক প্রভাব ও ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে উপকূলীয় এলাকা দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন তীরবর্তী এবং অন্তর্বর্তী উপকূলীয় এলাকা।[৬৯] আয়তনের (প্রায় ৫,৭৭,২৮৫ হেক্টর) দিক থেকে অপরিবর্তিত থাকলেও সুন্দরবনে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও সুন্দরী গাছের আগামরা রোগে বৃক্ষসম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ব্যাপকহারে বনজ দ্রব্যের ও মৎস্য চাষের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে অবৈধভাবে গাছকাটা ও কৃত্রিমভাবে জলাবদ্ধতা সমস্যা দেখা দেয়। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের আয়তন ১৯90 সালে ৪,০১৫ বর্গকিলোমিটার থেকে ২০০5 সালে ৩,৯৬৩ বর্গকিলোমিটার হয়েছে, কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকে ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার মোট আয়তনের বেশিরভাগই স্থির। ১৯৮০-এর দশকে ৩৯৪ হেক্টর/বছর, ১৯৯০-এর দশকে ১,১৩১ হেক্টর/বছর এবং ২০০০-এর দশকে ৬৯৮ হেক্টর/বছর হারে ১৯৮০ সাল থেকে সুন্দরবনের বনভূমি উপকূলীয় ক্ষয়ের কারণে হারিয়ে গেছে। প্রায় ৪ মিলিয়ন মানুষ তাদের জীবিকার জন্য সরাসরি ম্যানগ্রোভের উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে ৩.৫ মিলিয়ন সুন্দরবন এলাকার উপর নির্ভর করে। বসতিগুলোর আশেপাশে ম্যানগ্রোভ বন উজাড়ের প্রধান কারণগুলো খাদ্য, জ্বালানী এবং আশ্রয়ের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বনগুলোও সাধারণত অতিরিক্ত শোষণ, বন উজাড়, ভূমি পুনরুদ্ধার, উজানের পানির প্রবাহ হ্রাসের ফলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং দূষণের কারণে হ্রাস পাচ্ছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীনে প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম (৫,০০০ হেক্টর) এবং সমৃদ্ধকরণ রোপণ (১০,০০০ হেক্টর) বাস্তবায়িত হয়েছিল। সুন্দরবনের গাছগুলো কাগজ এবং শক্ত কাঠের যোগানের পাশাপাশি নৌকা তৈরির মতো অন্যান্য শিল্পে সরবরাহ করার জন্য কাটা হয় এবং স্থানীয় জ্বালানি কাঠের জন্য ব্যবহৃত হয়।[৭০]

---

৬৭. Districts Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, opcit, p-17.

৬৮. *একনজরে শরণখোলা উপজেলা*, *বাংলাদেশ* জাতীয় তথ্য বাতায়ন, (http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/page), সাইটেশন ১৮-০২-২০২১, সাইটটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছে ০১-০৭-২০২১।

৬৯. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, **ভৌগোলিক পরিচিতি, শরণখোলা**, **(**http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/page**)**, সাইটেশন ১৮-০২-২০২১, সাইটটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছে ০১-০৭-২০২১।

৭০. UN-REDD, *Bangladesh National Program. 2016, Drivers of Deforestation and Forest Degradation in Bangladesh: Final repor*t. UN-REDD Bangladesh National Program, Dhaka, 10January 2017, p. 24-25.

বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ৩,২৩৩ হেক্টর বনভূমি চিংড়ি চাষের জন্য হস্তান্তর করেছে। অনিয়ন্ত্রিতভাবে চিংড়ি চাষ এবং লবণ উৎপাদনের জন্য মৌসুমে ঘের তৈরির ফলে অবশিষ্ট বনভূমি বিরান হয়েছে।[৭১] বন বিভাগ উপকূলবর্তী অঞ্চল ও বৃক্ষশূন্য দ্বীপসমূহে প্রতিরক্ষাবেষ্টনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের প্রথমদিকে উপকূলীয় বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বন গড়ে ওঠে।[৭২]

সারণি-**১: বিভিন্ন** বন বিভাগের অধীন বিভিন্ন ধরণের বনের বর্তমান বিস্তৃতি ও শ্রেণিবিন্যাস (হেক্টর):

বিভাগ	সংরক্ষিত বন	অধিগ্রহণকৃত বন	সুরক্ষিত বন	অর্পিত বন	অশ্রেণীভুক্ত সরকারি বন	খাস	মোট
পার্বত্য বনভূমি	৫,৯৪,৩৮৩	১১,০০৪	৩২,৩০৩	২,৬৩৬	৭,২১,৩৪৪	---	১৩,৬১,৬৭০
পার্বত্য চট্টগ্রাম (উ)	১,৫৯,৩৭৯	---	---	---	১,৫৩,০৬৩	---	৩,১২,৪৪২
পার্বত্য চট্টগ্রাম (দ)	৮২,১৬১	---	---	---	১,৭২,৭২১	---	২,৫৪,৮৮২
বান্দরবান (অশ্রেণীভুক্ত সরকারি বনভূমি)	৪০,১৯৮	---	---	---	৭৮,৫৯২	---	১,১৮,৭৯০
বান্দরবান	---	---	---	---	৫৮,২৩৬	---	৫৮,২৩৬
লামা	---	---	---	---	৭৫,১৪৯	---	৭৫,১৪৯
রাঙ্গামাটি (অশ্রেণীভুক্ত সরকারি বনভূমি)	১২,৮০১	---	---	---	৮৯,৬৯৪	---	১,০২,৪৯৫
জুমচাষাধীন	১২,৯০৩	---	---	---	৯,৬০০	---	২২,৫০৩
কাপ্তাই (পাল্পউড)	২৯,২৭৯	---	---	---	---	---	২৯,২৭৯
খাগড়াছড়ি (অশ্রেণীভুক্ত সরকারি বনভূমি)	১,৪০৯	---	---	---	৮২,০৭৩	---	৮৩,৪৮২
চট্টগ্রাম	৮২,৩০৭	৫,০৯৬	১৯,৮৭৩	২,৬৩৬	---	---	১,০৯,৯১২
কক্সবাজার	১,০৪,১০৩	১,২৪১	১২,৪৩০	---	---	---	১,১৭,৭৭৪
সিলেট	৬৯,৮৪৩	৪,৬৬৭	---	---	২,২১৫	---	৭৬,৭২৫
অভ্যন্তরীণ বনভূমি	৬৮,১৪০	৩১,১৯৮	২,৬৮৯	১৯,৯৮৫	---	---	১,২২,০১২
ঢাকা	২৬,২২১	---	---	---	---	---	২৬,২২১
টাঙ্গাইল	২২,৪৬০	২৭,২৮৭	---	---	---	---	৪৯,৭৪৭
ময়মনসিংহ	১৩,৪৬৭	---	---	১৫,০১৯	---	---	২৮,৪৮৬
দিনাজপুর	৫,০৩৭	৩৮৭	---	৪,৬৮১	---	---	১০,১০৫
রংপুর	৭৬৩	১,৬৯৭	২৬৩	---	---	---	২,৭২৩
রাজশাহী	১৯২	১১	২,৪২৬	২৭৬	---	---	২,৯০৫
কুমিল-া (সম্প্রসারণ)	---	১,৬৯৬	---	---	---	---	১,৬৯৬
ঢাকা (সম্প্রসারণ) দক্ষিণ	---	---	---	৯	---	---	৯
কুষ্টিয়া (সম্প্রসারণ)	---	৮	---	---	---	---	৮
বগুড়া (সম্প্রসারণ)	---	৭	---	---	---	---	৭
ফরিদপুর (সম্প্রসারণ)	---	১০	---	---	---	---	১০
যশোর (সম্প্রসারণ)	---	৯	---	---	---	---	৯
বোটানিক্যাল গার্ডেন, ঢাকা	---	৮৬	---	---	---	---	৮৬
উপকূলীয় বনায়ন	৬,৫৬,৫৭৯	৬	---	---	---	১০১,৫২৬	৭৫,৮১১
সুন্দরবন	৫,৫৭,২৮৫	---	---	---	---	---	৫,৭৭,২৮৫
ভোলা (উপকূলীয় বনায়ন)	২,২৩৬	---	---	---	---	২৪,৩০৪	২৬,৫৪০
পটুয়াখালী (উপকূলীয় বনায়ন)	৮,৫৭১	---	---	---	---	১৩,২৯৩	২১,৮৬৪
নোয়াখালী (উপকূলীয় বনায়ন)	৩৫,৭৪১	৬	---	---	---	৫৪,৬১৮	৯০,৩৬৫
চট্টগ্রাম (উপকূলীয় বনায়ন)	৩২,৭৪৬	---	---	---	---	৯,৩১১	৪২,০৫৭
মোট	১৩,১৯,১০২	৪২,২০৮	৩৪,৯৯২	২২,৬২১	৭,২১,৩৪৪	১,০১,৫২৬	২২,৪১,৭৯৩

১.৭ সুন্দরবনের নদ-নদী: সুন্দরবনের নদী-খাল অসংখ্য। তাই এর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বলা হয় যে, 'বরিশাল এবং সুন্দরবন অঞ্চলে নদীনালা এতো বেশি যে সে অঞ্চলে প্রকৃতই নদীজালিকার সৃষ্টি হয়েছে।'[৭৩] হান্টার এ সর্ম্পকে উল্লেখ করেন যে সুন্দরবনের বৈচিত্র্য স্থানে স্থানে গিয়ে অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্বে বা হুগলী থেকে মেঘনা সর্বত্রই ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। কাবাদাক নদী অফিসিয়াললি চব্বিশ পরগণা ও যশোর

৭১. Abul Khair, *Forest and Forestry*, Banglapedia, opcit

৭২. ঐ।

৭৩. (https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80), ২০-১২-২২.

সুন্দরবন এবং বলেশ্বর নদী বা হরিণঘাটা নদী যশোর এবং বাকেরগঞ্জ সুন্দরবনের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করেছে। হুগলী থেকে কাবাদাকের তিন-চতুর্থাংশ দূরত্বে যমুনা নদী সুন্দরবনে প্রবেশ করেছে। এই নদী কাঞ্চনপাড়ায় ২৪ পরগণার মধ্য দিয়ে যাওয়া ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের স্টেশনে হুগলীর সাথে যুক্ত হয়েছে এবং ইছামতি ও ভৈরব নদীর সাথে গঙ্গার সাথে যুক্ত হয়েছে। কালিগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের নিকটে বাসন্তপুরে এসে এই নদী দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এর পশ্চিম ধারাটি কালিন্দী নাম ধারণ করে প্রায় পঁচিশ মাইল প্রবাহিত হয়ে রায়মঙ্গল নদীর সাথে যুক্ত হয়। যমুনা রায়মঙ্গলের সাথে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। হুগলী এবং যমুনা বা কালিন্দীর মধ্যে যে অংশ সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তার অধিকাংশই ক্ষারীয় নদীতে পরিণত হয়েছে বা লবণাক্ত পানি রয়েছে। কালিন্দী এবং যমুনার পূর্বাংশে বলেশ্বর বা হরিণঘাটা পর্যন্ত অংশে প্রধান নদীগুলোর পানি মার্চ পর্যন্ত সুমিষ্ট পানি থাকে এবং যমুনার পশ্চিমাংশের নদীগুলোর মত নয়। সেসর নদীর মূল স্রোতধারা না থাকায় এবং গঙ্গার সাথে সংযুক্ত না থাকায় সারা বছরই পানি লবণাক্ত থাকে। বলেশ্বর বা হরিণঘাটা এবং বাকেরগঞ্জ সুন্দরবনের পূর্বাংশের নদীগুলো গঙ্গা থেকেই এসেছে এবং অধিকাংশ মৌসুমেই মিষ্টি পানি প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে।[৭৪]

প্রাকৃতিক গঠন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় হান্টার সুন্দরবনকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। একটি হচ্ছে হুগলী থেকে যমুনা ও কালিন্দী নদী পর্যন্ত; দ্বিতীয়টি যমুনা ও বলেশ্বর নদীর মধ্যবর্তী ভূমি এবং তৃতীয়টি, বলেশ্বর থেকে মেঘনা নদী পর্যন্ত।[৭৫]

---

৭৪. W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, Trubner and Co. London, 1876, reprint by W. Bengal Govt. India, 1998, p. 3.

৭৫. *ibid*, p. 3.

মানচিত্র-১২: গঙ্গা-পদ্মা নদী প্রণালী (উৎস: বাংলাপিডিয়া)

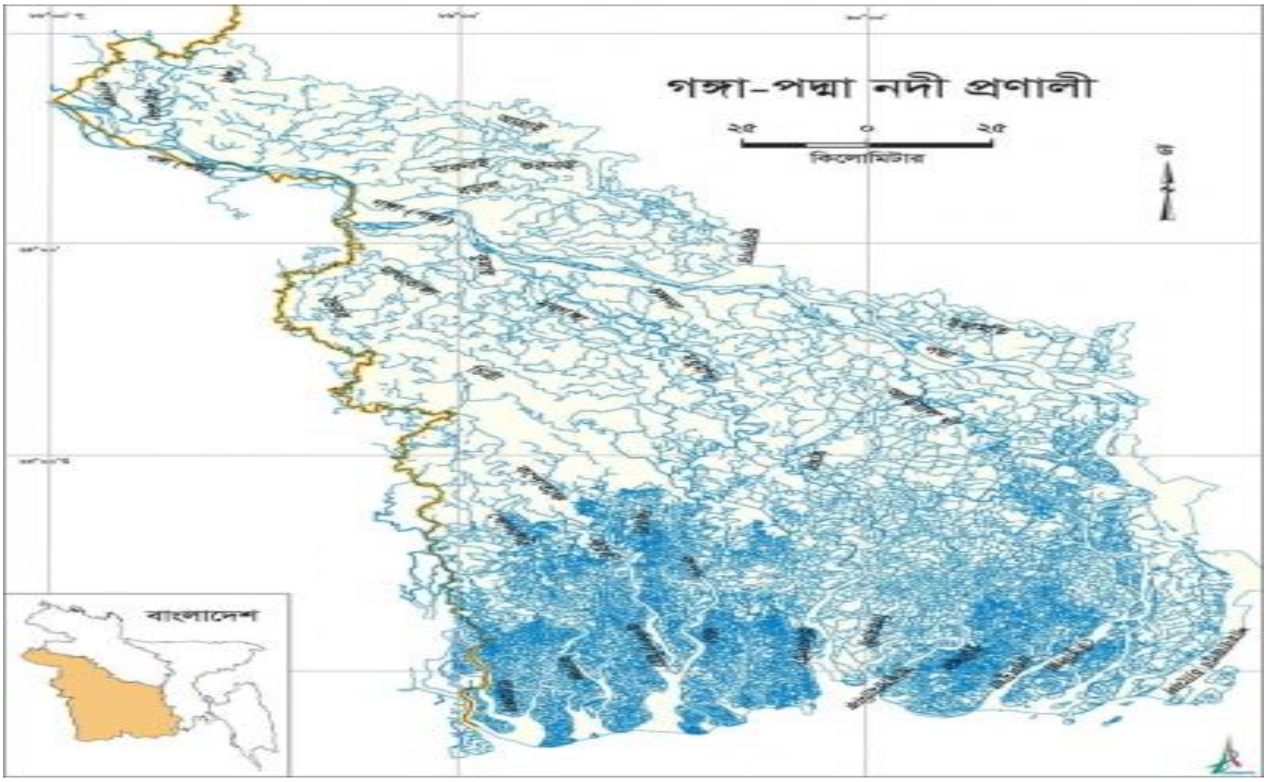

বনভূমির সমগ্র এলাকা জুড়ে বয়ে গেছে বিভিন্ন প্রশস্ততা ও গভীরতার অসংখ্য খাল ও নদী। পশুর, শিপসা, আড়পাঙ্গাশিয়া ও মালঞ্চের মতো অনেক নদ-নদীর সাথে বনের সংযোগ রয়েছে। এছাড়া রায়মঙ্গল ও যমুনা নদীর সাথে রয়েছে আংশিক সংযোগ। এসব নদী বনটিতে যথেষ্ট পরিমাণ পানি সরবরাহ করে থাকে। পূর্বাঞ্চলে বনটির সাথে বলেশ্বর নদীর সংযোগ রয়েছে যা স্বাদু পানি সরবরাহ করে থাকে।[৭৬]

বাংলাপিডিয়ায় সুন্দরবনে ছোট বড় প্রায় ১৭৭টি নদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে । যথা- বলেশ্বর, সুমতি, ছাপড়াখালি, বড় শেওলা, হরিণ চীনা, শরণখোলা, আমবাড়ে, চান্দেশ্বর, কাপা, কালিন্দী, সঠকা, জাভো, মরা পশুর, ডাংমারি, বিলে, ছুতোরখালি, চালো বগি, হরমহল, বেড়ি-আদা, বাকির খাল, আড়-শিবসা, হড্ডা, মহিষে, ছাছোন হোগলা, মজ্জত, শাকবাড়ে-সিঙ্গা, গোলখালি, কুকুমারি, কলাগাছে, ডোমরখালি, হংসরাগ, কাগা, নীলকমল, খেজুরদানা, সেজিখালি, বাইনতলা, রাঙ্গাবালী, দোবেকি, ফিরিঙ্গি, মানদো, কেওড়াসুতী, বন্দো, ধকোলা, লতাবেড়ি, ভেটুইপাড়া, বালুইঝাঁকি, কালিকাবাড়ী, বেকারদোন, আন্ধার মানিক, ঝালে, পাটকোষ্টা, বাসে, গোলভকসা, ধানিবুনে, হরিখালি, মনসার বেড়, পুষ্পকাটি, গঙ্গাসাগর, কালী লাই, বগী চেঁচানে, কুঁড়েখালি, ভূয়ের দনে, কাঠেশ্বর, সোনারুপাখালি, দুধমুখ, লাঠিকারা, তেরকাটি, ধানঘরা, আড়বাসে,

৭৬. ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৬, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪১।

দক্ষিণচরা, সাপখালি, কদমতলি, বুড়ের ডাবুর, লক্ষ্মী পশুর, মানকি, আশাশুনি, তালতক্তা, ধ্বজিখালি, মণ্ডপতলা, নেতোখালি, ভায়েলা, বাগানবাড়ি, ঝাড়াবাগনা, বগাউড়া, বক্সখালি, চাইলতাবাড়ি, সিঙ্গড়তলি, মাথাভাঙা, নারায়ণতলি, কইখালি, মথুরা, খাসিটানা, আগুনজ্বালা, ফুলঝুরী, মালাবগা, খামুরদানা, উবদে, গুবদে, সোনাইপাঁঠী, ধোনাইর গাঙ, কানাইকাঠি, মরিচঝাঁপি, নেতাই তালপাঁঠী, ধনপতি, রাগাখালি, মুক্ত বাঙাল, আরিজাখালি, দুলোর টেক, যিনগিলি, বিবির মাদে, টেকাখালি, দেউর যাঁদে, চামটা কামটা, কুঞ্জে মাঠে, ব্যয়লা কয়লা, মাদার বাড়ে, বয়ার নালা, হানকে, ধনচের নদী, মূল্যে মেঘনা, বাইলো, বেতমুড়ি, বুড়িগোল্লি, চুনকুড়ি, মায়াদি, ফুলবাড়ি, তালতলি, আংরা কনা, গাড়ার নদী, বাদামতলি, ভুতের গাঙ, বৈকুণ্ঠ হানা, করপুরো, ছায়া হলড়ি, আড়ভাঙা, তালকপাঁঠী, খেজুরে কুডূলে, ছোটো শেওলা, কাঁচিকাটা, দাইর গাঙ, বৈকিরী, জালঘাটা, ইলিশমারি, ঝলকি, সাতনলা, মকুরনি, হেলার বেড়, কালিন্দে, শাকভাতে, গোন্দা, পালা, তেরবেঁকী, তালবাড়ে, হেড় মাতলা, ভুড়ভুড়ে, ছদনখালি, ফটকের দনে, ভরকুণ্ডে, কেঁদাখালি, নওবেঁকী, কলসের বালি, পানির খাল, কুলতলি, বড়বাড়ে, মুকুলে, মধুখালি, পাশকাটি, গোছবা, ঘাট হারানো, গাবান্দারা, লোকের ছিপি, বাহার নদীপার, বড় মাতলা, পায়রা ঠুনী, কালবেয়ারা, ঢুকুনী ও পারশে মারী।[৭৭]

জার্মান নাগরিক হেলমুত দেনজাও ও গাক্রেদ নওম্যান দেনজাও এবং অস্ট্রিয়ান নাগরিক পিটার গ্রানগর্স ১৫ বছরের গবেষণায় সুন্দরবন এটলাস শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে সুন্দরবনের নদীর সংখ্যা পঁয়ত্রিশটি।[৭৮] সুন্দরবনের বড় ও উল্লেখযোগ্য নদী হলো পাঁচটি। বলেশ্বর, পশুর, শিবসা, খোলপেটুয়া ও কালিন্দি নদী। এগুলোর শাখা-প্রশাখা থেকেই আরো ত্রিশটি নদী তৈরি হয়েছে। নিম্নে সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য কিছু নদীর বর্ণনা দেওয়া হলো-

পশুর: পশুর নদী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা ও বাগেরহাট জেলার একটি নদী। পশুর নদীটি দাকোপ উপজেলায় অবস্থিত। এছাড়া এই উপজেলার উল্লেখযোগ্য নদী ভদ্রা, রুপসা, ঝপঝপিয়া। নদীটির দৈর্ঘ্য ৩৫ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৩০ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। সুন্দরবনের এক অতি বৃহৎ নদী, প্রকৃতপক্ষে রূপসা নদীরই বর্ধিত রূপ। পশুর নদীটি খুলনা জেলার খুলনা সদর উপজেলার একত্রিশ নং ওয়ার্ড এলাকায় প্রবহমান রূপসা নদী হতে উৎপত্তি লাভ করেছে।[৭৯] মংলার দক্ষিণে পশুর নদী সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। গড়াই নদীর অধিকাংশ পানি নবগঙ্গার মাধ্যমে এই নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। বদ্বীপ অঞ্চলে আকারের দিক দিয়ে মেঘনার পর পশুরের স্থান। পশুর নদী চালনা থেকে প্রায় ৩২ কিমি দক্ষিণে মংলা খালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তারপর প্রায় দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে মোহনার ৩২ কিমি উত্তরে শিবসার সঙ্গে মিলিত হয়

৭৭. (https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80), সাইটেশন ২০-১২-২০২২।

৭৮. (https://studypress.org/news/details/),সাইটেশন ২০-১২-২০২২।

৭৯. মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক, *বাংলাদেশের নদনদী: বর্তমান গতি প্রকৃতি*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪৮।

এবং পশুর নামেই সাগরে পতিত হয়। নদীটি খুব গভীর এবং সারা বৎসরই নাব্য থাকে বলে এর মধ্য দিয়ে সামুদ্রিক জাহাজ প্রবেশ করতে পারে।[৮০] এই নদীর তীরেই মংলা সমুদ্রবন্দর অবস্থিত। পশুর একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ, যে পথে খুলনা বরিশাল হয়ে স্টীমারসহ লঞ্চ ও বিভিন্ন নৌযান বিভিন্ন দিকে যাতায়াত করে। নদীটি রূপসায় ৪৬০মি. বাজুয়ানে প্রায় ৭৯০মি. এবং শিবসার সংযোগস্থলে প্রায় ২,৪৪০মি. প্রশস্ত। নদীটির মোট দৈর্ঘ্য ১৪২ কি.মি.। পশুর ও এর শাখা-প্রশাখাগুলো সবই জোয়ারভাটা দ্বারা প্রভাবিত। নদীতে সারাবছর পানিপ্রবাহ থাকে এবং ছোটবড় নৌযান চলাচল করে। বর্ষাকালে নদীটিতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং সেসময় নদীর তীরবর্তী এলাকা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। নদীটির উজানের তুলনায় ভাটির দিক অধিক প্রশস্ত। এক সময় দাকোপ উপজেলায় যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল পশুর নদী। বর্তমানে এই পশুর নদীর পানি দ্বারা কৃষিকাজ করা হয়। অধিকন্তু এই নদীতে অনেক মাছ পাওয়া যায়।[৮১]

চিত্র-৪: ইছামতি নদী

৮০. ঐ, পৃ. ৪৮।

৮১. ঐ।

ইছামতি নদী: ইছামতি নদী বা ইচ্ছামতি নদী বাংলাদেশ-ভারতের একটি আন্তঃসীমান্ত নদী। এটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। নদীটির দৈর্ঘ্য ৩৩৪ কিলোমিটার এবং গড় প্রস্থ ৩৭০ মিটার। ইছামতি নদীটিকে বর্তমান নদী গবেষকগণ তিনভাগে ভাগ করেন। উচ্চ ইছামতি, মধ্য ইছামতি এবং নিম্ন ইছামতি নামে। নিম্ন ইছামতি নদী পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এবং বাংলাদেশের সুন্দরবনের বুড়ি গোয়ালিনী রেঞ্জ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে রায়মঙ্গল নদীতে পতিত হয়। নদীটির উৎস হতে দেবহাটার পশ্চিম পর্যন্ত মোট দৈর্ঘ্য ২০৮ কি.মি.। প্রবাহ থেকে শেষ অংশ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাসনাবাদের কাছে এবং সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটার কাছে কালিন্দী নদীর সাথে যুক্ত হয়। ঈশ্বরীপুরের কাছে যমুনার একটি শাখা প্রথমে ইছামতি নামে পরিচিত। তারপর কয়েক কি.মি. পরিচিত 'কদমতলী' নদী নামে। কদমতলী সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মালঞ্চ নদী যেখানে সমুদ্রে পড়েছে, তার কাছেই পড়েছে এই নদীতে। ইছামতি নদীটির বাংলাদেশ অংশের দৈর্ঘ্য ৭৫ কি.মি.। ইছামতি-কালিন্দী-রায়মঙ্গলদল নদী একসূত্রে গাঁথা তিনটি নদী। এর ভিতরে ইছামতি-কালিন্দীর পূর্ব তীর ভাঙ্গনপ্রবণ। বাংলাদেশ অংশে ভাঙ্গে আর পশ্চিম সীমান্তে অনেক চর জেগে উঠেছে। দুর্গাপূজার শেষে, বিজয়া দশমীতে ইছামতিতে প্রতিমা বিসর্জনের অনুষ্ঠান ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের একটি অনন্য প্রদর্শনী। ইছামতি নদীটি যা দুই দেশের মাঝে নিরপেক্ষ সীমানা হিসেবে কাজ করে, তা উভয় দেশের নৌকা থেকে দেবদেবী বিসর্জনের সময় উচ্ছসিত প্রফুল্লতায় ভরে ওঠে। এসময় চোখের দূরতম সীমা পর্যন্ত বিভিন্ন আকৃতির নৌকা দৃষ্টিগোচর হয় এবং প্রতিটি নৌকায় সংশ্লিষ্ট দেশের পতাকা লাগানো থাকে।

কপোতাক্ষ নদ: সুন্দরবন প্রদেশের আর একটি বিখ্যাত নদীর নাম কপোতাক্ষ। দ্রাবিড়পূর্ব জনগোষ্ঠীর 'কবদাক' সংস্কৃত ভাষায় 'কপোতাক্ষ'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। ইছামতী নদী কুষ্টিয়া জেলার দর্শনার কাছে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে একটি শাখা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে যা ভৈরব নামে পরিচিত। কোটচাঁদপুরের দক্ষিণে ভৈরব থেকে একটি শাখা বের হয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে খুলনা জেলার পাইকগাছার কাছে শিবসা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ভৈরবের এ শাখাই কপোতাক্ষ। এ নদের পানি কপোত বা পাখির অক্ষির (চোখ) মতো স্বচ্ছ ছিল বলে নদীটির নাম হয় কপোতাক্ষ। ভৈরব নদী হতে উৎপত্তি হয়ে কপোতাক্ষ ক্ষুদ্রাকারে চৌগাছা, ঝিকরগাছা, চাকলা, ত্রিমোহনী, সাগরদাঁড়ি, তালা, কপিলমুনি রাড়ুলী, চাঁদখালী, বড়দল, আমাদি, বেদকাশি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের পাশ দিয়ে সুন্দরবনের মধ্যে খোলপেটুয়ার সঙ্গে মিশেছে। কপোতাক্ষ পদ্মার শাখা। কপোতাক্ষ যশোর থেকে কেশবপুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাগরদাঁড়ী হয়ে গাবুরা (শ্যামনগর) ইউনিয়নের চাঁদনীমুখার পাশ দিয়ে আড়পাঙ্গাশিয়া নাম নিয়ে সুন্দরবনের ভিতর মালঞ্চের সাথে মিলে সাগরে পড়েছে। নদীটি খুলনা জেলার প্রায় সর্বত্রই নাব্য এবং লঞ্চ চলাচলের ব্যবস্থা আছে। নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬০ কিমি।

শিবসা নদী: সুন্দরবনের অন্যতম প্রধান নদী। শিবসা নদী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ৮৫ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ১৫১০ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। নদীটি

খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলা, দাকোপ উপজেলা এবং কয়রা উপজেলার মাঝে অবস্থিত। মংলা-তে পশুর নদী দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পশ্চিম শাখাটি শিবসা নামে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মোহনার কাছে কুঙ্গা নাম ধারণ করে বঙ্গোপাসাগরে পড়েছে। শিবসা-কুঙ্গার তীরে হিরণ পয়েন্ট অবস্থিত। দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ কি.মি.। উৎপত্তির পর প্রায় ২৭ কি.মি. পাইকগাছা উপজেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশিষ্ট পথ পাইকগাছা এবং দাকোপ উপজেলার সাধারণ সীমা নির্ধারণ করে প্রবাহিত হয়েছে। শিবসা সুন্দরবনের অভ্যন্তরে পশুর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। শিবসার চলার পথে বাডুলিয়া, হাড়িয়া, বুনাখালী, গড়খালী, মৈনস, তাকী, বেষেখালী, বাদুরগাছা, ভেলতি, করুয়া গাংরাইল, হড্ডা, নালী জল্লা এবং আরও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খাল বিভিন্ন দিক থেকে এসে শিবসাকে জোরদার করেছে। নদীটি নিয়মিত জোয়ার-ভাটা দ্বারা প্রভাবিত। পূর্ণ বর্ষার কয়েক মাস ব্যতীত নদীর পানি সারা বছরই লবণাক্ত থাকে। এই নদীর অধিকাংশ অংশ উপকূলীয় বনভূমি সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ নদীর কিছু অংশ বাংলাদেশ-ভারত প্রটোকল রুটের অন্তর্গত। এই নদী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় শ্রেণির নৌপথ হিসেবে স্বীকৃত।[৮২]

আড়পাঙ্গাশিয়াঃ আড়পাঙ্গাশিয়া নদী বা আরপাঙ্গাশিয়া নদী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত অন্যতম নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ৬৬ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ১৪৩২ মিটার। আড়পাঙ্গাশিয়া নদীটি খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার দক্ষিণ বেদকাশি ইউনিয়নে প্রবহমান কপোতাক্ষ নদ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। অতঃপর এর জলধারা একই উপজেলার নালিয়ান রেঞ্জ ইউনিয়নে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।[৮৩] খোলপেটুয়া ও কপোতাক্ষের স্রোত প্রবল হয়ে আড়পাঙ্গাশিয়া নাম ধারণ করেছে। এর সঙ্গমস্থলেই কপোতাক্ষ ফরেস্ট অফিস। বঙ্গোপসাগর হতে দশ-বার মাইল উত্তরে আড়পাঙ্গাশিয়া নদী উত্তর-পশ্চিম দিক হতে আগত মালঞ্চ নদীর সাথে মিশে সমুদ্র পর্যন্ত মালঞ্চ নাম ধারণ করেছে। এ নদীর মোহনায় স্রোত ভয়ংকর। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ জাহাজ 'ফালমাথ' এখানে নিমজ্জিত হয়। মালঞ্চ ও রায়মঙ্গল এর দক্ষিণ দিকে বিখ্যাত অতলস্পর্শ বা অতলতল অবস্থিত। এটি সম্পর্কে বলা হয়-

> *আড়পাঙাশিয়া এ-নদী সে-নদী বেয়ে প্রবেশ করেছে গভীর বনে। কয়রা নদী থেকে কাশীর খাল ধরে আড়পাঙাশিয়া পড়ল। আড়পাঙাশিয়া বিরাট নদী। তারপর নাম না জানা খাল ও পাশ-খাল দিয়ে এসে হাজির গহীন অরণ্যে।*[৮৪]

---

৮২. ঐ, পৃ. ৭৪-৭৫।

৮৩. ম ইনামুল হক, বাংলাদেশের নদনদী, অনুশীলন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৪১। আরো দেখুন, মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক, *বাংলাদেশের নদনদী: বর্তমান গতি প্রকৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

৮৪. শিবশঙ্কর মিত্র, *সুন্দরবন সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৫।

ভদ্রা নদী: ভদ্রা নদী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা জেলার একটি নদী। কপোতাক্ষ হতে হরিহর নদী এসে ভদ্রায় মিশেছে। ত্রিমোহনী ও মির্জানগর ভদ্রার তীরে মূঘল ফৌজদারের রাজধানী ছিল। জনশ্রুতি রয়েছে যে, যাত্রাপথে কোন ভাঙন বা বিপর্যয় সৃষ্টি না করার কারণে নদীর নাম হয়েছে ভদ্রা। যশোরের ঝিকরগাছার কাছে কপোতাক্ষ নদ থেকে উৎপন্ন হয়ে খুলনা জেলার পশুর ও শিবসা নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগকে বিভক্ত করেছে। অতঃপর সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশুর ও শিবসা নদীদ্বয়ের মিলনস্থলে গিয়ে পতিত হয়েছে। স্থানীয়ভাবে এই অংশ মরা ভদ্রা নামে পরিচিত। কিন্তু পরবর্তীকালে ভদ্রা সুতারখালীর নিকট থেকে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে প্রায় ৩০ কি.মি. পথ অতিক্রম করে পশুর নদীতে পড়েছে। বর্তমানে নদীর এই গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে সুতারখালী নদী দিয়ে এর মূল স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। সম্প্রতি ভদ্রার মূল প্রবাহ ঝপঝপিয়া নদী হয়ে পশুরে গিয়ে পড়েছে। কিছু অংশ হাব্রাখালী হয়ে শিবসায় পড়েছে। মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯৩ কিমি।[৮৫]

খোলপেটুয়া নদী: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের বড় নদীগুলোর একটি খোলপেটুয়া। গঙ্গার স্রোতধারাই পদ্মা হয়ে বয়ে গেছে এই নদীতে। সাতক্ষীরার আশাশুনি আর শ্যামনগর উপজেলা জুড়েই এই নদীর বিস্তৃতি। পদ্মপুকুর থেকে যে খোলপেটুয়া দক্ষিণ-পূর্বে গেছে সেখানে ইংরেজি ওয়াই আকৃতি নিয়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য ৫৬ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৫৫০ মিটার এবং প্রকৃতি সর্পিলাকার। খোলপেটুয়া নদী সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার বুদ্ধহাটা ইউনিয়নে প্রবহমান বেতনা নদী থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। অতঃপর নদীটি খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেদকাশি ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রবহিত হয়ে আড়পাঙ্গাশিয়া নদীতে পতিত হয়েছে। এই নদী পথিমধ্যে কাপসণ্ডা, গোরালি প্রভৃতি স্থান স্পর্শ করে ঘোলা নামক স্থানে গলঘেসিয়া নদীর সাথে যুক্ত হয়েছে। অতঃপর আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে শ্যামনগর উপজেলার নওয়াবেকির পাশ দিয়ে বুড়িগোয়ালিনিতে আড়পাঙ্গাশিয়া নাম ধারণ করেছে এবং পারশেমারির নিকট কপোতাক্ষের সাথে মিলিত হয়েছে। নীলডুমুরের পূর্ব পাড়ে গাবুরা ইউনিয়ন আর দক্ষিণেই শুরু সুন্দরবন। নীলডুমুর, মুন্সীগঞ্জ, পদ্মপুকুর, গাবুরার মানুষের জীবনে অনেক গল্পই বইয়ে দিয়েছে এই খোলপেটুয়া। এ অঞ্চলের অনেক প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এই নদী। আবার দিয়েছে জীবিকাও। আইলা বা সিডরে শ্যামনগর আর আশাশুনি উপজেলার বাঁধগুলো ভেঙ্গে দৈত্যের রূপ ধারণ করেছিল এই নদী। মানুষ গাছের আগায় উঠেও পরিত্রাণ পায়নি। সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। গাবুরা আর পদ্মপুকুরকে দুমড়ে মুচড়ে করেছে বিধ্বস্ত। খোলপেটুয়া এই অঞ্চলের মানুষকে দিয়েছে জীবিকা। এই নদীতে প্রায় সারা বছরই মাছ ধরে দ্বীপের মানুষ। মোহনায় ধরা পড়ে প্রচুর মাছের পোনা। যা পরবর্তীতে চাষের জন্যে বিক্রি হয়। এই নদীতে সারা বছর ধরেই কাঁকড়া পাওয়া যায়। সুন্দরবন ঘেঁষে জাল ফেললে মাছও অনেক পাওয়া যায়। বৈশাখ-

৮৫. (https://bn.banglapedia.org/index.php?title), মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক, *বাংলাদেশের নদনদী: বর্তমান গতি প্রকৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

জৈষ্ঠ্যের খোলপেটুয়ার বিধ্বংসী চেহারাকে অনেকটাই প্রতিরোধ করে সুন্দরবন। দক্ষিণ থেকে আসা ঝড়কে আর উত্তরে যেতে দেয় না। সুন্দরবনের পাড় ধরে খোলপেটুয়ার বাঁক ধরে ঘুরতে থাকলে হরিণের দৌড়, লাফ দিয়ে গাছের পাতায় মুখ দেয়া, বানরের বাঁদরামি আনে চঞ্চল ভাব।[৮৬]

চিত্র-৫: রায়মঙ্গল নদী

রায়মঙ্গল: শ্যামনগর ও সুন্দরবনের পশ্চিম দিকের বৃহত্তম নদী রায়মঙ্গল। রায়মঙ্গল নদী বাংলাদেশ-ভারতের একটি আন্তঃসীমান্ত নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য বাংলাদেশ অংশের দৈর্ঘ্য ৬২ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ২২৬৫ মিটার । রায়মঙ্গল নদীটি সুন্দরবনের কাছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার সীমান্ত ঘেঁষে প্রবাহিত হয়েছে। হিঙ্গলগঞ্জের কাছে ইছামতি নদী কয়েকটি জলধারায় বিভক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রায়মঙ্গল নদী, বিদ্যাধরী নদী, ঝিলা নদী, কালিন্দী নদী এবং যমুনা নদী। সুন্দরবনের উপকূল জুড়ে এই নদীগুলো প্রশাখা বিস্তার করেছে। সুন্দরবনের অভ্যন্তরস্থ নৌচলাচল পথ হিসেবে নদীটি ব্যবহৃত হয়। নদীটি উপকূলীয় জোয়ার ভাটার নদী। এটি একটি জোয়ার মোহনার

৮৬. মাজেদুল নয়ন, *সুন্দরবনে রহস্যময় খোলপেটুয়া*, বাংলা নিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬, (https://www.banglanews24.com/tourism/news/bd/543916.details).

নদী। ইছামতি নদী সাতক্ষীরা জেলার পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে কালিন্দী নামে প্রবাহিত হয়ে আরও দক্ষিণে সুন্দরবনের ভিতরে প্রবেশের পর রায়মঙ্গল নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। মোহনায় রায়মঙ্গল নদীর মুখ ফানেলের মতো। একসময় এই পথে স্টিমার সার্ভিস কলকাতা থেকে বরিশাল হয়ে বাংলাদেশের অন্যান্য বন্দরে চলাচল করতো। রায়মঙ্গল জোয়ারভাটা দ্বারা প্রভাবিত নদী এবং এর পানি লবণাক্ত। ইহার কিয়দাংশে বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তর্জাতিক সীমারেখা সৃষ্টি করেছে।[৮৭] এ নদীর তেজস্বীতা সম্পর্কে বলা হয়-

> *রায়মঙ্গল! রায়মঙ্গল তো কালোপানির নদী! তাই না বাউলেদা? -হ্যাঁ, কালোপানির নদীই। ভারি গাঙ। জোর তোড়ও বড্ড বেশি। তেমোহানার মুখে বড্ড ঘোলা। বিদ্যার জল আর রায়মঙ্গলের জল মিশে তোলপাড় করতে থাকে যেন। জলে ঘূর্ণি ওঠে বারবার। তাইতেই তো পশ্চিম পাড় ঘেঁষে হাল ধরেছি। ঘোলের ফেরে যাতে না পড়ি।*[৮৮]

কালিন্দী: বসন্তপুরের উত্তরাংশে যমুনা-ইছামতি হতে কালিন্দী নামক একটি ক্ষুদ্র শাখা দক্ষিণ দিকে গিয়েছিল। প্রতাপাদিত্যের সময় এটি প্রবল ছিল না, খালের মত ছিল। ১৮১৬ খ্রি. এটি থেকে একটি খাল কেটে বড় কলাগাছিয়া নদীর সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এটিকে সাহেবখালি বলে। ইছামতির ভাটার জল এই পথে প্রবাহিত হয়ে কালিন্দী ক্রমে বড় হতে থাকে। এটিই ভারতের সাথে শ্যামনগর উপজেলার সীমানা নদী। এটি শ্যামনগর, নূরনগর ও কৈখালীর পশ্চিম সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রায়মঙ্গলে মিশে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। সাতক্ষীরা জেলার পশ্চিম সীমান্ত বরাবর ইছামতী নদী দক্ষিণে মোটামুটিভাবে আন্তর্জাতিক সীমারেখা ধরে কালিন্দী নামে প্রবাহিত হয়ে আরও দক্ষিণে সুন্দরবন এলাকায় রায়মঙ্গল নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। রায়মঙ্গল যেখান থেকে আন্তর্জাতিক সীমারেখা ত্যাগ করেছে সেখান থেকে একটি শাখা হাড়িয়াভাঙ্গা নামে আন্তর্জাতিক সীমারেখা বরাবর প্রবাহিত হয়ে সাগরে পড়েছে। কালিন্দীর একটি শাখা যমুনা নামে প্রবাহিত হয়ে হাড়িয়াভাঙ্গার পূর্বে রায়মঙ্গল নদীর সঙ্গে মিশে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।[৮৯]

---

৮৭. (https://bn.banglapedia.org/index.php?title)

৮৮. শিবশঙ্কর মিত্র, *সুন্দরবন সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

৮৯. (https://bn.banglapedia.org/index.php?title)

চিত্র-৬: কয়রা নদী

কয়রা নদী: খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার একটি নদী। নদীটি খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার কপোতাক্ষ নদ থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং একই উপজেলার শিবসা নদীতে পতিত হয়েছে। কয়রা উপজেলায় এর জন্ম ও সমাপ্তি বলে এর নাম কয়রা বলে অনুমিত হয়।[৯০] দৈর্ঘ্য ৪৩ কিলোমিটার এবং গড় প্রস্থ ৪৫ মিটার। নদীটির গভীরতা ৮.৫ মিটার। নদী অববাহিকার আয়তন ৮০ বর্গ কিলোমিটার। এই নদীতে সারা বছরই পর্যাপ্ত পানি থাকে। কয়রা নদী জোয়ার-ভাটা দ্বারা প্রভাবিত হয়। খুলনার কয়রা উপজেলার কপোতাক্ষ, শাকবাড়িয়া ও কয়রা নদী দ্বারা এ উপজেলা বেষ্টিত। এই নদীর তীর ধরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মৎস্য খামার, যা থেকে চিংড়ি চাষ ও চিংড়ি খামারে কাজ করে এই এলাকার অনেক মেহনতি মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে।

বলেশ্বর: শরণখোলা উপজেলার প্রধান নদী বলেশ্বর যা সুন্দরবনের পার্শ্ব হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিলিত হয়েছে। পিরোজপুর, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ১৪৬ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ১৬৪৪ মিটার। বলেশ্বর নদীটি বাগেরহাট জেলার পূর্ব সীমান্তে এবং বরগুনা জেলার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। নদীটির পূর্ব প্রান্তে

৯০. মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক, *বাংলাদেশের নদনদী: বর্তমান গতি প্রকৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫-২৬। মোকাররম হোসেন, *বাংলাদেশের নদী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপকূলীয় বনভূমি সুন্দরবন অবস্থিত। এই নদীটি সুন্দরবনের মাঝে অবস্থিত একটি নদী। বলেশ্বর নদী দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে হরিণঘাটা নদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এ নদীর মোহনায় লালদিয়া সমুদ্রসৈকত অবস্থিত।[৯১] বলেশ্বর নদী থেকে পানগুছি নদী হয়ে বাগেরহাট জেলা সহ ঢাকায় যাতায়াত করার ব্যবস্থা রয়েছে।

শরণখোলার নদী ভোলা: ভোলা শরণখোলা উপজেলার আরও একটি নদী যা সুন্দরবন হয়ে মংলা বন্দর এ মিলিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত নদী সমূহে দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিবারে ৬ ঘণ্টা করে ২ বার জোয়ার ও ২ বার ভাটা হয়। ভাটার সময় বনাঞ্চলের পানি সমুদ্রে পতিত হয় এবং জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানিতে নদী ফেঁপে ওঠে।

১.৮ সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার ইতিহাস:

১.৮ (ক) বনভূমি ব্যবস্থাপনার আদি ইতিহাস: প্রাচীন ভারতে বন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। কারণ প্রাচীনকালে বনভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাস সম্পর্কিত উৎস খুবই কম। তবে বিভিন্ন সাহিত্যিক উৎসে কিছু তথ্যাদি পাওয়া যায়। বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আর্য সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, তারা পশুপালনের পাশাপাশি কৃষির প্রতি আগ্রহী হয় এবং বন পরিষ্কার করে বসতি নির্মাণ ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতো।[৯২] মূলত প্রাচীনকালে বনভূমি ছিল মানব বসতি ও অন্যান্য চাহিদা পূরণস্থল, সাধারণ জনগণের পশুচারণক্ষেত্র ও রাজকীয় হস্তিবাহিনীর বিচরণক্ষেত্র।

---

৯১. মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক, *বাংলাদেশের নদনদী: বর্তমান গতি প্রকৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪। *HM Khaled Kamal "Bagerhat District", Sirajul Islam,* Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh , Asiatic Society of Bangladesh. *2012.*

৯২. Abul Khair, *Forest and Forestry*, Banglapedia (https://en.banglapedia.org/index.php/Forest_and_Forestry) cited 16-12-2019.

মানচিত্র-১৩: বাংলাদেশের বন আচ্ছাদিত এলাকা

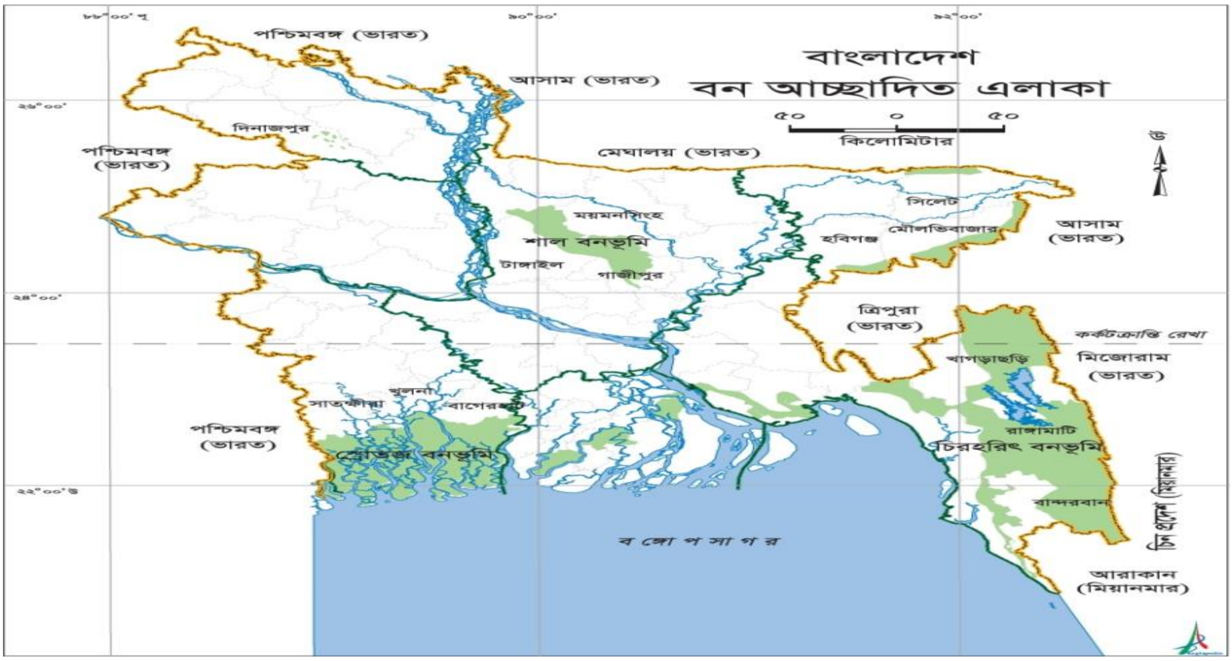

১.৮ (খ) মৌর্য যুগ (৩২১-২২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ): সম্রাট আশোক বন ও বন্যপ্রাণী খুব ভালবাসতেন এবং তিনি বন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেন। মেগাস্থিনিস তৎকালের বর্ণনায় লিখেছেন: 'ফল ও বৃক্ষশোভিত অনেকগুলো সুউচ্চ পর্বত এবং অনেকটা সুদৃশ্য ও অত্যন্ত উর্বর বিশাল সমতল ভূমি, যা অসংখ্য নদ-নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন'।[৯৩] মৌর্য শাসনামলে প্রথম বনজ পণ্য ব্যবস্থাপনার জন্য *'Kupyadhyasta'* কুপধ্যায়স্ত পদবী প্রধানের অধীনে Department of Forest Products বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৯৪] এই বিভাগ তৎকালীন ৮টি বনভূমির ব্যবহারবিধি তদারকি করতো। এই ৮টি বনভূমিকে বলা হতো *'গজবনজ'* (Gajavanas) বা Elephant Forests. এই বনভূমিগুলো ধর্মীয়, বনজ পণ্য, রাজহাতির বিচরণ, রাজ পরিবারের শিকার এবং সাধারণ জনগণের শিকারের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ সময় সুন্দরবন এলাকা উত্তর ও দক্ষিণ বাংলার বনভূমি নিয়ে গঠিত Angirya-Vana-বনের অধীন ছিল।[৯৫]

---

৯৩. Abul Khair, *Forest and Forestry,* Banglapedia (https://en.banglapedia.org/index.php/Forest_and_Forestry) cited 16-12-2019.

৯৪. Prasanta Kumar Pandit, *PAST MANAGEMENT HISTORY OF MANGROVE FORESTS OF SUNDARBANS, Indian Journal of Biological Sciences, Vol-19,* Kolkata, *2013,* p. *24.*

৯৫. *ibid,* p. *25.*

প্রাচীন ভারতের বন ব্যবস্থাপনার মানসিকতা ছিল পরিবেশ বান্ধব। সে সময় ধর্মীয়, আধ্যাত্মিকবোধ এবং সম্প্রদায়গত স্বার্থ থেকেই বনভূমিকে সংরক্ষণ করা হতো। প্রাচীন বাংলার সামসময়িক নানা উৎসে বন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয়তার দিক আলোচিত হয়েছে। ২৭৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী চাণক্য যিনি কৌটিল্য নামে সমধিক পরিচিত তাঁর লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ *অর্থশাস্ত্র*-এ বন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নানা নির্দেশনা রয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনামলে বনজ সম্পদ রক্ষার জন্য একটি পূর্ণ মাত্রার বনবিভাগ চালু করা হয়।[৯৬] সুপারিন্টেনডেন্ট বা কুপাধ্যক্ষ ছিলেন এই বিভাগের প্রধান। কুপাধ্যক্ষকে সহায়তা করার জন্য নিয়োজিত ছিলেন অসংখ্য বনপাল। এদের সকলের দ্বায়িত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল। মৌর্য শাসনামলে বনকে ৩টি শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়[৯৭]:

১. রিজার্ভ ফরেস্ট

২. প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকে অনুদিত বন

৩. পাবলিক ফরেস্ট

রিজার্ভ ফরেস্টকে আবার কয়েকটি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়[৯৮]।

১. রাজার জন্য সংরক্ষিত বন। রাজার শিকারের জন্য এই বন সংরক্ষিত ছিল। এই বন খুবই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

২. রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত বন। এটি কুপাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে ছিল।

উল্লেখ আছে যে, সংরক্ষিত বনসমূহে প্রয়োজনে বনায়নও করা হতো। বনজ সম্পদ ব্যবহারে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্রায়ত্ত সংরক্ষিত বনে আগুন দেয়া বা গাছ কাটা ছিল নিষিদ্ধ। ফাঁদে ফেলে পাখি ধরা, হত্যা করার জন্য ২৬টি রৌপ্য মুদ্রা জরিমানা দিতে হতো। হরিণ কিংবা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে এই জরিমানা ছিল দ্বিগুণ। বিখ্যাত মৌর্য সম্রাট অশোক বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীসহ তোতাপাখি, ময়না, রাজহাঁস, তিতিরপক্ষী, কচ্ছপ, কাঠবিড়ালি,বানর এবং ঘুঘু প্রভৃতি শিকার থেকে সংরক্ষণের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি শিকার ও বনভূমি পরিস্কারের জন্য অপ্রয়োজনে বনে আগুন দেয়া নিষেধ করেন।[৯৯] অর্থাৎ মৌর্য শাসন নীতির অন্যতম ছিল বন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অমাবস্যা এবং প্রতিপদ

---

৯৬. Md. Millat-e-MUSTAFA, *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh Bangladesh Forest Policy Trends,* Policy Trend Report, IGES, 2002.

৯৭. *Ibid.*

৯৮. *ibid.*

৯৯. Mark Poffenberger (ed.), *Communities and Forest Management in South Asia a Regional Profile of The Working Group On Community Involvement In Forest Management*, IUCN, September 2000, p-14.

দিনগুলোতে বন্য প্রাণী হত্যা করার অনুমতি কারোর জন্যই ছিল না।[১০০] রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে ধর্মাচারণোদ্দেশ্যে বনভূমি ব্রাহ্মণদের দান করা হতো। নীহাররঞ্জন রায় এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন,

> *"লোকনাথের ত্রিপুরা-পট্টোলীতে দেখিতেছি সুব্বুঙ্গ বিষয়ে রাজা লোকনাথ সর্প-মহিষ-ব্যাঘ্র-বরাহাধ্যুষিত অটবী ভুখণ্ডে চতুর্বেদবিদ্যাবিশারদ দুই শত এগার জন বাহ্মণ বসাইবার জন্য প্রচুর ভূমি দান করিয়াছিলেন; দানের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্মা।"*[১০১]

৬২৯ থেকে ৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে ভ্রমণ করা চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং এ অঞ্চলে বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্যতা লক্ষ্য করেন। বননিরাপত্তায় ধর্মীয় বিশ্বাস আর সরকারি বিধিনিধের বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন।[১০২] হিউয়েন সাং ৬২৯-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভ্রমণে আসেন। তাঁর স্মৃতিকথায় তখনকার বনসমূহের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। তিনি শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু ও রামগ্রামসহ নিকটবর্তী অঞ্চলে গভীর বনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি রামগ্রাম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হন বিখ্যাত এক অরণ্য পথে, যা ছিল অপ্রশস্ত ও অত্যন্ত বিপদসংকুল। অরণ্য থেকে বেরিয়ে তিনি কৃষ্ণগড় নামক দেশে পৌঁছান। অতঃপর হিউয়েন সাং সমতটে অর্থাৎ বর্তমান বৃহত্তর যশোর, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলে পৌঁছান এবং এখানকার নিম্ন ভূমি, আর্দ্র জলবায়ু এবং পর্যাপ্ত গাছপালা ও হিংস্র জীবজন্তুর কথা উল্লেখ করেন।[১০৩] মৌর্য শাসনের পর কুষাণরা ক্ষমতা দখল করে।

১.৮ (গ) গুপ্ত যুগ (৩২০-৪১৫ খ্রিষ্টাব্দ):

কুষাণের পর ক্ষমতায় আসে গুপ্ত সাম্রাজ্য। ৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে গুপ্তদের পতন হলেও কিছু কিছু এলাকায় তারা বার বা তের শতক পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। সমগ্র গুপ্ত শাসনামলে মূল রাজস্বের অন্যতম উৎস ছিল বন। এক্ষেত্রে বনভূমি তদারকির জন্য *গলমিকাস* নামক পদবীদের নিয়োগ করা হতো। কাঠ, বাঁশ, বেত জাতীয় গুল্ম ও আঁশ এবং ঔষধি লতা প্রভৃতি বন থেকে সংগ্রহ করা হত।[১০৪] গুপ্ত শাসনামলে পূর্ববর্তী বন ব্যবস্থাপনার অধিকাংশই বাতিল হয়ে যায়। এসময় সংরক্ষণের পরিবর্তে বনভূমির বিস্তীর্ণ অংশ চাষাবাদের জন্য পরিষ্কার করা হয়।

১.৮ (ঘ) পাল আমল: অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় চারশত বছর বাংলা পাল সাম্রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। তাদের সময় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থাপনায় বন বিভাগ পরিচালনা করা হত। পাল ও চন্দ্র লিপিমালায় দেখা যায়

---

১০০. Md. Millat-e-MUSTAFA, A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh Bangladesh Forest Policy Trends, Policy Trend Report, opcit.

১০১. *Ibid.*

১০২. Mark Poffenberger (ed.), Communities and Forest Management in South Asia: A regional Profile of The Working Group on Community Involvement in Forest Management, *ibid*, p-14.

১০৩. Abul Khair, *Forest and Forestry*, Banglapedia (https://en.banglapedia.org/index.php/Forest_and_Forestry) cited 16-12-2019.

১০৪. Md. Millat-e-MUSTAFA, A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh Bangladesh Forest Policy Trends, ibid.

রাজপুরুষদের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তালিকায় রাজন, রাজন্যক, রাণক, সামন্ত, মহাসামন্ত প্রভৃতি রাজপাদোপজীবীধারী। এমনই একজন ছিলেন অপর মন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশুর যার উপাধি ছিল ***"আটবিক সামন্ত-চক্র-চূড়ামণি"***। উপাধিটিতে সংযুক্ত *আটবিক* শব্দটি মূলত বনভূমিকে নির্দেশ করছে। নীহাররঞ্জন রায় *বাঙালির আদি ইতিহাস* রচনায় বনভূমি বোঝাতে বন, অরণ্য, অটবী ও আটবিক শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন।[১০৫] তবে এসময় অধিক পরিমাণে কাঠ সংগ্রহ, বিকল্প উৎপাদনের অভিষ্টে বনভূমি ব্যবহার, বিভিন্ন সামন্ত্রতান্ত্রিক যুদ্ধে বনে আগুন জ্বালানো এবং এসকল ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে দমনে ব্যর্থতা প্রভৃতির কারণে ব্যাপক আকারে বনভূমি ধ্বংস হয়।[১০৬]

১.৮ (ঙ) সেন আমলঃ সেন আমলে সুন্দরবন পরিচিত ছিল খাট, খাটা, খাটিকা ও খাঁড়ি প্রভৃতি নামে। এর প্রতিটি শব্দই মূলত খাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুন্দরবনের যেহেতু অসংখ্য খাল রয়েছে তাই এটি খাড়িভূমি নামে অভিহিত ছিল। বলা হয়, যে জনপদে অনেক খাল রয়েছে সেটিই খাড়িমণ্ডল। নীহাররঞ্জন রায় এ প্রসঙ্গে বলেন ***"চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশ যে খালবহুল তাহা তো সকলেই জানেন।"***[১০৭] তিনি তাঁর *বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব* গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার ভূমির মাপ ও মূল্য সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করেন যে, রাজা লক্ষণসেন সুন্দরবন পট্টোলীতে দ্রোণের নিম্নতর ক্রম হচ্ছে *খাড়িকা* এবং তারপর যথারীতি *উন্মান* ও *কাকিণী*।[১০৮] অষ্টম শতকের পূর্বের লিপিমালাগুলোতে দেখা যায় ভূমি পরিমাপের মানদণ্ড ছিল নল। লক্ষ্মণ সেনের আনুলিয়া শাসনে উল্লেখ আছে যে, ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলে (পশ্চিম-নিম্নবঙ্গ) *বৃষভশংকর* নলমানদণ্ড প্রচলিত ছিল।[১০৯]

১.৮ (চ) সুলতানি আমলঃ ১২০৪ থেকে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত সুন্দরবন ইন্দো-তুর্কি শাসনাধীন ছিল। মধ্যযুগে স্থানীয় শাসকরা বিশেষ কিছু মূল্যবান দারুবৃক্ষ প্রজাতিকে 'রাজবৃক্ষ' ঘোষণা করতেন।[১১০] মুসলিম প্রচারকগণ ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি কৃষির ব্যাপক চাষাবাদে গুরুত্ব দিয়েছিল। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উপমহাদেশের বনসমূহ সবাই অবাধে ব্যবহার করতে পারতো।[১১১] সুলতানি আমলে সুফি, পীর বা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা ভূমি পুনরুদ্ধার

---

১০৫. *ibid.*

১০৬. *ibid*

১০৭. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৮-১৮৯।

১০৮. ঐ।

১০৯. ঐ, পৃ. ১৯১।

১১০. Abul Khair, *Forest and Forestry*, Banglapedia (https://en.banglapedia.org/index.php/Forest_and_Forestry) cited 16-12-2019

১১১. *Ibid.*

ও মানব বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করা হতো।[১১২] তারা জনগণের কাছে যেহেতু খুব গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাই অনাবাদী ভূমি পরিষ্কারের বিষয়টি সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠে। ডেম্পিয়ার হজেস এ সম্পর্কে বলেন-[১১৩]

> “..between the thirteenth and eighteenth centuries Muslim pioneers locally remembered as holymen not only established the Islamic religion in much of south and eastern Bengal, but also played important roles in the intensification of wet rice agriculture, established new modes of property rights, and contributed to a fundamental altering of a natural, forested ecosystem”

মুবাররা গাজী ছিলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি সকলের কাছে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, ফকির (পবিত্র ব্যক্তি) হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। তিনি হুগলি নদীর পশ্চিম (বাম) তীরকে ধানের জমিতে পরিণত করেছেন বলে জানা গেছে। জেমস ওয়াইজ লিপিবদ্ধ করেছেন: “মুবাররা গাজী একজন ফকির ছিলেন বলে কথিত আছে, যিনি হুগলি নদীর বাম তীরে জঙ্গল এলাকা পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং প্রতিটি গ্রামবাসীর কাছে তাকে উৎসর্গ করা একটি বেদি রয়েছে। তার জন্য স্থাপিত বেদিতে উপাসনা না করে কেউ বনে প্রবেশ করতো না, এবং কোনও দল লোকালয়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা করতো না। বনভূমি পরিষ্কারের একপর্যায়ে যখন রাজস্ব সংগ্রহের মত উৎপাদন করতে সক্ষম ছিল তখন মুসলিম অগ্রগামীদের বনভূমির নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জমির বরাদ্দ দেওয়া হতো।[১১৪]

এ সময় সুন্দরবন ভূমি ব্যবস্থাপনা ইসলামি শাসক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গ তথা পীরদের অধীনে ছিল। খান জাহান, মুবাররা গাজী, জিন্দা গাজী, মেহের আলী ও উমর শাহ প্রমূখ সুফি সাধক ব্যক্তিবর্গ ইসলাম প্রচারে এই বনভূমি ব্যবহার করেছেন।[১১৫] ব্রিটিশ আমলে সুন্দরবন ভূমি পুনরুদ্ধারের সময় তৎকালীন পটুয়াখালী মহকুমার দক্ষিণ অংশে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। সুন্দরবনের কমিশনার Mr Reilly-এর বর্ণনামতে, সেখানে খোদাই করা একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এটি ১৪৬৫ সালে নির্মাণ করা হয়েছিল। মসজিদটি আবিষ্কারের সময় এটি ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত ছিল। সেখানে পাওয়া শিলালিপিটি পরবর্তীতে এশিয়াটিক সোসাইটি জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়। শিলালিপিটির অনুবাদ করেন Colonel Lees সেখানে লেখা ছিল *"The Prophet of God (on whom be peace, & c.) said, Whose buildeth a mosque.* মসজিদটি ইটের তৈরি। বিঘাই

---

১১২. Food and Agricultural Organization of the United Nations, Forest management – History Bangladesh, last updated: Monday, March 1, 2010.

১১৩. Wise, James, *Notes on the races, castes and trades of Eastern Bengal*, 2 vols, Harrison and Sons, London, 1883.

১১৪. *ibid*.

১১৫. Prasanta Kumar Pandit, PAST MANAGEMENT HISTORY OF MANGROVE FORESTS OF SUNDARBANS, *opcit.* p. 26.

এবং গুলসাদখালী থেকে কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে মসজিদ বাড়ি নামক স্থানের একটি উপনদীর কাছে অবস্থিত। মূলত হিজরি ৮৭০ সাল এবং ইংরেজি ১৪৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ শাহের পুত্র আবু আল মুজাফলার বারবাক শাহের শাসনামলে খান মোয়াজ্জেম উজিল খানের দ্বারা নির্মান করা হয়েছিল। ১৮৭৪ সালে বেভেরেজ মসজিটি পরিদর্শন করে এর অবস্থা তুলে ধরে বলেন-

> *I visited this mosque in 1874, and found it in good preservation. It is, however, quite devoid of architec- tural interest or beauty. The woods which once surrounded it have been cleared away, and it now lies in the midst of rice-fields. A faqir has assumed the charge of it, and is supported by the gifts of occasional visitors.*[১১৬]

ত্রয়োদশ শতকের পর কোনও সময় চব্বিশ পরগণা জেলার নিম্নভূমি পরিত্যক্ত বা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কারণ দায়ী থাকতে পারে। এরপর থেকেই এই অঞ্চল গভীর অরণ্যময়। যশোর-খুলনা ও ফরিদপুর-বাকেরগঞ্জের কিছু কিছু নিম্নভূমি হিন্দু আমলেই ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল, নতুন নতুন আবাদ এবং পাঠান আমলেও জনপদ গড়ে তোলা হচ্ছিল কিন্তু প্রকৃতির বিরুপ প্রভাব এবং মানুষের ধ্বংসাত্মক ভূমিকার কারণে যোড়শ ও সপ্তদশ শতকেই এই জনপদ গঠনের পরিসমাপ্তি হয়ে যায়। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের প্রবল বন্যায় ফতেহাবাদ সরকারের অসংখ্য ঘর-বাড়ি, নৌকা এবং দুইলক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। এর সাথে সাথে আরম্ভ হয় বৈদেশিক আক্রমণ। মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের উন্মত্ত হত্যা ও লুণ্ঠনের কারণে খুলনার নিম্ন অঞ্চল একেবারে জনমানবহীন গভীর অরণ্যে পরিণত হয়। রেনেলের নকশায়ও (১৭৬১) দেখা যায় যে, বাকেরগঞ্জ জেলার সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে লেখা আছে *"মগদের অত্যাচারে পরিত্যক্ত জনমানবহীন"* *(Country depopulated by the Maghs).*[১১৭]

১.৮ (ছ) মোগল শাসনামল: মোগল আমলে বনভূমি পুনরুদ্ধারে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। যখনই বনের কোনো অংশ যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব উৎপাদনের জন্য পরিষ্কার করা হতো তখনই সেটি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় একীভূত হতো এবং একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে ঘোষণা করা হতো যার নাম ছিল পরগণা।[১১৮] এসময় স্থানীয় মোগল নেতৃবৃন্দ বন ইজারা দিতেন।[১১৯] আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি ও বাবরের দিনলিপি থেকে জানা যায়, মোগল প্রশাসন সুবা বাংলার মধ্যে জান্নাতাবাদ, খলিফাবাদ ও বাজুহা ছিল বনভূমিপূর্ণ অঞ্চল।

---

১১৬. H. Beveridge, B. C. S., The Districts of Bakarganj: Its History and Statistics, opcit, p. 39-40.

১১৭. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব, পৃ. ৮৬।

১১৮. Food and Agricultural Organization of the United Nations, Forest management – History Bangladesh, opcit.

১১৯ . Abul Khair, *Forest and Forestry*, Banglapedia (https://en.banglapedia.org/index.php/Forest_and_Forestry) cited 16-12-2019.

জান্নাতাবাদ মালদহের অংশ যা এখন নবাবগঞ্জ নামে পরিচিত; ফতেহাবাদ- ফরিদপুর, দক্ষিণ বাখেরগঞ্জ এবং গঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত দ্বীপাঞ্চল; খলিফাবাদ- দক্ষিণ যশোর ও পশ্চিম বাখেরগঞ্জ; বাকলা- উত্তর ও পূর্ব বাখেরগঞ্জ এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ঢাকা; বাজুহা- রাজশাহীর অংশ, বগুড়া পাবনা ও ঢাকার অংশবিশেষ; সোনারগাঁও- পশ্চিম ত্রিপুরা ও নোয়াখালী। খলিফাবাদে প্রচুর বুনোহাতি এবং বাজুহায় মাস্তুল তৈরির জন্য লম্বা ও পুরু কাঠ পাওয়া যেত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জান্নাতাবাদের বিস্তীর্ণ তৃণ ভূমিতে বুনো মহিষ চরে বেড়াতো। এই বর্ণনা অনুযায়ী বর্তমান সুন্দরবন উত্তরে আরও সম্প্রসারিত হয়ে উত্তর নদীয়া ও উত্তর যশোর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সেখানে পাওয়া যেত কুমির আর বাঘ। বন সম্পর্কে মোগলরা ছিল অনেকটা উদাসীন। তারা বনকে প্রধানত সংরক্ষিত শিকার ভূমি হিসেবে ব্যবহার করত। উদ্যান ও ছায়ানিবিড় রাজপথ নির্মাণে গাছ ব্যবহৃত হতো। মোটকথা, গাছ সম্পর্কে তাদের মনোভাব ছিল সৌন্দর্যবোধ প্রভাবিত, তাতে সংরক্ষণ, বিস্তার, উন্নয়নসহ বনায়নের সমস্যা সম্পর্কে কোন পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না।[১২০] ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ এলাকা বনভূমিতে ঢাকা ছিল। **১৭১৩** সালে একজন চাকমা আদিবাসী প্রধান তৎকালীন মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতল ভূমির বণিকদের পাহাড়ি জনগণের সাথে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদানের অুনরোধ করেন। সম্রাট তখন পারস্পরিক বাণিজ্যের অনুমতি দেন এবং এর মাধ্যমে বনভূমি উজাড় হতে থাকে।[১২১]

মোগল শাসনামলে বাংলা ছিল সুবা বাংলা নামী প্রশাসনিক ইউনিট। অধিক রাজস্বের জন্য এ সময় বাংলায় বনভূমি পরিষ্কার করে কৃষি আবাদের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়। বনজ পণ্যে অর্থনীতি সম্প্রসারিত হওয়ায় তারা বন বাণিজ্যে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। ফলে ভূমি করের মাধ্যমে নগদ অর্থকে উৎসাহিত করা হয়। মোগল শাসননীতিতে রাজস্ব জমি বৃদ্ধির জন্য বন সাফ করার তাগিদ দেয়া হয়।[১২২] ভূস্বামীরা নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য এই নীতিকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলেন।[১২৩] তারা শিকারের জন্য বন সংরক্ষণের ঘোষণা দেন। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম কাঠের অন্যতম উৎস হওয়ায় ঢাকায় বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।[১২৪] ফলে শহরের চারপাশে প্রচুর বৃক্ষের উপস্থিতি থাকলেও ভূমি দখলের অনুপ্রেরণায় পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে বন উজাড় হতে দেখা যায়।[১২৫] জ্বালানীর অভাবে বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী লাঠির সাহায্যে গরুর গোবর শুকিয়ে

---

১২০. *Ibid*.

১২১. Food and Agricultural Organization of the United Nations, Forest management – History Bangladesh, opcit.

১২২. *ibid*.

১২৩. *ibid*.

১২৪. Md. Millat-e-MUSTAFA, A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh Bangladesh Forest Policy Trends, Policy Trend Report, opcit.

১২৫. Cited in Ajay S. Rawat, *History of Forestry in India*, New Delhi: Indus Publishing Company, 1991, p.165.

লাকড়ি তৈরি করতে বাধ্য হয়।[১২৬] দুর্গম ও ঘন জঙ্গলে আদিবাসী জনগণ শিকার, খাদ্য সংগ্রহ ও চাষাবাদের চর্চা করতে শুরু করে। এসময় ব্যবসা-বাণিজ্যে অকাষ্ঠ জাতীয় বনজ পণ্য রেসিন, গাম, মধু, মোম ও ভেষজ চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠে।[১২৭] মধ্যযুগের শাসকগণ বনকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করলেও তারা স্থানীয় জনগণের অধিকার ও প্রয়োজনের ব্যাপারে অবগত ছিলেন। মহারাষ্ট্রের রাজা শিবাজি ১৬৭০ সালের ফরমানে উক্ত বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে:

> *"There are tress like teak in our Kingdom. Such of theseas are needed may be cut with the permission of His Highness. What is needed over and above this should be purchased from outside. The mango and jack trees in our own kingdom are of value to the Navy. But these must never be touched. This is because these trees cannot be grown in a year or two. Our people have nurtured them like their own children over long periods. If they are cut, their sorrow would know no bounds. An end achieved by harming one person can serve only in the short run. Rather it would bring ill repute to the ruler who hurts the citizenry. Furthermore, there is grave danger in the loss of tree cover".*[১২৮]

স্থানীয়রা সুন্দরবনের বনকে ভেজা ধানের ক্ষেতে রূপান্তরিত করা এবং তাদের আশেপাশের মুসলমানদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হওয়ায় বন-পরিষ্কারকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা মোগল আমলে অব্যাহত ছিল। এমনকি মুসলমানদের পূর্বে সুন্দরবনে বসবাসকারী হিন্দু বাঙালি জাতি, পশ্চিমে পোদ এবং পূর্বে চণ্ডালরা এই ধরনের পরিসংখ্যান দ্বারা তাদের জীবিকার ক্ষেত্রে প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। সুন্দরবনের অধিপতি দেবতা হিসেবে বন বিবির আবির্ভাব এই প্রভাবের জন্য দায়ী হতে পারে। আজও কেউ হিন্দু এবং মুসলিম একইভাবে বন বিবিকে স্মরণ না করে বন বা সমুদ্রে প্রবেশ করে না। তিনি দক্ষিণ রায়কে (বাঘ-দেবতা) নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। শুঁটি ও চণ্ডালরা মৎস্যজীবী ছিল। তারা এর মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করতো। যাই হোক, হিন্দু চাষীদের অভিবাসন এবং চাষের উপর মুসলিম নেতাদের গুরুত্বারোপের ফলে মৎসজীবীদেরকে কৃষিকাজে উৎসাহিত করা হয়েছিল। ১৮৮৩ সালে জেমস ওয়াইজ উল্লেখ করেছেন যে মুসলমানরা মাছ ধরাকে একটি নিম্ন পেশা বলে মনে করে, কারণ অমুসলিম এবং বহিষ্কৃত উপজাতিদের সাথে এর ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে, যারা তাদের চারপাশের মুসলিম সমাজে কখনোই একত্রিত হয়নি। শুধু মুসলমানরাই মৎস্যজীবীদের চেয়ে কৃষিকে

---

১২৬. Mark Poffenberger (ed.), Communities and Forest Management in South Asia: A regional Profile of The Working Group on Community Involvement in Forest Management, opcit, p-14.

১২৭. *ibid*, p-14.

১২৮. As cited in Madhav Gadgil, "*Deforestation: Problems and Prospects*," in Ajay S. Rawat, *History of Forestry in India*, New Delhi: Indus Publishing Company, 1991 p.13.

প্রাধান্য দিত তা নয়, মাছ ধরা এবং কৃষিকাজের প্রতি হিন্দুদের আবেগ তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের অনুরূপ; কৃষিকাজ ছিল নির্বাচিত পেশা।[১২৯] কৃষকের পণ্য, শস্য, সহজেই নগদে রূপান্তরিত হতে পারে, যাতে সরকারকে কর দিতে পারে; সহজে মাছ ধরতে না পারাসহ বিভিন্ন কারণে জেলেদের পণ্যের উপর এত সহজে কর দেওয়া হত না। অধিকন্তু, পূর্বে মাছে বোঝাই উপহ্রদগুলো শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে যায়, কারণ প্রধান নদীগুলো নিচের দিকের পলির আমানতকে ধুয়ে দেয়। ফলস্বরূপ, যারা আগে তাদের জীবিকার জন্য মাছ ধরার উপর নির্ভর করতো তাদের অনেকেই ক্রমবর্ধমানভাবে চাষের দিকে ঝুঁকেছে। মুসলিম এবং হিন্দু (অ-মৎস্য শিকারী জাতি) একইভাবে এখনও মাছ ধরার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে। যাই হোক, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরবর্তীতে জমির উপর চাপের পাশাপাশি ভাঙনের কারণে জমির ক্ষতির সাথে সাথে দখলের পাল্টা রূপান্তর প্রত্যক্ষ করা যায়। চাষী পরিবার, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মাছ ধরা, বিশেষ করে চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে; পেশার ক্ষেত্রে জাতি ও ধর্মীয় বিরোধ আর থাকে না। মাছ ধরার চেয়ে চাষাবাদের এই অগ্রাধিকার ভারতে ব্রিটিশ শাসনে অব্যাহত ছিল।[১৩০]

রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের নব উদ্ধারকৃত ভূমিসমূহ মোগল প্রশাসনিক ইউনিট ‘পরগণা’-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৭৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে ‘আমবারাবাদ’ নামে ১৭৩৪ সালে সুন্দরবনে প্রথম পরগণা প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১৩১] এরকমই আরো একটি পরগণা ছিল বুজুর্গ উমেদপুর। বাকেরগঞ্জ, পটুয়াখালী, বেতাগী, আমতলী, বরগুনা, পাথরঘাটা, বামনা প্রভৃতি বুজুর্গ উমেদপুর পরগণার অন্তর্গত ছিল। এটি একটি পুরনো পরগণা। এটি পূর্বে সরকার বাজুহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বুজুর্গ থেকে এর নাম এসেছে বলে জানা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলায় শায়েস্তা খানের পুত্র উমেদ খান শাসন করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব মগ-পর্তুগীজদের সাথে যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য চন্দ্রদ্বীপ, পরগণা ও সরকার বাজুহা হতে নতুন একটি পরগণা সৃষ্টি করে শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্গ উমেদকে প্রদান করেন। তাঁর নামে পরগণার নাম হলো বুজুর্গ উমেদপুর।[১৩২] তার কিছু বিবরণ খণ্ড আকারে পাওয়া যায়

১২৯. Wise, James, *Notes on the races, castes and trades of Eastern Bengal*, opcit.

১৩০. *ibid*.

১৩১. Anamitra Anurag Danda, *SURVIVING IN THE SUNDARBANS: THREATS AND RESPONSES An analytical description of life in an Indian riparian commons*, the doctor´s degree at the University of Twente, 2007, p-29.

১৩২. এ প্রসঙ্গে বরিশাল বার্তায় উল্লেখ আছে যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব মগ-পর্তুগীজদের সাথে যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য চন্দ্রদ্বীপ পরগণা ও সরকার বাজুয়া হতে নতুন একটি পরগণা সৃষ্টি করে শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্গ উমেদকে প্রদান করেন। তাঁর নামে পরগণার নাম হলো বুজুর্গ উমেদপুর। বাকেরগঞ্জ, পটুয়াখালী, বেতাগী, আমতলী, বরগুনা, পাথরঘাটা, বামনা প্রভৃতি এ পরগণার অন্তর্গত ছিল। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর শাসনের শেষ ভাগে আগাবাকের খান বুজুর্গ উমেদপুর পরগণা লাভ করেন। ১৭৫৩ খৃস্টাব্দে আগাবাকের নিহত হলে রাজবল্লভ বুজুর্গ উমেদপুর দখল করে নেন। রাজবল্লভের প্রথম কাছারি বারৈকরণে ছিল। তার পুত্র গোপাল কৃষ্ণ ঝালকাঠির সুতালরীতে কাছারি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন তার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর পীতাম্বর সেন জমিদারী পরিচালনা করেন। তার সময় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি কালেক্টর মিঃ মেসি সরকারের পক্ষে বুজুর্গ উমেদপুর পরগণা নিলামে ক্রয় করেন। ১৮০১ খৃস্টাব্দে জমিদারী বিক্রির পর অধীনস্থ তালুকগুলো বিক্রি হয়। তখন তালুকের সংখ্যা ছিল ৫৯৪টি। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে পৃথক তালুকের সংখ্যা ছিল ৪০৭টি এবং রাজস্ব ছিল ২,৬৫,৮৯৫ টাকা।

১৮৭১ সালে প্রকাশিত ‘কলকাতা রিভিউ’র, ‘চট্টগ্রামের ফেরিঙ্গিস’ প্রবন্ধে। উল্লেখ আছে যে, এটি পরবর্তীতে আলীবর্দী খানের জামাতা ও ভাতিজা শাহামত জং এর নায়েব রাজ বল্লভ রাজার সম্পত্তি হয়ে যায়। এই পরগণার রাজস্ব পরিমাণ যেখানে ৬০০০ টাকা ছিল পরবর্তীতে ২ লাখ টাকায় উন্নীত হয়। এর প্রধান কারণ হিসেবে বলা হয় সুন্দরবনের নতুন আবাদি ভূমি উদ্ধার। এ প্রসঙ্গে বেভেরেজ বলেন-

> *“..improved in its rental from Rs.6000 to two lacs, chiefly through new acquisitions of soil, though doubtless partly from amelioration of the uncultivated wastes of the Sundarbaus, increased manufacture of salt, and growth of betel-”* [১৩৩]

মোগল আমলে কৃষির উপর জোর দেওয়া হয় এবং কৃষিতে রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে অধিক কৃষি কাজের জন্য অনেক বন উজাড় করা হয়। পাশাপাশি বন সংরক্ষণ, বংশ বিস্তার, সুরক্ষা ও উন্নতির দিকে কম নজর দেওয়া হয়। ১৮৬০ সালে ভারতের বঙ্গ প্রদেশে বন বিভাগ স্থাপিত হওয়ার পর বনসমূহের একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা চালু হয়। বন সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বহু বছর ধরে বিধিবিধান প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবর্তন ও উন্নয়ন করা হয়। এসব বিধিবিধান দীর্ঘকাল প্রচলিত আইন ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত।[১৩৪]

মোগল আমলে সুন্দরবনে আরাকানি মগ ও পর্তুগীজদের বিচরণ ছিল। সাধারণ জনগণের কাছে পরিচিত ছিল ডাকাত ও জলদস্যু নামে। তাদের বিচরণের নানাদিক উঠে আসে শিব শংকর মিত্রের স্মৃতিতে। তিনি উল্লেখ করেন-

> *শুধু ডাকাতি ও লুটপাট নায়, যাকে পায় তাকেই ধরে নিয়ে যেতো, মেয়েদের পেলে তো কথাই ছিল না। নিয়ে গিয়ে গরু ভেড়ার মতো তাদের বেচা-কেনা করতো মগ-ফিরিঙ্গিরা দেশ-বিদেশে। দাস-ব্যবসার অভিশাপ এমনি করেই নেমে আগে গোটা বাদা অঞ্চলে। বন্দীদের হাতের তেলো ফুটো করে বেত চালিয়ে হালি বানাতো। এইভাবে বেঁধে জাহাজের খোলে গাদি মেরে রেখে দিতো বন্দরে বন্দরে দাস বিক্রীর জন্য। সুন্দরবন তখন ‘মগের-মুল্লুক’ হয়ে ওঠে।*

বুজুর্গ উমেদপুর পরগণার জমিদার পরিবারসমূহ: ১. রাজবল্লভ পরিবার, ২. শিবপুর তালুকের ফ্রেরাফেলডা আলজোস পরিবার, ৩. বামনার সৈয়দ পরিবার, ৪. বামনার চৌধুরী পরিবার, ৫. পাথরঘাটার চৌধুরী পরিবার, ৬. নিয়ামতির সিকদার পরিবার, ৭. চালিতাবুনিয়ার মির পরিবার, ও ৮. বিঘাইর মিয়া পরিবার। আরো দেখুন, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২।

১৩৩. H. Beveridge, B. C. S., The Districts of Bakarganj: Its History and Statistics, opcit, p. 96-100.

১৩৪. Abul Khair, *Forest and Forestry*, Banglapedia (https://en.banglapedia.org/index.php/Forest_and_Forestry) cited 16-12-2019

সেই অতীতকালে রাজা প্রতাপাদিত্যের দৌলতে এবং পরবর্তীকালে শায়েস্তা খাঁর কঠোর শায়েস্তাতে সুন্দরবনের মানুষ দাস-ব্যবসা আর লুঠপাটের অভিশাপ থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।[১৩৫]

মগ ও পর্তুগীজদের দমনে রাজা প্রতাপাদিত্যও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে-

সুন্দরবেন এ আর-এক অদ্ভুত ঘটনা। কোথাও মন্দির, কোথাও কেল্লা, কোথাও বা পরিষ্কার মিষ্টি জলের পুকুর। এখন অবশ্য সবই জঙ্গলাকীর্ণ। ঐতিহাসিকরা বলেন, এসব তৈরি হয়েছিল রাজা প্রতাপাদিত্যের আমলে। প্রতাপাদিত্যের প্রতাপের নিদর্শন এই সব। ওলন্দাজ, ফিরিঙ্গি আর মগদের দমনের জন্য গভীর বনে তাঁর অনেক ঘাঁটিই করতে হয়েছিল।[১৩৬]

১.৮ (জ) ব্রিটিশ আমল: ঔপনিবেশিক আমলে বন ব্যবস্থাপনায় আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ: সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার ইতিহাস দীর্ঘকালের। মোগল আমলের শেষে আসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং পরে ব্রিটিশ শাসন। গোড়ার দিকে, অর্থাৎ অষ্টাদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত জাহাজ নির্মাণ ও রেলের স্লিপার তৈরির জন্য ব্যাপক পরিসরে বনের কাঠের ব্যবহার শুরু হয় এবং এ সময় বন সংরক্ষণের কোন প্রচেষ্টা ছিল না। প্রথম বন রক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয় দক্ষিণ ভারতে। ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৫ সালের ৩ আগস্ট এক বিবৃতি প্রকাশ করেন যাতে প্রথমবারের মতো সমগ্র ভারতবর্ষে বন সংরক্ষণের একটি রূপরেখা ছিল। স্ট্যাবিং (Stabbing) এটাকে 'ভারতীয় বনসম্পদের সনদ' হিসেবে অভিহিত করেন। ব্রিটিশ শাসন শুরুর আগে উপমহাদেশের কোথাও বন সংরক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত কোন উদ্যোগ গৃহীত হয় নি। এমনকি ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকেও সাধারণের চাহিদা মেটানোর জন্য বনকে যথেচ্ছভাবে বিনষ্ট করা হয়েছে। ব্রানডিস ১৮৫৬ সালে মহাবনপরিদর্শক নিযুক্ত হন। ব্রিটিশ ভারতে সর্বপ্রথম বন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৮৬৪ সালের ১ নভেম্বর। ১৮৬৫ সালে ভারতীয় বন আইন পাশ এবং ১৮৬৯ সালে ফরেস্ট সার্ভিস গঠিত হয়। বলা যায় যে, ১৮৭০ সাল নাগাদ ব্রানডিস বন বিভাগের ভিত্তি স্থাপন করেন। একটি নিয়মিত ফরেস্ট সার্ভিস চালু হয় এবং ১৮৭১-১৯০০ সালের মধ্যে বনবিদ্যা সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি অর্জন করে।[১৩৭]

মহাবনপরিদর্শক ব্রানডিস ১৮৬২ সালে তৎকালীন বাংলার কতিপয় বন পরিদর্শন করেন। ব্রানডিস ১৮৬২ সালে বার্মা (মায়ানমার) থেকে দিল্লি যাবার পথে বঙ্গদেশের অরণ্যের একাংশ পরিদর্শনকালে এই অঞ্চলের বনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি বক্তব্য প্রস্তুত করেছিলেন, আর এ থেকেই বাংলাদেশের বনব্যবস্থাপনার সূত্রপাত।

---

১৩৫. শিবশঙ্কর মিত্র, *সুন্দরবন সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭।

১৩৬. ঐ. পৃ. ২৬১।

১৩৭. Md. Millat-e-MUSTAFA, A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh Bangladesh Forest Policy Trends, Institute of Forestry and Environmental Sciences, opcit, p. 114-121.

কলকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের তত্ত্বাবধায়ক অ্যাণ্ডারসন ১৮৬৪ সালে বাংলার নিম্নাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ ও আসামে (বর্তমানে যার একাংশ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) প্রথম বনসংরক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁর পরিচালিত প্রাথমিক অনুসন্ধান থেকেই প্রথম বনাঞ্চল সংরক্ষণ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ১৮৭১ সালে পার্বত্য বনের প্রায় ১৪,৬৮৫ বর্গ কিলোমিটার নিয়ে সরকারি বন এবং ১৮৭৫ সালে প্রথম সংরক্ষিত বন ঘোষণা করা হয়। প্রথম সংরক্ষিত বন হলো সীতাপাহাড় (বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বিভাগের অধীন) ও সুন্দরবন।[১৩৮]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় বন বিভাগ এ অঞ্চলের বনের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। বন উজাড় রোধ করতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। উদাহরণ হিসেবে, ১৮৭৮ সালের আইনে বনসমূহকে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়: (ক) সংরক্ষিত বন (Reserved forests) সরকার নিয়ন্ত্রিত, স্থানীয় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার (ভোগাধিকার) নেই; (খ) সুরক্ষিত বন (Protected forest) অকাষ্ঠল বনজ দ্রব্যে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার (ভোগাধিকার) সীমিত এবং (গ) গ্রামের বন স্থানীয় চাহিদা পূরণের জন্য। প্রথম ঔপনিবেশিক বন নীতি (১৮৯৪ সাল) বেসরকারি বনসহ সকল বন অধিগ্রহণের ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে।[১৩৯]

১৮৭৯ সালে সুন্দরবনের ৪,৮৫৬ বর্গ কিলোমিটার (১৮৭৫ বর্গ মাইল) এলাকাকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ১৮৯৩ সালে হিনিং (Heining) সুন্দরবনের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ১৮৮০ সালে প্রথমবারের মতো এখানে গুলিছোঁড়া, শিকার ও মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়। অ্যাণ্ডারসন পদত্যাগ করার পর ১৮৬৭ সালে লিডস (Leeds) বন সংরক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৭২ সালে ড. শ্লিচ (Dr Schlich) বন সংরক্ষক হিসেবে যোগদানের পর ৫টি বন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় ।[১৪০]

ফরেস্ট সার্ভিসের নির্বাহী ও নিয়ন্ত্রণ শাখায় নিয়োগের জন্য ১৮৭১ থেকে ১৯০০ সালের কারিগরি শিক্ষা ও কর্মী প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রথম বন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৭৮ সালে উত্তর ভারতের দেরাদুন শহরে। ১৮৯৪ সালের জাতীয় বন নীতিতে দেশে বনব্যবস্থাপনার জন্য আইন ও বিধিবিধান প্রণয়নের মৌলিক দিকনির্দেশনাসমূহ রয়েছে। ব্রিটিশ ভারত সরকার কর্তৃক ১৮৫৫ সালের ভারতীয় বনসমূহের ওপর জারিকৃত সনদ বন সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথমবারের মতো তুলে ধরে। এই সনদ জারির আগে রাজস্ব সংগ্রহের

১৩৮. The Calcutta Review, *Famines in Bengal and the Reclamation of Sundarban as a Means of Mitigating Them*. Vol. LIX, 1874, p. 332-350.

১৩৯. Abul Khair, *Forest and Forestry*, Banglapedia (https://en.banglapedia.org/index.php/Forest_and_Forestry)

১৪০. *Ibid.*

জন্য গাছকাটার ব্যাপারে যৎসামান্য বিধিবিধান বলবৎ ছিল। ১৮৯২ সালে সুন্দরবনের (জোয়ারবিধৌত বন) জন্য বাংলাদেশে প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণীত হয়।[১৪১]

বাংলাদেশের বননীতির ঐতিহাসিক বিবর্তনে দেখা যায় ব্রিটিশ ভারতের প্রথম বন নীতি প্রণীত হয় ১৮৯৪ সালে। তবে এই আইনে বনায়নের চেয়ে কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং প্রস্তাব করা হয় যে বনাঞ্চল পরিষ্কারের মাধ্যমে আবাদযোগ্য জমির চাহিদা কিছুটা হলেও পূরণ করা যাবে। মূলত বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে চলমান বনভূমি পরিষ্কার করার প্রক্রিয়াকে আরো নতুন গতি দেয়। এই আইনে চারণভূমি ও জ্বালানি সংগ্রহের জন্য সীমিত আকারে জনগণকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। গবেষক রহমান এ বিষয়ে যুক্তি দেখান যে এই আইনের মূল লক্ষ্য ছিল রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং তথাকথিত ছাড় দিয়ে স্থানীয় জনগণকে সন্তুষ্ট করা। ব্রিটিশ আমলের অফিসিয়াল আর্কাইভাল নথিগুলোর বিস্তারিত সমীক্ষা ও পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে গবেষক রাজন *ঔপনিবেশিক বনায়ন* (colonial forestry) সম্পর্কিত মূল বৈশিষ্ট্য এবং শাসকের প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করে দেখান যে বৃহৎ কাঠের বাণিজ্যিক উৎপাদন (মনোকালচার), স্থানীয় জনগণের প্রতি জবরদস্তিমূলক ও দমনমূলক অনুশীলন, শক্তিশালী আইন দ্বারা ঔপনিবেশিক বনবিভাগের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা, বনভূমির প্রতি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতার কারণ দেখিয়ে স্থানীয় জনগণকে অবহেলা করা, তাদের বনভূমি সংক্রান্ত জ্ঞানকে অবজ্ঞা করা এবং একধরণের কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার প্রচলন করা।[১৪২] তিনি আরো বলেন যে, উনিশ শতকের শুরুতেই ভারতীয় বনায়ন ক্রমবর্ধমানভাবেই শাসকদের জন্য একটি লাভজনক উদ্যোগ হয়ে উঠে। ফলে দেখা যায় ১৮৬৪-৬৫ সাল থেকে ১৮৬৮-৬৯ সময়কালে রাজস্ব এবং ব্যয় যথাক্রমে ৩৬০,০০০ এবং ২২,০০০ পাউণ্ড এবং ১৮৮২-৮৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৯৫,০০০ এবং ৬০০,০০০ পাউণ্ড।[১৪৩]

১৯০৬ সালে লর্ড কার্জন দেরাদুনে ইম্পেরিয়াল ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) এবং ভারতীয় স্বশাসন (Home Rule) ও অসহযোগ আন্দোলন বনাঞ্চলের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এই সময় বনের ক্ষতিসাধন এবং বন আইন লঙ্ঘনের ফলে বিপুল পরিমাণ বনসম্পদ ধ্বংস হয়। ১৯১৯ সালে বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত রাজকীয় কমিশন মহাবনপরিদর্শকের নিকট থেকে কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতের পরামর্শ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯২১ সালে বন প্রশাসন প্রদেশের নিকট হস্তান্তরিত হয়। এবং ১৯২৪ সালে একজন বন বিশেষজ্ঞ সেখানে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯২৫ সালে ই.ও শেবারে (EO Shebbare) বেসরকারি বনের ব্যাপারে পদ্ধতিগত অনুসন্ধান শুরু করেন। ১৯৩১ সালে বন ব্যবহার কর্মকর্তার (Forest Utilization

১৪১. *Ibid.*

১৪২. Food and Agriculture Organizations of the United Nations, Forest Management History of Bangladesh, 2010, (http://www.fao.org/forestry/country/61580/en/bgd/).

১৪৩. Abul Khair, *Forest and Forestry,* Banglapedia, opcit.

Officer) একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯১৯-২০ সালে কক্সবাজার বিভাগ গঠিত হলেও ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ গঠিত হয় ১৯২৫-২৬ সালে। ১৯২৭ সালে বেঙ্গল ফরেস্ট সার্কেল বিভক্ত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ সার্কেল গঠিত হয়। একই বছর ১৮৭৮ সালের বন আইন (Act VII, ১৮৭৮) সংশোধন এবং ১৯২৭ সালের বন আইন কার্যকর করা হয়। সুন্দরবন, চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা, কক্সবাজার ও ঢাকা-ময়মনসিংহ নিয়ে গঠিত হয় দক্ষিণ সার্কেল, যা এখন বাংলাদেশের অংশ। সমগ্র উত্তর সার্কেলটি পড়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। ১৯২৬ সালে ভারত সরকার মহাবনপরিদর্শকের পদ ও বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্টের পদ একত্রিত করে। ক্রমান্বয়ে প্রদেশগুলোর প্রধান বন সংরক্ষকগণ নিজ প্রাদেশিক প্রশাসকদের নিকট দায়বদ্ধ থেকে স্বীয় অধিদপ্তরের স্বতন্ত্র প্রধান হন।[১৪৪]

ব্রিটিশ আমলে সুন্দরবন অধিগ্রহণের ধারাবাহিক ইতিহাস: ১৫ শতক থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত সুন্দরবনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা জটিলতর হতে থাকে। বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ও অধিকৃত ভূমির মালিকানায় তালুকদার, জমিদার ও সরকারের লভ্যাংশের হিসাব নির্ধারনে ক্রমান্বয়ে সুন্দরবনের আয়তন সংকুচিত হতে থাকে।[১৪৫] ১৭৬৪ সালে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রায় দুই শতাব্দী ধরে বাংলায় আধিপত্য বিস্তারকারী মোগল শক্তির উপর জয়লাভ করে। বর্ধিত চাষের আওতায় জমি আনার চিন্তাভাবনা নিয়ে, ব্রিটিশ সরকার এবং বাঙালি উভয়ই সীমান্তকে আরও দক্ষিণে ঠেলে দেওয়ার জন্য কাজ করেছিল। ১৭৭০ সালের মধ্যে, বাঙালিদের বিভিন্ন মেয়াদে জমি দেওয়া হয়েছিল যারা 'বর্জ্য জমি' (waste land) পুনরুদ্ধার করবে।[১৪৬] যদিও তুর্কি শাসনের আগে চাষাবাদের জন্য জমি পরিষ্কার করা শুরু হয়েছিল, ব্রিটিশরা কৃষিজমিতে রূপান্তর এবং সুন্দরবনের আয়তন পরিবর্তনের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। প্রতাপাদিত্যের সময় [প্রাক-পর্তুগিজ এবং স্পষ্টতই প্রাক-ব্রিটিশ], যেখানে বদ্বীপ নির্মাণ প্রক্রিয়াগুলো পরিপক্কতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল সেখান থেকে বনগুলো পরিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামলে নিচু এলাকাগুলোও দখল করা হয়েছিল এবং বেষ্টনী বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল।[১৪৭] সুন্দরবনে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে এই দুটি শাসনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এটাই। Richards, J.F. and Flint, E.P. (1990). Long-term transformations in the Sundarbans wetlands forests of Bengal শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ আমলে ভূমি রাজস্ব এবং অন্যান্য বনজ দ্রব্যের চাহিদার পাশাপাশি, সুন্দরবনের বৃহৎ আকারের রূপান্তরের কারণটি ছিল এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে: "এটি দুর্ভেদ্য বনভূমিতে আচ্ছাদিত একটি ভূমি, জন্তু এবং সরীসৃপের সমস্ত বর্ণনার জঘন্য আস্তানা...

১৪৪. *Ibid.*

১৪৫. Prasanta Kumar Pandit, PAST MANAGEMENT HISTORY OF MANGROVE FORESTS OF SUNDARBANS, opcit.p. 27.

১৪৬. Wise, James, *Notes on the races, castes and trades of Eastern Bengal,* opcit.

১৪৭. Anamitra Anurag Danda, SURVIVING IN THE SUNDARBANS: THREATS AND RESPONSES An analytical description of life in an Indian riparian commons, opcit, p. 30.

তাই শুধু ... অরণ্য উজাড় করে বনকে ধানের জমিতে রূপান্তরিত করে উন্নত করা"।[১৪৮] এটি বনকে ধানের জমিতে রূপান্তরিত করার আকাঙ্ক্ষাকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়, একজন দর্শনার্থীর মন্তব্যে: "It is pleasing to reflect that what was once only a den of wild beasts is now made to yield to not a few their 'daily bread'..." [১৪৯]

এভাবে দেখা যায় দীর্ঘ সময় ধরে বনের অবনতি ঘটেছে; চাষের উপর এই ধরনের সক্রিয় মনোযোগের ফলে পরবর্তীতে যে প্রভাবগুলো বিকাশ লাভ করবে সে সম্পর্কে খুব কম ভাবনা ছিল। ফলে দেখা যায় গত তিনশত বছরের মধ্যে, দুই শিংওয়ালা গণ্ডার (সর্বশেষ ১৮৭০ সালে রেকর্ড করা হয়েছিল), ভারতীয় গণ্ডার, ভারতীয় চিতা, সোনার ঈগল, গোলাপী মাথার হাঁস ও বুনো মহিষ (১৮৯০ সালে শেষ দেখা যায়) সুন্দরবনে বিপন্ন হয়ে গেছে।[১৫০]

প্রাক ব্রিটিশ আমলে সুন্দরবনে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে যেহেতু পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সুন্দরবনের ভূমি প্রসারিত হচ্ছিল, সেক্ষেত্রে বনজ সম্পদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু এটি শুধু পরিষ্কার করার সাথে সম্পর্কিত ছিল। বন, জলপ্রবাহ এবং সমুদ্রে অবাধ বিচরণ সাধারণ জনগণের অধিকার থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে রিচার্ড এম ইটন বলেন "Typically … indigenous peoples, while working as ordinary cultivators on these newly claimed lands from the jungle, were permitted continued access to the uncleared portion of the Sundarbans adjacent to these plots."[১৫১] ১৭৯৮ সালে, হ্যামিল্টন বুকানন চট্টগ্রামের পাহাড়ে ভ্রমণ করেন, যেটি কৃষি সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সুন্দরবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি এলাকা এবং তিনি লিখেছিলেন: "The woods, however, are not considered as property; for every ryot [settler-cultivator] may go into them and cut whatever timber he wants."[১৫২] ব্রিটিশ ঊর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মচারী হান্টার ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত তার একটি প্রবন্ধে সুন্দরবনকে মূলত বর্জ্যভূমি 'waste Land' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থাংশের মধ্যে ভারতের

---

১৪৮. Richards, J.F. and Flint, E.P., *Long-term transformations in the Sundarbans wetlands forests of Bengal. Agriculture and Human Values,* Springer, 7(2), 1990, p. 17-33.

১৪৯. *ibid*, p. 19.

১৫০. Mukherjee, A.K. and Tiwari, K.K. Mangrove Ecosystem Changes Under Induce Stress: The Case History of the Sundarban, 1984, West Bengal, India; E. Soepadmo, A. N. Rao, & D. J. Macintosh (Eds.) Proceedings of the Asian Symposium on Management Environment – Research and Management Kuala Lumpur: University of Malaya and UNESCO, 1990, pp. 633-643

১৫১. Eaton, R.M. *Human settlement and colonization in the Sundarbans*, 1200-1750. Agriculture and Human Values, 7(2), 1990, p. 12.

১৫২. Anamitra Anurag Danda, SURVIVING IN THE SUNDARBANS: THREATS AND RESPONSES An analytical description of life in an Indian, riparian commons, opcit, p-30.

বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের ক্ষেত্রে স্থানীয় দাবিগুলোকে বাদ দেওয়ার জন্য ঔপনিবেশিক নীতি-নির্ধারকরা তাদের শোষণের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এই 'বর্জ্যভূমি' 'waste Land' পরিভাষা তৈরি করছিলেন।[১৫৩] যেহেতু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জঙ্গলের 'নোম্যানস ল্যাণ্ড'-এ ইজারা বন্দোবস্তের প্রসার ঘটানোর জন্য জোর দিচ্ছিল তখন জমির মালিকানা এবং রাজস্বের পরিমাণ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, কারণ জমিদাররা বনভূমি পরিষ্কার করছিল। তারা ইজারা নিয়েছিল। এ কারণে Permanent Settlement ১৭৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে কোম্পানিকে বাৎসরিক ভূমি কর প্রদানের বিনিময়ে জমিদারদেরকে সম্পূর্ণ মালিকানার অধিকার দেওয়া হয়। শর্ত দেওয়া হয়, ট্যাক্স না দিলে রাজ্য অন্য কারো কাছে জমি বিক্রি করবে।[১৫৪] কোম্পানি নিজেকে সুন্দরবন বনভূমির একমাত্র মালিক বলে মনে করত, জমিদারদের জমিগুলো শুধুমাত্র বনের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিন্তু ড্যাম্পিয়ার-হজেস লাইন দ্বারা সীমানা নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত সীমানা অনিশ্চিত ছিল।[১৫৫]

পারগিটারের বর্ণনামতে, ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের ধারাবাহিকতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চব্বিশ পরগণা অনুদান দেওয়ার সময় এই অঞ্চল এমনকি কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ বন জঙ্গল এবং অনাবাদী ছিল। এ প্রেক্ষিতে ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য কালেক্টর জেনারেল Mr. Claude Russell ব্যক্তি পর্যায়ে নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে জমি ইজারা অনুদান প্রদান শুরু করেন।[১৫৬] এই বন্দোবস্ত রীতিতে ১৭৭০ থেকে ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত ইজারা দেয়া হয়। শর্তের ক্ষেত্রে বলা হয়- ইজারাদারদের সাত বছরের জন্য করমুক্ত চাষাবাদের সুযোগ দেয়া হবে। করমুক্ত সময়সীমার পর জমির অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি জরিপ পরিচালনা করা হবে এবং এর ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ের জন্য বিঘা প্রতি ধারাবাহিকভাবে ১২, ৮ ও ৬ আনা হারে খাজনা প্রদান করতে হবে। মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুনরুদ্ধারকৃত প্রথম সারির উৎকর্ষ ভূমির ক্ষেত্রে উৎপাদনের ৭৫% এবং এর পরবর্তী স্তরের ভূমির জন্য ৭০% সরকারকে খাজনা হিসেবে প্রদান করতে হবে।[১৫৭] এভাবে প্রতি দশ বছর পর পর ভূমি পুনরুদ্ধারের পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং উদ্ধারকৃত নব ভূমি পূর্বের নির্ধারিত হারে চাষাবাদের জমির সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই ধরণের ব্যবস্থাকে বলা হতো *পতিতাবাদি তালুক বা পতিত জমির চাষ (The Cultivation of waste or fallow land)*। পরবর্তীতে ১৭৭৫-১৭৭৬ এবং ১৭৭৯-১৭৮০ মেয়াদে এই ব্যবস্থায়

---

১৫৩. Guha, Ramachandra, An early environmental debate: the making of the 1878 Forest Act. Indian Economic and Social History Review 27(1), 1990, p. 66.

১৫৪. সিরাজুল ইসলাম, 'পত্তনী প্রথা ও মধ্যস্বত্ব সমস্যা, 'বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৭৮।

১৫৫. Anamitra Anurag Danda, opcit, 2007, p-31. বিস্তারিত দেখুন, Danda, A.A. Institutional inadequacies to attaining sustainability in the Sundarbans. Journal of the Indian Anthropological Society, Vol- 38, 2003, p. 61-66.

১৫৬. Fredrick Eden Pargiter, *A Revenue History of Sundarbans*, opcit, p. 2.

১৫৭. ibid.

ভূমি যাচাই ও রাজস্ব পরিচালনা করা হয়।[১৫৮] তবে প্রথম অবস্থাতেই এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হতে ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ সরকারের কর্মকর্তাদের মতে, যে সকল আমিনের দ্বারা জমি পরিমাপ করা হতো সেসব আমিনের পারিশ্রমিক শোধ করতেন দেশীয় তালুকদাররা। ফলে আমিনদের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যেত না এবং তারা পক্ষপাতিত্ব করতে থাকে। আমিনদের প্রতি আস্থার অভাব এবং সে সময়ে দেশে ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী পরিস্থিতি প্রভৃতির কারণে এই পদ্ধতিতে প্রকৃত পরিমাপের ব্যাপারে কোম্পানি সন্দিহান ছিল। কি পরিমাণ ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে এবং আবাদি জমির পরিমাণের জন্য ১৭৮৩ সালে একটি যথাযথ ভূমি পরিমাপ পরিচালনা করা সম্ভব হয়। এই পরিমাপের ভিত্তিতেই এই এলাকায় পরবর্তীতে ১৭৯০ সালে দশসনা বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।[১৫৯]

বাকেরগঞ্জে সুন্দরবনের পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির অধিকাংশই সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। আর অন্যান্য অংশের উদ্ধারকৃত ভূমির অধিকাংশই উত্তরের সীমানার সাথে লাগোয়া। যশোর সুন্দরবনের ভূমি পুনরুদ্ধারের বর্ণনায় Mr. Westland- তাঁর রিপোর্টে বলেন-

> *There arefew or no villages, properly speaking, here; that which is marked in the map as a village is perhaps only an expanse of rich rice land, with a few houses, those of the cultivators, scattered here and there. Everything is here subordinated to rice and to rice cultivation; in the forest clearings hardly a tree is left, and people live, not in villages, but far apart, among their rice fields. The khals and rivers of the Sundarbans wind about among the rice clearings, and their course can be traced by the fringes of brushwood that line their banks. Farther south, nearer the sea, we find the primeval forest, impenetrable jungle, trees and brushwood in terwined, and dangerous-looking creeks running into the darkness in all directions.”*[১৬০]

---

১৫৮. *ibid*, p. 3; Colnell Gastrell (1914), in Revenue Survey Report on the districts of Jessore, Faridpur and Backergunge as quoted by O’Malley, L.S.S, Bengal District Gazetteers, 24-Parganas, Calcutta, 1914.

১৫৯. Fredrick Eden Pargiter, A Revenue History of Sundarbans, opcit, p. 3.

১৬০. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p. 3.

Mr. Tilman Henckell – এর পরিকল্পনা:

সুন্দরবন অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থা, তথা ভূস্বামী, কৃষক, বর্গাদার, ক্ষেতমজুরদের অবস্থান ও পারস্পরিক সম্পর্ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভূক্ত এলাকার মতো হয়েও কিছুটা পৃথক ছিল। পার্থক্য গড়ে দিয়েছে সুন্দরবনের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও মীরজাফরের সন্ধিপত্রে কলকাতা থেকে কুলপি পর্যন্ত সমগ্র এলাকা কোম্পানির জমিদারি বলে বিবেচিত হয়। ১৭৫৯ সালে কোম্পানির রাজস্ব আদালত বনভূমির জমিদারি ইজারা দেয়। সুন্দরবন তখন ঘন জঙ্গলে ভরা ছিল। জমিদারি এলাকা ও সুন্দরবনের মধ্যে স্থায়ী কোনো সীমারেখা ছিল না। জঙ্গল পরিষ্কার করে অনেক জমিদার তাঁদের জমিদারি এলাকা বাড়িয়ে নিতেন। সুন্দরবন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আয়ত্তে ছিল না। ১৭৮৩ সালের আগে সুন্দরবন অঞ্চল মূলত ছিল অনাবাদি। ১৭৮৫ সালে টিলম্যান হেঙ্কলের প্রস্তাবানুসারে সর্বপ্রথম জঙ্গল জমি বন্দোবস্ত দেওয়া শুরু হয়। রায়তওয়ারি অর্থাৎ সরাসরি কৃষকদের সাথে বন্দোবস্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।[১৬১] সুন্দরবনকে ডাকাত ও দস্যুমুক্ত শান্তিময় এবং আবাদি ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য যশোরের তৎকালীন জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট Mr. Tilman Henckell গভর্নর জেনারেল Warren Hastings'র কাছে বনের জমি বন্দোবস্তের ব্যাপারে ১৭৮৩ সালের ২০ ডিসেম্বর নির্ধারিত কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[১৬২] তিনি মালিকানার বহুমুখিতা এবং তালুকদারদের দৌরাত্ম্য হ্রাসের জন্য দখলি জমি রায়তদেরকে অনুদানের জন্য প্রস্তাব করেন। প্রত্যেক রায়ত তার নির্ধারিত ছোট প্লট পরিষ্কার করবে এবং জমিদার, কৃষক ও পরিমাপের সাথে সংযুক্ত যে কোন ব্যক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে সরকারের অধীন জমি চাষাবাদ করবে। তার মতে নিয়মিত চাষাবাদের ফলে ডাকাতদের উৎপাত কমে যাবে এবং লবণ উৎপাদনে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হবে। প্রস্তাবের অনুকুলে তিনি মোগল আমলে সুন্দরবনে সমৃদ্ধ চাষাবাদ, মাটির উর্বরতা এবং নিকটবর্তী কলকাতা বাজারের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া প্রদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য বিকল্প স্থান হিসেবে তিনি এই অঞ্চলে স্থানান্তরের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পাশাপাশি বনভূমি পরিষ্কার করার সময় শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে রায়তের জন্য এখানের প্রাকৃতিক সম্পদ যথা- কাঠ, জ্বালানি, মোম ও চুনসহ প্রভৃতি সহায়ক হবে বলে উল্লেখ করেন। তবে অবশ্যই সরকারকে রায়তের নির্ধারিত বরাদ্দকৃত সময়ে নিয়মিত তদারকি করার জন্যও বলেন। Henckell ভূমি অনুদানের ক্ষেত্রে দুই বছর করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করেন এবং এর পরবর্তীতে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করা হবে বলে উল্লেখ করেন। নিজ ব্যাখ্যানুযায়ী দেশ ও সরকারের জন্য লাভজনক এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য তিনি কোম্পানির কাছে আবেদন করেন।[১৬৩] তিনি মনে করেন বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও ঐকান্তিকতা এবং যত্নতৎপরতার মাধ্যমে এসব

---

১৬১. গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই, পৃ. ১১।

১৬২. পূর্বোক্ত।

১৬৩. ঐ।

অতিক্রম করা সম্ভব হবে। অবশেষে ১৭৮৪ সালের ৭ এপ্রিল Henckell-র এই প্রস্তাব গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন লাভ করে। পুনরায় কিছু বিষয় বিবেচনা করে তিনি ১৭৮৪ সালের ৩ এপ্রিল থেকে এটিকে বাস্তবায়ন করতে শুরু করেন। নির্ধারিত সীমায় প্রথম তিন বছর করমুক্ত অনুদান প্রদান করা হয়। পরবর্তী চতুর্থ বছর থেকে চাষাবাদের আওতাধীন ভূমির উপর প্রতি বিঘায় ২ আনা, পঞ্চম বছরে ৪ আনা, ষষ্ঠ বছরে ৬ আনা এবং সপ্তম বছর থেকে পরিপূর্ণহারে বিরতিহীনভাবে বিঘাপ্রতি ৮ আনা খাজনা প্রদান করতে হবে।[১৬৪] অতিরিক্ত ভূমি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও একই হার প্রযোজ্য হবে এবং বনভূমি পরিষ্কারের খরচ হিসেবে এক-ষষ্ঠাংশ খাজনা থেকে কর্তন করা হবে। একই সময়ে তিনি তার তত্ত্বাবধানে সুন্দরবনের সীমা নির্ধারণ করেন দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে হরিণঘাটা নদী, পশ্চিমে রায়মঙ্গল এবং উত্তরে দুলাপুর, কাগরীঘাট, চিংড়িখালী, কচুয়াসহ প্রতিষ্ঠিত সমভূমির অঞ্চল।[১৬৫] একই সময়ে তিনি একটি সম্ভাব্য পরিমাণ নির্ধারণ করেন যাতে অনুমান করা হয় যে প্রায় ৬০০,০০০ বিঘা ভূমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে এবং এর থেকে সরকার ৭ বছরের মধ্যে প্রায় ৭.৫ (সাড়ে সাত) লাখ আনা খাজনা পাবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৫ সালে সরকার এই পরিকল্পনাটিও গ্রহণ করে এবং সরকারি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পাশাপাশি অনুদানের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হতে থাকে; সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারে জোর দেয়া হয়। সুন্দরবনের সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে Henckell ১৭৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যেই তার এলাকার মধ্যে রায়মঙ্গল ও হরিণঘাটা নদীর মধ্যবর্তী ১৪৪টি অনুদানে মোট ৬৪,৯২৮ বিঘা জমি অনুদান দেন। অনুদানকৃত ভূমির সীমা নির্ধারণ করা হয় 'চিহ্নিত নামা' (descriptive schedules) নামে।[১৬৬]

Mr. Tilman Henckell তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আরো দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বনভূমির পতিত জমি পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি ১৭৮৫-৮৬ সালে সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারণ, বনভূমি পুনরুদ্ধারের উৎসাহ প্রদান, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সওয়ারিদের সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় এলাকা গুলোতে তিনটি সরকারি ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিটি ফাঁড়ি একজন *গোমস্তা'র (Gomashta)* দায়িত্বে দেয়া হয়।[১৬৭] ফাঁড়ি তিনটি যথাক্রমে- যমুনা নদীর পশ্চিম তীরবর্তী *হেঙ্কেলগঞ্জ (Henckellganj)* পরবর্তীতে বিবর্তিত হয়ে *হিঙ্গালগঞ্জ (Hingalganj)* যেটি তার নামানুসারে করা হয়েছে এবং তার তত্ত্বাবধানাধীন এলাকার পশ্চিমে কালিন্দি নদী তীরবর্তী সংলগ্ন অঞ্চল, কাবাদাক নদী মধ্যবর্তী *চাঁদখালী (Chandkhali)* ও পূর্ব দিকের বলেশ্বর এবং ভৈরব নদী সংলগ্ন *কচুয়া (Kachua)*। হেঙ্কেল প্রবর্তিত প্রশাসনের অধীনে কিছু ব্যয়সাপেক্ষে চাষাবাদ ভালোভাবেই হতে থাকে। এসব আবাদি ভূমিকে নির্ধারণ করা হয় '*খাস আবাদ*' (*khass abads*) নামে।[১৬৮] পাশাপাশি খাস জমির সাথে সুন্দরবনে

---

১৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

১৬৫. *ঐ।*

১৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

১৬৭. *ঐ।*

১৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

জমিদারদের মালিকানাধীন ভূমির মধ্যে সীমানা নির্ধারণের জন্য ১৭৮৪ সালে জমিদারদের আহ্বান করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে জমিদাররা প্রায় নিরব থাকেন। প্রায় ৯ মাস কোম্পানি সীমানা নির্ধারণ না হলেও জমিদারদের চাষাবাদে অনুমতি দেয়। পারগিটারের তথ্য মতে, যখন অনুদান গ্রহণকারীরা ভূমি পুনরুদ্ধার করতে শুরু করে তখনই জমিদাররা তাদের দাবি উত্থাপন করতে থাকেন। এ ব্যাপারে বোর্ড অব রেভিনিউ ১৭৮৬ সালে 'অধিকার নয় বরং সমতার ভিত্তিতে' তাদের দাবি পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেয়। বলা হয় এ প্রেক্ষিতে হেঙ্কেল তদন্ত শুরু করলেও নির্ধারিত সীমানা সম্পর্কে অজ্ঞতা, জমিদারদের অমনোযোগী আচরণ এবং গোপনে চাষাবাদি জমি সম্প্রসারণের কারণে তিনি বাধাগ্রস্ত হন। তিনি সুন্দরবনের উত্তরাংশের সীমানা স্পষ্টকরণের জন্য কানুনগো, উকিল ও অন্যান্যদের কোম্পানিতে নিয়োগ দেন। তার অনুরোধে এ সময় বোর্ড অব রেভিনিউ একটি নোটিশে দুই মাসের মধ্যে জমিদারদের ভূমির ব্যাপারে তাদের দাবি উপস্থাপনের আদেশ দেয়।[১৬৯]

সুন্দরবনের জঙ্গল জমি বন্দোবস্ত নিতে বিত্তশালী, জমিদার, ব্যবসায়ী এমনকি বুদ্ধিজীবীরাও এগিয়ে এসেছিলেন। এক্ষেত্রে অধিক উৎসাহী ছিলেন জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা।[১৭০] মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল, কাঁথি, নন্দীগ্রাম, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায়ই অনাবাদ দেখা দিতো। সেচের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তার উপর জমিদার ও সরকারের অবহেলায় নিকাশি ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল। চাষাবাদ একরকম বন্ধ হয়ে যায়, কৃষকদের ধার-দেনা করে চলতে হয়। গরিব কৃষকরা বাধ্য হয়ে জমি বিক্রি করে আহারের যোগান করতে শুরু করে এবং ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভূমিহীন কৃষকদের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিতে থাকেন সুন্দরবনের নতুন ভূস্বামীরা। ভূস্বামীরা সুন্দরবনের সেইসব দূর্গত এলাকায় দালাল পাঠাতে শুরু করে। সুন্দরবনের ভাষায় এদের বলা হয় 'আড়কাঠি'। এই আড়কাঠিরা হতদরিদ্র কৃষকদের নানা ধরনের লোভ ও ঝামেলামুক্ত পরিবেশের কথা বলে প্রলুব্ধ করতে থাকে। লাখেরাজ জমি পাবে নামমাত্র দামে, সেটাও নগদে নয় কিস্তিতে, অঢেল জমি কিনতে পারবে, গ্রামের মোড়লদের শাসানি থাকবেনা, সমাজপতিদের বিধানে সমাজচ্যুত হতে হবে না। কৃষকদের চাওয়ার সাথে মিলে যাওয়ায় তারাও প্রলুব্ধ হয়ে আড়কাঠির পেছন ধরে সুন্দরবন যেতে থাকে।[১৭১]

ব্রিটিশ আমলে অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনার জন্য বিনা রাজস্বে বা নাম মাত্র রাজস্বে ইজারা দেওয়া হতো। এরকম একটি ইজারা ভূমি হলো চর কলমি। মেঘনা নদীর মোহনায় এটি অবস্থিত ছিল। বেভেরেজ এটাকে দ্বীপ বলেছেন। ১৭৮৫ সালে নাজিরপীরের জমিদার বৈদ্যনাথ সেনকে ভূমি সুন্দরবনের সুপারিন্টেনডেন্ট Mr. Tilman Henckell ইজারা দিয়েছিলেন। প্রথম তিন বছর কোনো খাজনা দিতে হবে না, পরবর্তী চতুর্থ বছরের জন্য বিঘা প্রতি দুই আনা, পঞ্চম বছরে জন্য চার আনা, ষষ্ঠ বছরে ছয় আনা এবং সপ্তম বছর থেকে

১৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

১৭০. গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩।

১৭১. ঐ, পৃ: ১৫

নির্ধারিত হয় আট আনা করে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই ইজারাটি দেওয়া হয়েছিল ১,২০০ বিঘার একটি জঙ্গলভূমীর এক নবমাংশ ২৪৫ বিঘা গাছ কেটে পরিষ্কার করার জন্য। এর মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় এই সময় সুন্দরবন বনভূমি ও অনাবাদি ভূমি চাষের আওতায় আনা হয়েছিল পূর্বের চেয়ে অধিক পরিমাণে।[১৭২]

১৭৮৫ সালের ২৫ এপ্রিল সরকারি ঘোষণায় কলকাতার অধীন রাজস্ব প্রদানকারী হুজুরী মহালগুলোকে রাজস্ব সংগ্রহের ভিত্তিতে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যশোর এই ঘোষণার অধীন হয় এবং হেঙ্কেলকে যশোরের কালেক্টর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি ১৭৮৬ সালের ১৯ জুলাই সুন্দরবন সংলগ্ন তিনটি পরগণা যথা- যশোর, নদীয়া ও বুজুর্গ উমেদপুর এর সীমানা নির্ধারণ করেন। একই বছর আগস্টের মধ্যেই এসময় সংলগ্ন নদীগুলোর তীরঘেঁষে বাঁশ রোপন করে সীমানা নির্ধারণ করা হয়।[১৭৩] এই সীমানা লাইনের নাম দেয়া হয় *Henckell`s Bansgari.* সীমানা নির্ধারণের পর রাজস্ব আদায়ে কিছুটা নিশ্চয়তা আসে এবং তার পরিকল্পনা সফল হতে থাকে। দেখা যায় ১৭৮৭ সালের জুলাই মাসে ২১,০০০ বিঘা ভূমি আবাদের অধীনে আসে এবং হেঙ্কেল একই বছরে ১৩,০০০ বিঘা নতুন দখলীকৃত ভূমি অনুদান দেন।[১৭৪]

বুজুর্গ উমেদপুর Seton-Karr's Selections–এর ১৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি সরকারি আদেশ সেখান থেকে পাওয়া যায় যে এটি পরবর্তীতে একজন ইউরোপীয় কালেক্টর দ্বারা পরিচালিত হয়, এখানে কোম্পানির ফ্যাক্টরি ছিল এবং ১৭৮৭ সালের পূর্বে মি. হেনরি লজ (Mr. Henry Lodge) –এর দায়িত্বে ছিল। ১৭৬৪ সালের বুজুর্গ উমেদপুরের জমিদার রাজা রাজ বল্লবের উকিলের একটি পিটিশন থেকে মুদ্রিত Mr. Long's Selections পৃ. ৪০৮-এ ইংরেজ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। কোম্পানির কারখানা এবং অন্যান্য ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অনেকের নিপীড়নের কারণে বাসিন্দাদের অনেকে পলায়ন করেছিল। তাদেরকে অর্ধেক মজুরীতে সুন্দরবনের বাশঁ ও কাঠ কাটতে বাধ্য করা হতো। বাসিন্দাদের জোর করে দূরে নিয়ে যাওয়া হতো, কেউ অভিযোগ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হতো। স্থানীয় লোকজনকে বলপূর্বক মজুরির অর্ধেক দিয়ে তাদেরকে সুন্দরবনে নিয়ে যাওয়া হতো জমি পুনরুদ্ধারের জন্য। লবণ কারখানা স্থাপন, লবণ তৈরি প্রভৃতি কাজ করানো হতো কোনো মজুরি ছাড়াই এবং এর জন্য কোম্পানির লোকজন কোনো খাজনাও দিতো না। বেভেরেজ স্বয়ং এ বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন-

১৭২. H. Beveridge, B. C. S., The Districts of Bakarganj: Its History and Statistics, opcit, p. 145.

১৭৩. Fredrick Eden Pargiter, A Revenue History of Sundarbans, opcit, p. 6.

১৭৪. *ibid, p. 7.*

They seize the salt of the tafalls of the pargana and of the inhabitants Tlicy force the inhabitants to take tobacco, salt, and other articles, and refuse to pay the legal duties on the trade which they carry on.[১৭৫]

এই পিটিশনে স্থানীয়দের অভিযোগে বলা হয়-

If, demand a sight of the Company's dustah, they beat us with bamboos. Some of them pretend that they have been robbed and insist on our making restitution, placing peons ujDon us, and putting us to a good expense. They judge causes, impose and exact fines. They send peons and seize the Naib of the pargana, taking for talabana (peons' fees) one rupee everyday. [১৭৬]

যশোরের কালেক্টর Mr Westland–এর বর্ণনায় এ সম্পর্কে জানা যায় যে, স্থানীয় লবণ কারখানার শ্রমিকদের প্রতি Mr Kenckell-এর এই বিতর্কিত আচরণ Mr AVestland দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। তার মতামত ১৭৮৮ সালের ২৪ এপ্রিলএকটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ আছে যে,

"253 of Seton-Karr's Selections, which in all probability refers to Mr Henckell. "It is a fact," says the newspaper, "that the conduct of Mr H in the Sundarbans has been so exemplary and mild towards the poor molunghies or salt manufacturers, that, to express their gratitude, they have made a representation of his figure or image, which they worship among themselves. A strong proof that the natives of this country are sensible of kind treatment, and easily governed without coercive measures."[১৭৭]

১৭৮৮ সালের ৯ এপ্রিল কোম্পানি সরকার হেঙ্কেলের পরিকল্পনার সাফল্য যাচাই এবং বছরের শেষ পর্যায়ে আরো কতটুকু সম্প্রসারণ করা যেতে পারে সে ব্যাপারে জানতে চায়। হেঙ্কেল ১৬ মে তার প্রেরিত রিপোর্টে অনুদানের ক্ষেত্রে জমিদারদের সাথে সৃষ্ট সমস্যার আলোকপাত করেন। তিনি জানান যে, জমিদারদের অধিকৃত ভূমির সাথে সীমানা নির্ধারণে সমস্যা, তাদের বিরোধিতা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুদান গ্রহণের পূর্বে সুনির্দিষ্ট সীমানার ব্যাপারে অবহেলা প্রভৃতি কারণে ১৭৮৫ সালে যারা পাট্টা গ্রহণ করেছিল তাদের একটি বড় অংশ অনুদান ফিরিয়ে দেয় এবং পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে। ফলে দেখা যায় যে, ১৭৮৫ সালে অনুদানকৃত ৩৪,০০০ বিঘা ভূমির মাত্র ১৯,৪৬০ বিঘা ভূমির অনুদান বহাল থাকে ১৭৮৮ সালে। এমনকি অবশিষ্ট ভূমিও জমিদাররা দাবি করতে

১৭৫. H. Beveridge, B. C. S., The Districts of Bakarganj: Its History and Statistics, opcit, p. 146.

১৭৬. H. Beveridge, B. C. S., The Districts of Bakarganj: Its History and Statistics, opcit, p. 140.

১৭৭. *ibid*, p. 145.

থাকেন। এসকল পরিস্থিতিতে তিনি এই প্রকল্পটিকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব দেন। এই সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আর্থিক আয়-ব্যয়ের হিসাব উল্লেখ করেন যে, ৩৪,০০০ বিঘায় ১৭৯৬ সালে প্রায় ২,৭২,৫০০ রুপি আয় হবে এবং ব্যয় হবে ৯৪,৭৭৬ রুপি, সরকার নিট রাজস্ব পাবে ১,৭৭,৭২৪ রুপি।[১৭৮] মূলতঃ হেঙ্কেল আশাহত না হয়ে পুনরায় জমিদারদের ব্যাপারে বোর্ডকে ঘোষণা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। বোর্ড ১৭৮৮ সালের জুলাই মাসে পুনরায় জমিদারদের তিন মাসের মধ্যে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত তাদের অধিকৃত ভূমির সীমানা নির্ধারণের নির্দেশ দেয় এবং এ ব্যাপারে শাস্তি হিসেবে জমি থেকে তাদের মালিকানা বাজেয়াপ্ত করারও হুমকি দেয়া হয়।[১৭৯] এই ধারাবাহিকতায় অনেকের অধিকৃত ভূমি কোম্পানি সরকার দখল করে নেয়।

১৭৮৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কালিদাসপুর, চাঁদপুর, মোহাম্মেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে জমিদারদের স্বত্ব ফিরিয়ে দেয়া হয়। এসময় বিভিন্ন স্থানে অনুদান গ্রহণকারী প্রজাদের সাথে কৃষকদের দ্বন্দ্ব হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মীমাংসা করা হয়, কোনো কোনো জমিদারদের জমি দখলও করা হয়। এসকল জটিলতার কারণে ১৭৯০ সালের দিকে সরকারের মাত্র ২৫ টি অনুদানকৃত ভূমি বহাল থাকে। শুধুমাত্র রায়তদের অনুদান প্রদানের এই পরিকল্পনায় দূর্বল ও সবলের সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যারা টিকে থাকতে সক্ষম তাদের অনুদানই বহাল থাকে। এর ফলে হেঙ্কেলের এই পরিকল্পনা সংশোধিত করার পরিস্থিতি তৈরি হয়।[১৮০]

Mr. Rocke- এর পদক্ষেপ:

১৭৮৯ সালে হেঙ্কেল এর পর যশোরের কালেক্টর হয়ে আসেন Mr. Rocke. তিনি এসে হেঙ্কেল প্রবর্তিত পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। তার সামনে মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় সুন্দরবনের প্রকৃত সীমানা। এসময় জমিদাররা তাদের নির্ধারিত অংশে চাষাবাদ করতে থাকলেও সরকারের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। ভূমির মালিকানায় জমিদারদের দাবি নিয়ে সৃষ্ট এই জটিলতায় তিনি একমাত্র পন্থা হিসেবে মনে করেন যে, জমিদারদের দাবির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরি তৈরি করতে হবে। তিনি প্রস্তাব করেন, ১৭৭২-৭৩ সেটেলমেন্ট অনুযায়ী জমিদারদের নিলামকৃত ভূমি তাদের অধিকারে থাকবে এবং ১৭৮৬ সালে সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারণকৃত অংশের ভূমি সরকারের অধীন থাকবে। যেসকল ভূমি কোনো সেটেলমেন্টের অধীন আসেনি, সেসকল ভূমির ব্যাপারে জমিদারদের তিন মাসের মধ্যে দাবি উপস্থাপন করতে হবে অন্যথায় সরকারের ভূমি হিসেবে পরিগণিত হবে।[১৮১] তবে তিনি আশঙ্কা করেন যে হেঙ্কেলের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৭৯৭ সালের মধ্যে সরকার নিট রাজস্ব পাবে প্রায় ১,৫৭,৭০১ রূপি এবং পরবর্তী বছরে এর পরিমাণ কমে দাঁড়াতে পারে ৭১, ৯৫৫ রুপিতে।

---

১৭৮. Fredrick Eden Pargiter, A Revenue History of Sundarbans, opcit, p. 7.

১৭৯. *ibid*, p. 8.

১৮০. Fredrick Eden Pargiter, A Revenue History of Sundarbans, opcit, p. 9.

১৮১. *ibid*, p. 9.

অনুদান গ্রহণে অনেকেই আগ্রহী হলেও এই পরিকল্পনার নানা জটিলতা, আর্থিক অনুৎসাহী পরিস্থিতি, অধিক ব্যয় প্রভৃতি কারণে তিনি ১৭৯০ সালের ২০ আগস্ট হেঙ্কেলের এই পরিকল্পনা বাতিলের জন্য সুপারিশ করেন।[১৮২] এসময় অনেক ভূমি অনাবাদী থেকে যায় এবং পুনরায় জঙ্গলে পরিণত হয়। তাই অন্যান্য এলাকার মত ১৭৯০ সালের দিকে সুন্দরবনেও জমিদারদের সাথে দশসনা ব্যবস্থা নেয়া হয়। মি. রক ১৭৯২ সালের ২৬ জুলাই এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারের কাছে রিপোর্ট করেন। এসময় সরকারের রাজস্বের পরিমাণও বাড়তে থাকে। ১৭৯০ সারে বিঘাপ্রতি রাজস্ব ছিল ১,৩৬৩ রুপি এবং ১৭৯৫ সালে এটি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,১২০ রুপি।[১৮৩]

সুন্দরবন জঙ্গলের উত্তরদিকের সীমা নির্ধারণের জন্য ১৮২২ সালে জমি জরিপ শুরু হয় এবং ১৮৩০ সালে তা শেষ হয়। এই জরিপের নাম ডামপিয়ার হজেম সার্ভে। সার্ভে শেষে জঙ্গল জমি ইজারা দেওয়া শুরু হয়। চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন এলাকাকে কয়েকটি ব্লকে বা প্লটে ভাগ করা হয়। এই ব্লক বা প্লটগুলোকে বলা হতো 'লট'। পরে লট হয়েছে 'লাট', লটের ইজারাদার হয়েছে 'লাটদার', ইজারার শর্ত ছিল মোট জমির চারভাগের একভাগ ৫ বৎসরের মধ্যে আবাদযোগ্য করতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ ইজারাদার শর্ত পূরণ করতে পারেননি। ফলে ১৮৫৩ সালে লটগুলো নতুন শর্তে বন্দোবস্ত দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ইজারার মেয়াদ ৯৯ বৎসর এবং ইজারা নেয়ার মোট চারভাগের একভাগ ভূমি চিরকালের জন্য রাজস্বমুক্ত। বাকি জমির জন্য ২০ বৎসর পর্যন্ত রাজস্ব মওকুফের ব্যবস্থা থাকে। ২১ তম বৎসর থেকে ধাপে ধাপে রাজস্ব বাড়বে এবং চূড়ান্ত রাজস্ব হবে একর প্রতি ৬ আনা। তবে ৩০ বৎসরের মধ্যে সব জমি চাষযোগ্য করতে হবে। এই নিয়মে ইজারার ন্যূনতম পরিমান উল্লেখ না থাকায় সাধারণ মধ্যবিত্তরাও জমি বন্দোবস্ত নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মধ্যবিত্তদের পক্ষে বাঁধ দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করার ব্যয় বহন করা সম্ভব ছিলোনা। ফলে অনেক লিজ বাতিল হয়ে যায়।[১৮৪]

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ১৮২৮ সালে সুন্দরবন সরকারি ব্যবস্থাপনার অধীনে নিয়ে আসে। ১৮৩০ সাল থেকে অধিক রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আরো নতুন ভূমি দখল করা হতে থাকে এবং ১৮৫৫ সালের বন আইন তৈরি করার পূর্ব পর্যন্ত এই বনভূমি নিধন অভিযান চলতে থাকে। Dr. Brandis কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৬৩-১৮৬৯ সাল সময় পর্যন্ত একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণে সুন্দরবনকে রাজস্ব উৎপাদনের মূল্যবান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সময় ভূমি উদ্ধার প্রক্রিয়া স্থগিত রেখে The Port Canning Land Reclamation and Rehabilitation Private Company-কে বনের ২৪টি ব্লকের রাজস্ব

১৮২. *ibid.*

১৮৩. *ibid*, p. 12.

১৮৪. গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই, পূর্বোক্ত পৃ: ১১

সংগ্রহের জন্য ইজারা দেয়া হয়।[১৮৫] স্থানীয় বনের অধিবাসীদের সাথে কোম্পানির বিরূপ আচরণের কারণে পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্ত খুবই সমালোচিত হয়। ১৮৬৯ সালে সরকার পুনরায় বনভুমির ইজারা নিয়ে নেয় এবং বনজ উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করতে শুরু করে। ১৮৭১ সালে সর্বপ্রথম সুন্দরী গাছ আবাদের লক্ষে সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ করা হয়। বার্মার ফরেস্ট কনজারভেটরের সুপারিশ এবং ১৮৫৪ সালের আইনের প্রেক্ষিতে ১৮৭৮ সালে সুন্দরবনের কিছু অংশ সংরক্ষিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[১৮৬] পরবর্তীকালে সংরক্ষিত এলাকার সীমানা একাধিকবার পরিবর্তিত হয়। সুন্দরবন ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ১৯০০ সালে। এসময় সুন্দরবনকে কয়েকটি কমপার্টমেন্টে বিভক্ত করা হয়।[১৮৭]

ঔপনিবেশিক শাসকগণ জাহাজ ও রেলওয়ে শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ ও রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বনভূমি উজাড় করেছিল।[১৮৮] ভারতে সংগঠিত বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৮৮৬ সালে চট্টগ্রাম ও সুন্দরবনের ব্যবস্থাপনার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলায় একটি পৃথক বনবিভাগ তৈরি করা হয়।[১৮৯] ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বাংলার বনভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য কোনো প্রচেষ্টা করা হয়নি। বনভূমির সাথে কোম্পানির সম্পর্ক কেবল এজেন্টদের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারা এত বেশি কর আদায় করছিল যে পার্বত্য বনভূমিতে ১৭৮৩ সালে একজন চাকমা প্রধান তা দিতে অস্বীকার করেছিলেন। ১৭৮৯ সালে আরোও শোষণের নীতি গ্রহণ করে বলা হয় যে নগদে ভূমিকর প্রদান করতে হবে। ফলে বনভূমি পরিষ্কার করে অর্থকরী ফসল ফলাতে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে কর প্রদানে বাধ্য করা হয়।[১৯০] কোম্পানি শাসন পরবর্তী ব্রিটিশ সরকারের আমলে একইভাবে ব্রিটিশ সরকার রাজস্ব বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালায়। ফলে ১৮৭১ সালে অধিকাংশ বনভূমিকে সরকারি সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে। জনগণকে বনজ দ্রব্য সংগ্রহে উৎসাহিত করা হয় এবং ব্যবসায়ীদেরকে কাঠ কাটার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এসকল পদক্ষেপের ফলে বনজ দ্রব্য থেকে সরকারি রাজস্ব উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৬২-১৮৭১ সালে কাঠ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্যের বার্ষিক গড় আয় ছিল ১১,০০০ টাকা এবং ১৮৭৪-৭৫ সালে তা বেড়ে ১০২,০০০ টাকায় পৌঁছায়। পাশাপাশি এই জাতীয়করণের ফলে বন একটি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে একটি উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারযোগ্য স্থানে পরিণত হয়। রেলওয়ে সংযোগ সম্প্রসারণের ফলে বন উজাড়ের প্রক্রিয়া আরো তীব্র

১৮৫. Prasanta Kumar Pandit, PAST MANAGEMENT HISTORY OF MANGROVE FORESTS OF SUNDARBANS, *opcit,* p. *24-27.*

১৮৬. *ibid,* p. *24.*

১৮৭. *ibid,* p.*27.*

১৮৮. Food and Agricultural Organization of the United Nations, Forest management – History Bangladesh, opcit.

১৮৯. *ibid.*

১৯০. Food and Agricultural Organization of the United Nations, Forest management – History Bangladesh, last updated: Monday, March 1, 2010.

হয়।[১৯১] ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ব-দ্বীপের জলাভূমিতে সীমান্ত সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত হয়েছিল। ১৮২৮ সালে ব্রিটিশরা সুন্দরবনের মালিকানা গ্রহণ করে এবং ১৮৩০ সালে ভূমি পুনরুদ্ধারে পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগে আগ্রহীদের কাছে বনের বিভিন্ন অংশ ইজারা দেওয়া শুরু করে।[১৯২]

সুন্দরবনের জলাশয়ে মাছ ধরার অধিকার তখন ছিল সাধারণ জনগণের এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো রাজস্ব আদায় করা হয়নি। ১৮৬৬ সালে, সরকার পাঁচ বছরের জন্য সুন্দরবনের সমস্ত নদীতে মৎস্য অধিকার নিলামে তুলেছিল। পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি মাছ ধরার অধিকার ক্রয় করেছিল, কিন্তু ১৮৬৮ সালের অক্টোবরে জেলেদের দাবির বিরোধের ফলে কোম্পানির ইজারা প্রত্যাহার করা হয়েছিল; তারপর শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে জোয়ারের জলে মৎস্য চাষের অধিকার সরকারের কাছে থাকবে না ব্যক্তিগতভাবেই পরিচালিত হবে।[১৯৩]

সুন্দরবনের বাওয়ালিদের (কাঠুরে) বনের কাঠ কাটার একটি নির্দেশমূলক অধিকার ছিল বহুকাল পূর্ব থেকেই এবং বন থেকে কাঠ কাটার জন্য কোনো সরকারি রাজস্ব আদায় করা হতো না। তা সত্ত্বেও, ১৮৬৬ সালে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র মুখ বরাবর সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য অংশ ইজারা দেয়। ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইজারা বাতিল করা হয় এবং বনগুলো আবার সাধারণ জনগনের সম্পদ হিসেবে ফিরে আসে। ২৪ পরগণা জেলার তৎকালীন জেলা কালেক্টরের অভিমত ছিল যে, বনকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করলে বন থেকে রাজস্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। টোল স্টেশন স্থাপন এবং লাইসেন্স প্রদানের জন্য ১৮৭৩ সালের প্রথম দিকে একজন ডেপুটি বন সংরক্ষককে বিশেষভাবে সুন্দরবনে পাঠানো হয়েছিল। বনজ সম্পদ সাধারণ জনগণের অধিকারে ছিল এবং সেই সাথে কাঠের চাহিদা, বিশেষ করে জ্বালানি কাঠের চাহিদা বেশি ছিল। এই লোকেরা ছিল মুসলমানদের নিম্নশ্রেণি এবং হিন্দুদের মধ্যে নিম্নোক্ত বর্ণগুলি: পোদ, বাগদি, কাওরা, টিওরস, চণ্ডাল, কৈর্বত এবং কাপালি (Pods, Bagdis, Kaoras, Tiors, Chandals, Kaibarttas, and Kapalis)।[১৯৪]

অবিরাম বন দখলের প্রবণতা ঊনবিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত ছিল; এটি ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত বনকে 'সংরক্ষিত বন' বা 'সংরক্ষিত' আইন হিসেবে ঘোষণা করার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কারণ সকলেই বন পুনরুদ্ধারের জন্য উৎসাহ বোধ করেননি। ১৮৬৫ সালে ভারতীয় বন পরিসেবা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভারতীয় বন সংরক্ষণের একটি

---

১৯১. Food and Agricultural Organization of the United Nations, opcit.

১৯২. *ibid*.

১৯৩. Anamitra Anurag Danda, SURVIVING IN THE SUNDARBANS: THREATS AND RESPONSES An analytical description of life in an Indian, riparian commons, opcit, p-30.

১৯৪. *ibid*, p-31. বিস্তারিত দেখুন, Danda, A.A. Institutional inadequacies to attaining sustainability in the Sundarbans, opcit, p. 61-66.

নজির স্থাপিত হয়েছিল। যদিও পরিসেবা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল বন সম্পদ থেকে রাজস্বের উপর নজর রেখে কোম্পানি সরকার দ্বারা বন বণ্টনের সুবিধা আদায়। এই নতুন ব্যবস্থা বন রক্ষায় সাহায্য করেছিল, তবে যারা আগে বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল তারা এখন এই সম্পদ ব্যবহারে আইনত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এটি সম্পদ ব্যবহারের উপর একটি প্রতিযোগিতা তৈরি করেছে যা আগে বিদ্যমান ছিল না।[১৯৫]

১৮৭৯ সালে আরও একটি নতুন নিয়মে ইজারা দেওয়া শুরু হয়। এই নতুন নিয়মটি হল 'লার্জ ক্যাপিটালিস্ট রুল'। এতে বলা হয় ২০০ বিঘার কম এবং ৫,০০০ বিঘার বেশি জমি লিজ নেওয়া যাবে না। জমির দাম একর প্রতি এক টাকা। লিজের মেয়াদ ছিল ৯৯ বছর এবং লিজ ছিল হস্তান্তরযোগ্য মালিকানা স্বত্ব। এই লিজের মেয়াদ প্রথমে ৪০ বৎসর রাখা হলেও পরে চিরস্থায়ী করা হয়। পূর্বের মতো মোট জমির চারভাগের একভাগ রাজস্ব মুক্ত রাখা হয়। প্রথমে ১০ বৎসর বাকি জমির রাজস্ব দিতে হবেনা এবং একাদশ বৎসর থেকে ধাপে ধাপে বেড়ে ৪০ তম বৎসরে রাজস্ব হবে একর প্রতি ৮ আনা। তবে ৫ বৎসরের মধ্যে ৮ ভাগের ১ ভাগ জমি চাষযোগ্য করতে হবে।[১৯৬]

১৮৯৭ সালে সাগরদ্বীপের জমি লিজ দেয়ার সময় এই নিয়মের সামান্য পরিবর্তন করা হয়। বলা হয় ১০,০০০ বিঘা পর্যন্ত জমি লিজ দেওয়া যাবে এবং ১৫ বৎসর পর্যন্ত কোনো রাজস্ব দিতে হবেনা। তাই চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে অনেক জমি ৯৯ বৎসর মেয়াদে এবং অনেক জমি ৪০ বৎসর মেয়াদে লিজ দেওয়া হয়। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলের অর্ধেক অর্থাৎ ২,৩০১ বর্গমাইলের মধ্যে ১,২২৩ বর্গমাইল এলাকা ১৯০০ সালের মধ্যে ইজারা দেওয়া হয়। পূনর্বন্দোবস্ত দেয়ার নিয়ম থাকায় ইজারাদাররা বা লটদাররা অল্প মূল্যে জমি পূনর্বন্দোবস্ত দিয়ে দেন। অর্থাৎ শুরুতেই মধ্যস্বত্বভোগীদের আগমন ঘটে সুন্দরবনে।[১৯৭]

জমিদারি এলাকার মতো এই অঞ্চলেও জমি ছোট বড় মধ্যস্বত্বভোগীদের দখলে চলে যাওয়ায় সরকার পূর্বের বন্দোবস্ত বাতিল করে ১৯০৪ সালে পুনরায় রায়তওয়ারি বন্দাবস্তে সরাসরি কৃষকদের জমি বিলি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই নতুন ব্যবস্থা পরীক্ষা করা হয় ফ্রেজারগঞ্জে। লে. গভর্ণর অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের নামে অঞ্চলটির নামকরন করা হয়। এর স্থানীয় নাম নারায়ণতলা। এটি একেবারে বঙ্গপোসাগরের মুখে অবস্থিত বিস্তীর্ণ জঙ্গলভূমি। আয়তন প্রায় ১৫ বর্গমাইল বা ২৮,৫৫৬ বিঘা।[১৯৮]

১৯০৫ সালে ধনী পুঁজিপতি নিয়মে (লার্জ ক্যাপিটালিস্ট) ইজারা দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করে রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় এই দ্বীপের জমি বিলির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফ্রেজারগঞ্জের অবস্থান হলো- এর চারিদিকে পাতিবুনিয়া খাল, সপ্তমুখী

---

১৯৫. ibid, p. 61-66.

১৯৬. গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

১৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

১৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

নদী, সুন্দরিকা দেয়ালিকা নদী ও পুকুর বেড়িয়া খাল ঘেরা। খাল দুটিও ছোট নদীর মত চওড়া। নদী মুখে এলাকার অবস্থান এই যে, একই সঙ্গে সব জমি মজবুত বাঁধ দিয়ে ঘিরে জঙ্গল হাসিল করতে হবে, তা না হলে সমুদ্রের লবণাক্ত জল সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিবে। কেননা এটি প্রায় ৩.৫ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা। দ্বীপটিকে মোট ৬১০ একর থেকে ১,২৮৫ একর পর্যন্ত আয়তনের ৯ টি ব্লকে ভাগ করা হয়। তিনটি ব্লক সংরক্ষিত রেখে, ১৯০৮ সালের মধ্যে ১,৯০০ বিঘা জমি সরাসরি কৃষকদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। বন্দোবস্তের তিনটি বিশেষ শর্ত ছিল নিম্নরূপ[১৯৯]:

১. বন্দোবস্তের মেয়াদ- পঁচিশ বৎসর।

২. খাজনা- বিঘা প্রতি তিন টাকা

৩. সাধারণভাবে জমি হস্তান্তর বা পুনর্বন্দোবস্ত দেওয়া নিষিদ্ধ। একমাত্র কালেক্টরের অনুমতি নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের পুনর্বন্দোবস্ত দেয়া চলবে।

কিন্তু পরবর্তীতে এই উদ্যোগে নিরুৎসাহ দেখা দেয়। জঙ্গল উদ্ধারের জন্য সরকার অর্থ ব্যয় করতে অসম্মত হয়। সরকার ১৮৭৯ সালের নিয়ম অনুযায়ী দ্বীপটিকে কাশিমবাজারের মহারাজাকে বন্দোবস্ত দেয়। শর্ত ছিল: প্রথম ১০ বৎসর রাজস্ব দিতে হবেনা, পরে রাজস্ব বিঘা প্রতি ২ আনা থেকে বাড়তে বাড়তে মেয়াদ শেষে হবে ১ টাকা ১২ আনা। ১৯১১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি চুক্তি হয়। ১৯১৫ সালের নিয়মে মহারাজা ১৫ হাজার বিঘা জমি বন্দোবস্ত দিয়ে দেন। পুনর্বন্দোবস্ত বিলি করা জমির খাজনা ধার্য হলো বিঘাপ্রতি ২ টাকা। ১৫,৯৩৮ টাকা রাজস্ব দিয়ে ৩০ হাজার টাকা খাজনা আদায় করলেন লাটদার।[২০০]

নিয়ম অনুযায়ী লাটদাররাই প্রথম ইজারাদার। সরকারের কাছ থেকে একর প্রতি এক টাকা দু'টাকা দাম দিয়ে এরা হাজার হাজার বিঘারও বেশি জমি বন্দোবস্ত নিয়েছেন। লাটদার আবার বন্দোবস্ত দেন দুইভাবে- প্রজাস্বত্বে ও রায়তিস্বত্বে। অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগী চকদারদের বন্দোবস্ত দিলেন আবার সরাসরি কৃকষদেরও জমি বিলি করলেন। জঙ্গল জমির দাম একর প্রতি চার থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত। কিছুটা পরিষ্কার জঙ্গলের দাম আরও বেশি। অনেক লাটদার আবার কিছু জমি খাস দখলে রাখলেন।

জঙ্গল পরিষ্কারের কাজটা লাটদার, চকদার বা বড় জোতদার সকলেই কৌশলে কৃষকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। জঙ্গল পরিষ্কারের প্রাথমিক কাজটা করানো হয় ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলের ভূমিহীন আদিবাসীদের দিয়ে। তাদের আগাম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, লাখেরাজ (নিষ্কর) জমি দেয়া হবে। এতে

১৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

২০০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

উৎসাহী আদিবাসীরা এককাট নিয়ম অনুযায়ী ছোট-বড় সব গাছের উপরের অংশ কেটে ফেলে। সুন্দরবনে এই শ্বাপদ সঙ্কুল পরিবেশে তারা মূলত নিজেদের আর্থিক প্রয়োজনে এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহী হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। কারণ, এককাট করা জমির দাম অনেক বেশি। বিঘা প্রতি পাঁচ থেকে সাত টাকা। লাটদার এককাট জমিকে পাঁচ-দশ বিঘা বা তারও বেশি আয়তনের কয়েকটা খণ্ডে ভাগ করে, এক বা একাধিক খণ্ড চকদারদের অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগীদের বন্দোবস্ত দেন। চকদারদের বন্দোবস্ত নেয়া একখণ্ড জমিকে স্থানীয় লোকজন বলতেন 'ঘেরি'। মালিকের পদবীর সাথে ঘেরিগুলোর নামকরণ করা হয়। যেমন- চকদার দ্বারিক সামন্তের কেনা খণ্ডটির নাম হয়েছে 'সামন্ত ঘেরি', অন্নদা দাসের নামে 'দাসের ঘেরি', গোপী গিরির নামে 'গিরির ঘেরি' ইত্যাদি।[২০১]

সুন্দরবন রক্ষায় ব্রিটিশ বন সংরক্ষক শ্লিচঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ ধরে সুন্দরবন বাস্তুতন্ত্রের উপর ক্রমাগত আক্রমণের সাক্ষী ছিল। চাষাবাদ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে কিছু সময় লেগেছিল। ব্র্যাণ্ডিস (১৮৬৫ সালে বনের প্রথম মহাপরিদর্শক) এবং শ্লিচ (১৮৭৪ সালে তৎকালীন বন সংরক্ষক) এর মতো পুরুষরা দীর্ঘকাল ধরে বৈজ্ঞানিক বনায়নের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। বনের গুরুত্ব এবং ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারের মধ্যে কারও কারও কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে বনের অংশ রক্ষা করা সুবিধাজনক হবে। শ্লিচ সুন্দরবনের কাঠ, ঘাস এবং জ্বালানী কাঠের সরবরাহের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন।[২০২]

শ্লিচ এবং অন্যরা সুন্দরবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিলেন। শ্লিচ লিখেছেন:

> *সুন্দরবনের সরবরাহ যেন শেষ না হয় তা দেখা আমাদের কর্তব্য। অধিকন্তু, চাহিদা বৃদ্ধি নিশ্চিত, তাই আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে বৃদ্ধির জন্যও সরবরাহ করা হয়েছে। এটা বলা হয়েছে যে সরবরাহ অক্ষয়, কিন্তু সেরকম নয়। এর বিপরীতে, দেখা যাচ্ছে যে সুন্দরবনের পশ্চিম অংশ, যেটি কলকাতার নিকটতম, ইতিমধ্যেই অনেকাংশে নিঃশেষ হয়ে গেছে।*[২০৩]

তারপরে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন:

> *"...যদি সুন্দরবন সকল আগতদের জন্য উন্মুক্ত থাকে, এবং যদি কিছু বিধিনিষেধ চালু না করা হয়, তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হবে। এটিকে এড়িয়ে চলতে হবে, যেহেতু অন্য কোন উৎস পাওয়া যায় না, এবং তাই বনজ উৎপাদনের স্থায়ী ফলন*

২০১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

২০২. Anamitra Anurag Danda, SURVIVING IN THE SUNDARBANS: THREATS AND RESPONSES An analytical description of life in an Indian riparian, commons, ibid.

২০৩. *ibid.*

কতটা কমানো যেতে পারে তা বিবেচনা না করে দক্ষিণ দিকে চাষ সম্প্রসারণ না করে সুন্দরবনকে দেরি না করে বন ব্যবস্থাপনায় নিতে হবে" ।[২০৪]

যদিও বঙ্গ সরকার সমস্ত উপলব্ধ সম্পদ ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল এবং চব্বিশ পরগণা সুন্দরবনের দিকে তার মনোযোগ স্থানান্তরিত করেছিল। ১৮৭৪ সালে লেফটেন্যান্ট গভর্নর রিচার্ড টেম্পলের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন পাওয়ায় অবশিষ্ট বনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি এড়াতে সাহায্য করেছিল। ১৮৭৫ সালে বাংলায় পাঁচটি বন বিভাগ তৈরি হলে সুন্দরবন বন ব্যবস্থাপনার অধীনে আসে।[২০৫] নতুন গঠিত ফরেস্ট সার্ভিস সমগ্র উপমহাদেশে সরকারি বনাঞ্চল জরিপ এবং ম্যাপিং করার কাজে ব্যস্ত ছিল। সুন্দরবন এই নতুন শাসনের অধীনে এসেছে। ১৮৯০ সালের মধ্যে চব্বিশ পরগণায় মোট ৪,৪৮০ বর্গ কি.মি. সংরক্ষিত বন ছিল। বন বিভাগ চব্বিশ পরগণার জোয়ারের বনগুলোকে সংরক্ষিত না করে সুরক্ষিত হিসেবে মনোনীত করে। উদ্দেশ্য ছিল হয় এই জমিগুলোকে সাফ করা এবং চাষের জন্য উপযোগী করে ইজারা দেওয়া, অথবা এটি সংরক্ষিত বন হিসাবে কাঠ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় স্থানান্তর করতে পারে। চব্বিশ পরগণা জেলার পশ্চিম সুন্দরবনের জন্য, সংরক্ষিত বন হিসাবে মনোনীত এলাকাটি ১৮৯০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ৪,৪০০ থেকে ৪,৫০০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে তুলনামূলকভাবে স্থির ছিল।[২০৬] বলা হয় সংরক্ষিত বা সংরক্ষিত বন হিসেবে উপাধি প্রদান ছিল মূলত একটি হস্তক্ষেপ যা সুন্দরবনের বনাঞ্চলকে জমির বাজারে শক্তি এবং পুনরুদ্ধার চাপের বিরুদ্ধে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। ফলে সুন্দরবনের বনভূমি নিম্ন বাংলায় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া শিল্প হিসেবে পরিচালিত একটি উৎপাদন ইউনিট হয়ে ওঠে এবং থেকে যায়। বন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৮৯০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে সুন্দরবনের প্রায় ৪০ শতাংশ পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। মোট ৭,৫০০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে শুধু ৩,১১৫ বর্গ কি.মি. স্বতন্ত্র মালিকদের বিভিন্ন ধরনের অনুদানে বরাদ্দ করা হয়েছিল। সংরক্ষিত বন থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঠ, বাঁশ এবং অন্যান্য পণ্য বিক্রয় করা হয়।[২০৭] ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে বড় আকারের জমি ছাড়পত্রের ঘটনা ঘটেছে; ফসলি জমি ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি দুটি বড় আকারের মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত করে: ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে তৎকালীন নবনির্মিত ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের উভয় দিকে উদ্বাস্তুদের ব্যাপক স্থানচ্যুতি। এই সময়ে চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবন এলাকার প্রায় ষাট শতাংশ বন বিভাগ দ্বারা শাসিত হয়েছিল। এটি দেশভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গ সুন্দরবন বন সংরক্ষণের ভিত্তি তৈরি করেছিল।[২০৮]

---

২০৪. *ibid.*

২০৫. *ibid*

২০৬. *ibid.*

২০৭. *ibid.*

২০৮. *ibid.*

সুন্দরবনের অধিবাসীদের ভাবনায় ব্রিটিশ প্রশাসক হেমিল্টন: এ প্রসঙ্গে শীব শংকর মিত্র বলেন- "সেই পরাধীনতা আমলের কথা। বিলাতের বাজবংশের নীল রক্ত গায়ে নিয়ে জন্মেছিলেন ডেনিয়াল হেমিল্টন সাহেব। অগাধ সম্পত্তির মালিক যেমন তেমনি ব্রিটিশ শাসকযন্ত্রের উপর আধিপত্যও অগাধ। আসলে তাঁর মনোভাব ছিল প্রজাবৎসল জমিদারের। এই ধরনের প্রজাবৎসল অনেক জমিদার আমরা দেখেছি এই বঙ্গ দেশেও যাদের জন্য ন্যুব্জেপড়া বহু চাষীও সহসা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি ব্রিটিশ আমলে। হেমিল্টন সাহেব নানাভাবে ব্রিটিশ শাসকদের বোঝান, ভারতের চাষীরা আজ শোষণের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠবে তার ঠিক নেই। সমবায় আন্দোলন গড়ে দেখাতে হবে যে তারা একত্রিত হয়ে মাজা খাড়া করে নিজের অন্ন ও বস্ত্র জোটাতে পারে।[২০৯] হেমিল্টন তখন ভারতে আসেন 'পি-এণ্ড-ও' জাহাজ কোম্পানির সর্বময় কর্তা হয়ে।[২১০] এসেই বেরিয়ে পড়লেন জলযানে। সন্ধান চললো, কোথায় তাঁর সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত করবেন, কোথায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবেন। পরিক্রমা চলে চব্বিশ পরগণার গোটা সুন্দরবন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে পূর্বে রায়মঙ্গল নদী থেকে পশ্চিমে মেদিনীপুর এলাকা পর্যন্ত। শেষমেষ গোসাবা অঞ্চলই হয় তার মনঃপূত। সরকারের কাছ থেকে বনের তিনটি পাশাপাশি দ্বীপ- গোসাবা, সাতজেলিয়া ও রাঙাবেলিয়া বন্দোবস্ত করে নিয়ে কাজে নেমে পড়েন ১৯০৮ সালে। বাদার এই তিনটি দ্বীপকে প্রথমে আবাদে পরিণত করলেন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও উড়িষ্যার আদিবাসীদের আমন্ত্রণ করে ও তাদের বসতি বানিয়ে দিয়ে। গোসাবায় গড়ে উঠতে লাগলো একের পর এক সমবায়, সমবায় ব্যাংক, সমবায় চালকল, সমবায় বিপণি, সমবায় মৎসজীবী ও আরও কত নতুন ধারার সমবায়। পরীক্ষা চলতে থাকে কিভাবে নোনাজলের দাপটকে উপেক্ষা করে ধান ফলানো যায়, কিভাবে ও কোন সারের সাহয্যে খেজুর গাছের রস নোনতা না হয়ে উঠতে পারে, কিভাবে জমিকে এক ফসলার জায়গায় তিন ফসলা করা যায়, কিভাবে আপদকালীন ধর্মগোলা সমবায় পদ্ধতিতে পড়ে তোলা যায়, গভীর ও ভয়ঙ্কর শ্বাপদ সঙ্কুল সুন্দরবনে মাছ ও মধু আহরণের অভিযানগুলো কিভাবে নিরাপদ করে তোলা যায়। এমনি ধরনের অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার আবেগের যেন অবধি ছিলো না। গোসাবায় সে এক রমরমা অবস্থা।[২১১]

গোসাবার মানুষের মধ্যেও উৎসাহ ও কাজের যেন জোয়ার আসে। হেমিল্টন সাহেব দেখলেন এত কিছু হলো কিন্তু চাষীরা সবার আড়ালে মারা পড়ছে মহাজনী ঋণের সুদ মেটাতে। তিনি তখন প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে নিজে এক টাকার কাগুজে নোট ছাপিয়ে চালু করার অনুমতি আনেন। এই কাগুজে নোট গোসাবার গোটা সমবায় সংস্থাতেই

---

২০৯. শিবশংকর মিত্র, *সুন্দরবন সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

২১০. ঐ।

২১১. ঐ।

শুধু গ্রাহ্য ছিল। কাজেই কাজের মৌসুমে নিজেদের সংসার চালাতে চাষীদের আর মহাজনের কাছে হাত পাততে হতো না।[২১২]

ঔপনিবেশিক আমলে সুন্দরবন এলাকায় জমিদারদের আদায়কৃত বে-আইনি করঃ

১. ডাক খরচা- জমিদারের ডাক কর, যা প্রজারা দিতে বাধ্য থাকতো।

২. ভিক্ষা- জমিদারের ঋণ পরিশোধ করার জন্য প্রজাদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থ।

৩. পার্বণি- জমিদারের বাড়িতে ধর্মানুষ্ঠানের খরচ মেটাতে প্রজাদের ওপর ধার্য কর।

৪. তহুরি- প্রজাদের সালতামামির সময়ে ধার্য কর।

৫. বিবাহ কর- প্রজার বাড়ির কোন বিবাহের জন্য ধার্য কর।

৬. পুলিশ খরচ- জমিদারিতে পুলিশ কোন তদন্তে এলে তার খরচ মেটানোর জন্য ধার্য কর।

৭. রথ খরচা- রথের সময় ধার্য কর।

৮. বরদারি খরচা- জমি লিজ নেয়ার সময় কৃষকদের এই কর দিতে হতো।

৯. আয়কর- কোনো কোনো জমিদার সরকারকে প্রদেয় আয়কর কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করে নিতেন।

১০. তাঁত কর- তাঁতীদের কাছ থেকে আদায়কৃত কর।

১১. ধাই কর- ধাইদের ওপর ধার্য কর।

১২. মাথুর- নাপিতের ওপর ধার্য কর।

১৩. সন্তনজমা- চর্মকারের ওপর ধার্য কর।

১৪. বনসেলামি- গুড় প্রস্তুতকারকদের ওপর ধার্য কর।

১৫. অন্তরা সেলামি- লবণ প্রস্তুত করে বিক্রয়কারীর ওপর ধার্য কর।

১৬. এছাড়াও আরো নানা ধরণের কর আদায় করা হতো কৃষকদের কাছ থেকে।[২১৩]

সুন্দরবনে ফসল আবাদ/জমিদার তালুকদাদের দৌরাত্ম্যঃ[২১৪]

২১২. ঐ।

২১৩. গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই, পূর্বোক্ত, পৃ. ২।

২১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আমলের শুরুতে সুন্দরবনে জনবসতি ছিল না। কিন্তু জনশূণ্য এই জঙ্গলে চঞ্চলতার সৃষ্টি হয় বনের কাঠ সংগ্রহকে কেন্দ্র করে। শ্বাপদসংকুল বাধা অতিক্রম করে জঙ্গল পরিষ্কার করা শুরু হয়। একদল কালো মানুষ আবাদ করতে শুরু করে ধান। এর মাধ্যমে এখানে গড়ে উঠতে থাকে জমিদার, তালুকদার, লাটদার, চকদার প্রভৃতি শ্রেণি। ফসল উৎপাদনকারীদের সাথে ফসল আত্মসাৎকারীদের লড়াই। এই লড়াই চলছে এখন পর্যন্ত। বর্তমান সুন্দরবনে এই লড়াই মূলত প্রধান বিষয়।[২১৫]

১.৮ (ঝ) পাকিস্তান আমলে বন ব্যবস্থাপনা: ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বঙ্গদেশ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) বিভক্ত হয়ে যায়। দক্ষিণ সার্কেলের বন বিভাগ (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ ও খুলনা জেলাধীন সুন্দরবন) পূর্ব বাংলার বনাঞ্চলভুক্ত হয়। আসামের সিলেট বিভাগও পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানে বিভাজিত হয়ে যায়। একজন বনসংরক্ষকের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের বন প্রশাসন গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে প্রথমে দুটি এবং পরে তিনটি বন সার্কেল যথা- পূর্ব সার্কেল, পশ্চিম সার্কেল ও উন্নয়ন সার্কেল গঠিত হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট পূর্ব সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুন্দরবন, ঢাকা ও ময়মনসিংহ পড়ে পশ্চিম সার্কেলে এবং কর্ম পরিকল্পনা ও ব্যবহার বিভাগ নিয়ে গঠিত হয় উন্নয়ন সার্কেল। বনপালদের (foresters) প্রশিক্ষণের জন্য সিলেটে একটি বন বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। পাকিস্তান গঠনের ফলে বনের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার প্রকৃতিতে সামান্য পরিবর্তন আসে। এসময় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ধারাবাহিকতা এবং শাসনের ফলাফল একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। বননীতির রাজস্ব অভিমুখীকরণ, সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা, বন থেকে সর্বাধিক অর্থনৈতিক আয়ের উপর জোর দেওয়া, বন ভিত্তিক শিল্পের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, সর্বাধিক শোষণ এবং বনের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানার সম্প্রসারণ এসময়ের বনায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৯৫৫ ও ১৯৬২ সালে দুটি বননীতি গ্রহণ করা হলেও এসব নীতিতে স্থানীয় অধিকার ও দাবিগুলো উপেক্ষিতই থেকে যায়।

১.৮ (ঞ) বাংলাদেশ আমল: বাংলাদেশ আমলে বিভিন্ন বন আইন, নীতি, নিরাপত্তা আইন, আদালত আইন ও ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বনায়ন, পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণে চেষ্টা করা হয়। যেমন: বন আইন ১৯২৭ (১৯৮৯ এবং ২০০০ সালে সংশোধিত), বন নীতি ১৯৯৪ (Forest Policy ১৯৯৪), ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০০১, Burning (Control) (Amendment) Act ২০০১, সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০১, Social Forestry Rules ২০০৪ (amended in 2010 and 2011) সহ বেশ কয়েকটি আইন, নীতি এবং প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। (২০১০ এবং ২০১১ সালে সংশোধিত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন ২০১০, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল আইন ২০১০ (Bangladesh Climate

---

২১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

Change Trust Fund Act ২০১০), বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন ২০১০ (Bangladesh Environment Court Act ২০১০), বন উৎপাদন ট্রানজিট (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১১ (Forest Produce Transit (Control) Rules ২০১১), বন্যপ্রাণীর জন্য ক্ষতিপূরণ- ২০১২ (Compensation for Wildlife Victim ২০১২), বাংলাদেশ ২০১০-২০১১ বিধিমালা ২০১২, বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ (Bangladesh Wildlife Conservation and Security Act ২০১২), বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন ২০১২ (খসড়া) (Tree Conservation Act ২০১২, Draft), বাংলাদেশ REDD+ প্রস্তুতি রোডম্যাপ ২০১২ (Bangladesh REDD+ Readiness Roadmap ২০১২), বাংলাদেশ জৈবিক বৈচিত্র আইন ২০১২ (Bangladesh Biological Diversity Act ২০১২), Bangladesh Bio-safety Rules ২০১২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ (Disaster Management Act ২০১২), স'মিল (লাইসেন্স) বিধি (Sawmill (License) Rule ২০১২), বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান আইন ২০১২ (Bangladesh Biological Diversity Act ২০১২), ইট প্রস্তুত ও ইট ভাটা ইনস্টলেশন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ (The Brick Manufacture and Brick Kiln Installation (Control) Act ২০১৩), পরিবেশগতভাবে জটিল এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৩ (Ecologically Critical Area Management Rules ২০১৩), পরিবেশগতভাবে জটিল এলাকা আইন (খসড়া) ২০১৬ (Ecologically Critical Areas Act (Draft) ২০১৬), জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল (খসড়া) ২০১৬ (National Conservation Strategy (Draft) ২০১৬), সংরক্ষিত এলাকার নিয়ম (খসড়া) ২০১৬ (Protected Area rules (Draft) ২০১৬), জাতীয় বননীতি ২০১৬ (খসড়া) (National Forestry Policy (Draft) 2016), আপডেটেড ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান ২০১৬ (খসড়া) (Updated Forestry Master Plan for Bangladesh 2016, Draft) বাংলাদেশ ১৯৫০ সালে পাখির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন (Convention for the protection of Birds in ১৯৫০), ১৯৫১ সালে উদ্ভিদ সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন (অনুমোদিত) (Convention for the protection of plant in 1951 (ratified), ১৯৫৬ সালে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য উদ্ভিদ সুরক্ষা চুক্তি (অনুমোদিত) (Plant Protection Agreement for the South East Asia and Pacific Region in ১৯৫৬ (ratified), বিশ্ব সুরক্ষার জন্য কনভেনশন স্বাক্ষর করে। ১৯৭২ সালে সংস্কৃতি এবং জাতীয় ঐতিহ্য (অনুমোদিত) (Convention for the protection of the World Culture and National Heritage in ১৯৭২ (ratified), ১৯৭৩ সালে বন্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিপন্ন প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত কনভেনশন (অনুমোদিত) (Convention on International Trade in endangered species of Wild Fauna and Flora in 1973 (ratified), ১৯৭৯ সালে বন্য প্রাণীর পরিযায়ী প্রজাতির সংরক্ষণের কনভেনশন (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild animals in ১৯৭৯), আন্তর্জাতিক জলাভূমি সম্পর্কিত কনভেনশন সংশোধন

করার প্রটোকল বিশেষ করে ১৯৮২ সালে জলপাখির আবাসস্থল হিসেবে গুরুত্ব (Protocol to Amend the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat in ১৯৮২), ১৯৯২ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (অনুমোদিত) (United Nations Framework Convention on Climate Change in 1992 (ratified), ১৯৯২ সালে জৈবিক বৈচিত্র্যের কনভেনশন (Convention on Biological Diversity in ১৯৯২), ১৯৯৭ সালে ইউএনএফসিসিসির কিয়োটো প্রোটোকল (অনুমোদিত) (the Kyoto Protocol to the UNFCCC in 1997 (ratified), বেইজিং অ্যাডজাস্টমেন্টস এবং ১৯৯২ সালের চুক্তি ১৯৯৯ সালে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী পদার্থের উপর এবং জৈব বৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশনের জৈব নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্টেগেনা প্রোটোকল, ২০০০ সালে (অনুমোদিত) The Beijing Adjustments and Amendments to the 1987 Montreal Protocol on substances that Deplete the Ozone Layer in ১৯৯৯। এটি রামসার কনভেনশন এবং ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কনভেনশনেরও স্বাক্ষরকারী।[২১৬]

বাংলাদেশের সুন্দরবন অংশ বনবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের অধীন। দেশে অবস্থিত সুন্দরবনের অংশটুকুকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে- সুন্দরবন পূর্ব ও সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ। সুন্দরবন পশ্চিম বনবিভাগের সদর দপ্তর খুলনায় এবং পূর্ব বনবিভাগের সদর দপ্তর বাগেরহাটে অবস্থিত। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা ডিএফও এর অধীনে বনবিভাগগুলো পরিচালিত হয়। সুন্দরবন বন বিভাগ খুলনা সার্কেলে অধীনে। সার্কেলের প্রধান একজন বন সংরক্ষক। প্রধান বন সংরক্ষক বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সুন্দরবন তদারকি করেন। এছাড়া খুলনা সার্কেল প্রধান বন সংরক্ষকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। বনটি দুইভাগে বিভাজিত ছাড়াও একে আরোও সুবিন্যস্তভাবে পরিচালনা করা হয়। ৫৫টি কম্পার্টমেন্ট, ৪টি রেঞ্জ, ১৭টি ফরেস্ট স্টেশন, ৪৮টি পেট্রোল পোস্ট বা ফাঁড়ি, ৭টি গোলপাতা কূপ ও ৪টি গরান কূপ রয়েছে। বন ব্যবস্থাপনায় ১,০৩৮ জন জনবল নিয়োজিত।[২১৭]

১৯৮২ সালে শরণখোলা থানা দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল। সুন্দরবনে দুর্নীতি, চোরাচালান ও ডাকাত দমন করার জন্য তাফালবাড়ী, বড়রাজাপুর পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনসহ শরণখোলা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস ও কোস্টগার্ড স্টেশন স্থাপন করা হয়।[২১৮]

২১৬. (https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3763.pdf[Accessed: 06January 2017]

২১৭. সুন্দরবন ফ্লিপ চার্ট, উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২।

২১৮. শরণখোলা উপজেলার পটভূমি, (http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/page) সাইটেশন, ১৮-০২-২০২১, সাইটটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছে ০৭-০১-২০২১।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত কার্যকরভাবে মোকাবেলার জন্য ২০১১ সালে '*পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন*'কে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছে। বলা হয়

> *"১৮ক। রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।"*[২১৯]

বিজ্ঞান ভিত্তিক যথাযথ নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভারসাম্য সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বব্যাপী জাতীয় লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হয়।[২২০] ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক টেকসই ও পরিবেশবান্ধব আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 17 Sustainable Development Goals (SDG's) অনুমোদিত হয়। SDG'র ১৫ নং লক্ষ্য পূরণের জন্য বাংলাদেশ ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ অন্তত ২০%-এ উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২২১] এর লক্ষ্যে বলা হয়-

> *The 7FYP strategies for achieving the goals include continuing a moratorium on felling trees in natural forests, increasing tree density through 'enrichment planting' and 'assisted natural regeneration', intensification of plantation activities in coastal areas and continuing social forestry programmes.*[222]

২০০৫-২০০৭ সময়কালে বন বিভাগ প্রথম জাতীয় বন মূল্যায়ন National Forest Assessment (NFA) বাস্তবায়ন করে। উদ্দেশ্য ছিল বন সম্পদ এবং ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ক্যাপচার করা। এটি একটি পদ্ধতিগত নকশায় সারা দেশে ২৯৯ টি নমুনা প্লট সহ রিমোট সেন্সিং বিশ্লেষণ, জাতীয় ভূমি ব্যবহারের এলাকা, ক্রমবর্ধমান মজুদ, জীববৈচিত্র্য এবং পুনর্জন্ম, বন ও গাছের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক এবং বায়োমাস এবং কার্বন উল্লেখ করা হয়েছে।[২২৩]

---

২১৯. ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ, *বায়ুদূষণ রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ*, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯ উপলক্ষে প্রকাশিত ম্যাগাজিন, ২০১৯, ঢাকা, পৃ. ৩৭।

২২০. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, 2019, p-41.

২২১. *ibid*, p. 41.

২২২. *ibid*, p. 43.

২২৩. ibid, p. 12.

এছাড়া টেকসই বন ব্যবস্থাপনার জন্য আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৪ সালের সংশোধিত জাতীয় বন আইনে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ২০% ভূমি বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।[২২৪] ২০১০-২০২১ সালের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমি ২.৮৪ মিলিয়ন হেক্টরে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। ২০১৬ সালের জাতীয় বন আইনেও ২০% এলাকা বনভূমির আওতায় আনার পরিকল্পনা হয়।[২২৫] পাশাপাশি ২০১৮ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতির জন্য পরবর্তী ছয় বছরে নির্ধারিত কিছু শর্ত পূরণের কথা বলা হয়। নির্ধারিত সেসকল শর্ত পূরণ ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রাকৃতিক সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এ সময় প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণে গুরুত্ব দেয়া হয়। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ বনবিভাগ, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বন জরিপ ২০১৯ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপের মাধ্যমে বৃক্ষ ও বনভূমির পরিমাণ, আচ্ছাদিত বনভূমির পরিমাণ পরিবর্তন মাত্রা, জীববৈচিত্র্যতা ও সংরক্ষণ, স্টক, বায়োমাস, কার্বন, ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা, বৃক্ষ ও বনভূমি বিনাশে নানা উপদ্রব, টেকসই বন ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, বৃক্ষ ও বনভূমি কেন্দ্রিক জীবন ও জীবিকা প্রভৃতি নানা বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহের জন্য এই জরিপ করা হয়। সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও এই জরিপে অনুসন্ধিৎসু প্রতিটি খাতে গবেষণা জরিপ করা হয়।[২২৬]

বিএফআই-এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল গাছ এবং এ সম্পর্কে জাতীয় স্কেল বেসলাইন তথ্য প্রদান করা, বন সম্পদ এবং মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক টেকসই করা এবং সকল ভূমি ব্যবহারে বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ। বাস্তুতন্ত্রের মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য বন সম্পদের ব্যবহার এবং অবস্থার মধ্যে লিঙ্কগুলো শনাক্ত করন, জাতীয় স্কেল ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে সহায়তাকরণ, বনায়ন খাতের জন্য প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধিকরণ। সুন্দরবনকে আশেপাশের সম্প্রদায়ের কাছে এর আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব ভালভাবে নথিভুক্তকরণ। এর সাথে সুন্দরবন অঞ্চলের ১০ কি.মি. বাফারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ৮৯টি ইউনিয়ন ও পরিবারের জরিপ করা হয়েছে।[২২৭]

এছাড়া বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদান এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার এবং বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। বন সংরক্ষণ ও সহব্যবস্থাপনায় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বন বিভাগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন

২২৪. ibid, p. 41.

২২৫. ibid, p. 44.

২২৬. ibid, p. 41.

২২৭. ibid, p. 35.

করেছে। এছাড়া সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে একটি স্থায়ী, চলমান ও স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রমে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণে যারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাদেরকে 'বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার' প্রদান করা হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিবছর এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।[২২৮] জাতীয়ভাবে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি/সংস্থাকে সম্মানিত এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে *Bangabandhu Award for Wildlife Conservation* পদক প্রদান করা হচ্ছে।[২২৯]

পাশাপাশি সুন্দরবন পূর্ব বনবিভাগ কর্তৃক (১) স্মার্ট টহল ব্যবস্থা চালু রাখার ব্যবস্থা করা; (২) বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত; (৩) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ নেওয়া; (৪) বনাঞ্চলে টহল ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। [২৩০]

১.৯ উপসংহার: যাই হোক, সুন্দরবনের আশেপাশে ধীরে ধীরে প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা অনেক বেড়েছে তবে গাছের আচ্ছাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর বন উজাড় এবং বনের অবক্ষয় থেকে রক্ষা ও গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার পাশাপাশি বন খাতে অবৈধ কার্যকলাপ হ্রাস করার প্রচেষ্টার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা, দায়িত্বরত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের জবাবদিহিতা, আইনের শাসন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারণ বন খাতে দরিদ্র শাসন, দুর্নীতি এবং অবৈধতা বন-নির্ভর জনসংখ্যাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে যারা তাদের জীবিকা ও বেঁচে থাকার জন্য কাঠ এবং অ-কাঠ বনজ পণ্যের উপর নির্ভর করে। [২৩১]

---

২২৮. তথ্যকনিকা: জাতীয় বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ অভিযান মেলা ২০১৯, বন অধিদপ্তর: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়, পৃ. ৩৬-৪০

২২৯. Ibid.

২৩০. (http://foresteast.bagerhat.gov.bd/site/page) সাইটেশন, ০২-০৩-২০২১, ৩:৪৫ পিএম.

২৩১. (https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion files/3763.pdf [Accessed:06January 2017], UN-REDD Report, p.28-32.

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবেশ:

প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় সুন্দরবনের ভূমিকা

২.১. প্রাককথন:

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগপ্রবণ দেশ। উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে উন্মুক্ত জলরাশির বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপে প্রতি বছরে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দূর্যোগ দেখা দেয়।[২৩২] জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এখানে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি যেমন হুমকিস্বরূপ তেমনি বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং নানা মহামারী এদেশের নিত্য সঙ্গী। ১৯৯৩ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে প্রায় ৯৩টি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দূর্যোগের রেকর্ড রয়েছে। ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালে দেশের দুই তৃতীয়াংশ এলাকা বন্যায় আক্রান্ত হয়েছিল।[২৩৩] বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলীয় এলাকায় তথা বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বর্ষার পূর্বে এবং পরে সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় এবং বাতাস গরম ও হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় এবং নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই এখানে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। বনশূন্যতা যেকোনো এলাকায় পরিবেশের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে অস্বাভাবিক হারে উপকূলীয় এমনকি পাহাড়ি এলাকার বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে। যার ফলে এ এলাকায় বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২৩৪] ঘূর্ণিঝড়ের তীব্র বাতাসে সৃষ্ট সমুদ্রের ঢেউ স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে অনেক বেশি হয়। আর তা যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় হয়, তাহলে এ জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা আরও অনেক বেশি হয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের ঢেউ ৪৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে দেখা গেছে। জলোচ্ছ্বাসের এই বিশাল ঢেউ উপকূলের ঘরবাড়ি, মানুষজন, পশুপাখি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মারা পড়ে হাজার

---

২৩২ . ড. সুব্রত কুমার সাহা ও ড. রেজাউল করিম, *বাংলাদেশের পরিবেশ ও সমাজ*, মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ. ২৮৬-২৮৭।

২৩৩. Natural calamities and diseases of sundarbans mangrove forest, https://www.slideshare.net/rnsImran/natural-calamities-and-diseases-of-sundarbans-mangrove-forest, 17.4.20 at 7: 55 pm, বিস্তারিত দেখুন, Haroun Er Rashid, *Geography of Bangladesh,* UPL, Dhaka, 1977.

২৩৪. খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, *দুর্যোগকোষ*, সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি), ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭২।

হাজার মানুষ আর পশুপাখি।[২৩৫] প্রাকৃতিক দূর্যোগে সমগ্র দেশের পাশাপাশি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উপকূলীয় অঞ্চল। সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় এর ভূমিকা সর্বাগ্রে লক্ষণীয়। সুন্দরবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব এর সংরক্ষণমূলক ভূমিকা। এ বন উপকূলভাগের ভূমিক্ষয়রোধ করে, উপকূলীয় এলাকা পুনরুদ্ধার করে এবং নদীবাহিত পলি স্তরীভূত করে। সুন্দরবন অঞ্চলে মাটির উপরে এবং নিচের বায়োমাস কার্বন স্টকের অত্যন্ত উচ্চ ঘনত্ব রয়েছে, যার ঘনত্ব জাতীয় গড় থেকে যথাক্রমে ৩.৪ গুণ এবং ৯.৬ গুণ বেশি। বাংলাদেশ Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change,**Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, 2019**-এর তথ্যমতে সুন্দরবনের পাঁচটি কার্বন পুলের মোট কার্বন ঘনত্ব হল ৩৪৫ টন বা হেক্টর (মাটি থেকে ১ মিটার গভীরতা)।[২৩৬]

২০০৯-২০১০ ইং সনে IPAC প্রকল্পের আওতায় সুন্দরবনের (Sundarban Reserved Forest) কার্বনের পরিমান নির্ণয় (Carbon Inventory) করা হয়। সুন্দরবনের কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টি কার্বন ইনভেন্টরি প্লট চিহ্নিত করে ম্যাপ তৈরি করা হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কার্বনের হিসাব নিরূপণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে ৫টি কার্বন-পুল বিবেচনায় আনা হয়।[২৩৭] এগুলো হলোঃ

১) ক. Trees above ground (ভূমির উপরের গাছসমূহে যেমনঃ পুরো গাছ)
   খ. Trees below ground (ভূ-নিম্নস্থ গাছের অংশ সমূহ, যেমনঃ root system)
২) Seedling & Sapling (ছোট ও অপেক্ষাকৃত বড় চারাসমূহ)
৩) Non-tree vegetation
৪) Down wood (পতিত কাঠ) এবং
৫) Soil (০ থেকে ১০০ সে.মি. পর্যন্ত গভীরতার মাটির অংশ)

ভূমির উপরিস্থ (above ground) এবং ভূমির নিম্নস্থ (below ground) কার্বন পুল স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় প্রকার allometric equation এবং প্রজাতি ভিত্তিক বিভিন্ন কাঠের ঘনত্বের সারণি (wood density table) ব্যবহার করে কার্বনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। মাটিতে মজুদ কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কার্বন

২৩৫. খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, *দুর্যোগকোষ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

২৩৬. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, opcit, p: 100.

২৩৭. http://www.bforest.gov.bd/site/page/6ec068d0-f8ad-4092-8212-39f5bd733c35/.

ঘনত্ব (Carbon density), মাটির বাল্ক ডেনসিটি ও মাটির গভীরতার বিস্তৃত (soil depth range) বিবেচনা করা হয়।[২৩৮] নিচের ছকে সুন্দরবনে প্রাপ্ত কার্বন এর পরিমাণ উল্লেখ করা হলোঃ

গড় কার্বন ঘনত্ব (মেগাগ্রাম/হেক্টর)	সুন্দরবনের ভূমির পরিমান (হেক্টর)	সুন্দরবনের মোট কার্বন মজুদ (মেগাটন)	সমপরিমান কার্বন ডাইঅক্সাইড (মেগাটর)
২৫৬.৬	৪১১,৬৩৯	১০৫.৬	৩৮৭.৭

অথচ জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট নানা কারণে বিশ্বের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে।[২৩৯]

বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ দেশ। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার বাস্তবতা হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে বসবাস। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের এক ষষ্ঠাংশ বাংলাদেশে চলে আসে। সাধারণত বর্ষার আগে গ্রীষ্ম ঋতুতে (এপ্রিল-মে) ও পরে হেমন্ত ঋতুতে (অক্টোবর-নভেম্বর) বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় হতে দেখা যায়। উত্তর বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের স্থলভূমিতে ত্রিকোণাকৃতি ধারণ করায় ও মহীসোপান (স্থলভাগ সন্নিহিত সমুদ্রতলের অংশ) অগভীর হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের পুনরাবৃত্তি ও মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক কিংবা সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে ম্যানগ্রোভ বনের এই কার্যকর ভূমিকা পালনকে বিশেষজ্ঞরা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতান্ত্রিক সেবা বলে অভিহিত করেছেন। ম্যানগ্রোভ বন ঢেউ ও ঝড়ের বিরুদ্ধে জৈব ঢাল হিসেবে কাজ করে। দীর্ঘ ও চওড়া ম্যানগ্রোভ বন ঘূর্ণিঝড়জনিত জলোচ্ছ্বাস ও বাতাসের গতিবেগ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উপকূলীয় এলাকার মানুষের জন্য ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসজনিত বিপদ অনেকটাই কমিয়ে দেয় ঘন ম্যানগ্রোভ বনের চওড়া বেষ্টনী।[২৪০]

---

২৩৮. http://www.bforest.gov.bd/site/page/6ec068d0-f8ad-4092-8212-39f5bd733c35/-

২৩৯. সুন্দরবন সুরক্ষায় যা জরুরি, ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৮ জুলাই ২০২০; Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change **Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory,** opcit, p-156.

২৪০. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, *দুর্যোগ মোকাবিলা করছে ম্যানগ্রোভ*, পূর্বোক্ত।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপের ২০১৭ সালে করা একটি গবেষণাপত্রেও বাংলাদেশে ঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে সুরক্ষার জন্য ম্যানগ্রোভ বনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়। ম্যানগ্রোভ প্রজাতির ভিন্নতা, তাদের ঘনত্ব ও ম্যানগ্রোভ বনের প্রশস্ততার ওপরেই ঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে সুরক্ষার বিষয়টি জড়িত বলে ওই গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে ৫০ মিটার থেকে দুই কিলোমিটার চওড়া ম্যানগ্রোভ বন জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতাকে ৪ সেন্টিমিটার থেকে ১৬.৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। আর ৫০ মিটার থেকে ১০০ মিটার চওড়া বাইন ও কেওড়ার বন ২৯ শতাংশ থেকে ৯২ শতাংশ পানির গতিবেগ হ্রাস করতে পারে।[২৪১]

সুন্দরবনের বিভিন্ন গাছের ঘনত্ব ও তাদের শেকড় এবং কাণ্ডের ওপর জরিপ করে ওই গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে কেওড়া, বাইন আর সুন্দরী গাছ যেকোনো উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসের গতিবেগ কমিয়ে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত কার্যকর। উল্লিখিত গবেষণাপত্রে ম্যানগ্রোভের কোন গাছ কোথায় লাগাতে হবে, সে ব্যাপারেও দিকনির্দেশনা ছিল। জেগে উঠা চরে কেওড়া আর বাইনগাছ ও জোয়ার-ভাটার জায়গায় গরান, গেওয়া ও সুন্দরীগাছ লাগানোর কথা সেখানে বলা হয়েছে। গবেষণাপত্রে বেড়িবাঁধের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখানো হয়েছে ও নদী বরাবর বেড়িবাঁধের পাশ দিয়ে ম্যানগ্রোভ গাছ লাগানোর কথা বলা হয়েছে।[২৪২]

২০১৭ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা থেকে প্রকাশিত একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল বাংলাদেশের দক্ষিণে উপকূলীয় বন সৃজনে প্রকল্পিত খরচ ও উপকারের তুলনামূলক উপাত্ত প্রদর্শিত হয়। বৃক্ষরোপণ, ভূমি খরচ ও পর্যবেক্ষণ, প্রশাসনিক খরচের বিপরীতে কাঠ ও জ্বালানির মূল্য, অন্যান্য বনজ দ্রব্যের মূল্য, উপকূলীয় মৎস্য মূল্য, প্রতিরোধিত মৃত্যু ও গৃহক্ষতি মূল্যের তুলনামূলক হিসাব দেখিয়ে বলা হয়েছে যে উপকূলীয় বন সৃজন লাভজনক।[২৪৩]

২.২ বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাসমূহ: বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের জন্য অধিকতর বিপদাপন্ন জেলাসমূহ হচ্ছে-

১. চট্টগ্রাম বিভাগ- চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষ্মীপুর, ফেনী ও নোয়াখালী।

২. খুলনা বিভাগ- খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট।

৩. বরিশাল বিভাগ- বরিশাল, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা ও পটুয়াখালী।[২৪৪]

---

২৪১. ঐ।

২৪২. ঐ।

২৪৩. ঐ।

২৪৪. খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, *দুর্যোগকোষ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

মানচিত্র-১৪: বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ

(https://en.banglapedia.org/index.php/Cyclone#/media/File:Cyclone.jpg)

২.৩ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় সুন্দরবনের ভূমিকা:

সমুদ্র তীরবর্তী সুন্দরবন প্রতিনিয়ত জীবন-জীবিকা রক্ষার লড়াই করে থাকে। শ্বাসমূলীয় এই বনের বৃক্ষ মাটিকে শক্তভাবে আকঁড়ে থাকে যে কারনে সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকা ও উপকূলীয় মানুষের জীবন সম্পদ রক্ষা করে প্রতিরক্ষা ব্যুহ হিসেবে কাজ করে।[২৪৫] সুন্দরবনের সুউচ্চ বৃক্ষসমূহ ও শাখা-প্রশাখা ঘূর্ণিঝড়, সুনামি এবং জলোচ্ছাস এর তীব্রতাকে দুর্বল করে দেয়।[২৪৬] সুন্দরবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির পর থেকেই এই ভূমিকা নিয়মিতভাবে পালন করে আসছে। ইউএনইপি (United Nations Environment Programme) এবং পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য সংস্থাগুলো দীর্ঘকাল ধরে প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় সুন্দরবনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করে আসছে। এ সম্পর্কে ভারত, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে ব্যাপক গবেষণাও পরিচালিত হয়েছে।[২৪৭] উপকূলীয় বন্যা থেকে মানুষকে বাচাঁনোর ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে একটি যেটি ম্যানগ্রোভ থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পায়। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুমান করছে যে, শহরের কাছাকাছি ২০কি.মি. প্রসারিত ম্যানগ্রোভ বছরে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বন্যা সুরক্ষা সুবিধা দিতে পারে। এই সংখ্যার মাধ্যমে আংশিকভাবে বাংলাদেশের জন্য সুন্দরবনের গুরুত্ব কল্পনা করা যায়। বাংলাদেশের

---

২৪৫. দৈনিক যুগান্তর, দূর্যোগ মোকাবেলা করছে ম্যানগ্রোভ, ১৮ জুলাই ২০২১; রাজিব আহমেদ (সম্পা.), সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, গতিধারা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৮৩।

২৪৬. Ranjan Roy, ‘Sundarbans: A natural shield against natural disasters, The Independent, 19 November 2019.

২৪৭. Iftekhar Mahmud, Sundarbans curbed Amphan’s intensity, saved Dhaka, প্রথম আলো, 22 May 2020, Dhaka.

মত ম্যানগ্রোভসমৃদ্ধ বিশ্বের সকল দেশই এর থেকে প্রচুর সুবিধা পেয়ে আসছে। ম্যানগ্রোভ প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী উপকূলীয় বন্যা সুরক্ষার জন্য ৬৫ বিলিয়ন ডলার মূল্য দেয়। পাশাপাশি মৎস, বনায়ন এবং বিনোদন থেকে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সুবিধা দেয়।[২৪৮] ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই রেসকোর্স ময়দানে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদ্বোধনকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুন্দরবনের তাৎপর্য উল্লেখ করে বলেন-

> "১৯৬৭-৬৮ সালের দিকে আমি পাকিস্তান সরকারকে বললাম যে, তাদেরকে অবশ্যই সুন্দরবন রক্ষায় পরিকল্পনা নিতে হবে, তা না হলে বাংলাদেশ টিকে থাকবে না। উত্তরে তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা কিভাবে গাছ কাটা বন্ধ করবো? এতে করে আমরা প্রায় ১.৫ কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবো। আমি বলেছিলাম, আমরা বৃক্ষরোপন করে সুন্দরবন তৈরি করতে পারবো না, এটি দেশকে রক্ষার জন্য প্রকৃতির আশীর্বাদ এবং বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন একটি প্রতিরক্ষা বাঁধ। যদি এটি রক্ষা না করা হয় তাহলে একদিন দেশের দক্ষিণাঞ্চল খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও কুমিল্লাসহ অধিকাংশ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যাবে, হাতিয়া এবং সন্দ্বীপের মতো দ্বীপে পরিণত হবে। সুন্দরবন যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে বঙ্গোপসাগরের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করার আর কিছুই থাকবে না। তাই অনুগ্রহ করে ১.৫ কোটি টাকার জন্য এই বনকে ধ্বংস করবেন না। যেহেতু এ অঞ্চলের মানুষের প্রতি তাদের ভালোবাসা ছিলো না তাই এই আবেদনে তারা কর্ণপাতই করেনি। তারা শুধু চেয়েছে আমাদের বৃক্ষরাজি, আমাদের সম্পদ আর আমাদের কাঁচামাল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল লুট করা।"[২৪৯]

২০১৯ সালে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরে বলা হয় হয় সুন্দরবন অতিক্রম করে ঘূর্ণিঝড় বেশিদূর এগোতে পারে না বলে চলতি বছরের অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড়ের কোন প্রভাব বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে পড়েনি।[২৫০]

শুধু প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় নয় দেশের বনজ সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রেও সুন্দরবন ভূমিকা পালন করে। পর্যটন, প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে লোকালয় ও জীবন রক্ষা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ এই তিনটি খাতে সুন্দরবনের আর্থিক অবদান সম্পর্কিত অনুসন্ধানের নিমিত্তে ২০১৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যিালয়ের Institute of Forestry and Environmental Science এবং যুক্তরাষ্ট্রের Winrock International-এর যৌথ গবেষণায় দেখা যায় যে, শুধু প্রাকৃতিক দূর্যোগেই সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৪৮৫,২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সম্পদ রক্ষা

২৪৮. Haseeb Md Irfanullah, Its Time for the Sundarban, The Daily Star, 5 June 2020, Dhaka.

২৪৯. Anisul Hoque, Sundarbans, Bangladesh, Bangabandhu, Prothom Alo, 15 November 2019.

২৫০. সানজানা চৌধুরী, ঘূর্ণিঝড় বুলবুল: শক্তিশালী হয়ে ধেয়ে আসছে বাংলাদেশের দিকে, বিবিসি, ৮ নভেম্বর ২০১৯।

করে থাকে।[২৫১] গবেষণাটিতে বলা হয়, সুন্দরবন যদি না থাকতো তাহলে এই আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েকগুণ অধিক হতো।

সুন্দরবনের পশ্চিম বন বিভাগের কর্মকর্তা বশিরুল আল-মামুনের ভাষায়-

> "সুন্দরবন আমাদের জাতীয় সম্পদ। এটা এখন বিশ্ব ঐতিহ্য।.... দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে আগলে রেখেছে সুন্দরবন। মায়ের কোলে একটা শিশু যেমন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে তেমনি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের এক বিরাট এলাকা সুন্দরবনকে অবলম্বন করে নিরাপদ রয়েছে।"[২৫২]

বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় কমিশনের সহায়তায় ২০০৮ সালে প্রকাশিত ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে সুন্দরবনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়-

> "Their effectiveness as a barrier to cyclones depends on the width of the plantation, the number of stems per unit area, the size of the trees, the effect of branches and the roughness of the land."

২.৪ সুন্দরবন যেভাবে প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা করেঃ

প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে সুন্দরবন কিভাবে রক্ষা করে সে বিষয়টি পর্যালোচনা করে কয়েকটি কারণ পাওয়া যায়। যথা-

প্রথমত, সুন্দরবনকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। সর্বনিম্নের অংশ অর্থাৎ মোট সুন্দরবনের ৩৫% সুন্দরবন এলাকা। এই এলাকাটি উদ্ভিদের আবাসস্থলের সাথে ঘনবসতিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এই জায়গাটুকু সুন্দরবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর। একটি ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কা এবং এর ফলে লোকালয় প্লাবিত হওয়া থেকে সর্বাগ্রে রক্ষা করে। মাঝামাঝি অংশ সুন্দরবনের মোট এলাকার প্রায় ৩৫%। এখানে ঝড়ের প্রভাব আরো ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। উত্তর অভিমুখে প্রসারিত উপরের ৩০% এলাকা। এই এলাকা কমে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা থেকে প্রধানত লোকালয়কে রক্ষা করে। এই এলাকাটুকু সাধারণত অপেক্ষাকৃত কম আচ্ছাদিত। তবে এর কারণ মানুষের কার্যকলাপ দ্বারা সৃষ্ট বলে ধরে নেওয়া হয়।[২৫৩]

---

২৫১. Iftekhar Mahmud, *Sundarbans curbed Amphan's intensity, saved Dhaka,* 22 May 2020, Dhaka

২৫২. সুন্দরবনকে ভালোবাসুন, দৈনিক ইনকিলাব, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, ঢাকা।

২৫৩. Sakib, Mohiuddin & Sarkar, Md Fatin Nihal & Haque, Anisul & Rahman, Munsur & Jisan, Mansur Ali. Sundarban as a Buffer against Storm Surge Flooding. World Journal of Engineering and Technology. 3, 2015, p. 59-64.

দ্বিতীয়ত, একটি ম্যানগ্রোভ বন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করতে বিভিন্ন উপায়ে প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। ম্যানগ্রোভ বাতাসের উচ্চতা এবং শক্তি হ্রাস করে এবং তাদের মধ্য দিয়ে যাওয়া তরঙ্গ স্ফীত করে, তাদের পলি ক্ষয় করার ক্ষমতা হ্রাস করে এবং সমুদ্রে তৈরি হওয়া বাতাসের দেয়ালের মতো কাঠামোর ক্ষতি করে। এটি জলের পৃষ্ঠ জুড়ে বাতাসকেও হ্রাস করে এবং এটি তরঙ্গের বিস্তার বা পুনর্গঠনকে বাধা দেয়। বিভিন্ন বয়স এবং আকারের বিভিন্ন প্রজাতির ম্যানগ্রোভগুলি তরঙ্গের উচ্চতা কমাতে সবচেয়ে বেশি কার্যকর।[২৫৪]

তৃতীয়ত, ম্যানগ্রোভ ঝড় ও ঘূর্ণিঝড় থেকে জীবনহানি এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমাতে অবদান রাখে কারণ এটি ঢেউ, ঝড়বৃষ্টি এবং উচ্চ বাতাসের প্রভাব কমায়। সুন্দরবনের গাছগুলো যথেষ্ট লম্বা হওয়ায় তুলনামূলকভাবে বড় ঝড়ের সময়, ঢেউয়ের সময়, বনের ছাউনির পাতা এবং শাখা তরঙ্গ শক্তি কমাতে সাহায্য করে। ম্যানগ্রোভগুলি ব্যাপকভাবে ঝড়ের তীব্রতা এবং জলের গভীরতা কমাতে সক্ষম হয় কারণ ঢেউ অভ্যন্তরীণভাবে প্রবাহিত হয়। ঘন ম্যানগ্রোভ বনের ছাউনিও স্থানীয়ভাবে বাতাসের গতি কমিয়ে দেয়।[২৫৫]

চতুর্থত, ম্যানগ্রোভ অভ্যন্তরীণভাবে প্রবাহিত জলের ধ্বংসাত্মক শক্তি হ্রাস করে সুনামির প্রভাব কমায়। বিস্তৃত ম্যানগ্রোভ বন সুনামির উচ্চতা কমাতে বেশি কার্যকরী, সেইসাথে পানির গতি এবং সুনামিতে প্লাবিত এলাকাকে রক্ষা করে। ঘন বনের গাছপালা সুনামির গভীরতা এবং বন্যার পরিসীমা কমাতেও সাহায্য করে। তবে, বিশাল সুনামি ম্যানগ্রোভের ক্ষতি করতে পারে।[২৫৬]

পঞ্চম, ম্যানগ্রোভ মাটিক্ষয় কমায় এবং মাটিকে একত্রে আবদ্ধ করে। ম্যানগ্রোভের ঘন শিকড় মাটিকে বাঁধতে এবং গড়তে সাহায্য করে। উপরের মাটির শিকড়গুলি জলের প্রবাহকে মন্থর করে, পলি জমাতে উৎসাহিত করে এবং ক্ষয় কমায়। জটিল বায়বীয় রুট সিস্টেমগুলি জলের প্রবাহকে ধীরগতিতে সাহায্য করে, পললকে স্থির হতে দেয় এবং পললকে ক্ষয় না করে বর্ধিত হতে দেয়।

ষষ্ঠ, ক্রমবর্ধমান প্রমাণ রয়েছে যে ম্যানগ্রোভগুলি সমুদ্রের স্তর বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। সময়ের সাথে সাথে ম্যানগ্রোভগুলি সক্রিয়ভাবে মাটি তৈরি করতে পারে, ম্যানগ্রোভ মাটির পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি করে।

(https://www.researchgate.net/publication/283290748_Sundarban_as_a_Buffer_against_Storm_Surge_Flooding, 17. 4.2020 at 8: 7 pm)

২৫৪. Ranjan Roy, 'Sundarbans: A natural shield against natural disasters, The Independent, 19 November 2019

২৫৫. *ibid.*

২৫৬. *ibid.*

উপকূলীয় সুরক্ষার সকল দিকের জন্য ঘন বিস্তৃত ও যথাযথ গুণসম্পন্ন ম্যানগ্রোভ থাকা একটি পূর্বশর্ত। যথাযথ গুণসম্পন্ন ম্যানগ্রোভের জন্য পর্যাপ্ত পলি এবং মিঠা পানি সরবরাহ এবং অন্যান্য বাস্তুতন্ত্রের সাথে সংযোগ প্রয়োজন। বিপরীতভাবে, দূষণ বৃদ্ধি এবং ব্যাপক ব্যবহার ম্যানগ্রোভকে বিপন্ন করে তোলে।[২৫৭]

মানচিত্র-১৫: ১৯৮৮-২০১৬ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের মোকাবেলা করা উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়[২৫৮]

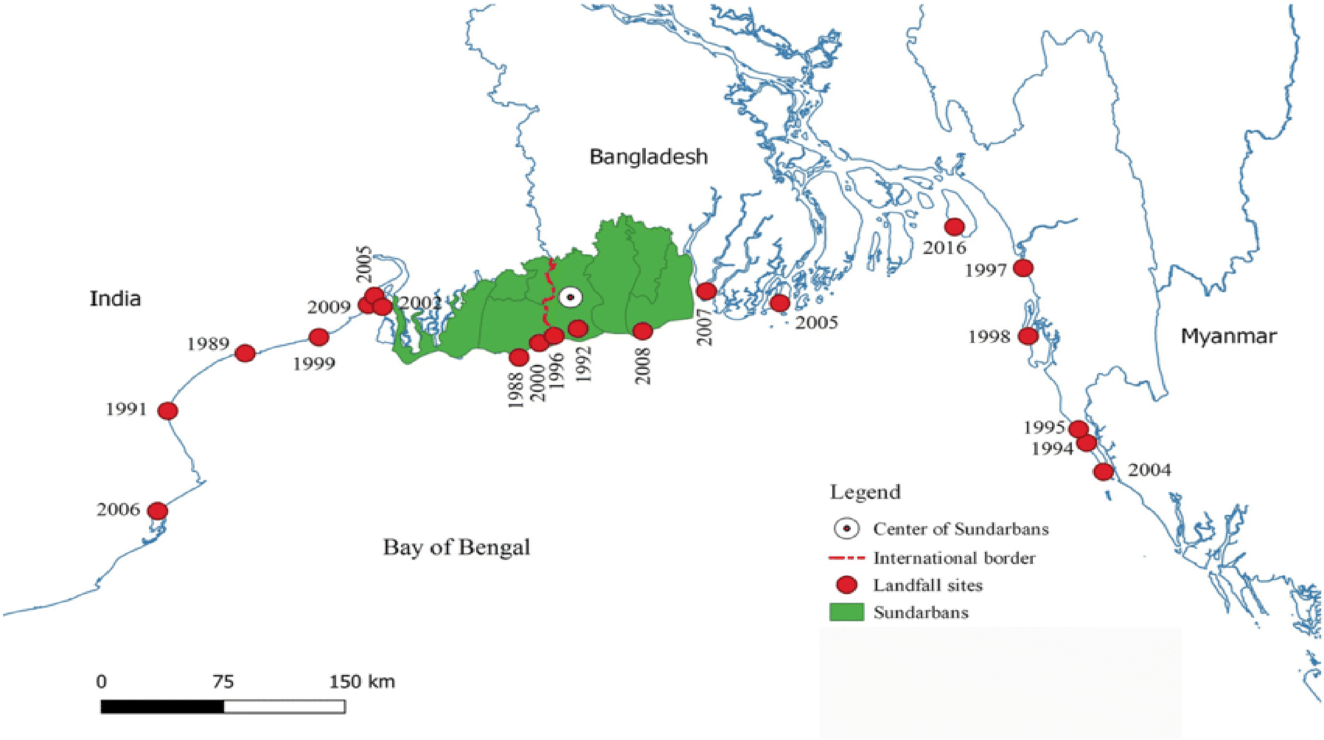

২৫৭. *ibid.*

২৫৮. *Sundarbans mangrove forests with the international boundary between Bangladesh and India. Approximate landfall sites of 20 cyclones can be confirmed of the 21 studied cyclones that occurred between 1988 and 2016; one cyclone path was close to the Cox's bazar Bangladesh but did not show the landfall in the original data. And the center of Sundarbans, a centroid point used to calculate the distance between the cyclonic paths and the Sundarbans.* Mandal, Mohammad Shamim Hasan & Hosaka, Tetsuro, Assessing cyclone disturbances (1988–2016) in the Sundarbans mangrove forests using Landsat and Google Earth Engine. Natural Hazards, 2020, pp.102, 133-150.

২.৫ প্রাকৃতিক দূর্যোগে সুন্দরবনের প্রতিরক্ষার আর্থিক মূল্যঃ

ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবন যেমন ঝড়বৃষ্টির সময় ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি কমাতে সাহায্য করে পাশাপাশি আর্থিক মূল্যের দিক দিয়ে ঝড়ের ঢেউ থেকে গৃহস্থালির সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষার মাধ্যমে এর গুরুত্ব রয়েছে। এ সংক্রান্ত গবেষণা ভারতে বেশি করা হলেও বাংলাদেশে খুবই কম। তাই বাংলাদেশের সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে পরিবারের সম্পদ এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির নির্ণয়ে Storm-Protection Function of Sundarban Mangroves in Bangladesh শীর্ষক গবেষণায় দেখানো হয় যে, মানুষের বসবাসের ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামোর পরিমাণ ম্যানগ্রোভের কাছাকাছি স্থানে কম ছিল। ঝড়ের তীব্রতা বরগুনা, বাগেরহাট, খুলনা এবং সাতক্ষীরা অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।[২৫৯] এই গবেষণায় বলা হয় ঘূর্ণিঝড় এবং ঝড়-বৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত পারিবারিক স্তরের ক্ষতির পরিমাণ ম্যানগ্রোভের এক কিলোমিটার প্রস্থের মধ্যে কম হয়। এছাড়াও ম্যানগ্রোভের সুরক্ষা মান রিপোর্টে দেখানো হয় যে, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ক্ষয়ক্ষতি এবং এ সংক্রান্ত খরচ বাধ দ্বারা সুরক্ষিত গ্রামগুলির তুলনায় অন্যান্য গ্রামে বেশি।[২৬০] যেমনঃ প্রতি পরিবারে USD ১৫৩.৭৪ বেশি খরচ হয়। ঘূর্ণিঝড়ের সাথে সম্পর্কিত আর্থিক ক্ষতি ছিল আশ্রয়প্রাপ্ত গ্রামগুলিতে পরিবার প্রতি USD ১,০২৫, যা ম্যানগ্রোভের ছায়ায় না থাকা গ্রামগুলির তুলনায় প্রায় অর্ধেক। ম্যানগ্রোভের বিস্তার সুরক্ষা নির্ধারণ করে, যেহেতু ম্যানগ্রোভ ঘূর্ণিঝড়ের রুট সিস্টেমে বাধা প্রদান করে জলের প্রবাহকে ধীর করে দেয়। ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির একটি অনুমান গণনা করে ৩৫টি গ্রামের ১০% পরিবারের উপর জরিপ করে দেখা গেছে যে, ম্যানগ্রোভ না থাকার তুলনায় ম্যানগ্রোভ থাকা বেশি উপকারী।[২৬১]

২.৬ সুন্দরবন উপকূল দিয়ে আসা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সুন্দরবনের ভূমিকাঃ

বাংলার উপকূলীয় সমভূমি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় ঘূর্ণিঝড় তার নিত্যসঙ্গী। বজ্র-ঝড় এই অঞ্চলে প্রায়ই আক্রমণ করে। এ নিয়ে এলাকাবাসীও আতঙ্কিত। মৃত্যুর সঙ্গে হাত কাঁপিয়ে বাঁচতে হয় তাদের। মোট ঘূর্ণিঝড়ের ১০% এর উৎপত্তি বঙ্গোপসাগরে। এই ঘূর্ণিঝড়গুলির ধারাসমূহের কতিপয় শেষ পর্যন্ত মারাত্মক হয়ে ওঠে। ঝড়ে এই অঞ্চলের কৃষি ও সামগ্রিক অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। বারবার তাদের ঘরবাড়ি তৈরি করতে হয়। অন্য কোনো উপায় না থাকায় তারা জায়গা ছাড়তে পারছে না। উপকূলীয় মানুষের কাছে ঘূর্ণিঝড়ের অভিজ্ঞতা খুবই সাধারণ। স্থানীয় মানুষ ঝড়ের ভয় পায় না। যদিও ঝড় তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে মাঝে মাঝে, কিছুক্ষণ পর তা স্বাভাবিক হতে শুরু করে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় পরিবেশের ওপর দারুণ ছাপ

২৫৯. A. H. M. Raihan Sarker, Mohammad Nur Nobi, Eivin Røskaft, David J. Chivers & Ma Suza, Value of the Storm-Protection Function of Sundarban Mangroves in Bangladesh, Journal of Sustainable Development; Vol. 13, No. 3;, Canadian Center of Science and Education, 2020 .

২৬০. *ibid.*

২৬১. *ibid*

ফেলেছে। জোয়ারের ঢেউ সভ্যতার ক্ষেত্রগুলিকে প্রভাবিত করেছিল। জমি লবণাক্ত এবং কৃষির জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ঘূর্ণিঝড় মানুষের মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় শস্য, জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে। বিভিন্ন সুত্রে উল্লেখিত বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত প্রাকৃতিক দূর্যোগের তথ্যগুলো দেখায়, স্থানীয় লোকেরা কীভাবে সংগ্রাম করে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিভাবে গাছপালা, জমি এবং মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রাকৃতিক দূর্যোগের ভয়াবহতার মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলকে কিভাবে সুন্দরবন প্রত্যক্ষভাবে প্রাকৃতিক দূর্যোগের মারাত্মক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করছে সেটি উপলব্ধি করা যাবে। বিভিন্ন সময়ে যখন সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকাসমূহ দিয়ে ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়েছে সেসব স্থানের ক্ষয়ক্ষতি আর সুন্দরবন ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো:

২.৭ ঘূর্ণিঝড় সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা:

১৫৮৪ সালের হারিকেন: বাকেরগঞ্জ এবং পটুয়াখালী জেলায় আঘাত হানে। বজ্রবিদ্যুৎসহ হারিকেনের বৈশিষ্ট্য সংবলিত এই ঝড় পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী হয়, কেবল উঁচু স্থানে স্থাপিত মন্দিরগুলো ছাড়া সমস্ত ঘরবাড়ি নিমজ্জিত হয় এবং বহু নৌযান ডুবে যায়। মানুষ ও গৃহপালিত জীব মিলিয়ে প্রায় ২০,০০,০০০ প্রাণহানি ঘটে।[২৬২]

১৫৮৫ সালের ঘূর্ণিঝড়: মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে। প্রচণ্ড ঝড়ো প্লাবনের ফলে বাকেরগঞ্জের পূর্বাঞ্চল সম্পূর্ণ প্লাবিত হয়। প্রাণহানি এবং ফসলের ক্ষতি ছিল সামান্য।[২৬৩]

১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্প: বিশালতা এবং বিধ্বংসী শক্তি অনুসারে, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্প স্মরণীয়। সুন্দরবনে এর গভীর প্রভাব পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলা সাধারণত ঘূর্ণিঝড়-প্রবণ এলাকা নয়। তবে সমুদ্রের কাছাকাছি স্থানগুলি ঘূর্ণিঝড় দ্বারা প্রভাবিত হয়। ১৭৩৭ সালের ঘূর্ণিঝড় প্রথমে হাওড়া জেলায় আক্রমণ করেছিল এবং তারপরে তা সুন্দরবনে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থল ছিল বঙ্গোপসাগর। এই ঘূর্ণিঝড়টি একটি বিপজ্জনকভাবে শক্তিশালী বাতাস এবং ভারী বৃষ্টিপাতের সাথে আসে। এই ঘূর্ণিঝড় বহু জাহাজ, নৌকা এবং আরও ২০ হাজার জলযানকে ছুঁড়ে ফেলেছিল। এই ঘূর্ণিঝড়টি প্রায় ৩০ হাজার মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছিল এবং অন্যান্য সূত্র বলছে এই ঝড়ের কারণে ৩০ লক্ষ প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং অগণিত সংখ্যক প্রাণী মারা গেছে। পানির স্তর ৪-৬ মিটার পর্যন্ত বেড়ে যায়। উপকূলীয় অঞ্চল

---

২৬২. খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, *দুর্যোগকোষ*, সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি), পূর্বোক্তপৃ. ২১২।

২৬৩. পূর্বোক্ত।

প্লাবিত হয়ে পড়ে। এই এলাকাটির লোকবল এবং গবাদি পশুর জন্য প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও এই অঞ্চলে তাদের বসতবাড়ি স্থাপন অব্যাহত রেখেছে।[২৬৪]

১৭৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড়: তীব্র ঘূর্ণিঝড় চট্টগ্রাম অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। সাধারণ ঘরবাড়ি মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং চট্টগ্রাম বন্দরে দুটি জাহাজ নিমজ্জিত হয়।[২৬৫]

১৮২২ সালের ঘূর্ণিঝড়: বরিশাল, হাতিয়া দ্বীপ এবং নোয়াখালী জেলায় তীব্র ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। সরকারি নথিপত্রাদি পানিতে ভেসে যায়, ৪০,০০০ মানুষের মৃত্যু এবং ১,০০,০০০ গবাদিপশুর জীবনহানি ঘটে।[২৬৬]

১৮৩১ সালের বন্যা: জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবনে বরিশাল অঞ্চল আক্রান্ত হয়। মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে (ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না)।[২৬৭]

১৮৩৩ সালের ২১শে মে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়: আরেকটি বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ১৮৩৩ সালের ২১শে মে সাগরদ্বীপের মধ্য দিয়ে চব্বিশ পরগণা আক্রমণ করেছিল। ঝড়ের কারণে বিপজ্জনক জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। এই এলাকা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং অনেকের প্রাণ কেড়ে নেয়। সাগরদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে 'একমন পাথর' নামে একটি দ্বীপ দুই ভাগে বিভক্ত এবং একটি অংশের অর্ধেক বিলীন হয়ে যায়। এই ঘূর্ণিঝড় সুন্দরবনের ৫০ হাজার মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছিল।[২৬৮]

১১ই নভেম্বর ১৮৪২ সালের ভূমিকম্প: ১১ ই নভেম্বর ১৮৪২ সালে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প সুন্দরবন আক্রমণ করে। এর কেন্দ্রটি চব্বিশ পরগণা বা যশোরের যেকোনো স্থানে ছিল বলে মনে করা হয়। বিপুল সংখ্যক প্রাণ হারিয়েছে; এসব কম্পনে সুন্দরবন অঞ্চলের কয়েকটি বন্দর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়।[২৬৯]

১৮৬৪ সালের ৫ই অক্টোবর সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়: ১৮৬৪ সালের ৫ই অক্টোবর সুন্দরবন ও বাংলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র ছিল আন্দামানের কাছাকাছি। এই ঘূর্ণিঝড়টি উত্তর থেকে পশ্চিম দিকে বয়ে যেতে

---

২৬৪. Sujit Mandal, Natural Calamity - Storm in the Sundarbans: A Geo-Historical Study, E ISSN 2348 –1269, PRINT ISSN 2349-5138 68 IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews Research Paper, [VOLUME 5 I ISSUE 2 I APRIL – JUNE 2018].

২৬৫. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, *দুর্যোগকোষ*, পূর্বোক্ত।

২৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০।

২৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩।

২৬৮. ঐ।

২৬৯. পূর্বোক্ত।

শুরু করে এবং প্রথমে ওড়িশার বালাসোরে আক্রমণ করে। তারপর এটি পূর্ব অংশে অগ্রসর হতে শুরু করে এবং মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলে আক্রমণ করে এবং এইভাবে চব্বিশ পরগণা, সাগরদ্বীপ এবং কাকদ্বীপ আক্রমণের পর সমস্ত সুন্দরবনে ছড়িয়ে পড়ে। এলএসএসও ম্যালি অনুমান করেছিলেন যে সেই ঘূর্ণিঝড়ে ৩৩ হাজার লোক মারা গিয়েছিল।[২৭০] অন্য একটি সূত্র অনুসারে, ৫০ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল। ৯ ড্যাম্পিয়ারের রিপোর্ট অনুসারে; এই ঘূর্ণিঝড়ে সাগরদ্বীপ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। বন্যা ও ঝড়ের পরের পরিস্থিতি ছিল পানীয় জল ও খাবারের অভাবের কারণে কলেরা, আমাশয়, গুটিবসন্ত বড় এলাকায় মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। দুর্ভিক্ষ এই সবের সাথে একটি ভয়ঙ্কর মাত্রা যোগ করেছিল।[২৭১]

১৮৬৯ সালের ঘূর্ণিঝড়: ১৮৬৯ সালে আরেকটি ঘূর্ণিঝড় ও ঢেউ সুন্দরবনে আক্রমণ করে। নিচু জমিতে বন্যায় বহু মানুষ ও গবাদি পশু মারা যায়। পানীয় জলের সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। ১৮৬৯ সালের ১৬ই অক্টোবরের সবচেয়ে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়টি আগের সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছিল। ২৫ মিনিটের এই ঘূর্ণিঝড় ৩০ হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। বৃদ্ধ বেসামরিক অশোক মিত্র স্মরণ করেন যে, ***"মৃত্যুর বার্তাবাহক তার মৃত্যু লাঠি দিয়ে সমস্ত শস্য এবং গাছপালা নষ্ট করে মোট এলাকা ফাঁকা করে দিয়েছিলেন। কঙ্কাল, হাড় ও খুলি বিস্তীর্ণ বালির উপর ছড়িয়ে পড়েছিল।[২৭২]"***

১৮৭২ সালের ঘূর্ণিঝড়: কক্সবাজারের ওপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও বহু মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।[২৭৩]

১৮৭৬ সালের বন্যা: মেঘনা মোহনা এবং চট্টগ্রাম, বরিশাল ও নোয়াখালী উপকূলে তীব্র ঝড় জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবন সংঘটিত হয়। এই ঝড়ের সঙ্গে সংঘটিত ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল ১২.২ মিটার (৪০ ফুট)। এ সময় বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের জলস্রোত মেঘনার মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়। এতে প্রায় ২,০০,০০০ মানুষ মারা যায়। আরও অধিক মানুষ মারা যায় দুর্যোগপরবর্তী মহামারী ও দুর্ভিক্ষে।[২৭৪]

১৮৮৫ সালের উত্তাল ঢেউ: ১৮৮৫ সালে উত্তাল ঢেউয়ের কারণে সুন্দরবন এলাকার বড় অংশ পানির নিচে চলে যায়। তখন মাত্র ৭৮৬ বর্গমাইল এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে ছিল।[২৭৫]

---

২৭০. Sujit Mandal, Natural Calamity - Storm in the Sundarbans: A Geo-Historical Study, opcit.

২৭১. *ibid.*

২৭২. *ibid.*

২৭৩. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, *দুর্যোগকোষ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪-২১০।

২৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯।

২৭৫. Sujit Mandal, Natural Calamity - Storm in the Sundarbans: A Geo-Historical Study, opcit.

১৮৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড়: হারিকেনের তীব্রতাসহ প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়া দ্বীপে আঘাত হানে। সমুদ্রতীরবর্তী মূলভূমির গ্রামসমূহ ভেসে যায়। দুর্যোগে প্রাথমিকভাবে মৃত্যু হয় ১৪,০০০ মানুষের এবং পরবর্তী সময়ে মহামারীর (কলেরা) কারণে আরো ১৮,০০০ জনের মৃত্যু হয়।[২৭৬]

১৮৯৮ সালের ঘূর্ণিঝড়: ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবন টেকনাফে আঘাত হানে। ক্ষয়ক্ষতির সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি।[২৭৭]

১৯০৪ সালের ঘূর্ণিঝড়: সোনাদিয়ার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়া ঘূর্ণিঝড়ে ১৪৩ জনের মৃত্যু এবং বহু মাছ ধরার নৌকা ধ্বংস হয়।[২৭৮]

১৯০৯ সালের ঘূর্ণিঝড়: খুলনা অঞ্চলে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবনে ৬৯৮ জন মানুষ ও ৭০,৬৫৪টি গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।[২৭৯]

১৯১৩ সালের ঘূর্ণিঝড়: ঘূর্ণিঝড়ে মুক্তাগাছা উপজেলার (ময়মনসিংহ) ৫০০ মানুষের মৃত্যুসহ বহু গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়।[২৮০]

১৯১৭ সালের ঘূর্ণিঝড়: হারিকেনের তীব্রতা সম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়ে খুলনায় ৪৩২ ব্যক্তি নিহত এবং ২৮,০২৯ গবাদিপশু মারা যায়।[২৮১]

১৯৪১ সালের ঘূর্ণিঝড়: মেঘনা মোহনার পূর্ব অংশে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বহু মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।[২৮২]

১৯৪২ সালের ঘূর্ণিঝড়: তীব্র ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সুন্দরবনের প্রচুর বন্য প্রাণী মারা যায় এবং নৌযানের ক্ষয়ক্ষতি হয় (সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি)। [২৮৩]

১৯৪৮ সালের ঘূর্ণিঝড়: চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর মধ্যবর্তী এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১,২০০ মানুষ ও ২০,০০০ গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।[২৮৪]

---

২৭৬. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, *দুর্যোগকোষ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭।

২৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬।

২৭৮. ঐ, পৃ. ২১১।

২৭৯. ঐ. পৃ. ২১২।

২৮০. ঐ, পৃ. ২০৮।

২৮১. ঐ, পৃ. ২০৩-২০৬।

২৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩-২১৪।

২৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪-২১০।

১৯৫৮ সালের ঘূর্ণিঝড়: মেঘনা মোহনার পূর্ব ও পশ্চিমাংশ এবং বরিশালের পূর্বাঞ্চল ও নোয়াখালীতে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ৮৭০ জন মানুষ ও ১৪,৫০০ গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।[২৮৫]

১৯৫৮ সালের ঘূর্ণিঝড়: চট্টগ্রামের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়। এতে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়, প্রায় এক লক্ষ পরিবার গৃহহীন হয় এবং সরকার গৃহনির্মাণ ঋণ বিতরণ করে।[২৮৬]

১৯৬০ সালের ঘূর্ণিঝড়: মেঘনার মোহনার পূর্বাঞ্চলে (নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং পটুয়াখালী) ঘণ্টায় ২০১ কি.মি. বেগে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সর্বোচ্চ ৩.০৫ মিটার জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয় চর জব্বার, চর আমিনা, চর ভাটা, রামগতি, হাতিয়া এবং নোয়াখালীতে। প্রায় ৩,০০০ মানুষের মৃত্যু, ৬২,৭২৫টি বাড়িঘর ধ্বংস এবং প্রায় ৯৪,০০০ একর জমির ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট ও হাজার হাজার গবাদিপশু মারা যায়।[২৮৭]

১৯৬০ সালের ঘূর্ণিঝড়: চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর, পটুয়াখালী এবং মেঘনা মোহনার পূর্বাঞ্চলে ঘণ্টায় ২১০ কি.মি. বায়ুপ্রবাহ ও ৪.৬ মিটার থেকে ৬.১ মিটার জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এতে ৫,৬৮,১৬১টি বাড়িঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, বিশেষত হাতিয়া দ্বীপের ৭০% ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। দুটি বৃহৎ সমুদ্রগামী জাহাজ তীরে আছড়ে পড়ে, কর্ণফুলী নদীতে ৫-৭টি জাহাজ নিমজ্জিত হয় এবং মোট প্রায় ১০,০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটে।[২৮৮]

১৯৬১ সালের ঘূর্ণিঝড়: ঘণ্টায় ১৬১ কি.মি. বায়ুপ্রবাহ ও ২.৪৪-৩.০৫ মিটার জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় বাগেরহাট ও খুলনা সদরের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। নোয়াখালী হরিনারায়ণপুরের রেলযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং চর আলেকজাণ্ডারে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে। মোট ১১,৪৬৮ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ২৫,০০০ গবাদিপশু ধ্বংস হয়।[২৮৯]

১৯৬২ সালের ঘূর্ণিঝড়: ঘণ্টায় ১৬১ কি.মি. বায়ুপ্রবাহ ও ২.৪৪–৩.০৫ মিটার জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় ফেনীতে আঘাত হানে। প্রায় ১,০০০ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ২৫,০০০ গবাদিপশু ধ্বংস হয়।[২৯০]

---

২৮৪. ঐ।

২৮৫. ঐ।

২৮৬. ঐ।

২৮৭. ঐ, পৃ. ২০৮।

২৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১।

২৮৯. ঐ, পৃ. ১৫২-১৫৫।

২৯০. ঐ, পৃ. ১৯৯-১৯৮।

১৯৬৩ সালের ঘূর্ণিঝড়: তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কক্সবাজারসহ উপকূলবর্তী দ্বীপ কুতুবদিয়া, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, মহেশখালী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চট্টগ্রামে ৪.৩-৫.২ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়। সর্বোচ্চ বায়ুপ্রবাহ ছিল ঘণ্টায় ২০৩ কি.মি. এবং কক্সবাজারে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৬৪ কি.মি.। এই দুর্যোগে বিপুল সম্পদ বিনষ্ট হয়, কমপক্ষে ১১,৫২০ জন মানুষের মৃত্যু ঘটে, ৩২,৬১৭ গবাদিপশু মারা যায়, বাড়িঘর ধ্বংস হয়, ৪,৭৮৭টি নৌযান নিমজ্জিত হয় এবং বহু ফসল বিনষ্ট হয়।[২৯১]

১৯৬৫ সালের ঘূর্ণিঝড়: ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৬২ কি.মি. বেগে ৩.৭ মিটার উঁচু ঝড়ো জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় বরিশাল ও বাকেরগঞ্জে আঘাত হানে। জীবনহানি ছিল প্রায় ১৯,২৭৯ জন, বরিশালেই মৃতের সংখ্যা ছিল ১৬,৪৫৬ জন।[২৯২]

১৯৬৫ সালের ঘূর্ণিঝড়: কক্সবাজার ও সংলগ্ন সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা, পটুয়াখালী ৪.৭ থেকে ৬ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয় কক্সবাজার। সর্বোচ্চ বায়ুপ্রবাহ ছিল ঘণ্টায় ১০ কি.মি.। কক্সবাজার, পটুয়াখালী এবং সোনাদিয়া, রাঙ্গাদিয়া ও হামিদিয়া দ্বীপের উপকূল এলাকায় ১০ নম্বর বিপদ-সংকেত প্রদর্শন করা হয়। কক্সবাজারের ৪০,০০০ লবণক্ষেত প্লাবিত এবং মোট ৮৭৩ জন মানুষ নিহত হয়।[২৯৩]

১৯৬৬ সালের ঘূর্ণিঝড়: সন্দ্বীপ, বাকেরগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লায় ঘণ্টায় ১৪৬ কি.মি. বায়ুপ্রবাহসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে এবং ৪.৭ থেকে ৯.১ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়। এই দুর্যোগে মোট ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ১৫,০০,০০০। নোয়াখালী ও বাকেরগঞ্জ এলাকায় মানুষ ও গবাদিপশুর মৃত্যু সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮৫০ জন ও ৬৫,০০০টি।[২৯৪]

১৯৬৯ সালের ঘূর্ণিঝড়: ঢাকা জেলার ডেমরায় টর্নেডো আঘাত হানে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৬৪৩ কি.মি.। মৃতের সংখ্যা ৯২২ জন এবং ১৬,৫১১ জন আহত। উপদ্রুত অঞ্চলে আর্থিক ক্ষতি হয় ৪ থেকে ৫ কোটি টাকা।[২৯৫]

১৯৭০ সালের পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়: ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে আঘাত হানে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়। এতে ২০ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল।[২৯৬] বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী এটির সর্বোচ্চ গতি ছিল ঘণ্টায় ২২৪

২৯১. ঐ, পৃ. ২০৪-২১০।

২৯২. ঐ, পৃ. ১৩৫।

২৯৩. Sujit Mandal, Natural Calamity - Storm in the Sundarbans: A Geo-Historical Study, opcit.

২৯৪. খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, *দুর্যোগকোষ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩।

২৯৫. Sujit Mandal, Natural Calamity - Storm in the Sundarbans: A Geo-Historical Study, opcit.

২৯৬. করাচি থেকে প্রচারিত পাকিস্তান রেডিও সম্প্রচার, ১৪ নভেম্বর ১৯৭০। সংগৃহিত হয়েছে- The New York Times 15 November 1970.

কিলোমিটার এবং জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা ছিল ১০ থেকে ৩৩ ফুট। প্রায় দশ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারায় এতে। ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় গোটা লোকালয় ও ফসলি জমি।[২৯৭] এতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় চট্টগ্রাম, খুলনা এবং নোয়াখালীসহ গোটা উপকূলীয় অঞ্চল। সে রাতের তাণ্ডবে স্বজন হারাননি এমন কোনো মানুষ ছিলেন না উপকূলীয় অঞ্চলে। নদী নালা খালে কচুরিপানার মত হাজার হাজার লাশ ভাসতে দেখা গেছে। সময়টা ছিল রমজান মাস। দিনভর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি আর আকাশে ছিল কালো মেঘ।[২৯৮] কিন্তু রাত বাড়ার সাথে সাথে ভয়াবহ আকার ধারণ করে প্রকৃতির রূপ। বেঁচে যাওয়া মানুষ পড়েন বিশুদ্ধ পানি আর খাবারের তীব্র সংকটে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে হাহাকার। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার তথ্য মতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল এ পর্যন্ত যত দূর্যোগের কবলে পড়েছে তার মধ্যে ১৯৭০ এর ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। সরকারি হিসেব মতে ঐ দূর্ঘটনায় ভোলায় প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে।”[২৯৯] হারিকেনের তীব্রতা নিয়ে প্রচণ্ড বাতাস দু'দিন ধরে বারবার আঘাত হানে চট্টগ্রামে এবং সেই সঙ্গে বরগুনা, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী, চর বোরহানউদ্দিনের উত্তরাঞ্চল, চর তমিজুদ্দিন, মাইজদির দক্ষিণাঞ্চল ও হরিণঘাটায়। সবার্ধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর মধ্যে ছিল হাতিয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, দুবলার চর অঞ্চল এবং নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল জেলা। হাতিয়ার ১ লক্ষ ২০ হাজার বাসিন্দাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকেই বাস্তুহারা হয়ে যান। দ্বীপের অর্ধেকাংশ প্রায় ২৪২ বর্গকিলোমিটার এলাকা ২০ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে ৮ ঘণ্টা পানির নিচে ছিল। আরো ছোট বড় প্রায় ১০০ টি দ্বীপের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ছিল।[৩০০] অসহায় মানুষের উপর পরিবেশের তাণ্ডবলীলা লক্ষ্য করা যায় সমকালীন কিছু সংবাদ শিরোনামে- *‘একটি প্রাণীও বাচিঁয়া নাই’*, *‘সাহায্য করুন’*, *‘আজ গায়েবী জানাজা’*, *‘শোক মিছিল’*, *‘রিলিফ জাহাজ’*, *‘মৃতের সংখ্যা ৫০০,০০০ দাড়াতে পারে’*, *‘ক্ষতি অকল্পনীয়’*, *‘দুর্গত এলাকা ঘোষণা’*, *‘৩০,০০,০০০ মৃত্যুর সাথে লড়ছে’*, *‘৮ লাখ মারা গেছে’।*[৩০১] এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃতের সংখ্যা ছিল ভোলায়।[৩০২] *Thousands of Pakistanis Are Killed by Tidal Wave*[৩০৩] *TOLL IN PAKISTAN IS PUT AT 16,000,*

---

২৯৭. Cyclone page, Historical Cyclones, List of Major Cyclonic Storms from 1960 to 2017, BANGLADESH METEOROLOGICAL DEPARTMENT; A.M. ‘*Choudhury, Cyclones in Bangladesh’* K. Nizamuddin (ed.), *Disaster in Bangladesh: Selected Readings*, Disaster Research Training and Management Centre (DRTMC), University of Dhaka, 2001, p-65; সুরাইয়া আক্তার, চলচিত্রে প্রতিফলিত পরিবেশ ইতিহাস: ক্ষেত্র সমীক্ষা দুখাই, ইতিহাস সম্মিলনী প্রবন্ধ সংগ্রহ, খণ্ড-১০, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ২৯৫-২৯৮।

২৯৮. The New York Times, Page-1, 15 November 1970, collected from The New York Times Archives, Tue 18 Nov 2014, https://www.theguardian.com/world/2014/nov/18/bhola-cyclone-manpura-east-pakistan-bangladesh-1970

২৯৯. সময় টেলিভিশন নিউজ সম্প্রচার, পূর্বোক্ত; সুরাইয়া আক্তার, চলচিত্রে প্রতিফলিত পরিবেশ ইতিহাস: ক্ষেত্র সমীক্ষা দুখাই, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭।

৩০০. DACCA, Pakistan, Nov. 14, The New York Times, Page-1, 15 November 1970, collected from The New York Times Archives.

৩০১. সময় টেলিভিশন নিউজ সম্প্রচার, পূর্বোক্ত।

৩০২. *The New York Times*, Page-1, 15 November 1970, collected from The New York Times Archives.

৩০৩. *The New York Times*, November 16, 1970, Page, collected from The New York Times Archives.

EXPECTED TO RISE[৩০৪] *PAKISTANIS FEAR CHOLERA'S SPREAD*[৩০৫] *Mass Burial in Noakhali, Noakhali authorities confirmed the mass burial of about 5,000 people on one of the islands, where 3,000 more remained to be buried.*[৩০৬]

চিত্র-৭: The Guardian, পত্রিকায় ভোলা ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াভহতা নিয়ে প্রকাশিতসংবাদ (১৮ নভেম্বর, ১৯৭০)

THE GUARDIAN

Manchester Wednesday November 18 1970 9d

Which prices went down?

Fight for life as aid reaches stricken isles

From HOWARD WHITTEN, Reuters Correspondent

Manpura Island, November 17

Three quarters of the 22,000 people of Manpura Island in East Pakistan are dead. No one had visited the island since the tidal wave on Friday until survivors carried me ashore today. A 90-minute walk through muddy debris, heavy with the stench of death, gave no reasons to doubt the size of the losses estimated by local leaders—16,500 dead here alone.

Only a few hundred buffaloes survived of the 20,000 cows, sheep, goats, and buffalo, which grazed here. The people of Manpura Island grow rice and go fishing. Today the rice crop is ruined and the boats are crushed.

Officials fear death toll of 'one million'

By our Foreign Staff

Russia may attempt crawler recovery

Control of sleep pills likely

'Smell' on Rhodesia

PROBLEM:

এটিকে স্মরণকালের সবচেয়ে সর্বনাশী ঘূর্ণিঝড় হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৩০৭] ঢাকার ***The Morning News*** এ শিরোনাম প্রকাশিত হয় ***the catastrophe "may go down as one of the worst in history."*** সবচেয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভোলা জেলা। এজন্য এ ঘূর্ণিঝড়কে ভোলা সাইক্লোনও বলা হয়। ভোলা শহর প্রদক্ষীণকারী এক পাইলটের ভাষ্যনুযায়ী *"Nothing remains in Bhola. All is gone." He said that at least 1,000 perons had fled there. A major part of Bhola was under water, it was reported.*

সরকারি হিসাব মোতাবেক ৫,০০,০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল এবং ৩৮,০০০ সমুদ্রনির্ভর মৎস্যজীবী ও ৭৭,০০০ অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত দূর্যোগকোষের বর্ণনামতে-

---

৩০৪. By Sydney H. Schanberg; Special to The New York Times, The New York Times, November 16, 1970, *op.cit*. Nov. 23, 1970, Page 6; সুরাইয়া আক্তার, চলচিত্রে প্রতিফলিত পরিবেশ ইতিহাস: ক্ষেত্র সমীক্ষা দুখাই, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯।

৩০৫. *The New York Times*, Page-1, 15 November 1970, op.cit

৩০৬. The disaster was described as "the worst in this century" by a newspaper in Chittagong, the largest port and the second largest city of East Pakistan.; সুরাইয়া আক্তার, চলচিত্রে প্রতিফলিত পরিবেশ ইতিহাস: ক্ষেত্র সমীক্ষা দুখাই, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬।

৩০৭. *প্রাগুক্ত।*

এক হিসেবে দেখা যায় যে, ৪৬,০০০ জন অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবী ঘূর্ণিঝড় চলাকালে মাছ ধরার সময় মৃত্যুবরণ করে। মোট ২০,০০০-এর অধিক মাছ ধরার নৌকা ধ্বংস হয়। সম্পদ ও ফসলের ক্ষতির প্রমাণ বিশাল, দশ লাখেরও অধিক গবাদিপশুর মৃত্যু হয়, ৪,০০,০০০ ঘরবাড়ি এবং ৩,৫০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭০ সালের এই ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ২২২ কি.মি. এবং জলোচ্ছ্বাসের সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল প্রায় ১০.৬ মিটার। সমুদ্রে ভরা জোয়ারের সময় ঘূর্ণিঝড়টি সংঘটিত হওয়ায় এমন প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল।[৩০৮]

চিত্র-৮: ঘূর্ণিঝড়ে তীরে ভেসে আসা বালকের ফুলে উঠা মৃতদেহ টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

(http://www.londoni.co/index.php/about)

১২ নভেম্বর ২০১১ সালে দিগন্ত নিউজ ডেস্ক সম্প্রচারণায় নোয়াখালীর ঘূর্ণিঝড় প্রত্যক্ষদর্শীদের স্বজন হারানোর আর্তনাদ প্রকাশিত হয় আবার নতুন করে। তাদের ভাষ্য-

"আমার ফ্যামিলিতে আমার বাপ গেছে, আমার গেছে আর আমার ভাই বোন ২ জন। সবাই মিলে আমরা ৫ জন ঘরের চালর উফরে উডি, ভাসি গেছি। এর বেতর কত দূর

---

৩০৮. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, *দুর্যোগকোষ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪-২১০।

গেছে ছাল ছোলায় বোলায়, আর কই গেছে, কন কন, মুই কইতে হইতে ফারতান ন।”[৩০৯]

১৯৭১ সালের ঘূর্ণিঝড়: চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী অঞ্চলে তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে (ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ পাওয়া যায়নি)।[৩১০]

১৯৭১ সালের বন্যা: সুন্দরবনের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘণ্টায় ৯৭–১১৩ কি.মি. বায়ুপ্রবাহ ও এক মিটারের কম উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসসহ ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। সমগ্র খুলনা অঞ্চলে ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করে এবং খুলনা শহরের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়।[৩১১]

৬–৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালের ঘূর্ণিঝড়: সুন্দরবনের উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। পটুয়াখালীর উপকূলবর্তী নিম্নাঞ্চল এবং সমুদ্র তীরবর্তী দ্বীপসমূহ প্লাবিত হয়।[৩১২]

১৩–১৫ আগস্ট ১৯৭৪ সালের ঘূর্ণিঝড়: ঘণ্টায় ৮০.৫ কি.মি. বায়ুপ্রবাহসহ ঘূর্ণিঝড় খুলনার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। প্রায় ৬০০ মানুষের মৃত্যু ও প্রচুর গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।[৩১৩]

২৪–২৮ নভেম্বর ১৯৭৪ সালের ঘূর্ণিঝড়: কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমুদ্র তীরবর্তী দ্বীপসমূহে ঘণ্টায় ১৬১ কি.মি. বেগে বায়ুপ্রবাহসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় ও ২.৮–৫.২ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। প্রায় ২০০ মানুষ ও ১,০০০ গবাদিপশু নিহত হয় এবং ২,৩০০ ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়।[৩১৪]

৯–১২ মে ১৯৭৫ সালের ঘূর্ণিঝড়: ভোলা, কক্সবাজার এবং খুলনায় ঘণ্টায় ৯৬.৫ থেকে ১১২.৬ কি.মি. বায়ুপ্রবাহসহ ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। ৫ ব্যক্তির মৃত্যু এবং কিছুসংখ্যক মৎস্যজীবী নিখোঁজ হয়।[৩১৫]

৯–১২ মে ১৯৭৭ সালের ঘূর্ণিঝড়: খুলনা, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, বরিশাল, চট্টগ্রাম এবং উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহে ঘণ্টায় ১১২.৬৩ কি.মি. বেগে ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়। মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানি এবং বেশ কিছু নৌযান নিখোঁজ (ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি) হয়।[৩১৬]

---

৩০৯. Hurricane Research Division, *'30th anniversary of Bangladesh cyclone'*, NOAA/OAR/Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, MAY 27, 2015; NOAAHRD; BANGLADESH METEOROLOGICAL DEPARTMENT Cyclone page, Historical Cyclones, List of Major Cyclonic Storms from 1960 to 2017.

৩১০. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, *দুর্যোগকোষ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪-২১০।

৩১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০-২২২।

৩১২. ঐ, পৃ. ২০৯।

৩১৩. ঐ, পৃ. ২১৫।

৩১৪. ঐ, পৃ. ২১৮।

৩১৫. ঐ, পৃ. ২২১।

১৪–১৫ অক্টোবর ১৯৮৩ সালের ঘূর্ণিঝড়: উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর চরাঞ্চলে ঘণ্টায় ১২২ কি.মি. বায়ুপ্রবাহসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। ৪৩ ব্যক্তি নিহত, ৬টি মাছ ধরার ট্রলার ও ১টি যন্ত্রচালিত নৌকা নিমজ্জিত হয়। ১৫০ জন মৎস্যজীবী ও ১০০ মাছ ধরার নৌকা নিখোঁজ হয় এবং ২০% আমন ফসল বিনষ্ট হয়।[৩১৭]

৫–৯ নভেম্বর ১৯৮৩ সালের ঘূর্ণিঝড়: ঘণ্টায় ১৩৬ কি.মি. বেগে বায়ুপ্রবাহ ও ১.৫২ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় চট্টগ্রাম, কুতুবদিয়ার সন্নিকটস্থ কক্সবাজার উপকূল ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের নিম্নাঞ্চল, টেকনাফ, উখিয়া, ময়িপং, সোনাদিয়া, বরিশাল, পটুয়াখালীর ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ৫০টি নৌকাসহ ৩০০ মৎস্যজীবী নিখোঁজ হয় এবং ২,০০০ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়।[৩১৮]

২৪–২৫ মে ১৯৮৫ সালের ঘূর্ণিঝড়: তীব্র ঘূর্ণিঝড় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী এবং উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহে (সন্দ্বীপ, হাতিয়া এবং উড়িরচর) আঘাত হানে। বাতাসের গতিবেগ ছিল চট্টগ্রামে ১৫৪ কি.মি./ঘণ্টা, সন্দ্বীপে ১৪০ কি.মি./ঘণ্টা, কক্সবাজারে ১০০ কি.মি./ঘণ্টা এবং সেই সঙ্গে ৩.০–৪.০৬ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়। এতে ১১,০৬৯ ব্যক্তি নিহত হয় এবং ৯৪,৩৭৯টি ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত ও মোট ১,৩৫,০৩৩ পশুসম্পদ বিনষ্ট হয়। মোট ৭৪ কি.মি. সড়ক ও বাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩১৯]

১৯৮৫ সালের ঘূর্ণিঝড়: ১৯৮৫ সাল, ২৪ শে মে মধ্যরাতে বঙ্গোপসাগর থেকে এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকা দিয়ে বয়ে যায়। সর্বোচ্চ ১৫ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে[৩২০] পূর্বপ্রস্তুতি এবং আবহাওয়া সতকর্তা থাকা সত্ত্বেও প্রায় ১১ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে।[৩২১] ঘণ্টায় ১৫৪ কিলোমিটার বেগে বয়ে যাওয়া এই ঝড়ে[৩২২] উড়ির চর এবং সন্দ্বীপের যথাক্রমে প্রায় ৪০% এবং ৩.৪% অধিবাসী তাদের পরিবারের সদস্যদের হারায়।[৩২৩] ঘরবাড়ি, শস্য, গবাদি পশু সকলকিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩২৪] লোকজন খাবার, বিশুদ্ধ পানি,

৩১৬. Sujit Mandal, Natural Calamity - Storm in the Sundarbans: A Geo-Historical Study, opcit.

৩১৭. ibid.

৩১৮. খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, *দূর্যোগকোষ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১-২১৩।

৩১৯. Sujit Mandal, Natural Calamity - Storm in the Sundarbans: A Geo-Historical Study, opcit.

৩২০. A.M. '*Choudhury, Cyclones in Bangladesh'* K. Nizamuddin (ed.), Disaster in Bangladesh: Selected Readings, Disaster Research Training and Management Centre (DRTMC), University of Dhaka, 2001, p-65.; Hurricane Research Division, 30th anniversary of Bangladesh cyclone, op.cit; সুরাইয়া আক্তার, চলচিত্রে প্রতিফলিত পরিবেশ ইতিহাস: ক্ষেত্র সমীক্ষা দুখাই, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮।

৩২১. Hurricane Research Division, 30th anniversary of Bangladesh cyclone, *ibid*

৩২২. A K Siddique, A Eusof, *'Cyclone deaths in Bangladesh, May 1985: who was at risk, Comparative Study'*, National Center for Biotechnology Information, 1987

৩২৩. ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য বিবিসির আহ্বান, Bangladesh Cyclone Appeal, P.O. BOX. 999, LONDON, EC4M 8DD.

ঔষধ ও আশ্রয়হীন ছিলেন দীর্ঘদিন।[৩২৫] **৩১** মে **১৯৮৫** পর্যন্ত সন্দ্বীপ, উড়ির চর, ফেনী, কক্সবাজার ও ভোলার প্রায় ৪,৮৬৩ জন নিখোঁজ ছিলেন তাদের মধ্যে ছিল ৮০% থেকে ৯০% শিশু। ৮০,৯৫৯ টি গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, **৯১**,৭০০টি গবাদি পশু নিখোঁজ ছিল। শুধু তাই নয় বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ পূর্ব ও পূর্বাঞ্চল থেকে নতুন করে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।[৩২৬] কৃষি বিভাগের তথ্যানুযায়ী প্রায় **৩১**,৪০০ একর ধানী জমি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো হলো- পটুয়াখালী, ভোলা, চট্টগ্রামের উত্তরাংশ, ফেনী, নোয়াখালী, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, উড়ির চর, জব্বার চর, বাতা চর, দরবেশ চর, সুধারাম। ঘূর্ণিঝড়ের সময় সাধারণত দুই ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়। প্রথমে তীব্র বাতাস এরপর জলোচ্ছ্বাস। সুন্দরবন থাকার কারণে বাতাস বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত কম গতি নিয়ে লোকালয়ে আঘাত হানে। অন্যদিকে জলোচ্ছ্বাস লোকালয়ে পৌঁছানোর পূর্বেই সুন্দরবনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা অনেক কমে যায়। বাতাসের গতিবেগ ও জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা হ্রাসের পাশাপাশি সুন্দরবন নিজেকে বিলীন করে দিয়ে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা করে দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলোকে রক্ষা করে আসছে।

৮–৯ নভেম্বর ১৯৮৬ সালের ঘূর্ণিঝড়: উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং চট্টগ্রাম, বরিশাল, পটুয়াখালী ও নোয়াখালীর চরাঞ্চল ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়। বাতাসের গতিবেগ ছিল প্রতি ঘণ্টায় চট্টগ্রামে **১১০** কি.মি. এবং খুলনায় ৯০ কি.মি.। এতে ১৪ ব্যক্তি নিহত হয় এবং ৯৭,২০০ হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয়।[৩২৭]

২৪–৩০ নভেম্বর ১৯৮৮ সালের ঘূর্ণিঝড়: যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং খুলনা-বরিশালের চরাঞ্চলের ওপর দিয়ে ঘণ্টায় **১৬২** কি.মি. বেগে বায়ুপ্রবাহসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। মংলায় ৪.৫ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়। ৫,৭০৮ ব্যক্তি নিহত হয় এবং ৬৫,০০০ গবাদিপশু মারা যায়। বহুসংখ্যক বন্য পশু মারা যায়– তার মধ্যে হরিণ **১৫**,০০০ ও রয়েল বেঙ্গল টাইগার ৯, এবং ফসল বিনষ্ট হয় প্রায় ৯৪**১** কোটি টাকার।[৩২৮]

২৯ এপ্রিল ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়: এই ঝড়টিকে '১৯৯১-এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়' নামে চিহ্নিত করা হয়। এটি **১৯৯১** সালের ২৯ এপ্রিল রাতে বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করে। ঝড়টির উৎপত্তি হয় প্রশান্ত মহাসাগর, বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে ৬,০০০ কি.মি. দূরে। বাংলাদেশের উপকূলে পৌঁছাতে ঝড়টির সময় লেগেছিল ২০

---

৩২৪. UNDRO GENEVA 28148, UNDRO 85/1208, BANGLADESH–CYCLONE, UNDRO INFORMATION REPORT NO. 3, 29 MAY 1985.

৩২৫. ESSAAFI UNDRO GENEVA 28148, UNDRO 85/1248, BANGLADESH-CYCLONE, UNDRO INFORMATION REPORT NO. 4. 31 MAY 1985; সুরাইয়া আক্তার, চলচিত্রে প্রতিফলিত পরিবেশ ইতিহাস: ক্ষেত্র সমীক্ষা দুখাই, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮।

৩২৬. *Ibid.*

৩২৭. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, *দুর্যোগকোষ*, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি), ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৪০-১৪৪।

৩২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫।

দিন। আকারের দিক থেকে ঘূর্ণিঝড়টির বিস্তার ছিল বাংলাদেশের আকৃতির চেয়েও বড়। কেন্দ্রীভূত মেঘপুঞ্জের ব্যাস ছিল ৬০০ কি.মি.। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল সন্দ্বীপে ঘণ্টায় ২২৫ কি.মি.। এ ছাড়া অন্যান্য ঝড়কবলিত অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ ছিল– চট্টগ্রামে ঘণ্টায় ১৬০ কি.মি., খেপুপাড়া (কলাপাড়া) ১৮০ কি.মি., কুতুবদিয়া ১৮০ কি.মি., কক্সবাজার ১৮৫ কি.মি. এবং ভোলা ১৭৮ কি.মি.। নোয়া-১১ (Noaa-11) উপগ্রহের ২৯ এপ্রিল ১৩:৩৯ ঘণ্টায় তোলা দূর অনুধাবন চিত্র অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়টির বাতাসের প্রাক্কলিত সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ২৫০ কি.মি.। স্পারসো (Sparrso) সর্বপ্রথম ২৩ এপ্রিল তারিখে নোয়া-১১ এবং জিএমএস-৪ (GMS-4) উপগ্রহগুলো গৃহীত চিত্র বিশ্লেষণ করে ঘূর্ণিঝড়টিকে একটি নিম্নচাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল (যার বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৬২ কি.মি.-এর নিচে) নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় ২৫ এপ্রিল। প্রাথমিক অবস্থায় ঘূর্ণিঝড়টি কিছুটা উত্তর-পশ্চিম দিকে ও পরে উত্তর দিকে সরে যায়। ২৮ এপ্রিল থেকে এটি উত্তর-পূর্ব দিকে সরে যাওয়া শুরু করে এবং ২৯ এপ্রিল রাতে চট্টগ্রাম বন্দরের উত্তর দিয়ে বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করে। ঘূর্ণিঝড়টি ওই দিন সন্ধ্যা থেকেই উপকূলীয় দ্বীপসমূহে (যেমন নিঝুম দ্বীপ, মনপুরা, ভোলা, সন্দ্বীপ) আঘাত হানতে শুরু করেছিল। ঘূর্ণিঝড়কালীন ঝড়ো জলোচ্ছ্বাসের প্রাক্কলিত উচ্চতা ছিল ৫ থেকে ৮ মিটার। এই দুর্যোগে জীবন ও সম্পদ ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিশাল। সম্পদের প্রাক্কলিত আর্থিক ক্ষতি ৬,০০০ কোটি টাকা। মোট ১,৫০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, গবাদিপশু মারা যায় ৭০,০০০।[৩২৯]

৩১ মে–২ জুন ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়: উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং পটুয়াখালী, বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের চরাঞ্চলে ঘণ্টায় ১১০ কি.মি. বায়ুপ্রবাহ ও ১.৯ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানিসহ বেশ কিছু নৌযান নিখোঁজ হয় এবং ফসল নষ্ট হয়।[৩৩০]

২৯ এপ্রিল–৩ মে ১৯৯৪ সালের ঘূর্ণিঝড়: উপকূলবর্তী দ্বীপ এবং কক্সবাজারের চরাঞ্চল ঘণ্টায় ২১০ কি.মি. বায়ুপ্রবাহসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়। প্রায় ৪০০ মানুষের মৃত্যু এবং ৮,০০০ গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।[৩৩১]

১২–২৫ নভেম্বর ১৯৯৫ সালের ঘূর্ণিঝড়: উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং কক্সবাজারের চরাঞ্চলে ঘণ্টায় ২১০ কি.মি. বেগে বায়ুপ্রবাহসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। প্রায় ৬৫০ জনের মৃত্যু ও ১৭,০০০ গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।[৩৩২]

---

৩২৯. ঐ, পৃ. ১৫১।

৩৩০. ঐ, পৃ. ১৫৪।

৩৩১. ঐ, পৃ. ১৬৪।

৩৩২. Sujit Mandal, Natural Calamity - Storm in the Sundarbans: A Geo-Historical Study, opcit.

১৬–১৯ মে ১৯৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড়: উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী এবং ভোলার বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল ঘণ্টায় ২২৫ কি.মি. বায়ুপ্রবাহ ৩.০৫ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের (হারিকেন) শিকার হয়। সরকার ও বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য জনসাধারণের যথাযথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এই মহাদুর্যোগে ১২৬ জন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।[৩৩৩]

২৫–২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড়: হারিকেনের তীব্রতাসম্পন্ন প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও ১.৮৩ থেকে ৩.০৫ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী এবং ভোলার চরাঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যায়।[৩৩৪]

১৬–২০ মে ১৯৯৮ সালের ঘূর্ণিঝড়: উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও নোয়াখালীর চরাঞ্চল ঘণ্টায় ১৫০ কি.মি. বায়ুপ্রবাহ ও ১.৮৩ থেকে ২.৪৪ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়।[৩৩৫]

১৯–২২ নভেম্বর ১৯৯৮ সালের ঘূর্ণিঝড়: উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালীর চরাঞ্চল ঘণ্টায় ৯০ কি.মি. বায়ুপ্রবাহ ও ১.২২ থেকে ২.৪৪ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাসসহ ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়।

চিত্র-৯: সিডরে বিধ্বস্ত লোকালয় (সূত্র: প্রথম আলো, ১৫ নভেম্বর ২০২১)

৩৩৩. খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, *দুর্যোগকোষ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯।

৩৩৪. Sujit Mandal, Natural Calamity - Storm in the Sundarbans: A Geo-Historical Study, opcit.

৩৩৫. খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, *দুর্যোগকোষ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮-১৮০।

১৫ নভেম্বর ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডর: ১৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হেনেছিল প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় সিডর। ঘণ্টায় ২৬০ কিলোমিটার গতিতে ধেয়ে আসা এই ঝড়ের তীব্রতা থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করে ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন।[৩৩৬] ৪ নং ক্যাটাগরির এই ঝড়ের সাথে ৫ ফুট উচ্চতায় কোথাও কোথাও ৬ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে নদী, বাঁধ, নিম্নভূমি, লোকালয়, রাস্তাঘাট, সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের ৩০টি জেলার মধ্যে ৪টি জেলাকে (বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর) 'মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত' এবং আরো ৮টি জেলাকে (খুলনা, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, বরিশাল, ভোলা, সাতক্ষীরা, ঝালকাঠি এবং গোপালগঞ্জ) 'মাঝারি আকারে ক্ষতিগ্রস্ত' হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছিল। সিডরের প্রভাবে প্রায় ১০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মৃতের সংখ্যা ছিল ৩,৪০৬ জন, নিখোঁজ ছিল প্রায় ১,০০০ এর অধিক এবং ৫৫ হাজারের বেশি মানুষ শারীরিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল। বলা হয় যদি উন্নত পূর্বাভাস, সতর্কতা ব্যবস্থা এবং সবচেয়ে বেশি কার্যকর পদক্ষেপ উপকূলীয় বনায়ন প্রকল্প বিস্তৃত থাকতো তাহলে প্রত্যাশিত হারের চেয়ে কম হতাহতের ঘটনা ঘটতো।[৩৩৭] সে বছরে দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়টি হয়েছিল যেটির ভয়াবহতা দেশের প্রাকৃতিক মোকাবিলার প্রস্তুতি এবং সুন্দরবনের ভূমিকার কথা আবার স্মরণ করে দিয়েছিল।[৩৩৮]

যুক্তরাষ্ট্রের 'উইনরক ইন্টারন্যাশনাল' এর সাথে যৌথ সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বন ও পরিবেশবিদ্যা ইনস্টিটিউট সুন্দরবনের পর্যটন, ঘূর্ণিঝড় থেকে জনজীবন রক্ষাও আহরিত সম্পদের আর্থিক মূল্যায়ন শীর্ষক গবেষণায় দেখা যায় সিডরের সময় সুন্দরবন প্রায় ৪৮৫.২৯ মিলিয়ন ডলার পরিমাণ সম্পদ রক্ষা করেছিল। বলা হয় যে, সুন্দরবন না থাকলে ক্ষতির পরিমাণ আরো অনেক বেশি হতো। বিশ্বজুড়ে কৃষি, মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করে উইনরক। সুন্দরবন নিয়ে করা এই গবেষণায় আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা ইউএসএইড এবং জন ডি. রকফেলার ফাউণ্ডেশন। ২০১৪ সালের নভেম্বরে শুরু হওয়া এই গবেষণা তিন বছর পর ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হয়। সিডরের ক্ষয়ক্ষতি ও সুরক্ষার আর্থিক মূল্য নির্ধারণের জন্য গবেষক দল সুন্দরবন-সংলগ্ন এলাকা বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরার পাশাপাশি সুন্দরবনবিহীন বরগুনায় ১ হাজার ৫২৫টি বসতঘরের ওপর জরিপ চালায়। এসব বসতঘরের অর্ধেক ছিল সুন্দরবন-সংলগ্ন এলাকার এবং বাকিগুলো ছিল সুন্দরবনবিহীন এলাকায়। গবেষণায় বলা হয়, বাগেরহাট,

---

৩৩৬. Iqbal Hossain, 'Sundarbans mangrove forest protects Bangladesh from the worse of Cyclone Amphan', Forests, Italy, Lifegate, 2020.

৩৩৭. Damage, Loss, and Needs Assessment for Recovery and Reconstruction after Cyclone Sidr, Opcit, xvii

৩৩৮. The cyclone was the second natural disaster to affect Bangladesh in twelve months. Monsoon floods had previously caused extensive agricultural production losses and destruction of physical assets, totaling near US$ 1.1 billion. The occurrence of these events in close succession is a reminder of the country's extreme vulnerability to frequent hydro-meteorological hazards, which stand to be further exacerbated because of climate change.

খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার চেয়ে বরগুনা জেলার প্রতি বসতিতে সিডরের সময় গড়ে ১৫ হাজার ২৭৮ টাকার ক্ষতি বেশি হয়। সুন্দরবনের কারণে বরগুনার চেয়ে ওই তিন জেলার প্রতি বসতিতে সমপরিমাণ টাকার ক্ষতি কম হয়। বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে যুক্ত সুন্দরবনের বলেশ্বর নদীর ওপর দিয়ে সিডর প্রবাহিত হয়। এই নদীর এক পাশে সুন্দরবন এবং অন্য পাশে বরগুনা জেলা (বন থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে)।[৩৩৯] গবেষণায় বলা হয়, সুন্দরবনের কারণে ঘূর্ণিঝড় সিডরের গতি কমে যায় এবং গতিপথেরও পরিবর্তন হয়। সিডরের গতিপথ ছিল সুন্দরবনের দিকে। পরে এটি গতিপথ পাল্টে ডান দিকে বাঁক নিয়ে বরিশাল বিভাগের দিকে চলে যায়। সিডর সুন্দরবনে আঘাত হানলেও প্রচুর পরিমাণ গাছ থাকার কারণে শক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে সুন্দরবন-সংলগ্ন এলাকায় কম ক্ষয়ক্ষতি হয়। তিনি বলেন, গত ১০০ বছরে বঙ্গোপসাগরে ৫০৮টি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়। এর ১৭ শতাংশ আঘাত হানে বাংলাদেশে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ওপর দিয়ে যত ঝড় বয়ে গেছে, প্রতিবারই মানুষের জীবন ও সম্পদকে অনেকাংশে রক্ষা করেছে সুন্দরবন।[৩৪০] এই ঝড়ে সুন্দরবনের প্রায় ২৫% বনভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বনবিভাগের সিদ্ধান্তে এই ক্ষতি কাটিয়ে সুন্দরবনের পূর্ববর্তী রূপে ফেরানোর পূর্ব পর্যন্ত গাছ না কাটার পরিকল্পনা নেয়া হয়।[৩৪১] ঘূর্ণিঝড় সিডরের তীব্রতা মোকাবিলার মাধ্যমে সুন্দরবন প্রাকৃতিকভাবে একটি কার্যকর প্রতিরক্ষা হিসেবে আবার প্রতীয়মান হয়। সিডর পরবর্তী ক্ষতি ও লোকসান পর্যালোচনাপূর্বক পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার ও International Development Community কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে সুন্দরবনের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়:

> *The importance of the Sunderban mangroves and coastal forests, as effective barriers to cyclones, became obvious during Cyclone Sidr. Destruction to inland assets and livelihoods losses could have been much more severe without their acting as barriers. Due to the lack of market information, a full economic assessment of the damages to these resources was not possible. However, of the total infrastructure destroyed (critical for monitoring and managing of these vital assets), replacement costs were assessed at about BDT 420 million (US$ 6 million).*[৩৪২]

৩৩৯. প্রণব বল ও সুজন ঘোষ, ঝড়ে সুন্দরবন থেকে দূরের জনবসতির বেশি ক্ষতি, প্রথম আলো, ২৯ জানুয়ারি ২০১৮।

৩৪০. ঐ (https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment)

৩৪১. Anisul Haque, ‘Sundarbans, Bangladesh, Bangabandhu’ Prothom Alo, Dhaka, 15 November 2019.

৩৪২. A Report Prepared by the Government of Bangladesh Assisted by the International Development Community with Financial Support from the EuropeanCommission, Cyclone Sidr in Bangladesh: Damage, Loss and Need Assesment for Disaster Recovery and Reconstruction, April 2008 P. 51-55.

চিত্র-১০: ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন (সূত্র:পূর্ব বনবিভাগ, সুন্দরবন)

ঘূর্ণিঝড় সিডরে সুন্দরবনের পূর্বাংশ বিশেষ করে দুবলার চর, কটকা, কচিখালী, হিরণ পয়েন্ট, শরণখোলা এবং চাঁদপাই প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৩০০ মাইল নদীবাঁধ এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপগ্রহ চিত্রাবলীর মাধ্যমে জানা যায় যে, এই ঝড় সুন্দরবনের প্রায় ৩০% এলাকায় আঘাত হেনেছিল, বাস্তুসংস্থান প্রক্রিয়া ব্যাপক হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল।[৩৪৩] বাংলাদেশের বনবিভাগের তথ্যমতে সুন্দরবনের প্রায় ৩০ হাজার একর বনজ সম্পদ পুরোপুরি এবং প্রায় ৮০ হাজার একর বনজসম্পদ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি সুন্দরবনের অসংখ্য গাছপালার শাখা-প্রশাখা ভেঙে যায়। বিশেষ করে সুন্দরী Sundri (*Heritiera fomes*), গেওয়া Gewa (*Exococaria agallocha*), এবং কেওরা Keora (*Sonneratia apetala*) ব্যাপকভাবে ক্ষতির শিকার হয়। UNDP-sponsored রিপোর্টে বলা হয়- *Keora was the most affected plant species (80 percent) among all those affected in a total of 47,211 acres. The FD estimated total forest resources damaged in the affected 110,000 ha are about BDT 10 billion (US$ 145 million).* শুধু তাই নয়

৩৪৩. রিপোর্টে বলা হয়, The severe ecosystem disruption included uprooted, broken and twisted plants, and burnt foliage. A Report Prepared by the Government of Bangladesh Assisted by the International Development Community with Financial Support from the European Commission, Cyclone Sidr in Bangladesh: Damage, Loss and Need Assesment For Disaster Recovery and Reconstruction, April 2008, P. 53.

সুন্দরবনের স্বাভাবিক বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থায় ব্যাপকাকারে বিঘ্ন ঘটেছিল। ক্ষতিগ্রস্ত ও ভাঙা গাছপালা বন্যপ্রাণীর অবাধ চলাচল ও প্রজননে বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছিল। পাশাপাশি ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির প্রায় ৫৭টি সুপেয় পানির পুকুর লবণাক্ত পানিতে প্লাবিত হয়েছিল।[৩৪৪]

Cyclone Sidr Impacts on the Sundarbans Floristic Diversity শীর্ষক গবেষণায় দেখানো হয় যে, সিডরের কারণে সুন্দরবনের প্রায় ২৫% এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে প্রায় ৩ বছর লেগেছিল।[৩৪৫]

সারণি-২ ঘূর্ণিঝড় সিডরে সুন্দরবনের ক্ষতিগ্রস্ত মোট বৃক্ষপ্রজাতির পরিমাণ[৩৪৬]

বৃক্ষপ্রজাতি	মোট বৃক্ষ এলাকা (হে:)	মোট ক্ষতিগ্রস্ত বৃক্ষ এলাকা (হে:)	মোট ক্ষতিগ্রস্ত বৃক্ষ এলাকা (%)
সুন্দরী	৭৫,৬৫৪	১৭,৪০০	২৩
গেওয়া	৬৬,৮২১	২৫,৩৯২	৩৮
কেওড়া	৪,৮৮৬	৩,৯০৮	৮০
অন্যান্য	১,১০৯	৫১০	৪৬
মোট	১,৪৮,৪৬৯	৪৭,২১১	৩২

সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি পূর্ব বনবিভাগের ৯৪টি প্রশাসনিক ইউনিট, বিভিন্ন কার্যালয় এবং আবাসিক স্থাপনা সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ৫০ টি নৌকা, ২০ টি কমিউনিকেশন টাওয়ার ও আরটি সেটস নষ্ট হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বনবিভাগের তথ্যমতে প্রায় ২.৯ মিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। অর্থাৎ উপকূলবর্তী লোকালয় ও জনজীবন রক্ষায় সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। বনবিভাগের তথ্যমতে, প্রায় ৩,৫০০ হেক্টর উপকূলবর্তী বনভূমি ও ৩.১ মিলিয়ন বীজ উদ্যান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[৩৪৭]

---

৩৪৪. A Report Prepared by the Government of Bangladesh Assisted by the International Development Community with Financial Support from the European Commission, Cyclone Sidr in Bangladesh: Damage, Loss and Need Assesment For Disaster Recovery and Reconstruction, April 2008 P. 53.

৩৪৫. Cyclone Sidr Impacts on the Sundarbans Floristic Diversity Avit Kumar Bhowmik1 & Pedro Cabral, Earth Science Research; Vol. 2, No. 2; 2013 ISSN 1927-0542 E-ISSN 1927-0550 Published by Canadian Center of Science and Education

৩৪৬. A Report Prepared by the Government of Bangladesh Assisted by the International Development Community with Financial Support from the European Commission, opcit, P. 53.

৩৪৭. বলা হয়, "*The importance of coastal forests as a natural barrier to reduce wind velocities (protecting embankments and settlements) was evidenced. Many coastal forests were heavily affected by the uprooting of millions of timber and fruit trees, nurseries were destroyed, and hundreds of miles of roads and embankments with planted trees on the slopes were eroded.*

২৫ মে ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড়: বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষত খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় সাইক্লোন আইলা আঘাত হানে। সরকারি হিসেবে আইলার কারণে ১৯০ জনের প্রাণহানি ঘটে এবং পশুসম্পদ ও কৃষিজ ফসলসহ ব্যাপক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা।[৩৪৮] আইলা হলো ২০০৯ সালে উত্তর ভারত মহাসাগরে জন্ম নেওয়া একটি ঘূর্ণিঝড়। ২১ মে ভারতের কলকাতা থেকে ৯৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে এর উৎপত্তি। তবে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং ভারতের দক্ষিণ-পূর্বাংশে আইলা আঘাত হানে ২৫ মে। নামটি এই ঘূর্ণিঝড়ের জন্য নির্ধারণ করেন জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আবহাওয়াবিদদের সংস্থা 'ইউএন এস্কেপ'-এর (UN Escape) বিজ্ঞানীরা। ঘূর্ণিঝড় আইলার ব্যাস ছিল প্রায় ৩০০ কিলোমিটার, যা ঘূর্ণিঝড় সিডর থেকে ৫০ কিলোমিটার বেশি। এটি ১০ ঘণ্টা সময় নিয়ে উপকূল অতিক্রম করে। পরে বাতাসের বেগ কমে যাওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি সিডরের তুলনায় কম হয়েছে। বাংলাদেশে আইলা পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালীর হাতিয়া, নিঝুম দ্বীপ, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় জানমালের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। আইলার প্রভাবে খুলনা ও সাতক্ষীরায় ৭১১ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ বিধ্বস্ত হয়েছে। এই দুই অঞ্চলে প্রাণ হারিয়েছে মোট ১৯৩ জন। ঘূর্ণিঝড় আইলার এক বছর পর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, আইলায় প্রায় দুই লাখ একর কৃষিজমি নোনা পানিতে তলিয়ে যায়। আক্রান্ত এলাকাগুলোয় পানীয় জলের উৎস সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। দুই লাখ ৪৩ হাজার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। পর পর দুই মৌসুম কৃষিকাজ না হওয়ায় প্রায় আট লাখ টন খাদ্যঘাটতি সৃষ্টি হয়; এমনকি সুন্দরবন অঞ্চলে বাংলার ২৬৫টি বাঘের আশ্রয় বিপন্ন হয়ে যায়। আইলার প্রভাবে নিঝুম দ্বীপ এলাকার সব পুকুরের পানিও লবণাক্ত হয়ে পড়েছিল।[৩৪৯]

According to the Forest Department, 3,500 ha of coastal forest, 502 miles of strip plantations and 3.1 million nursery seedlings were affected in the coastal areas. The estimated value of damage, including affected infrastructure, is BDT 100 million (US$ 1.4 million). In addition, the FD estimated the damage to areas under social forestry programs at BDT 120 million (US$ 1.7 million). The physical damage includes 3362 miles of strip plantation, 78 ha of char land plantation and nursery seedlings. The severe ecosystem disruption included uprooted, broken and twisted plants, and burnt foliage." বিস্তারিত দেখুন, A Report Prepared by the Government of Bangladesh Assisted by the International Development Community with Financial Support from the European Commission, Cyclone Sidr in Bangladesh: Damage, Loss and Need Assesment For Disaster Recovery and Reconstruction, April 2008 P. 20.

৩৪৮. দুর্যোগকোষ, পূর্বোক্ত, ২১৫।

৩৪৯. ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল, আইলা, কালের কণ্ঠ, ৩ ডিসেম্বর, ২০২১।

চিত্র-১১ (ক): আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের লোকালয় (সূত্র: খোলা কাগজ, মে, ২০০৯)

চিত্র-১১ (খ): আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের লোকালয় সূত্র: ভয়েস অব সাতক্ষীরা

চিত্র-১১ (গ): আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরার মুন্সীগঞ্জ (সংগ্রহ: স্থানীয় বাসিন্দা আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল)

চিত্র-১১ (ঘ): ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন (সূত্র: কলকাতা ট্রিবিউন)

বুলবুল: ঘূর্ণিঝড় বুলবুল তার উৎপত্তি থেকে শুরু করে বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানার আগ পর্যন্ত বেশ কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছে। ২৪ অক্টোবর ২০১৯ ফিলিপাইন সাগরে ক্রান্তীয় বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় একটি ঝড় 'মত্মা' সৃষ্টি হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে (৩০ অক্টোবর ২০১৯) সেটি দক্ষিণ চীন সাগরে এসে উপস্থিত হয়। এই সময় 'মত্মা'র কারণে মধ্য ফিলিপাইনে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং তার জন্য সেখানে বন্যাও হয়। এরপর 'মত্মা' পশ্চিম দিকে সরে এসে ভিয়েতনামের উপকূলে আছড়ে পড়ে। এই সময় সেখানে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১১২ কিলোমিটারের মতো ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ২০০ মিলিমিটার। স্বাভাবিক নিয়মে ঝড়টি পশ্চিম দিকে স্থলভূমিতে অগ্রসর হওয়ার পরেই তার গতিবেগ কমে আসতে থাকে। কারণ ভূপৃষ্ঠ যতই উষ্ণ হোক-সেখান থেকে কোনো ঝড় শক্তিশালী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জলীয়বাষ্প পায় না। ধারণা করা হয়েছিল যে ঝড়টি সেখানে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঝড়টি 'ভূতুড়ে ঝড়' হিসেবে থেকেই যায় ও হঠাৎ করে আরো পশ্চিমে-ব্যাংককের ওপরে ঘন মেঘ ও জলীয় বাষ্প তৈরিসহ সেখানে বৃষ্টিপাত শুরু হলে বোঝা যায় যে, ঝড়টি শেষ হয়ে যায়নি। এরপর এই ঝড় ২ নভেম্বর ২০১৯ আন্দামান সাগরের দিকে সরে যায়। আন্দামান সাগরে এই সময় পানির তাপমাত্রা ছিল ৩০ সেন্টিগ্রেডের ওপর। কাজেই স্তিমিত ঝড় নতুন করে আবার তার রসদ অর্থাৎ প্রচুর জলীয়বাষ্প পেয়ে বৃহস্পতিবারেই (৭ নভেম্বর ২০১৯) ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে থাকে ও বঙ্গোপসাগরে চলে আসে। এই সময় এর নাম দেওয়া হয় 'বুলবুল'। সাফির-সিম্পসন স্কেল অনুযায়ী তখন এর ক্যাটাগরি নম্বর হয় ২। এরপর 'বুলবুল' পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উপকূলের দিকে ধেয়ে আসতে থাকে এবং আসার পথেই তার শক্তি হারিয়ে আবার ক্যাটাগরি নম্বর ১-এ পরিণত হয়। শনিবার (৯ নভেম্বর ২০১৯) সন্ধ্যার পরে 'বুলবুল' পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন সন্নিহিত এলাকা বকখালী, ফ্রেজারগঞ্জ ও সাগরদ্বীপে আছড়ে পড়ে বাংলাদেশের সুন্দরবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।[৩৫০] খুলনা জেলা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবহাওয়াবিদ আমিরুল আজাদ বলেন, শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল বাংলাদেশের সুন্দরবন উপকূলে প্রথম আঘাত হানে। রাত পৌঁনে ১২টার দিকে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় অবস্থান করছিল। এটি আরও উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে এবং পরবর্তীতে দুর্বল হয়ে শনিবার মধ্য রাত নাগাদ খুলনার সুন্দরবনের পাশ দিয়ে উপকূল অতিক্রম করে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) দুবলারচর ভিএইচএফ স্টেশনের অপারেটর মো. কাশেম জানান, বুলবুলের আঘাতের সঙ্গে বাড়ে ৪ থেকে ৫ ফুট পানির উচ্চতা। ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের অগ্রবর্তী অংশ সুন্দরবনের বঙ্গবন্ধু আইল্যাণ্ড, হিরণ পয়েন্ট, দুবলারচর, মেহের আলীর চর, অফিসকিল্লা, মাঝেরচর, আলোরকোল, মরণেরচরে আছড়ে পড়ে।

৩৫০. কালের কণ্ঠ, বুলবুলে আইলার স্মৃতি: দেয়াল হিসেবে দাঁড়াবে সুন্দরবন, ৯ নভেম্বর ২০১৯; সানজানা চৌধুরী, ঘূর্ণিঝড় বুলবুল: শক্তিশালী হয়ে ধেয়ে আসছে বাংলাদেশের দিকে, বিবিসি বাংলা, ঢাকা, ৮ নভেম্বর ২০১৯, https://www.bbc.com/bengali/news-50350021

২০১৯ সালের ৯ই নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল। এটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভূমিভাগ অতিক্রম করে আন্দামান সাগরে পূনর্জন্ম নেওয়া এখন পর্যন্ত চতুর্থ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় যার বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৫৫ কিলোমিটার। ধেয়ে আসার ক্ষেত্রে সুন্দরবনের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং গতি হ্রাস পেয়ে ঘণ্টায় ৭০-৮০ কিলোমিটারে গতিতে আঘাত হানে।[৩৫১] সাতক্ষীরা দিয়ে প্রবেশ করে ক্রমশ এটি দূর্বল হতে থাকে। এটি প্রথমে বাংলাদেশ সংলগ্ন সাতক্ষীরা জেলায় আঘাত হানে। এরপর খুলনা ও বাগেরহাট জেলার উপর দিয়ে যায়। কিন্তু খুবই ক্ষিপ্ত ও প্রচণ্ড শক্তিধর এই ঘূর্ণিঝড়ে জনপদে সেরকম আঘাত আসেনি।[৩৫২] সুন্দরবনের বাধার কারণে বাতাসের গতি দাড়াঁয় ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারের কম। সেই গতিবেগ পরবর্তীতে বন পার হয়ে লোকালয়ে যেতে যেতে শক্তি হারিয়ে দমকা হাওয়ায় রূপ নেয়। ২৬ জনের প্রাণহানির পাশাপাশি বনবিভাগের তথ্যানুযায়ী এই ঝড়ে ৪৫৮৯টি (পূর্বাঞ্চলে ৪০০২ এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৫৮৭) গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৬২.৫৮ লক্ষ।[৩৫৩] "Cyclone Bulbul came in such a ferocious form; fears of loss of lives were surely be big in size without the Sundarbans," a forest officer states.[৩৫৪] আড়পাঙ্গাসিয়া ও শিবসা নদীর তীরবর্তী বৃক্ষসমূহ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩৫৫] বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর এবং India Meteorological Department (IMD)-এর মতে এই ঝড়ে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ব্যূহ হিসেবে ভূমিকা রাখার কারণে প্রায় ২ মিলিয়ন উপকুলবাসী মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।[৩৫৬]

> *সাফির-সিম্পসন স্কেলে এই ঘূর্ণিঝড় বুলবুল ক্যাটাগরি নম্বর ১ হলেও তা সুন্দরবনের সঙ্গে বাধা না পেলে তা থেকে অবশ্যই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক গুণ বেশিই হতো। কাজেই সেই হিসেবে বলা যায় যে বরাবরের মতো এবারও সুন্দরবন আমাদের রক্ষা করল।*[৩৫৭]

---

৩৫১. Joydeep Gupta, Jayanta Basu, and Zobaidur Rahman Soeb, 'Bangladesh: Sundarban Mangroves Save Bengal from Cyclone Bulbul' India Climate Dialogue, India, 13 November 2019;

৩৫২. দুর্বল হয়ে সুন্দরবনে আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল', বিবিসি বাংলা, প্রকাশ: ১০ নভেম্বর ২০১৯।

৩৫৩. Mohammed Norul Alam Raju and Faima Rahman, 'Why Saving the Sundarban is So Urgent', The Statesman, January 2, 2020.

৩৫৪. Dr, Ranjan Roy, 'Protecting Sundarbans, Safeguarding Bangladesh', The Daily Sun, 13 November 2019.

৩৫৫. Dipankar Roy, Cyclone Bulbul: 4,500 trees in Sundarbans damaged, The Daily Star, 17 November, 2019, Dhaka.

৩৫৬. Joydeep Gupta, Jayanta Basu, Zobaidur Rahman Soeb, Sundarbans mangroves save Bengal from Cyclone Bulbul, ibid.

৩৫৭. বিধান চন্দ্র দাস, ঘূর্ণিঝড় বুলবুল ও সুন্দরবনের জৈবঢাল, ১২ নভেম্বর, ২০১৯।

বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে ভারত বাংলাদেশকে রক্ষায় সুন্দরবনের ক্ষয়ক্ষতি কতটা হয়েছে তার উত্তরে কলকাতার একটি পত্রিকায় ২০ নভেম্বর ২০২০ সালে প্রকাশিত হয় যে-

ঘূর্ণিঝড় বুলবুল থেকে কলকাতাকে বাঁচাতে কতটা বলিদান দিতে হল সুন্দরবনকে?-

৯ নভেম্বর ঘন্টায় ১২০ কিলোমিটার গতিবেগে প্রথমে ভারতে, পরে বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় আঘাত করে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল। সুন্দরবনে আঘাত করার কারণে ঝড়টির গতি কমে যায় এবং লোকালয়ের ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হয়। এদিকে লোকালয় বাঁচাতে গিয়ে কতটা ক্ষতি হল সুন্দরবনের? বুলবুলের জেরে ২৩ হাজার ৮১১ কোটি টাকার ক্ষতির পরিমাণ ধার্য করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে বুলবুলের জেরে পরিবেশের যা ক্ষতি হয়েছে তার কোনও হিসাব করা যাবে না। রাজ্যের এক সরকারি আধিকারিক জানান, রাজ্যের মোট ক্ষয়ক্ষতির ৭০ শতাংশই হয়েছে সুন্দরবনে। সাগর, ঘোড়ামারা, মৌসুনি দ্বীপ কয়েক বছর ধরেই জলের তলায় চলে যাচ্ছিল। তবে এই ঘূর্ণিঝড়ের জেরে সেই প্রক্রিয়া আরও দ্রুত গতিতে হতে শুরু করে দিয়েছে।

চিত্র-১২ (ক): ঘূর্ণিঝড় বুলবুলে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের পূর্বাংশ। ছবি: দি ডেইলি স্টার, ১৭ নভেম্বর ২০১৯

চট্টগ্রামের স্থানীয় লেখকের ভাষায়:

"সুন্দরবন দুর্যোগ থেকে মানুষের ধ্বংস রুখে দেয়, তার বড় প্রমাণ বুলবুল। গত ৯ নভেম্বর রাতে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের হাত থেকে সুন্দরবন যেভাবে উপকূলকে রক্ষা করেছে, তাতে এই বনাঞ্চল টিকিয়ে রাখাটা কতটা জরুরি- তাই যেন বলে গেছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল। সুন্দরবনে ঝড়ের তীব্রতা ঠেকাতে সাহসী হয়ে উঠেছিল তরুদল। বর্মের মতো প্রাচীর হয়ে বুক চিতিয়ে ছিল বৃক্ষরাজি। একেকটি দৃঢ়

ঋজু স্তম্ভের মতো অপ্রতিরোধ্য হয়েছিল এই সপ্রাণ সবুজ। সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলভাগকে ঘূর্ণিঝড়ের দুর্যোগের সময় প্রাকৃতিক-দেয়াল হয়ে বন্যার পানি তথা জলোচ্ছ্বাস ও দমকা হাওয়ার মতো প্রকোপ থেকে রক্ষা করে।”[৩৫৮]

ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের তাণ্ডব থেকে লোকালয়কে রক্ষা করতে গিয়ে সুন্দরবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন অধিদপ্তরের খুলনা অঞ্চলের বন সংরক্ষক মোঃ মঈনুদ্দিনের তথ্যমতে-

> ”আমরা দেখতে পেয়েছি, ঝড়ে ৪৫৮৯টি গাছ উপড়ে পড়েছে। সুন্দরবনের দুইটি বিভাগের মধ্যে সবচেয় বেশি ক্ষতি হয়েছে সুন্দরবনের পশ্চিম বিভাগে। তবে কোন বন্য প্রাণী মারা যাওয়ার তথ্য আমরা পাইনি।”

বনের পশ্চিম অংশে ক্ষতিগ্রস্ত গাছের মধ্যে রয়েছে গেওয়া, গড়ান, কেওড়া ইত্যাদি গাছ, যেগুলো নদী বা খালের পাড়ে হয়ে থাকে। আর পূর্ব অংশের ক্ষতিগ্রস্ত গাছের মধ্যে আছে রেইনট্রি, বাবলা, মেহগনি, অর্জুন ইত্যাদি গাছ। আড়পাঙ্গাশিয়া ও শিবসা নদীর দুই পাড়ের গাছ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে বড় জলোচ্ছ্বাস না হওয়ায় বন্যপ্রাণীর ক্ষতি হয়নি। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গাছের আর্থিক মূল্য ধরা হয়েছে ৫০ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। এছাড়া বিভিন্ন ফাঁড়ি ও স্টেশনের জেটি, ওয়াচ টাওয়ারসহ অবকাঠামোর অনেক ক্ষতি হয়।[৩৫৯]

---

৩৫৮. পুলক বড়ুয়া, প্রাকৃতিক ঢাল সুন্দরবন, কবি ও লেখক, চট্টগ্রাম, প্রকাশিতঃ নভেম্বর ১৩, ২০১৯।

৩৫৯. বিবিসি বাংলা, ঘূর্ণিঝড় বুলবুলে সুন্দরবনে উপড়ে পড়েছে সাড়ে চার হাজার গাছ November 16, 2019, https://eisamay.com/west-bengal-news/24pargana-news/from-huge-effect-of-cyclone-bulbul-mangrove-forest-saves-sundarban-area/articleshow/71994124.cms

চিত্র-১২ (খ): ঘূর্ণিঝড় বুলবুলে ক্ষতিগ্রস্ত জনজীবন (সংগ্রহ: স্থানীয় বাসিন্দা আরিফ ইসতিয়াক পাভেল)

চিত্র-১২ (গ): ঘূর্ণিঝড় বুলবুলে ঘর-বাড়ি

ঘূর্ণিঝড় আম্পানঃ

চিত্র-১৩ (ক): ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন (দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ মে ২০২০)

২০২০ সালের ২০ মে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় আম্পান আঘাত হানে। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২২০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যাওয়া এই ঘূর্ণিঝড়ে স্বাভাবিকভাবেই দেশ ও জনগণের রক্ষাকর্তা হিসেবে পালন করে সুন্দরবন। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় আম্পান যখন বাংলাদেশ ও ভারতের উপকূলবর্তী এলাকা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে ছিল তখন এর গতিবেগ ছিলো ঘণ্টায় ২২০ কিলোমিটার। কিন্তু এটি যখন সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে বসতি এলাকায় প্রবেশ করে তখন এর গতিবেগ ১৫১ কিলোমিটারে হ্রাস পায়। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের মতে, ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা অনুযায়ী ১৫ থেকে ১৮ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সুন্দরবনের ভূমিকায় এটি ১০ থেকে ১২ ফুটে নেমে আসে।[৩৬০] খুলনা বন বিভাগীয় কর্মকর্তা মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেনের ভাষায়- “সুন্দরবন আম্পানের বিশাল ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছে। এই বন বরাবরের মতই প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও এর প্রভাব থেকে রক্ষা করে চলেছে।”[৩৬১] ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন একটি ঢাল হিসেবে কাজ করে। বাতাসের গতিবেগ অনেকাংশে কমিয়ে দেয়ার পাশাপাশি ঝড় এর ভিতর দিয়ে যাওয়ার ফলে এই বন জলোচ্ছ্বাস এবং সমুদ্রের ঢেউকে ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলে।[৩৬২] একারণে ঝড়ে যে পরিমাণে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেই ক্ষতি থেকে উপকূলের মানুষ ও সম্পদ রক্ষা পায়।[৩৬৩] ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী গঠিত ক্ষতি নির্ধারণ কমিটির প্রতিবেদনে বনবিভাগের তথ্যানুযায়ী এই ঝড়ে প্রায় ১২,০০০ গাছ ভেঙে পড়ে যেটির আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২,২০,০০০ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ

৩৬০. Iftekhar Mahmud, Sundarbans curbed Amphan’s intensity, saved Dhaka, 22 May 2020, Dhaka

৩৬১. প্রাকৃতিক দেয়াল সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হবে, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ মে ২০২০, ঢাকা।

৩৬২. ঘূর্ণিঝড়ের বিরুদ্ধে পুনরায় রক্ষাকর্তা সুন্দরবন, যুগান্তর, ২১ মে ২০২০, ঢাকা।

৩৬৩. প্রাকৃতিক দেয়াল সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হবে, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ মে ২০২০, ঢাকা।

আবহাওয়া বিভাগের তথ্যমতে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ২৬টি জেলাকে রক্ষা করেছে সুন্দরবন।[৩৬৪] দুর্যোগ ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি সুন্দরবন না থাকতো তাহলে কলকাতার মত ঠিক একইভাবে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতো। আম্পান আঘাত হানার সময় ঢাকায় বাতাসের গতিবেগ ছিলো ঘণ্টায় ৭২ কিলোমিটার আর কলকাতায় যেখানে ছিল ঘণ্টায় ১১২ কিলোমিটার। সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যদি সুন্দরবন না থাকতো তাহলে ঢাকায় প্রায় ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে ঝড় আঘাত হানতো। ঝড়ে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা ও খুলনা অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতি হয়।[৩৬৫]

চিত্র-১৩ (খ): ঘূর্ণিঝড় আম্পান পরবর্তী সুন্দরবন। ছবি: প্রথম আলো ২২ মে ২০২০

চিত্র-১৩ (গ): ঘূর্ণিঝড় আম্পান পরবর্তী সুন্দরবন। (ছবি: স্থানীয় বাসিন্দা আরিফ ইসতিয়াক পাভেল)

৩৬৪. Iqbal Hossain, ‘Sundarbans mangrove forest protects Bangladesh from the worse of Cyclone Amphan’, Forests, 2020, Lifegate. Italy.

৩৬৫. Iftekhar Mahmud, Sundarbans curbed Amphan’s intensity, saved Dhaka, 22 May 2020, Dhaka.

চিত্র-১৩ (ঘ): ঘূর্ণিঝড় আম্পান পরবর্তী সুন্দরবন। (ছবি: স্থানীয় বাসিন্দা আরিফ ইসতিয়াক পাভেল)

চিত্র-১৩ (ঙ): ঘূর্ণিঝড় আম্পান পরবর্তী সুন্দরবন। (ছবি: স্থানীয় বাসিন্দা আরিফ ইসতিয়াক পাভেল)

আম্পানের আঘাতে সুন্দরবনে গাছ ভেঙ্গেছে ১২ হাজার ৩৫৮টি। আর বন বিভাগের অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২ কোটি ১৫ লাখ টাকার। ঘূর্ণিঝড় আম্পানের আঘাতের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে বন বিভাগের গঠিত ৪টি কমিটির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আম্পানের আঘাতে পশ্চিম সুন্দরবনের ২টি রেঞ্জ এলাকায় ১২ হাজার ৩৩২টি গাছ ভেঙে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত এ সব গাছের মধ্যে গরান গাছের সংখ্যা বেশি। যার মূল্য ১০ লাখ ১০ হাজার ৫৬০ টাকা। আর পূর্ব সুন্দরবনের ২টি রেঞ্জ এলাকায় ২৬টি গাছ ভেঙেছে। এ বিভাগের আওতায় জব্দ থাকা বেশ কিছু কাঠ জোয়ারের পানিতে ভেসে গেছে। এতে আর্থিক ক্ষতি ৭ লাখ ৬ হাজার ৮৩০ টাকা। পাশাপাশি পূর্ব বনবিভাগে ১ কোটি ৬০ লাখ টাকার অবকাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া স্থাপনা, জেটি, উডেন ট্রেইল, ওয়াচ টাওয়ার ও অবকাঠামোর ৪৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে বাঘ, হরিণসহ অন্য কোনও বন্যপ্রাণীর ক্ষতি হয়নি। পরিবেশবাদীদের ধারণা, এসব প্রাণী প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতায় ঝড়ের বিষয়টি বুঝতে পেরে নিজেদের মতো আত্মরক্ষা করেছে।

সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. বশিরুল আল মামুন *বাংলানিউজকে* বলেন, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের আঘাতে সুন্দরবনের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বর্তমানে সুন্দরবন থেকে সব ধরনের গাছ কাটা নিষিদ্ধ রয়েছে। যে কারণে আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেগুলো ওভাবেই থাকবে, কোনো গাছ কাটা হবে না। বন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।[৩৬৬]

সারণি-৩ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংক্রান্ত তথ

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
BANGLADESH METEOROLOGICAL DEPARTMENT
METEOROLOGICAL COMPLEX,
E-24 AGARGAON, DHAKA-1207.

Subject: List of Major Cyclonic Storms from 1960 to 2017.

Date of Occurrence	Nature of Phenomenon	Landfall Area	Maximum Wind Speed in km/hr.	Direction of the Max. Wind Speed	Tidal Surge Height in ft.	Central Pressure (mbs)
1	2	3	4	5	6	7
11.10.60	Severe Cyclonic Storm	Chittagong	160	South-East	15	-
31.10.60	Severe Cyclonic Storm	Chittagong	193	South-East	20	-
09.05.61	Severe Cyclonic Storm	Chittagong	160	South-East	8-10	-
30.05.61	Severe Cyclonic Storm	Chittagong (Near Feni)	160	South-South-East	6-15	-
28.05.63	Severe Cyclonic Storm	Chittagong- Cox's Bazar	209	South-East	8-12	-
11.05.65	Severe Cyclonic Storm	Chittagong-Barisal Coast	160	South-South-East	12	-
05.11.65	Severe Cyclonic Storm	Chittagong	160	South-East	8-12	-
15.12.65	Severe Cyclonic Storm	Cox's Bazar	210	South-East	8-10	-
01.11.66	Severe Cyclonic Storm	Chittagong	120	South-East	20-22	-
23.10.70	Severe Cyclonic Storm of Hurricane intensity	Khulna-Barisal	163	South-West	-	-
12.11.70	Severe Cyclonic Storm with a core of hurricane wind	Chittagong	224	South-East	10-33	-
28.11.74	Severe Cyclonic Storm	Cox's Bazar	163	South-East	9-17	-
10.12.81	Cyclonic Storm	Khulna	120	South-West	7-15	989
15.10.83	Cyclonic Storm	Chittagong	93	South-East	-	995
09.11.83	Severe Cyclonic Storm	Cox's Bazar	136	South-East	5	986
24.05.85	Severe Cyclonic Storm	Chittagong	154	South-East	15	982
29.11.88	Severe Cyclonic Storm with a core of hurricane wind	Khulna	160	South-West	2-14.5	983
18.12.90	Cyclonic Storm (crossed as a depression)	Cox's Bazar Coast	115	South-East	5-7	995
29.04.91	Severe Cyclonic Storm with a core of hurricane wind	Chittagong	225	South-East	12-22	940
02.05.94	Severe Cyclonic Storm with a core of hurricane wind	Cox's Bazar-Teknaf Coast	220	South-East	5-6	948
25.11.95	Severe Cyclonic Storm	Cox's Bazar	140	South-East	10	998
19.05.97	Severe Cyclonic Storm with a core of hurricane wind	Sitakundu	232	South-East	15	965
27.09.97	Severe Cyclonic Storm with a core of hurricane wind	Sitakundu	150	South-South-East	10-15	-
20.05.98	Severe Cyclonic Storm with core of hurricane winds	Chittagong Coast near Sitakunda	173	South-South-East	3	
28.10.00	Cyclonic Storm	Sundarban Coast near Mongla	83	South-South-West	-	-
12.11.02	Cyclonic Storm	Sundarban Coast near Raimangal River	65-85	South-South-West	5-7	998
19.05.04	Cyclonic Storm	Teknaf-Akyab Coast	65-90	South-East	2-4	990
15.11.07	Severe Cyclonic Storm with core of hurricane winds (SIDR)	Khulna-Barisal Coast near Baleshwar river	223	South-West	15-20	942
25.05.09	Cyclonic Storm (AILA)	West Bengal-Khulna Coast near Sagar Island	70-90	South-South-West	4-6	987

সারণি-৪ পশ্চিমবঙ্গ আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য

সাল	প্রাকৃতিক দূর্যোগ	সাল	প্রাকৃতিক দূর্যোগ	সাল	প্রাকৃতিক দূর্যোগ	সাল	প্রাকৃতিক দূর্যোগ
১৫৮২	ঘূর্ণিঝড়	১৮৬২	ঘূর্ণিঝড়	১৮৯৭	ভূমিকম্প	১৯৪২	দূর্ভিক্ষ
১৬৮৮	ঘূর্ণিঝড়	১৮৬৪	ঘূর্ণিঝড়	১৮৯৮	ঘূর্ণিঝড় (৪ বার)	১৯৪৩	ঘূর্ণিঝড়
১৭০৭	ঘূর্ণিঝড়	১৮৬৫	দূর্ভিক্ষ	১৮৯৯	ঘূর্ণিঝড়	১৯৪৮	ঘূর্ণিঝড়
১৭৩৭	ঘূর্ণিঝড়	১৮৬৭	ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা	১৯০০	বন্যা	১৯৫৬	ঘূর্ণিঝড়
১৭৪২	ঘূর্ণিঝড়	১৮৬৮	বন্যা	১৯০১	ঘূর্ণিঝড় (৪ বার)	১৯৬০	ঘূর্ণিঝড়
১৭৬২	ভূমিকম্প	১৮৬৯	ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা	১৯০৪	ঘূর্ণিঝড় (২ বার)	১৯৬১	ঘূর্ণিঝড়
১৭৭০	দূর্ভিক্ষ	১৮৭১	ঘূর্ণিঝড়	১৯০৭	বন্যা (২ বার)	১৯৬২	ঘূর্ণিঝড়
১৭৯১	দূর্ভিক্ষ	১৮৭৭	ঘূর্ণিঝড়	১৯০৯	ঘূর্ণিঝড়	১৯৬৫	ঘূর্ণিঝড়
১৮২৩	বন্যা	১৮৭৮	ঘূর্ণিঝড়	১৯১৩	ঘূর্ণিঝড় (২বার)	১৯৬৬	বন্যা
১৮৩০	ঘূর্ণিঝড়	১৮৮০	ঘূর্ণিঝড়	১৯১৬	ঘূর্ণিঝড় (২বার)	১৯৬৮	তীব্র ঘূর্ণিঝড়
১৮৩২	ঘূর্ণিঝড়	১৮৮১	ঘূর্ণিঝড়	১৯১৭	ঘূর্ণিঝড়	১৯৭০	ঘূর্ণিঝড়
১৮৩৩	ঘূর্ণিঝড়	১৮৮২	ঘূর্ণিঝড়	১৯১৯	ঘূর্ণিঝড়	১৯৭৩	ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা
১৮৩৪	বন্যা	১৮৮৩	ঘূর্ণিঝড়	১৯২১	দূর্ভিক্ষ	১৯৭৬	বন্যা
১৮৩৯	ঘূর্ণিঝড়	১৮৮৪	ঘূর্ণিঝড়	১৯২২	ঘূর্ণিঝড়	১৯৭৮	বন্যা
১৮৪০	ঘূর্ণিঝড়	১৮৮৫	বন্যা	১৯২৭	ঘূর্ণিঝড়	১৯৮১	ঘূর্ণিঝড়
১৮৪২	ভুমিকম্প	১৮৮৭	ঘূর্ণিঝড় (২ বার)	১৯২৮	ঘূর্ণিঝড়	১৯৮২	ঘূর্ণিঝড়
১৮৪৪	ঘূর্ণিঝড়	১৮৮৮	ঘূর্ণিঝড় (৩ বার)	১৯৩২	তীব্র ঘূর্ণিঝড়	১৯৮৫	ঘূর্ণিঝড়
১৮৪৮	ঘূর্ণিঝড়	১৮৮৯	ঘূর্ণিঝড় (২ বার)	১৯৩৪	তীব্র ঘূর্ণিঝড়	১৯৮৮	তীব্র ঘূর্ণিঝড়
১৮৫০	ঘূর্ণিঝড়	১৮৯০	বন্যা	১৯৩৫	তীব্র ঘূর্ণিঝড়	১৯৯১	ঘূর্ণিঝড়
১৮৫২	ঘূর্ণিঝড়	১৮৯৩	ঘূর্ণিঝড়	১৯৩৬	তীব্র ঘূর্ণিঝড়	১৯৯৪	ঘূর্ণিঝড়
১৮৫৬	বন্যা	১৮৯৪	ঘূর্ণিঝড়	১৯৩৭	তীব্র ঘূর্ণিঝড়		
১৮৫৮	ঘূর্ণিঝড়	১৮৯৫	ভুমিকম্প	১৯৪০	ঘূর্ণিঝড়		
১৮৫৯	ঘূর্ণিঝড় (২ বার)	১৮৯৬	ঘূর্ণিঝড় (৫ বার)	১৯৪১	ঘূর্ণিঝড়		

Source: Dr. Sujit Mandal, - International Journal of Research and Analytical Reviews Research Paper Natural Calamity - Storm in the Sundarbans: A Geo-Historical Study, VOLUME 5, ISSUE 2, India, 2018.

২.৮ সুন্দরবনের অস্তিত্ব বিপর্যয়:

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, উপকূলীয় ক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতি সুন্দরবনের গাছ ও প্রাণীদের জন্য আরো ধ্বংসরূপ হয়ে উঠেছে। ফলে বাস্তুসংস্থান, ফসল, বন, মৎসসম্পদ ও পশুসম্পদ হুমকির সম্মুখীন। ২০০৭ সালে জলবায়ু পরিবর্তন ও ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়, একবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হয়ত সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ৪৫ সে.মি.। এতে সুন্দরবনের প্রায় ৭৫% ধ্বংস হতে পারে। সুন্দরবনের বিভিন্ন সম্পদ বিশেষ করে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে।[৩৬৭] প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে লোকালয়কে রক্ষা করা হলেও সুন্দরবন ধীরে ধীরে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে, সাথে লোকালয়ও। সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়-

বিপজ্জনক অবস্থায় কলকাতা:

“এদিকে সুন্দরবনের ক্ষতির কারণে পরিবেশের দিক দিয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় চলে গিয়েছে কলকাতা। এর আগে ম্যানগ্রোভে ঘেরা সুন্দরবন ভয়ঙ্কর আইলা থেকে রক্ষা করেছিল কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে। এবারও ঘূর্ণিঝড় বুলবুলকে প্রতিহত করে কলকাতা রক্ষা করে সুন্দরবনের সেই ম্যানগ্রোভ বন। দুর্যোগ থেকে বাঁচাতে গাছের বিকল্প নেই। শুধু ঝড় নয়, বন্যা-ভূমিকম্প-দূষণ প্রতিরোধ করতেও গাছের বিকল্প আর কিছু নেই। তবে বুলবুলের জেরে সুন্দরবনের পূর্ব দিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত। যার হিসাব করা সম্ভব না। এবং এর জেরে আগামী দিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে কলকাতার বাঁচার সম্ভাবনা আরও একটু ক্ষীণ হল। কঠিন, দৃঢ় শিকড়ের ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছগুলি সুন্দরবন দ্বীপকে ঘিরে রয়েছে। তাই শক্তিশালী বুলবুলের যতটা তাণ্ডব দেখানোর ক্ষমতা ছিল, তা পুরোটা দেখতে হয়নি কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার মানুষকে। তবে কঠিন এই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ম্যানগ্রোভ জঙ্গল কি ভবিষ্যতেও পারবে আমাদের রক্ষা করতে? শক্তি বেড়েছে ঘূর্ণিঝড়গুলির বিজ্ঞানীদের মতে গত কয়েক দশকে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়গুলি তাদের শক্তি ২৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। এদিকে পরিবেশে বদলের জেরে নতুন আরও ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তবে বিজ্ঞানীদের সতর্কতা বাণী, যদি না আমরা সুন্দরবনকে রক্ষা করতে পারি তবে ভবিষ্যতে আমাদের অনেক কষ্ট পোহাতে হবে”।[৩৬৮]

২.৯ ঘূর্ণিঝড়ের স্মৃতিচারণমূলক ঘটনা:

ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবনের অধিবাসীদের জীবনে কি দূর্বিষহ বিপর্যয় নেমে আসে সে সম্পর্কে শিবশংকর মিত্রের একটি স্মৃতিচারণমূলক ঘটনা উল্লেখ করা হলো–

৩৬৭. Mohammed M. Rahman, M. Motiur Rahman, and Kazi S. Islam, *The causes of deterioration of Sundarban mangrove forest ecosystem of Bangladesh: conservation and sustainable management issues,* AACL BIOFLUX Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation International Journal of the Bioflux Society, 2010; Aminur Rahman, *Climate Change, Global Commons and Corruption in the context of Sundarban Mangrove Forest in Bangladesh*, Department of Environment, GOB, Climate Change and Bangladesh, 2007.

৩৬৮. https://bengali.oneindia.com/news/west-bengal/what-was-the-loss-incurred-by-sunderban-due-to-bulbul/articlecontent-pf69487-066461.htm

ফতিমা বলল,– জানো, এপাড়ার সবাই চলে গেছে। সবাই কাছারি বাড়ি গেছে। ওরা বলল, পুবে-হাওয়া দিয়েছে, লক্ষণ ভালো না। যে যার ঘর ছেড়ে কাছারিতে আশ্রয় নিয়েছে। আমাকেও ডাকতে এসেছিল। কিন্তু যাইনি। তুমি এখন কি করবে?

আর্জান চিন্তান্বিত হয়ে বলল,– আগে খেতে দাও তো! তারপর দেখি কি করা যায়। আর্জান তাড়াতাড়ি কোনমতে খেয়ে নেয়। খাবে কি! বাইরের বাতাসের ঝাপটা আর শোঁশোঁ শুনবার জন্য কোন পেতেই ছিল। ঘর ছেড়ে কি শেষ অবধি যেতেই হবে! মুখ ধুতে দাওয়ার এসে হাওয়ার গতির সঠিক বুঝে নিতে চাইল। এসে দেখে, জলে জলাকার। মেঘের ঝিলিকে পরিষ্কার দেখতে পায়। কই, যখন সে আসে তখন তো এতো পানি ছিল না! দাওয়ার খুঁটি এক হাতে ধরে উঠানে নেমে পড়ল। স্থির জল নয় তো! কেমন যেন জলের টান পায়ে অনুভব করে। উন্মনা হয়ে ওঠে আর্জান। তাড়াতাড়ি এক-কোশ পানি তুলে মুখে দেয়। দিতেই পাগল হয়ে উঠল যেন–'ওরে নোনাপানি! শীগ্‌গীর কর! যেতে হবে, এক্ষুনি যেতে হবে। ভেড়ি ভেঙে গেছে। শীগ্‌গরি কর!'

আর্জান হন্যের মত জল ভেঙে ছুটে গেল পাশের বাড়ির দিকে। ভাগ্যি, আসবার সময় সেখানে 'খোল্‌-ভেড়ি'তে একখান্‌ ছোট্ট ডিঙি দেখে এসেছিল। কোনমতে টানতে টানতে ডিঙি দাওয়ার লাগিয়েই বলল–নাও, তাড়াতাড়ি করো। যা তুলবার তোলো! তোলো!

–আমার মরণ! আল্লা!–বলেই ফতিমা যা পারে তাই টেনে হিঁচড়ে ডিঙিতে তুলল। হাঁড়ি, কলসি, কাঠের বাক্স, সবই ধরাধরি করে তুলে ফেলল। তুফান তার বন্দুক আর ক্যাপের বাক্স দুহাতে দুটো চেপে ধরে আতঙ্কে কেবলই বলে–কোথা যাবো? কোথা যাবো? ফতিমা যেন কিছুই রেখে যেতে চায় না। ছোট্ট ডিঙিতে আর কত ধরবে! তবুও হাঁড়ি-কলসি যেন কিছুই বাদ দিতে চায় না। দুটি মুরগি ছিল। তাদের পা বেঁধে ডিঙির খোলে ফেলে দিল। –বলেই নিজের কথায় নিজে ভয় পেয়ে তুফানকে দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে। আর্জান বলল,– খোলে বসো,–বসো এবার। দেখো যেন, তুফোকে বুকে জড়িয়ে রেখো। গরম করে রেখো ওকে। বড্ড পানি পড়ছে। দেখছো তো দমকা হাওয়া! ফতিমা ডিঙির মাঝখানে; আর আর্জান গলুইতে বসে লগি মেরে ডিঙি নিয়ে চলেছে। খুব সাবধানে যেতে হবে। চারদিকে জলে জলাকার হয়ে গেছে। বিলের জল আর নদীর জল প্রায় একাকার। ভুলক্রমে যদি নদীর জলেই টানের মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে স্রোতে কোথায় নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

নদী আর ভেড়ির মাঝে লম্বা লম্বা কেওড়া গাছের সারি। মেঘের ঝিলিকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আর্জান এগিয়ে চলে। ভেড়ি থেকে পঞ্চাশ-ষাট হাত ভিতরে সর্দার-পড়ার সার-বাঁধা ঘরগুলির মাথা জলের উপর ভেসে আছে। কেওড়া গাছ আর ঘরের মাথার মাঝ দিয়ে লগি মেরে মেরে আর্জান ডিঙি ঠেলতে থাকি। দমকা হাওয়ার দাপটে ডিঙি যেন এগুতে চায় না। প্রায় গলা-জল। 'না! হলো না!'–বলেই আর্জান জলে নামল। জল ভেঙে ভেঙে ঠেলে নিয়ে চলল ডিঙি।

তুফান মাকে আপ্রাণে জড়িয়ে ধরেছে। একটুও যাতে বৃষ্টি ওর গায়ে না লাগে তার জন্য ফতিমাও কয়েকখানা কাঁথা মুড়ি দিয়ে তুফানকে লেপটে ধরেছে বুকের মধ্যে। কাঁথার ফাঁকে ফতিমা কিছুই দেখতে পায় না। দেখবেই বা কি? দমকা হাওয়ায় কেওড়া গাছের ডাল মড়্‌মড়্‌ করে ওঠে। হঠাৎ আর্জানের ভয়ার্ত চিৎকার ফতিমার কানে আসে–'গেলাম রে! জন্মের মত গেলাম।' আচমকা ডিঙিখানাও দুলে ওঠে। মুখের কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে ফতিমা দেখে, –কোথাও আর্জান নেই! কোনও আওয়াজও শোনা যায় না। ফতিমা ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে, কোথায় গেলে! কোথায় গেলে!' ফতিমা দাঁড়াতে চায়, তুফান চিৎকার করে মায়ের পা জড়িয়ে ধরে। কোনও চিহ্ন নেই। ঝিলিকের আলোকে কর্দমাক্ত জলের তোলপাড় ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। মায়ের ও সন্তানের চিৎকার মেঘগর্জনে ডুবে যায়। দুজনে যেন ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে, ডিঙিও যেন দুলে-দুলে ডুবে যায়-যায়। দমকা হাওয়া ডিঙিকে বুঝি এবার ঠেলে নিয়ে যাবে। তুফানকে কোলে বসিয়ে রেখে ফতিমা চিৎকার করতে করতে লগি টেনে ধরল। মড়্‌মড়্‌ শব্দে কেওড়া গাছের একখানা ডাল ভেঙে পড়ল। ফতিমা লগি মারবে কি করে? দমকা হাওয়া তাকে ডিঙির উপর দাঁড়াতে দেয় না।

তুফো এবার বা'জান ভুলে 'আম্মাা, আম্মা' বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মা-ও বুঝি বা'জানের মত চলে যাবে! খড়ের বোঝা। কে যেন তার গরুর জন্য যত্ন করে রেখেছিল, তাই বানের জলে ভেসে আসছে। ফতিমা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। যেমন- তেমন ভাবে একবার এদিকে একবার ওদিক টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

না! এমন করে হবে না! সামনের কেওড়া গাছটার দিকে চলল। গাছ যখন ওখানে আছে, নিশ্চত ডুব-জল হবে না। গুড়ির সঙ্গে গলুইয়ের দড়ি বেঁধে ফেলল। গাছের ওপাশেই নদী। কয়রা নদী। দড়ি ছিঁড়ে একবার ডিঙি নদীর জলে গেলে, কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই! ভাটির দেশের মেয়ে তা জানে। জোর করেই বাঁধল। জলরাশির মাঝে আর্জানকে সে খুঁজে বের করবেই! ডিঙি হয়ত বাঁধন মানবে,... কিন্তু তুফো![৩৬৯]

২.১০ উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ম্যানগ্রোভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে কাজ করে, উদাহরণস্বরূপ, সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চলকে সুনামি এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার জন্য ডাইক সিস্টেম হিসেবে কাজ করে। তাই সুন্দরবনের সক্ষমতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করা একটি জরুরি বিষয়। সুন্দরবন যে উপকূলীয় মানুষ ও সম্পদের বেঁচে থাকার একটি অপরিহার্য অংশ তার জোরালো প্রমাণ রয়েছে। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব কমিয়ে আনা এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য কঠোর ম্যানগ্রোভ শাসন ব্যবস্থা। এই বনের মোট

---

৩৬৯. শিবশংকর মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১-৩৫২।

এলাকার প্রায় ৮.৩% ব্যক্তি এবং ব্যবসার দ্বারা বন উজাড় করা হয়েছিল। চিংড়ি ও লবণের খামার সম্প্রসারণের কারণে চকরিয়া সুন্দরবনের অধিকাংশ বন উজাড় হয়ে গেছে। সুন্দরবন রক্ষায় বন উজাড় বন্ধ করতে হবে।

ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনায়নের পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকেরা। একই সঙ্গে সুন্দরবন-সংলগ্ন ১০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে চিংড়ি চাষ এবং সুন্দরবন থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ বন্ধ করতে বলেছেন তাঁরা।

গবেষকেরা বলেন, চিংড়ি ঘেরগুলোর কারণে সুন্দরবন-সংলগ্ন নদীতে লবণাক্ততা বাড়ছে। লবণাক্ততার কারণে নদীতে জলজ প্রাণীর পরিমাণ কমে যাচ্ছে। চিংড়ি ঘেরগুলোর জায়গায় ম্যানগ্রোভ করা হলে এটি সবুজ বেষ্টনী হিসেবে কাজ করবে। এতে সুন্দরবনের সম্পত্তিও রক্ষা পাবে।

উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে রক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ/বেড়িবাঁধ এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি অক্ষত ম্যানগ্রোভ বন স্থাপন করা। একই সাথে, সরকারের উচিত আরও বন ধ্বংস বা অবক্ষয় রোধ করতে প্রাসঙ্গিক আইন প্রয়োগ করা।[৩৭০]

২০০১ সাল থেকে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারি সুন্দরবন দিবস পালন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সহায়তায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন *রূপান্তর*, *পরশ* এবং বাংলাদেশের আরো ৭০টি পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ সম্মেলনে ২০০১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারিকে সুন্দরবন দিবস ঘোষণা করা হয়। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার ভূমিকা ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে শিক্ষার্থী অভিমত- *"তাই দেশের সর্বস্তরের জনগন ও সরকারের সজাগ দৃষ্টি কামনা করছি। সুন্দরবন যেদিন থাকবে না, বাংলাদেশের প্রাণ ও দূর্যোগ সেদিন রুখবে কে? একবার বলে যান।*" সাইক্লোনের ভয়াবহতা থেকে অনেকাংশেই আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে এটি। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকুল ও তৎসংলগ্ন এলাকার মানুষকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা করে চলেছে এটি। অথচ ৬ হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এ বনের অস্তিত্ব ক্রমেই বিপন্ন হচ্ছে। একের পর এক ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঠেকিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে বাচিঁয়ে দিচ্ছে সুন্দরবন। অথচ, ঝড় থেমে গেলেই এই বনকে ধ্বংসের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের কর্মযজ্ঞ চলে।"[৩৭১]

৩৭০. A. H. M. Raihan Sarker, Mohammad Nur Nobi, Eivin Røskaft, David J. Chivers & Ma Suz, Value of the Storm-Protection Function of Sundarban Mangroves in Bangladesh, Journal of Sustainable Development; Vol. 13, No. 3; Canadian Center of Science and Education, 2020.

৩৭১. শিক্ষার্থী অভিমত, নাবিল হাসান, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০ জুলাই ২০২১।

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যাণ্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থী সম্পা ইসলাম ও মোঃ হাসানুর হাবীব এর উপলব্ধি প্রকাশ পায় এভাবে যে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং জাতীয় অর্থনীতিতেও সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটি দেশের বনজ সম্পদের একক বৃহত্তম উৎস। এই বন কাঠের উপর নির্ভরশীল শিল্পে কাঁচামাল জোগান দেয়। এছাড়াও কাঠ, জ্বালানী ও মণ্ডের মত প্রথাগত বনজ সম্পদের পাশাপাশি এ বন থেকে নিয়মিত ব্যাপকভাবে আহরণ করা হয় ঘর ছাওয়ার গোলপাতা, মধু, মৌচাকের মোম, মাছ, কাঁকড়া এবং শামুক-ঝিনুক। বৃক্ষপূর্ণ সুন্দরবনের এই ভূমি একই সাথে প্রয়োজনীয় আবাসস্থল, পুষ্টি উৎপাদক, পানি বিশুদ্ধকারক, পলি সঞ্চয়কারী, ঝড় প্রতিরোধক, উপকূল স্থিতিকারী, শক্তি সম্পদের আধার এবং পর্যটন কেন্দ্র।[৩৭২]

১০ নভেম্বর ২০১৯ সালে বিবিসি-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের ছোবল থেকে উপকূলীয় এলাকা রক্ষায় সুন্দরবন যে ঢাল হিসেবে কাজ করেছে, সেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পরিবেশবিদ ড. একিউএম মাহবুব এর উপলব্ধি- "মনে করেন আপনার বাড়ির সামনে একটা দেয়াল আছে। সেটার কারণে বন্যার পানি, দমকা বাতাস আপনার ঘরে ঢুকতে পারবে না। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের জন্য সুন্দরবন ঠিক সেই দেয়ালের কাজটাই করে।" এই বন না থাকলে উপকূলে বড় ধরণের তাণ্ডব হতে পারত বলে তিনি আশঙ্কা করেন।[৩৭৩]

ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মোকাবিলায় সুন্দরবন সহায়তা করেছে বলেন বাংলাদেশের দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান। সুন্দরবনকে রক্ষায় শিগগিরই ২২টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়নের কথা জানান তিনি। বনে যত্রতত্র গাছ কাটা ঠেকাতে ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বনের নিরাপত্তা বাড়ানো, সেইসঙ্গে বনায়নের জন্য বেশি বেশি গাছ লাগানোর সুপারিশ করবেন তারা। এছাড়া সবুজ উপকূল বেষ্টনী করার বিষয়টিকে তারা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন।[৩৭৪]

ঘূর্ণিঝড় থেকে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস থেকে উপকূলীয় এলাকায় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় সুন্দরবনের ভূমিকা আরও বৃদ্ধি করার জন্য গবেষক দল বেশ কিছু সুপারিশ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ম্যানগ্রোভ বনকে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা। এ দুর্যোগ থেকে রক্ষায় দেশের বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বৃক্ষ বনায়ন করারও পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। কৃষি, নগর উন্নয়ন কিংবা অন্য কোনো কাজের জন্য ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় বন

---

৩৭২. সম্পা ইসলাম ও মোঃ হাসানুর হাবীব, শিক্ষার্থী, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যাণ্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগমাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৭ জুলাই ২০২০

৩৭৩. ঘূর্ণিঝড় বুলবুল: সুন্দরবন যেভাবে উপকূলকে রক্ষা করেছে, তাতে এই বনাঞ্চল টিকিয়ে রাখাটা কত জরুরি, সানজানা চৌধুরী, বিবিসি বাংলা, ঢাকা, ১০ নভেম্বর ২০১৯।

৩৭৪. ঘূর্ণিঝড় বুলবুল: সুন্দরবন যেভাবে উপকূলকে রক্ষা করেছে, তাতে এই বনাঞ্চল টিকিয়ে রাখাটা কত জরুরি, সানজানা চৌধুরী, বিবিসি বাংলা, ঢাকা, ১০ নভেম্বর ২০১৯।

কোনোভাবেই নষ্ট ও ধ্বংস না করার কথা বলেছেন গবেষকেরা। সুন্দরবন সংলগ্ন যেসব এলাকায় চিংড়ি চাষ হচ্ছে তা সরিয়ে নেওয়া। সুন্দরবনের সীমানা থেকে বাইরের দিকে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে যেকোনো ধরনের অবকাঠামোগত স্থাপনা, চিংড়ি ঘের প্রকল্প অনুমোদন না দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে এই গবেষণায়।[৩৭৫]

উপকূলীয় ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রতিনিয়ত সুন্দরবনের মোট এলাকাকে নতুন আকার দিচ্ছে। পূর্ব এবং পশ্চিম অংশের ক্ষয়ের গড় হার যথাক্রমে ১৪ মি./বছর এবং ১৫ মি./বছর। উপকূলীয় ক্ষয় কমানোর জন্য 'নরম' এবং 'কঠিন' কাঠামোগত/ইঞ্জিনিয়ারিং বিকল্পগুলির একটি সমাবেশ প্রয়োজন।

উপকূলীয় সুরক্ষার জন্য ম্যানগ্রোভ বাগানে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোপিত ম্যানগ্রোভ নদী তীর ক্ষয় থেকে রক্ষা করে এবং নদীর ধারের নিকটবর্তী পরিবারগুলিকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে। এই বনকে টেকসই পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুন্দরবন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবন সম্প্রসারণের জন্য ডেল্টা প্ল্যানের তিনটি কৌশল বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজনঃ (ক) একটি বনের সমস্ত স্তরে একই সময়ে বৃক্ষ রোপণ করা (খ) প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলক না হয়ে সহযোগিতামূলক হওয়া এবং (গ) বহুবর্ষজীবী জোয়ারের প্রবাহ রক্ষণাবেক্ষণ।

উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ম্যানগ্রোভকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ম্যানগ্রোভগুলি ঝুঁকি হ্রাসে সর্বোত্তমভাবে অবদান রাখার জন্য, তাদের সংরক্ষণকে বৃহত্তর উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা নীতির যন্ত্রগুলিতে আত্তীকরণ করতে হবে। যেমনঃ উপকূলীয় অঞ্চল নীতি।

ম্যানগ্রোভ ফিরিয়ে আনতে বিনিয়োগ প্রয়োজন। ম্যানগ্রোভ এবং তাদের উপকূলীয় ঝুঁকি হ্রাস ফাংশন বেশিরভাগ জায়গায় পুনরুদ্ধার করতে পারে যেখানে উপযুক্ত পরিবেশগত এবং সামাজিক অবস্থা বিদ্যমান বা পুনরুদ্ধার করা হয়।[৩৭৬]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এর আগেও সুন্দরবন তার নিজের বুক পেতে অনেক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ভয়াল ছোবল গ্রহণ করেছিল। নিকট-অতীতে সিডর ও আইলা প্রথমে তাদের সর্ব শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়েছিল সুন্দরবনের ওপর। আছড়ে পড়ার পরই সেই সময় তার জন্য প্রবল বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুন্দরবন। সত্যি কথা বলতে কী-

৩৭৫. ঝড়ে সুন্দরবন থেকে দূরের জনবসতির বেশি ক্ষতি, প্রণব বল ও সুজন ঘোষ, চট্টগ্রাম ২৯ জানুয়ারি ২০১৮।

৩৭৬. Ranjan Roy, Sundarbans: A Natural Shield against natural Disasters, The Independent, 19 November 2019.

দেশের দক্ষিণে গড়ে ওঠা এই ম্যানগ্রোভ বন অতীতে অনেক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আঘাত রুখে দেওয়ার জন্য দুর্ভেদ্য বনদুর্গের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

অধ্যায়-৩

সুন্দরবনের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি

৩.১ প্রাককথন: IUCN Bangladesh (International Union for Conservation Nature and Natural Resources), ২০১৪-র তথ্যানুযায়ী (Bangladesh Sundarban Delta Vision 2050: A first Step in its Formulation, Document-1 & 2),[৩৭৭] বাংলাদেশের সুন্দরবনের মোট আয়তন ৯,৬১০ কিলোমিটার যার মধ্যে জীবিকায় প্রভাব বিস্তারকারী অঞ্চল ৩,৬৪১ কিলোমিটার। বাকি অংশ সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবস্থিত। বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবনের বিস্তারকে তিনটি জেলায় বিতরণ করা হয়েছে। যথা- সাতক্ষীরা (শ্যামনগর উপজেলা), খুলনা (কয়রা ও দাকোপ উপজেলা) এবং বাগেরহাট (মংলা এবং শরণখোলা উপজেলা)। BBS (Bangladesh Bureau of Statistics)-র মতে এই তিনটি জেলার পাঁচটি উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে প্রায় এক মিলিয়ন, এইভাবে মোট ১০ লাখেরও বেশি মানুষ বাংলাদেশের সুন্দরবন অংশে বাস করে। আরো প্রায় ৮ মিলিয়ন মানুষ বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন বাংলাদেশ সুন্দরবনের প্রান্তে বাস করে। মূলত প্রজন্ম ধরে তারা নির্ভর করে আসছে প্রকৃতির উপর। কাঠ কাটা, মধু সংগ্রহ, জেলে এবং কৃষি প্রভৃতি জীবিকা নিয়ে বসবাস করছে।[৩৭৮] উল্লেখ্য যে, সুন্দরবনের মোট জনসংখ্যা অনেক ইউরোপীয় দেশ যেমন সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, পর্তুগাল ইত্যাদির চেয়ে বেশি। সুতরাং সুন্দরবনের গুরুত্ব শুধু জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের দিক থেকেই নয়, এটি জীবন এবং চারপাশের প্রায় ১৫ মিলিয়ন মানুষ প্রজন্ম ধরে জীবিকার জন্য এই ভূখণ্ডে বসবাস করে আসছে।

বাংলাদেশ সুন্দরবনের অভ্যন্তরে কোনো মানব বসতি না থাকলেও এর প্রান্তে প্রায় ৮ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। যার মধ্যে প্রায় ২৮% বন থেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রধানত নিযুক্ত রয়েছে। যেমন মাছ ধরা, চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করা। সুন্দরবনের যে স্থানে বনজীবী মানুষ বসবাস করছে সেই স্থানটিকে Sundarban impact zone হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এভাবে বাংলাদেশের সুন্দরবন ইমপ্যাক্ট জোনের মধ্যে বসবাসকারী জনসংখ্যার একটি বড় অংশ নির্ভরশীল প্রাকৃতিক সম্পদের উপর এবং তাদের জীবিকা জলবায়ু এবং প্রকৃতির সাথে সরাসরি যুক্ত। সুন্দরবনকে কেন্দ্র করেই তারা গড়ে তুলেছে একটি অঞ্চলের ঐতিহ্য, গড়ে তুলেছে ধর্মীয় সৌহার্দবোধ।

---

৩৭৭. বিস্তারিত দেখুন, IUCN Bangladesh, *Bangladesh Sundarban Delta Vision 2050: A first Steps in its Formulation, Document-1 & 2, The Vision,* Dhaka, Bangladesh, 2014. (https://portals.iucn.org/library/node/44953)

৩৭৮. বিস্তারিত দেখুন, Statistics on demography and Health, জেলা পরিসংখ্যান (http://www.bbs.gov.bd/)

সুন্দরবন যেন তাদের মাতৃসূত্রে গাঁথা। এই বনই তাদের জন্মান্তরের সাথী। নগরীর উন্নততর জীবন, যান্ত্রিক সভ্যতা তাদের তেমন আকৃষ্ট করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে সুন্দরবনের স্মৃতিমন্থনকারী শিবশংকরের উক্তি-

> *কলকাতায় যেতে বললেই সুন্দরবনের মানুষের কেমন যেন গড়িমসি ভাব আসে। বনের কোথাও যেতে বলো- তা রায়মঙ্গলের মোহানা বা বিদ্যার মোহানায় যেতে বলো না কেন, ওরা প্রায় তখন-তখুনি বেরিয়ে পড়বে ডিঙি আর বৈঠে নিয়ে। কিন্তু কলকাতার মতো মানষালয়ে আসতে ওদের কেমন যেন অনীহা।*[৩৭৯]

নিশ্চিত বিপদ-শঙ্কা থাকলেও জীবিকার টানে বনই তাদের একমাত্র ভরসা। বলা হয়-

> *'তবু বনে না গেলে এদেশের মানুষের জীবন চলে না। রান্নার কাঠ চাই, বনে গিয়ে এরা কাঠ নিয়ে আসে; মাছ খেতে হবে–গভীর অন্ধকার রাতে একটা কুপি হাতে করে বনে চলে যায় মাছ ধরতে; হাটের খরচ নেই হাতে– বনের ভিতর অনেক দূরে গিয়ে গোলপাতা কেটে নিয়ে দূরের এক গ্রামে বিক্রি করে আসে।'*[৩৮০]

আলোচ্য অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য এই সুন্দরবন কে কেন্দ্র করে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা, তাদের আচার-প্রথা, বিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি, দুঃখ-বেদনা, প্রাপ্তি-বঞ্চনা প্রভৃতি নানা দিক তুলে ধরা।

৩.২ সুন্দরবনের অধিবাসীঃ সুন্দরবনের অধিবাসী সম্পর্কে পৃথক কোনো আদমশুমারি হয়নি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত। ১৮৭২ সালের প্রথম আদমশুমারিতে পৃথকভাবে ২৪ পরগণা, যশোর ও বাকেরগঞ্জ এর মধ্যেই গণনা করা হয়েছিল। এই তিনটি জেলার মধ্যেই সুন্দরবনের আর্থিক বিষয়গুলোও বিভাজিত ছিল। ১৮৭২-১৮৭৩ সালের দিকে স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল- এর সুন্দরবন ভলিউম লেখার সময় উইলয়াম হান্টার বলেন যেহেতু এখানকার অধিকাংশ জনসংখ্যা পার্শ্ববর্তী জেলা ও কিছু সুন্দরবনে বসবাস করে তাই এর যথাযথ হিসাব আসলে সম্ভব নয়। হান্টারের দেয়া তথ্যানুযায়ী ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের দক্ষিণাংশের যা সমুদ্র তীরের সাথে সংলগ্ন জঙ্গলের সংমিশ্রণে পূর্ণ সেখানে সম্পূর্ণ অংশটুকু তখন বসতিহীন ছিল। ব্যতিক্রম ছিল শুধু কিছু কিছু বনে বিচরণকারী কাঠুরে এবং জেলে। জনসংখ্যার বসবাস ছিল নগণ্য পরিমাণে।

৩.৩. সুন্দরবন সংলগ্ন বসবাসরত এলাকাসমূহঃ

বর্তমান বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট এই তিনটি জেলায় সুন্দরবনের বনজীবী লোকজন বসবাস করে। আরো নির্ধারিত করে যদি বলা যায় তাহলে, সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ১২ টি ইউনিয়ন যথা- ভুরুলিয়া, কাশিমাড়ী, শ্যামনগর, নূরনগর, কৈখালী, রমজাননগর, মুন্সিগঞ্জ, ঈশ্বরীপুর, বুড়িগোয়ালিনী,

৩৭৯. শিবশংকর মিত্র, *সুন্দরবন সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩১।

৩৮০. শিবশংকর মিত্র, *সুন্দরবন সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৩।

আটুলিয়া, পদ্মপুকুর, গাবুরা[৩৮১]; খুলনার কয়রা উপজেলার ৭ টি ইউনিয়ন যথা- আমাদী, বাগালী, মহেশ্বরীপুর, মহারাজপুর, কয়রা, উত্তর বেদকাশি, দক্ষিণ বেদকাশি[৩৮২]; দাকোপ উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন যথা- পানখালী, দাকোপ, লাইডোব, কৈলাশগঞ্জ, সুতারখালী, কামারখোলা, তিলডাংগা, বাজুয়া, বানীশান্তা; পাইকগাছা উপজেলার ১০ টি ইউনিয়ন যথা- হরিঢালী, কপিলমুনি, লতা, দেলুটি, সোলাদানা, লস্কর, গদাইপুর, রাড়ুলী, চাঁদখালী, গড়ইখালী[৩৮৩] এবং বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন যথা- ধানসাগর, খোন্দাকাটা, রায়েন্দা ও সাউথখালী[৩৮৪] প্রভৃতি এলাকার অধিবাসীগন বিশেষতঃ সুন্দরবনের উপর নির্ভর করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে থাকে এবং তাদের সমাজ-সংস্কৃতি লোকাচার, সংস্কৃতির উত্তরণ ও উন্নয়ন ঘটে চলেছে এই সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে।

৩.৪. সুন্দরবনে প্রাচীন মানব বসতিঃ সুন্দরবনের প্রাচীন মানব বসতি নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি মত লক্ষ্য করা যায়। দেশীয়দের মত ও বৈদেশিক মত। দেশীয়দের মতে, সুন্দরবন একসময় নগরী হিসেবে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন কারণে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। বৈদেশিক মতে, সুন্দরবনে কখনো উপযুক্ত বাসভুমি ছিলো না। সাহসী লোকজন বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন।[৩৮৫]

নীহাররঞ্জন রায় বলেন কখনো সমৃদ্ধ জনপদ আবার কখনো গভীর অরণ্য হিসেবে পরিচিত ছিল সুন্দরবন অঞ্চল। তিনি এই বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনের ইঙ্গিত করে বলছেন-

> *পদ্মার খাঁড়িতে ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর তীরে ডায়মণ্ড হারবারের সাগরসংগম পর্যন্ত বাখরগঞ্জ, খুলনা, চব্বিশ পরগণার নিম্নভূমি ঐতিহাসিককালেই কখনও সমৃদ্ধ জনপদ, কখনও গভীর অরণ্য, অথবা অনাবাস যোগ্য জলাভূমি, কখনও বা নদীগর্ভ বিলীন, আবার কখনও খাঁড়ি খাঁড়িকা অন্তর্হিত হইয়া নতুন স্থলভূমির সৃষ্টি।"*[৩৮৬]

৩৮১. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা 18-02-2021 সাইটটি শেষ হাল নাগাদ করা হয়েছে ২০২০-১২-২৮; District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-4

৩৮২. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, কয়রা, খুলনা, (http://koyra.khulna.gov.bd/site/page), cited on 18-02-2021, সাইটটি শেষ হাল নাগাদ করা হয়েছে ২০২১-০২-০৫; District Statistics 2011: Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-4

৩৮৩. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, পাইকগাছা, খুলনা (http://paikgasa.khulna.gov.bd/site/page), cited on 18-02-202 (http://shyamnagar.satkhira.gov.bd/site/page), সাইটটি শেষ হাল নাগাদ করা হয়েছে ২০২১-০২-১৮।

৩৮৪. ভৌগোলিক পরিচিতি, বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, (http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/page), cited on 18-02-2021, সাইটটি শেষ হাল নাগাদ করা হয়েছে ২০২১-০১-০৭; District Statistics 2011: Bagerhat, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-4

৩৮৫. ঐ, পৃষ্ঠা-৭১।

৩৮৬. *নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব, পৃ-৮৫।*

প্রাচীন বাংলায় যে সকল অঞ্চল সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল আর মধ্যযুগে এসে তার বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দরবন অঞ্চল, চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল) এর নিম্নভূমিতে ও পশ্চিম দিকটায় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সমৃদ্ধ ঘনবসতিপূর্ণ জনপদের অনেক চিহ্ন আবিষ্কার করা হয়েছে এবং এখনো করা হচ্ছে। যেমন: জয়নগর থানায় কাশীপুর গ্রামের সূর্যমূর্তি (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক), ডায়মণ্ড হারবারের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে বকুলতলা গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষণ সেনের পটোলী (দ্বাদশ), ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মলয় নামক স্থানে প্রাপ্ত জয়নাগের তাম্র-পটোলী (সপ্তম শতক), রাক্ষসখালী দ্বীপে প্রাপ্ত ডোম্মন পালের পটোলী (দ্বাদশ শতক), একাদশ শতকের প্রাপ্ত মাটির সীলমোহর, খাঁড়ি পরগণায় প্রাপ্ত অসংখ্য পাথরের মূর্তি, ২/৪ টি ভগ্ন মন্দির, কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপ্তমুদ্রা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই প্রাচীন বাংলায় এক বা একাধিক সমৃদ্ধ জনপদের ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে এইসব অঞ্চল প্রায় পরিত্যক্ত, গভীর অরণ্য।[৩৮৭] রালফ্ ফিচ্ বলেছেন, Bengal দেশ ব্যাঘ্র, বন-মহিষ ও বন-মুরগি অধ্যুষিত বনময় জলাভূমি। এদিকে ধর্মপালের খালিসপুর লিপি, দেবপালের নালন্দা লিপি এবং লক্ষণ সেনের আনুলিয়া লিপিতে ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল নামে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত একটি স্থানের উল্লেখ আছে। নীহাররঞ্জন রায় এই স্থানটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হিসেবে বলছেন যে: সমুদ্রতট ব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত আর এর দ্বারা চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জের দিকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে।[৩৮৮] আর এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, একই সাথে নবম-দ্বাদশ শতকে দক্ষিণ বাংলার অন্তর্গত কিছু কিছু অংশ গভীর অরণ্য ছিল। মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে যখন ভাটি অঞ্চলের সামন্তপ্রভু ছিলেন ঈশা খাঁ সেই সময়ও এর অনেকাংশ ছিল গভীর অরণ্যময়। ষোড়শ শতকে খান জাহান আলীর সময়ে যশোরের দক্ষিণাংশ ও পশ্চিমাংশে গভীর অরণ্য ছিল এবং তিনি সুন্দরবনের অনেক অংশে নতুন আবাদ করিয়েছিলেন। ফরিদপুর ও যশোর অঞ্চলে এসব অরণ্যময় স্থানে সুলতান ইউসুফ শাহ, সৈয়দ হোসেন শাহ, নুসরত শাহ আবাদ করেছিলেন।[৩৮৯]

অনুমান করা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলে জনবসতি ছিল না, তবে পশু শিকারি ও মধু সংগ্রহকারীদের যাতায়াত ছিল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও বাংলাদেশ অন্তর্গত সুন্দরবনের অনেক অধিবাসী আজও বিশ্বাস করে যে, এই অঞ্চলে জনবসতি ছিল। শুধু তাই নয়, এখানে একসময় প্রতাপাদিত্যের দুর্গ ছিল। এ বিশ্বাসের কারণে বলা হয় যে, সুন্দরবনে ভাঙ্গা মন্দিরের অস্তিত্ব, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইটের ও টালির টুকরো এবং চন্দন পিড়ি গ্রামে আবিষ্কৃত প্রাচীন ইটের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। ঐ অঞ্চলটি গ্রামবাসীর কাছে 'পাকাবাড়ি' নামে

---

৩৮৭. *ঐ।*

৩৮৮. *ঐ।*

৩৮৯. *ঐ।*

পরিচিত। এ ইট দিয়ে সেখানে তৈরি হয়েছে চন্দনপিড়ি স্কুল। সেখানে একটি ছোট ইটের ঢিবি এখনও বর্তমান।[৩৯০]

হান্টার তাঁর একাউন্টে দেখিয়েছেন যে, কাবাদাক নদীর (বর্তমানে ভারতে) পূর্বাংশে মানব বসতি ছিল। Colonel Gastrell'র রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, বর্তমান সুন্দরবনের ২১১ নং লটে অবস্থিত ২১২ নং লটকে বিভক্তকারী খালের পাশে কিছু ইটের গাঁথুনীর ধ্বংসাবশেষ, পরিত্যক্ত আঙিনার চিহ্ন এবং সেখানে উদ্যানী চারা ও গুল্ম ঝোপঝাড় প্রভৃতি আসলে এই জনশ্রুতির সত্যায়ন করে। কিন্তু কাদের দ্বারা এই দালানগুলো স্থাপিত হয়েছিল এবং কবে কখন থেকে বসতিপূর্ণ হয়েছিল সে সম্পর্কে কারো সঠিক জানা নেই। হান্টারের সঠিক উক্তিটি উপস্থাপনের মাধ্যমে এই মতের ব্যাপারে তাঁর সমর্থনের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে-

> *According to tradition, cultivation once extended down the eastern bank of the Kabadak river far below the now solitary village of Gobra, in Sundarban lot No. 212. Colonel Gastrell, in his Revenue Survey Report, states as follows: 'Some ruins of masonary buildings, the traces od old courtyards, the plants and shrubs, remain to the present day in lot 211, close to the khal which separates it from lot 212, and attest in some measure of the the truth of the legend.*[৩৯১]

হান্টার বলেছেন, সম্ভবত কাবাদাক নদীর সাথে সারাবছরই গঙ্গার যোগাযোগ ছিল। কারণ হিসেবে বলেছেন এর পানি বর্তমানের মত লবণাক্ত ছিল না, এর পানি ছিল বিশুদ্ধ। এই নদীর সীমানা হ্রাস-বৃদ্ধি হলেও এখানে ছিল উন্নতির সম্ভাবনা। তাই বর্তমানে বদ্বীপের অন্যান্য নদী তীরবর্তী স্থানে জনগন যেমন বসতি গড়ে তুলেছে ঠিক তেমনি এখানেও মানুষ চাষাবাদের সম্ভাবনার সুযোগে আবাস গড়ে তুলতে থাকে।[৩৯২] কিন্তু রেনেলের মানচিত্র জরিপের ও অনেক বছর আগে ভিন্ন স্রোত ধারার প্রভাবে গঙ্গা ও কাবাদাকের সাথে সংযোগ ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয় এবং মিঠা পানির মূল প্রবাহের পরিবর্তে এটি শুধু ছোট খাঁড়িতে পরিণত হয়। ফলে তীরে পলি জমার পরিমাণ কমে যায়। বৃষ্টির কারণে মাটির উপরের স্তর ধৌত হয়ে যাওয়ার ফলে ভূমির সাধারণ উচ্চতা আরো হ্রাস করে দেয়। একারণে এই স্থানটি অতি দ্রুতই দুর্বল হয়ে আসে এবং অনেকেই সেই স্থান পরিত্যাগ করে অন্যস্থানে চলে যেতে থাকে। এভাবে যশোরের অনেক গ্রাম যেগুলো একসময় বিদ্যমান ছিল সেগুলোর মধ্যে শুধু গোবরা গ্রামটি শোচনীয় অবস্থায় টিকে থাকে। গ্রামটির আয়তনও হ্রাস পেয়েছিল এবং একসময় যেখানে অধিক চাষ হতো সেখানে দুই মাইলের বেশি পরিসরে চাষাবাদ হতে দেখা যায়নি। পাশাপাশি ভূমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি

৩৯০. গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই, পূর্বোক্ত, পৃ. ২।

৩৯১. W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p-39.

৩৯২. *ibid.*

পেতে থাকে এবং শস্য আবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফলে গোবরা গ্রামটি খুব শ্রীঘ্রই জনশূণ্য হয়ে যাবার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।[৩৯৩]

১৮৭৩ সালের দিকে হান্টার লিখেছেন যে, বনের বিভিন্ন স্থানে ইটের নির্মিত ঘাট, পুকুরের চিহ্ন এবং একটি বা দুটি লোকালয়ে ইটের চুল্লিও পাওয়া গেছে। এসবের ভিত্তিতে সুন্দরবনে বর্তমানের তুলনায় কম পরিমাণে মানুষের বসবাস ছিল সে বিষয়ে তিনি একমত হননি। তিনি এ প্রসঙ্গে Colonel Gastrell-এর মতামত উল্লেখ করে বলেন-

> *Excepting the country bordering the on the Passar river, if ever the Jessor portion of the Sundarbans were populated lower than the present line forest boundary, which I much doubt, it must have been when some large branch of the Ganges conveyed fresh water much farther to the south than the present streams do.* [৩৯৪]

৩.৫ ধর্মীয় শ্রেণিবিভাজন: হান্টারের বর্ণনায় বলা হয় সে সময় প্রায় সকল অধিবাসীই হিন্দু অথবা মুসলমান ছিলেন। বাকেরগঞ্জ সুন্দরবন অংশে কিছু পরিমাণে আরাকানী মগ বৌদ্ধ ধর্মের এবং কিছু পরিমাণে দেশীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায় বসবাস করে।

হিন্দু জনগোষ্ঠী: হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে বেশিরভাগই নমঃশুদ্র গোত্রের। এরা সাধারণত চাষাবাদ, কাঠ কাটা এবং মাছ ধরে থাকে। উচ্চ বংশীয় হিন্দুদের অনুপস্থিতি এখানে লক্ষণীয়। এর মাধ্যমে এই বিষয়টি উপলব্ধি করা যায় যে, শুধু জীবিকার তাগিদেই নিম্নশ্রেণির অভাবী লোকজন এই বনে বাস করতে আসে।[৩৯৫] সুন্দরবনের কমিশনার জেমস ওয়েস্টল্যাণ্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী সে সময়ের পেশাভিত্তিক হিন্দু জনগোষ্ঠীর বিবরণঃ[৩৯৬]

সারণি-৫: ঔপনিবেশিক আমলে সুন্দরবনে বসবাসরত শ্রেণি ও পেশাভিত্তিক হিন্দু জনগোষ্ঠীর তালিকা

ক্রম.	শ্রেণি	পেশা	পরিমাণ ও আর্থিক অবস্থা
১.	নাপিত	ক্ষুরী ও চাষাবাদ	এরা সংখ্যায় কয়েকজন এবং আর্থিক অবস্থা মধ্যম পর্যায়ের
২.	কৈবর্ত্ত	চাষাবাদ ও মাছ ধরা	সংখ্যা কয়েকজন এবং আর্থিক অবস্থা মধ্যম পর্যায়ের

৩৯৩. *ibid*, p39-41.

৩৯৪. *ibid*.

৩৯৫. *ibid*, p-35.

৩৯৬. *ibid*, p. 36.

৩.	কাপালি	চাষাবাদ এবং সামান্য পরিমাণে ছোট ব্যাবসায়ী বা দোকানদার	সংখ্যায় বেশিও নয় আবার কমও নয় এবং আর্থিক অবস্থা মধ্যম পর্যায়ের
৪.	পোদ	চাষাবাদ, মাছ ধরা ও মৌসুমে কাঠকাটা	এরা সংখ্যায় অসংখ্য এবং আর্থিক অবস্থা মধ্যম পর্যায়ের
৫.	চণ্ডাল	চাষাবাদ ও মৌসুমে কাঠকাটা	এরা সংখ্যায় অধিক এবং আর্থিক অবস্থা মধ্যম পর্যায়ের
৬.	জালিয়া	চাষাবাদ ও মাছ ধরা	সংখ্যা কয়েকজন এবং আর্থিক অবস্থা মধ্যম পর্যায়ের
৭.	বাগদি	চাষাবাদ, মাছ ধরা ও মৌসুমে কাঠকাটা	সংখ্যায় অধিক তবে সামান কয়েকজনের আর্থিক অবস্থা মধ্যম পর্যায়ের এবং অধিকাংশই দরিদ্র
৮.	তিয়র	চাষাবাদ, শ্রমিক ও জেলে	সংখ্যায় কম এবং এরা সাধারণত দরিদ্র
৯.	ধোবা	ধোপা (কাপড় ধোয়া) ও মাছ ধরা	খুব কম সংখ্যায় এবং আর্থিক অবস্থা মধ্যম পর্যায়ের
১০.	যোগি	সম্প্রদায়গতভাবে কাপড় বুনন, কিছু পরিমাণে সুন্দরবনে চাষাবাদের জন্য নিযুক্ত, মহাজনি (অর্থ লগ্নিকারী) ও ছোট কারবারি	এরা সংখ্যায় খুব কম এবং অধিকাংশই ধনী।
১১.	গুরি	মদ প্রস্তুত, বিক্রয় এবং চাষাবাদ	খুব কম সংখ্যক এবং অধিকাংশই ধনী।
১২.	কেওরা	চাষাবাদ, শ্রমিক এবং কিছু পরিমাণে শূকর পালন ও বিক্রয় করে থাকে	সংখ্যায় কম এবং দরিদ্র।

তথ্যসূত্র: W. W. Hunter, A statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans.

মুসলমান জনগোষ্ঠী: সুন্দরবনের মুসলমান জনগোষ্ঠী সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। হান্টারের অভিব্যক্তিতে বলা হয়, ২৪ পরগণা ও যশোর সুন্দরবনে মুসলমানদের সহজে চাষাবাদের কাজে লাগানো যায়। তবে, বাকেরগঞ্জ এবং যশোরের পূর্বাংশের অধিকাংশ মুসলমানরা ফরায়েজি আন্দোলনের সাথে যুক্ত। রিপোর্ট অনুযায়ী বলা হয় এরা খুব দুর্ধর্ষ, মামলাবাজ যদিও এরা সক্রিয় ধর্মান্ধ নয়। হান্টার দেখিয়েছেন যে, কমিশনারের রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলমান ধর্ম হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে নতুন কোনো অগ্রগতি করতে পারে নি এমনকি তাদের মধ্যে নতুন কোন শাখাও বিকশিত হয়নি। সুন্দরবনের মুসলমানরা সাধারণত তিনটি শ্রেণিতে বিভাজিত ছিল। এছাড়া কিছু যাযাবর শ্রেণির অধিবাসী ছিল যারা ইসলাম ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েছিল তবে এরা ধর্মীয় বিধিনিষেধ পালনে খুব কর্তব্যপরায়ণ ছিল না। নিম্নে হান্টারের দেয়া শ্রেণিবিভাজনটি উল্লেখ করা হল-[৩৯৭]

৩৯৭. *ibid.*

সারণি-৬: শ্রেণি ও পেশাভিত্তিক মুসলমান জনগোষ্ঠীর তালিকা:

ক্রম	**শ্রেণি**	**পেশা**	**সংখ্যা ও আর্থিক অবস্থা**
১.	শেখ	চাষাবাদ ও কাঠকাটা	এরা সংখ্যায় অনেক, কিছু পরিমাণে ধনী, অধিকাংশের আর্থিক অবস্থা মধ্যম পর্যায়ের এবং কিছু পরিমাণে দরিদ্র অধিবাসী।
২.	সৈয়দ	চাষাবাদ	সংখ্যায় কম, ধনী-দরিদ্র উভয় আছে
৩.	পাঠান	চাষাবাদ	সংখ্যায় কম এবং আর্থিক অবস্থা মধ্যম পর্যায়ের।
মুসলিম ধর্মাবলম্বি যাযাবর শ্রেণি			
৫.	মিরশিকারি	শিকারী ও জেলে। এছাড়া মাছ, সূতা, সূচ, বড়শি প্রভৃতি বিষয় বিক্রি করে এবং কিছু পরিমাণে চাষাবাদী জমির মালিকানাও রয়েছে।	আর্থিক অবস্থা মধ্যম পর্যায়ের
৬.	গাপুরিয়া	সাপ ধরা ও খেলা দেখানো	এরা সাধারণত দরিদ্র
৭.	বেদিয়া বা বেদে	হাতুড়ে ডাক্তার। দাঁত ও বাতের ব্যাথাসহ সকল ধরনের ব্যাথা ও যন্ত্রনায় তারা চিকিৎসা করে।	প্রধানত দরিদ্র

তথ্যসূত্র: W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans.

খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী: দেশীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের অবস্থা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত এবং সকলেই চাষাবাদ করে। স্পষ্ট করে বলতে গেলে এদের আর্থিক অবস্থা মধ্যম পর্যায়ের। হান্টার তাঁর গবেষণায় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের যথাযথ সংখ্যা বলতে না পারার ক্ষেত্রে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির এজেন্ট এর দেয়া তথ্য ব্যবহার করে বলেন যে, সেসময় নারী-পুরুষ ও শিশু মিলে আনুমানিক ১০২ জন খ্রিষ্টান ছিল।[৩৯৮]

অভিবাসী জনগণ: সুন্দরবনের ভূমি পুনরুদ্ধার ও বসতিপূর্ণ করার জন্য পার্শ্ববর্তী উত্তরের জেলাগুলো থেকে বেশিরভাগ জনগণকে নিয়ে আসা হয়েছিল। বাড়তি জনসংখ্যার অধিকাংশ তখন ২৪ পরগণার পশ্চিমাংশ এবং বাকেরগঞ্জ সুন্দরবনের পূর্বাংশে বসতি স্থাপন করতে থাকে। নিম্ন জলাশয়যুক্ত যশোর সুন্দরবনে খুব বেশি বসতি লক্ষ করা যায় না। ২৪ পরগণা সুন্দরবনের অধিকাংশ অধিবাসী উড়িষ্যার কটাক ও অন্যান্য অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের ছোট নাগপুরের বুনা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত। এরা সাধারণত মলঙ্গী *Malangis* বা লবণ উৎপাদন এবং কাঠ কাটার পেশায় এখানে আসে।[৩৯৯] সরকারি লবণ উৎপাদন কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণে এদের অধিকাংশই ২৪ পরগণার বিভিন্ন এলাকায় চাষাবাদের কাজে যুক্ত হয়। সাগা উপদ্বীপে এদের একটি স্থায়ী লোকালয়ও তৈরি হয় এবং তাদের অনেকেই সেখানে বাস করতো। তবে ১৮৬৪ সালের ঘূর্ণিঝড়ে অনেকেই

৩৯৮. *ibid*, p-37.

৩৯৯. *ibid*, p-39.

বিলীন হয়ে যায়। সুন্দরবন কমিশনারের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থায়ী আবাস গড়ে তোলার জন্য এদের স্ত্রী-পরিবারকে সাথে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়া হয়। চাষাবাদে নিযুক্ত অনেকেই খুব মিতব্যয়ী এবং কিছু পরিমাণে ধনীও ছিল। বসবাসের ঘরগুলো চাষাবাদী জমির পাশেই অবস্থিত ছিল। এছাড়া পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র পরিসরে আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছিল। উড়িষ্যা অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে আন্তঃবিবাহ করতো এবং অন্যান্য অধিবাসীদের সাথে খুব মেলামেশা করতো না। আর অন্য অধিবাসীরা ছিল পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ি এলাকা ছোটনাগপুরের বুনা অঞ্চলের। পাহাড়ি এলাকার শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ এসব অধিবাসীদের সাধারণত সুন্দরবনের জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য আনা হয়েছিল। পরিবার, সন্তানদের সাথে নিয়ে এসে এখানে চাষাবাদ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে।[৪০০] এদের অনেকেই খুব ভালোভাবে বাংলা বলতে জানে। তাদের পোশাকও অন্যান্য সাধারণ জনগণের মতই। পরবর্তীতে শুধু বাকেরগঞ্জের পূর্বাংশের সুন্দরবনে মগ জাতি এসেছে আরাকানের উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে। তাদের অনেকেই বাঙালি ইজারাদারদের অধীন চাষাবাদে নিয়োজিত হয়ে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। আবার অনেকে সরাসরি সরকারের কাছ থেকে অনুদান নিয়ে চাষাবাদ করতে শুরু করে। এরা খুব শক্তিশালী, পরিশ্রমী এবং তেজী ছিল। চরিত্রগত দিক থেকে এরা খুবই সৎ এবং সত্যবাদী ছিল। মগ অভিবাসীরা পাশাপাশি বসবাস করতে থাকে। তাদের বাড়ি গুলো ছিল ভূমি থেকে নয় ফুট উচুঁ কাঠের তৈরি। নিজেদের পারস্পরিক অবস্থানে একটি ছোট্ট গ্রাম গড়ে উঠে। মগ নারী-পুরুষ উভয় কঠোর পরিশ্রমী। এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে। তবে গৃহের নানা নিয়ম ও কাজে এরা খুবই অপরিচ্ছন্ন। মগ নারীরা স্বামী ও পরিবারের জন্য কাপড় বুনন করত। পুরুষেরা কাঠ কাটায় এবং চাষাবাদের জন্য মাটি কর্ষণে খুব দক্ষ ছিল। সুন্দরবনের কমিশনারের তথ্যানুযায়ী, মগরা যখন এখানে আসতে শুরু করে তখন তাদের মধ্যে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল যে, বনের উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থিত নালা বা খালের পাশে নিজেদের আবাস গড়ে তোলা, যেখানে জঙ্গল পরিষ্কার করে তারা চাষাবাদ করতে পারবে।[৪০১] বনের গহীনে নিজেদের এমন স্বতন্ত্র আবাস গড়ে তোলার কারণ ছিল সরকারি রাজস্ব প্রদান থেকে বিরত থাকা। ১৮৭৩ সালের পর অবশ্য এই প্রথা ও চেষ্টা আর অব্যাহত থাকেনি। কারণ ইতোমধ্যেই বাকেরগঞ্জ সুন্দরবন অংশের অধিকাংশই উদ্ধার করা হয়ে যায় এবং তাই নিজেদেরকে আর লুকিয়ে রাখার কোন সুযোগ থাকেনি। মগরা স্থানীয় বাঙালিদের সাথে কোন সংস্পর্শে আসতো না এবং কমিশনারের রিপোর্টেও সে বিষয়ে কোন পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়নি। অন্যান্য জনগণের কাছ থেকে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখে। এমনকি অনেকেই আছে যারা সমগ্র জীবন এখানেই অতিবাহিত করেছেন কিন্তু কখনোই বাঙালিদের সংস্পর্শে আসেননি। মগরা নিজেদের জন্মভূমি বা স্বদেশের প্রতি অগাধ অনুরাগ ধরে রাখতো। বাকেরগঞ্জ সুন্দরবনে দীর্ঘ বছর ধরে বসবাস করে আসা মগরা মাঝে মাঝেই তাদের পূর্বপুরুষের ভূমিতে যেতেন।

৪০০ . *ibid*, p. 40.

৪০১ . *ibid*, p. 38.

আবার যারা কিছু অর্থ সঞ্চয় করতো তারা চিরতরের জন্যও চলে যেত। তাদের যদিও অনেকেই এখানে জীবন অতিবাহিত করেছে তবে খুব কম সংখ্যককেই এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেখা যায়।[৪০২] মোগল আমলে সুন্দরবনে আরাকানি মগ ও পর্তুগীজদের বিচরণ ছিল। সাধারণ জনগণের কাছে পরিচিত ছিল ডাকাত ও জলদস্যু নামে। তাদের বিচরণের নানাদিক উঠে আসে শিব শংকর মিত্রের স্মৃতিতে। তিনি উল্লেখ করেন-

> *শুধু ডাকাতি ও লুটপাট নয়, যাকে পায় তাকেই ধরে নিয়ে যেতো, মেয়েদের পেলে তো কথাই ছিল না। নিয়ে গিয়ে গরু ভেড়ার মতো তাদের বেচা-কেনা করতো মগ-ফিরিঙ্গিরা দেশ-বিদেশে। দাস-ব্যবসার অভিশাপ এমনি করেই নেমে আসে গোটা বাদা অঞ্চলে। বন্দীদের হাতের তেলো ফুটো করে বেত চালিয়ে হালি বানাতো। এইভাবে বেঁধে জাহাজের খোলে গাদি মেরে রেখে দিতো বন্দরে বন্দরে দাস বিক্রির জন্য। সুন্দরবন তখন 'মগের-মুল্লুক' হয়ে ওঠে। সেই অতীতকালে রাজা প্রতাপাদিত্যেও দৌলতে এবং পরবর্তীকালে শায়েস্তা খাঁর কঠোর শায়েস্তাতে সুন্দরবনের মানুষ দাস-ব্যবসা আর লুটপাটের অভিশাপ থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।*[৪০৩]

সুন্দরবনে বসবাসকারী মূলধারার জনগোষ্ঠী আনা হয়েছিল সংলগ্ন উত্তরাংশ থেকে এবং ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। যেহেতু পার্শ্ববর্তী উত্তরের জেলাগুলো থেকে জনগণকে দক্ষিণে সুন্দরবনে আনা হচ্ছিল তখন সুন্দরবন থেকে কেউ অভিবাসী হয়ে [৪০৪] অন্য কোথাও যায়নি শুধু মগ জাতি ব্যতীত।

৩.৬ সুন্দরবনে শহরঃ উনিশ শতকের শেষার্ধেও সুন্দরবনে উল্লেখযোগ্য কোন শহর গড়ে উঠেনি। মাতলা নদীতে অবস্থিত পোর্ট ক্যানিংই ছিল একমাত্র শহরের বৈশিষ্ট্য সংবলিত বন্দর। এটি পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল। মহানগরী কলকাতায় কাচাঁমালের যোগানের জন্য এখান থেকে রেলসংযোগ করা হয়েছিল। এর পরবর্তী কয়েক বছরও শহর-বন্দর, জাহাজ নোঙ্গরের জন্য সরকারি ঘাট গড়ে তোলার চেষ্টা করা হলেও নানা কারণে সেটি ব্যর্থ হয়ে যায় এবং অবশেষে স্থাপিত বন্দরটি আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৮৭০ সালে পোর্ট ক্যানিং-এ ৩৮৬টি পরিবার নিয়ে ৭১৪ জন অধিবাসীর বসবাস ছিল।[৪০৫] ১৮৭৩ সালের দিকে এটি প্রায় মানব বসতিহীন হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ১৮৭৩ সালের ১০ এপ্রিল সুন্দরবনের কমিশনার হান্টারকে দেয়া রিপোর্টে উল্লেখ করেন, কোম্পানির কর্মচারী, এজেন্ট ও *ডাক মুন্সি (Deputy Postmaster)* ব্যতীত আর কোন জনগণই ক্যানিং কোম্পানিতে বসবাস করতো না। পোর্ট ক্যানিং নিয়ে বিস্তারিত ২৪ পরগণা ভলিউমে আছে। বাণিজ্যের সাথে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী গ্রামগুলো ছিল চাঁদখালী, মোড়লগঞ্জ, বিষখালী ও কচুয়া। যদিও এই

---

৪০২. *ibid*, p. 38.

৪০৩. শিবশঙ্কর মিত্র, *সুন্দরবন সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭।

৪০৪. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, opcit, p-38-39.

৪০৫. *ibid*, p.40.

গ্রামগুলোর অবস্থান ছিল উত্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত জেলাগুলোতে বিশেষ করে যশোরে অবস্থিত। যথাযথভাবে সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নন তিনি। হান্টার তাঁর ***স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্ট যশোর*** ভলিউমে এগুলোকে যশোরের অন্তর্ভুক্ত দেখিয়েছেন। মূলত সুন্দরবনে গড়ে উঠা গ্রামগুলো আয়তনে ক্ষুদ্রাকার, সংখ্যায় কম এবং প্রকৃত অর্থে চাষাবাদী স্তরের জনগণের বসতি।[৪০৬]

৩.৭. বাসস্থান: সুন্দরবনের দোকানী বা বানিয়াদের ঘরগুলো সাধারণত সুন্দরী কাঠের খুঁটি, বাঁশ এবং নলখাগড়ার মাচা দিয়ে তৈরি। মেঝে মাটির তৈরি এবং ভূমি থেকে সাধারণত দুই থেকে তিন ফুট উচ্চতায় স্থাপিত। গৃহের বেড়া তৈরি করা হয় নলখাগড়া দিয়ে এবং মাঝে মাঝে বাঁশের খাপে শক্তভাবে আটকে রাখা হয়। এগুলো অনেকে বাড়তি সৌন্দর্যের জন্য কালো রঙ দিয়ে থাকে। গৃহের ছাদ খড়, ছন (স্বল্পদৈর্ঘ্য আকৃতির একধরণের ঘাস যা সহজে বৃষ্টিতে পঁচে না), গোলপাতা, হেঁতাল পাতা অথবা বনের মরে যাওয়া গাছের পাতা দিয়ে তৈরি করা হয়। কক্ষ সাধারণত একটি হয়ে থাকে থাকে। লম্বায় ত্রিশ ফুট এবং প্রস্থে পনেরো ফুট এবং সামনে পিছনে সরু বারান্দা থাকে। মাটির সিঁড়িও ব্যবহার করা হয়। ঘরে সাধারণত দুটি দরজা একে অপরের বিপরীতে দেয়া হয়। দরজাগুলো কাঠের ফ্রেমে করা হয়। প্রতিটি দরজার পাশে আলো বাতাস আসার জন্য জানালা থাকে। এছাড়া পৃথক রান্না করার ঘর যেখানে পরিবারের সবাই খাবার গ্রহণ করে, গরুর গোয়াল এবং শস্য রাখার জন্য গোলা প্রভৃতি ঘর থাকে। নির্দিষ্ট দূরত্বে ঘরগুলো নির্মাণ করা হয়। এছাড়া সমগ্র বাড়িটি নলখাগড়া দিয়ে বেড়া তৈরি করে ঘিরে রাখা হয়। আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে কাঠের তৈরি তক্তপোশ (*takhtposh*), কাঠের নিচু টুল, শক্ত কাঠের তক্তায় তৈরি বড় সিন্দুক যেটি আবার কাঠের কারুকার্যে শোভিত এবং পেরেক দিয়ে আটকানো থাকে। সিন্দুকে টাকা, মূল্যবান জিনিসপত্র, পিতলের নানা পাত্র ও রান্না করার হাঁড়ি-পাতিল রাখা হতো। এছাড়া কাপড় রাখার জন্য একটি বা দুটি ট্রাঙ্ক অথবা আলমিরা থাকতো।[৪০৭]

কৃষকদের ঘরগুলো সাধারণত মাটির তৈরি হয়ে থাকে, বিশেষ করে ২৪ পরগণা অঞ্চলে এমন দেখা যায়। তবে যশোর সুন্দরবন অঞ্চলে তাদের ঘরগুলো নল খাগড়া আর বাঁশ বা গরানের খুঁটি এবং খড় দিয়ে ছাদ ছাওয়া হয়। মধ্যবিত্ত পর্যায়ের কৃষকদের বাড়িতে প্রায় পাঁচটি কক্ষ থাকে। ২৪ পরগণায় সবচেয়ে বড় কক্ষটির দৈর্ঘ্য আঠারো এবং প্রস্থ বারো ফুট আর যশোর সুন্দরবনে এর আয়তন দৈর্ঘ্যে বাইশ ফুট ও প্রস্থে দশ ফুট। প্রধান ঘরের পাশে ছোট্ট একটি ঘর থাকে রান্না করার জন্য, তার অন্য পাশে আরেকটি ছোট ঘর থাকে যেখানে বাড়ির নারীরা ধানের তুষ রাখে, এছাড়া আরেকটু দূরে থাকে শস্যাগার ও গোয়ালঘর। প্রধান ঘরের সামনে একটি সরু বারান্দা থাকে। বারান্দা দিয়ে উপরে ওঠার জন্য মাটির তৈরি সিঁড়ি ব্যবহার করা হতো। ঘরের মেঝে মাটির এবং ভূমি থেকে প্রায়

---

৪০৬. *ibid*, p.42.

৪০৭. *ibid*, p. 42.

তিন ফুট উঁচুতে থাকে। তবে যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো তাদের কারো কারো ঘর মাটি থেকে ছয় ফুট, কখনো কখনো আট ফুট উঁচুতে তৈরি করা হয়। আসবাবপত্র বলতে কৃষকের কিছুই নেই। কিছু কাঠের তক্তায় বসার আসন, মাটির তৈরি পাত্র ও পাতিল, তামার কিছু পাত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৪০৮]

চিত্র-১৪ (ক): বনজীবীদের বাসস্থান, স্থান: সাতক্ষীরা

৪০৮. *ibid*, p. 44.

চিত্র-১৪ (খ): বনজীবীদের বাসস্থান, স্থান: সাতক্ষীরা

চিত্র-১৪ (গ): বাগদি পাড়ার জেলে গৃহ

চিত্র-১৪ (ঘ): মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বসবাসের জন্য সরকারি ব্যারাক

চিত্র-১৪ (ঙ): মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বসবাসের জন্য সরকারি ব্যারাক

চিত্র-১৪ (চ): বনজীবীদের বাসস্থান, স্থান: সাতক্ষীরা

সুন্দরবনের পূর্ব ও পশ্চিম বনবিভাগ সমন্বিত এলাকায় বহুকাল ধরেই অধিবাসীদের বসবাস হয়ে আসছে। শাসকের পট পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এর জনমিতি ও জনরূপেও ভিন্নতা আসতে শুরু করে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে রাজস্ব সংগ্রহের পরিসর বৃদ্ধিতে সুন্দরবন পরিষ্কার করে আবাদের জন্য পরিশ্রমী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অধিবাসীদের আনতে শুরু করে। উন্নত জীবনের আশা, নতুন ভূমিতে স্বাধীনভাবে বসবাস আর খাজনা না দেয়ার প্রস্তাবে তারা সুন্দরবনে আসতে আগ্রহী হয়। সুন্দরবন নিয়ে গবেষণায় এই দীর্ঘকালের জীবনধারা ও জীবন সংস্কৃতি নিয়ে খুব বেশি আলোকপাত করা হয়নি। ভারতে সুন্দরবনের অধিবাসী নিয়ে বেশ সংখ্যক গবেষণা ও আলোচনা হলেও বাংলাদেশে সে সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। অথচ এসব অধিবাসীদের চির লালিত সংস্কৃতি, আচার-রীতি নীতি আর সুন্দরবনকে আগলে রাখার মানসিকতাও এই বনকে বিশ্বে অনন্য করে তুলেছে। নিম্নে পূর্ব ও পশ্চিম বনবিভাগ সংলগ্ন সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করা হল-

<u>মুণ্ডা:</u> সুন্দরবনে বসবাসরত অন্যতম জনগোষ্ঠী হলো মুণ্ডা। মুণ্ডাদের প্রাচীন নাম 'বুনো'। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছোটনাথপুর থেকে এদের এই জঙ্গলে নিয়ে আসে। বর্তমানে মুণ্ডারা খুলনার কয়রা উপজেলার উত্তর ও দক্ষিণ বেদকাশির গাবুরা ইউনিয়নে বসবাস করে। কয়রা থানার সাতবাড়িয়া নদীর পাশেই গাবুরা ইউনিয়ন অবস্থিত। তাদের প্রধান খাবার ভেড়া, ছাগল, শামুক, ঝিনুক ও ইঁদুর। এর মধ্যে সবচেয়ে উপাদেয় হলো ইঁদুর পুড়িয়ে

খাওয়া।[৪০৯] ভারতবর্ষ থেকে এই মুণ্ডা জাতি এই অঞ্চলে প্রায় ৩০০ বছর পূর্ব থেকে বসবাস করছে। খুলনা, যশোর, সুন্দরবনের নিকটবর্তী শ্যামনগর ও জয়পুরহাটে তাদের দেখা যায়।[৪১০] সুন্দরবনের অন্যতম আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায় যাদের স্বতন্ত্র ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি এনে দিয়েছে রুপবৈচিত্র্য। মুণ্ডারা শর্ণা সম্প্রদায় নামেও পরিচিত। এছাড়া মুণ্ডারা নিজেদের 'হোরেকো' বলেও অভিহিত করে থাকে। 'হোরেকো' শব্দের অর্থ মানুষ। তবে তারা নিজেদের মুণ্ডা বলে পরিচয় দেওয়াকে বেশি গর্বের মনে করে। মুণ্ডা শব্দের অর্থ সম্মানী ও সম্পদশালী মানুষ।[৪১১] মুণ্ডাদের আদি নিবাস বিহারের রাঁচিতে। জীবিকার অন্বেষণে তারা খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকে। ভারতের মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম ছাড়া নেপাল ও বাংলাদেশে মুণ্ডারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ভারতে বসবাসরত মুণ্ডার সংখ্যা প্রায় ১০ লাখের অধিক।[৪১২] মোগল শাসনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের আদিবাসীরা মোটামুটি স্বাধীনভাবেই বসবাস করে আসছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে ঝাড়খণ্ডের মুণ্ডাদের উপর কর আরোপ করা হলে তাদের জীবিকায় অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক আমলে রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভূমিনীতি পরিবর্তন করা হলে মুণ্ডাদের দীর্ঘদিনের ভূমি মালিকানা রীতিতে বিচ্যুতি দেখা দেয় এবং গ্রামীণ সমাজ ভেঙে যেতে থাকে। জমিদার আর মহাজনদের অত্যাচার এবং ঔপনিবেশিক সরকারের দেয়া নানা প্রস্তাবে তারা আদি স্থান ত্যাগ করে চলে আসে। ১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে মুণ্ডারা রাজশাহী জেলার অধিবাসী হিসেবে গণ্য হয়। তবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মুণ্ডাদের সঠিক অবস্থান তখনো জানা যায়নি। সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকাগুলোকে মানব বসতিযোগ্য গড়ে তুলতে তাদের অবদান অনেক। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মুণ্ডারা সুন্দরবন সংলগ্ন যশোর, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলায় বসবাস করে। বর্তমানে খুলনা ও সাতক্ষীরার প্রায় ৩০টি জেলায় মুণ্ডারা বসবাস করে থাকে। তবে এই অঞ্চলে তাদের আসার যথার্থ ইতিহাস জানা যায়নি। যদিও তাদের আগমন সম্পর্কে লোকমুখে প্রচলিত জনশ্রুতি রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে জমিদারী প্রথার প্রচলন করা হলে অধিক রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসকের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের পূর্ব পুরুষেরা শাপদ সঙ্কুল অবস্থা এবং বাঘের গর্জন অগ্রাহ্য করে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের উপযোগী জমি তৈরি করেছিলেন।[৪১৩] দ্বিতীয় ধারণামতে, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জের নলডাঙ্গার তৎকালীন রাজা ব্রিটিশ আমলে তাদেরকে লাঠিয়াল এবং গৃহ পাহারাদার হিসেবে নিয়ে

---

৪০৯. https://www.risingbd.com/videogallery/?videoinfo=319

৪১০. Naveed Naushad in Resort review feature at The Daily Star, 1 December 2015. As cited in (https://www.thedailystar.net/lifestyle/travelogue/the-munda-people-the-sundarbans-180325), 12-04-2020 at 12:25 am.

৪১১. রাইজিং বিডি, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪, (https://www.risingbd.com/risingbd-special/news/84193), 29-03-2021, 12:49 pm

৪১২. পূর্বোক্ত।

৪১৩. ঐ।

আসেন। এছাড়া বলা হয় ঔপনিবেশিক আমলে নীল চাষ শুরু হলে নীল চাষাবাদের জন্য তাদের নিয়ে আসা হয়।[৪১৪]

মুণ্ডারা প্রতিকূল পরিবেশে কঠোর পরিশ্রম করতে পারায় প্রায় ২০০ বছর আগে ভারতে রাঁচি থেকে তৎকালীন শাসকেরা সুন্দরবনের গাছ কেটে বসতি গড়তে মুণ্ডাদের এদেশে এনেছিলেন। তারপর থেকে এখানেই তাদের স্থায়ী বসবাস। সাতক্ষীরার তালা উপজেলার বাকখালী, আসান নগর, হরিণখোলা, আড়োভাঙ্গি, কৃষ্ণনগর, গাছা দূর্গাপুর, সাপখালী, মুন্সিগঞ্জ, কচুখালী, শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা, পার্শ্বেমারী, ডুমুরিয়া, দাতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী, আবাদ চণ্ডীপুর, মাগুরাকুনি, উত্তর কদমতলা, খ্যাগড়াঘাট, শ্রীফলকাটী, ধুমঘাট, তারানিপুর, ভেটখালী, পূর্ব কালিঞ্চি, পশ্চিম কালিঞ্চি, কাশিপুর, বাদঘাটা, কেওড়াতলী, সাপখালী ও শৈলখালী এবং খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার টেপাখালি, জোড়শিং, নোনাদিঘীর পাড়, বড়বাড়ি, কটকটা, বতুল বাজার, আংটিহারা, পশুরতলা, মাজিবাইত, নলপাড়া, পাতাকাটা, গোয়াখালি ও ঘটিরঘেরগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মুণ্ডারা বসবাস করে।[৪১৫] তবে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও বসবাসকৃত মুণ্ডা অধিবাসীদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্যমতে, সাতক্ষীরার তালা উপজেলার ১২০ টি পরিবার নিয়ে ৫৪০ জন, কয়রা উপজেলায় ৩২০টি পরিবার নিয়ে ১৫৩০ জন এবং শ্যামনগর উপজেলায় ৩৫৩টি পরিবার নিয়ে ১৭৭০ জন মুণ্ডা বসবাস করছে।[৪১৬] সাতক্ষীরায় প্রায় আড়াই সহস্রাধিক মুণ্ডা রয়েছে। নিজ আদিভূমি মুণ্ডা নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক গোপাল চন্দ্র মুণ্ডার ভাষায় তারা এখানে যুগ যুগ ধরে বসবাস করলেও সুন্দরবনে আসার আগে তাদের অবস্থান কোথায় ছিল, সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। রাঁচি ছিল তাদের আদি নিবাস। এক্ষেত্রে তারা তথ্য সংগ্রহের জন্য ভারতের রাঁচিতেও গিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তারা পূর্বপুরুষের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়।[৪১৭] শ্যামনগরে মুণ্ডাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখতে কাজ করছে ক্যারামমুরা নাট্য গোষ্ঠী নামের একটি সংগঠন। সুন্দরবন এলাকার মুণ্ডাদের জীবন-জীবিকা বনের উপর নির্ভরশীল। সাংস্কৃতিক ঐহিত্য ধরে রাখার পাশাপাশি মুণ্ডাদের উদ্যোগে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার রমজাননগর ইউনিয়নের কালিঞ্চি গ্রামে গড়ে উঠেছে কালিঞ্চি ক্যারামমুরা ম্যানগ্রোভ ভিলেজ (পর্যটন কেন্দ্র)। এখানে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের থাকা, খাওয়া ও সুন্দরবন ভ্রমণের সুব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে আদিবাসী মুণ্ডাদের নানান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দেখার সুযোগও। তবে, তিনি অক্ষেপ করে বলেন, এখানে ছোট্ট একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হলেও রাস্থা-ঘাটের দুরবস্থা পর্যটন সম্ভবনা বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন বাইরে থেকে পর্যটকরা এখানে আসার জন্য

---

৪১৪. ঐ।

৪১৫. ঐ।

৪১৬. ঐ।

৪১৭. সুন্দরবনের আদিবাসী মুণ্ডা, বাংলা নিউজটুয়েন্টিফোর.কম সেপ্টেম্বর ৪, ২০১৯।

যোগাযোগ করেন, তখন রাস্তা-ঘাটের দুরবস্থার কথা শুনে অনেকে পিছিয়ে যান। যা আদিবাসী মুণ্ডাদের সংস্কৃতির বিকাশেও বাধাগ্রস্ত করে।[৪১৮]

নিজেদের অস্তিত্ব, বেঁচে থাকা আর জীবিকার তাগিদে তারা সুন্দরবনের চারপাশে অবস্থান করে। মুণ্ডাদের রয়েছে পৃথক ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রথা যা তাদের অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক করে তোলে। কিন্তু অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর সাথে থাকার কারণে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি প্রায় বিস্মৃতির পথে। মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি মূলত সারনিজম ও খ্রিষ্টান সংস্কৃতির সংমিশ্রণ।[৪১৯] তবে ধর্মীয় দিক থেকে তারা আদি প্রাকৃতিক ধর্ম চর্চা করে। তারা শিবসহ বিভিন্ন দেবতা, বিভিন্ন দৈবকাহিনীতে বিশ্বাস করে। সূর্য, চাঁদ ও তারা তাদের ধর্মীয় আচারের জীবন্ত উপাদান। এছাড়া কারাম গাছকে তারা বিশেষ ভক্তি করে। তাদের ধারণা পূর্বসূরীদের শত্রুদের হাত থেকে কারাম গাছ রক্ষা করেছিল। মুণ্ডা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে বসবাস করে এবং স্ব স্ব গোত্রের রীতি অনুসরণ করে। যেমন টুটি গোষ্ঠী মনে করে যে তারা সুন্দরী গাছ থেকে তাদের আবির্ভাব, অন্যদিকে বাঘর গোত্র মনে করে যে সুন্দরবনের বাঘ হচ্ছে তাদের পূর্বসূত্র।[৪২০] গোত্রভেদে রয়েছে বিভিন্ন পবিত্র প্রতীক যা তাদের গৃহ, উৎসব এবং বিশেষ উপলক্ষ্যেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মুণ্ডারা আধ্যাত্মিকতা, ভূত-প্রেত প্রভৃতিতে বিশ্বাস করেন। ভালো-মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই এই বিশ্বাস। অসুস্থ হলে সুস্থতার জন্য ভালো কে আহ্বান করা হয় আর কারো অনিষ্টের জন্য খারাপ ভূতকে ডাকা হয়।[৪২১] মুণ্ডা জনগোষ্ঠী ঝুড়ি তৈরি ও বুননে খুব পটু। এছাড়া তারা সুন্দরবন থেকে মাছ, কাঠ, মধু ও চিংড়ি সংগ্রহ করে থাকে। মুণ্ডারা কৃষিকাজেও নিয়োজিত থাকে তবে তাদের অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক। দিনমজুরির ভিত্তিতে মাছ ধরাও তাদের আরেকটি পেশা।[৪২২] স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সুন্দরবনের পণ্য সংগ্রহে মুণ্ডাদের শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। বিশেষ উৎসবে মুণ্ডারা ভাত, মদ বা হারিয়া পান করে।

---

৪১৮. ঐ।

৪১৯. Naveed Naushad in Resort review feature at The Daily Star, 1 December 2015. As cited in (https://www.thedailystar.net/lifestyle/travelogue/the-munda-people-the-sundarbans-180325), 12-04-2020 at 12:25 am.

৪২০. ibid.

৪২১. ibid.

৪২২. রাইজিং বিডি, ২৬ ডিসেম্বর 2014, (https://www.risingbd.com/risingbd-special/news/84193), 29-03-2021, 12:49 pm

চিত্র-১৫ (ক): মদ প্রস্তুত প্রক্রিয়া

চিত্র-১৫ (খ): মদ প্রস্তুত প্রক্রিয়া

চিত্র-১৫ (গ): প্রস্তুতকৃত মদ পান করছেন আদিবাসী মুণ্ডা

এছাড়া সাপ, ব্যাঙ, শামুক ও ইঁদুর ঝলসিয়ে খেয়ে থাকে।[৪২৩] নুপুর নামে তাদের রয়েছে বিখ্যাত নৃত্য সঙ্গীত। ছন্দময় এই নৃত্যে নারী-পুরুষ উভয়ই মল পরিধান করে। চাষাবাদ, বিবাহ অথবা শিশুর জন্ম উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।[৪২৪] ২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্যমতে, সুন্দরবনে বসবাসরত মুণ্ডাদের মধ্যে মাত্র ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন।[৪২৫] মুণ্ডারা কৃষিকাজেও নিয়োজিত থাকে তবে তাদের অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক। দিনমজুরির ভিত্তিতে মাছ ধরাও তাদের আরেকটি পেশা।[৪২৬]

মূণ্ডা সমাজ ব্যবস্থা মূলত পিতৃতান্ত্রিক। তবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে পালন করায় মুণ্ডা ছেলেমেয়েরা শিশুকাল থেকেই নাচ আর গান শিখে থাকে।[৪২৭]

মুণ্ডা সমাজে বাল্যবিবাহের পাশাপাশি বহুবিবাহ প্রচলিত। সাধারণত বৈশাখ ও ফাল্গুন মাসে বিয়ে হয়ে থাকে। মুণ্ডাদের ধারণা জন্মের অনতিপরেই বিয়ে বন্দোবস্ত করে রাখলে তারা জীবনটা দীর্ঘদিন উপভোগ করতে পারবে। বহুবিবাহ

৪২৩. Naveed Naushad in Resort review feature at The Daily Star, 1 December 2015. As cited in (https://www.thedailystar.net/lifestyle/travelogue/the-munda-people-the-sundarbans-180325), 12-04-2020 at 12:25 am.

৪২৪. *Ibid.*

৪২৫. রাইজিং বিডি, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪, https://www.risingbd.com/risingbd-special/news/84193, 29-03-2021, 12:49 pm

৪২৬. পূর্বোক্ত।

৪২৭. ঐ।

তাদের কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে। কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে দেবরের সাথেও বিয়ে দেয়া হয়। দেবর প্রাপ্ত বয়স্ক না হলেও এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে না। তবে কেউ পরিত্যাক্তা হলে সেই নারী আর দ্বিতীয় বারের মত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না, সারা জীবন এভাবেই কাটাতে হয়।[৪২৮] মুণ্ডা নারী-পুরুষ একসাথে কাজ করে। তবে কৃষি কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরা বেশি দক্ষ। নারীরা মাছ ধরতেও বেশ পারদর্শী।[৪২৯] মাতৃভাষায় শিক্ষা চর্চার কোন ব্যবস্থা না থাকায় বাঙালিদের সাথে লেখাপড়ার কারণে নিজেদের ভাষা ভুলতে বসেছে মুণ্ডাদের বর্তমান প্রজন্ম। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা না থাকায় নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চাও করতে পারে না।[৪৩০] মুণ্ডারী ধর্মের অনুসারী মুণ্ডাদের প্রধান উৎসব 'করম পূজা'। বাংলা ভাদ্র মাসের একাদশি তিথিতে অনুষ্ঠিত এই উৎসব। আর মুণ্ডাদের নিজস্ব ভাষা 'সাদরী'। মুণ্ডাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক 'বন্দনা নৃত্য'।[৪৩১]

সাধারণত বাংলাদেশের আদিবাসীরা সকল ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসীদের দুঃখ-কষ্টের সামান্য ধারণা রাখলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করা আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনধারা সম্পর্কে কারো দৃষ্টিগোচরই হয় না। সুন্দরবনের বনজীবী আদিবাসীরা তাদেরই অন্তর্গত।[৪৩২] সুন্দরবনের আদিবাসীরা খুব পরিশ্রমী হওয়ায় বনবিভাগ ও বহিরাগত ব্যবসায়ীরা স্বল্পমূল্য তাদেরকে বনের কাঠ কাটা ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত করে। সুন্দরবনে বসবাসরত মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে ৪০-৫০ বছর পূর্বের অধিবাসীর সংখ্যা অনেক কম। তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সুন্দরবন অঞ্চল পরিত্যাগ করে স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।[৪৩৩] বসবাসকারীদেরও নানা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সমস্যায় ভুগতে হয়। জীর্ণ শীর্ণ দেয়াল আর খড়ের ছাউনি দিয়ে তাদের নিবাস তৈরি। নোনা জল থাকায় সেখানে সুপেয় পানীয় জলের অভাব বিদ্যমান। দূরবর্তী স্থান থেকে নারীরা খাবার পানি নিয়ে আসেন। পাশাপাশি অনেকের গৃহেই স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নেই। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত আচার অনুষ্ঠান আর খাদ্যাভাসের কারণে বাঙালি জনগোষ্ঠী কর্তৃক নানাভাবে অবহেলিত ও বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়। মুণ্ডাদের প্রিয় ভোজ ইঁদুরের মাংস এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আবশ্যক পঁচানো ভাত দিয়ে তৈরি মদ পান করায় স্থানীয় বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুদের দ্বারা তারা নিগৃহীত হয়।[৪৩৪] সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে তাদের সাথে উঠা বসা, পারস্পরিক যাতায়াতকে এড়িয়ে চলে। এভাবে দেখা যায় সারা বিশ্ব যেখানে এগিয়ে যাচ্ছে, আমূল

৪২৮. ঐ।

৪২৯. ঐ।

৪৩০. গাছ কাটা ছেড়ে মাছ ধরে মুণ্ডারা, জাগো নিউজ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১, (https://www.jagonews24.com/country/news/646359), সাইটেশন ৩০-০৩-২০২০, ৬:০১ পিএম।

৪৩১. ঐ।

৪৩২. রাইজিং বিডি, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪, https://www.risingbd.com/risingbd-special/news/84193, 29-03-2021, 12:49 pm

৪৩৩. ঐ।

৪৩৪. ঐ।

ধারায় পরিবর্তিত হচ্ছে, সেখানে সুন্দরবনের আদিবাসীদের কোনো পরিবর্তন লক্ষণীয় হয় না।[৪৩৫] বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ এবং বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়ার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।[৪৩৬]

শ্যামনগরের কালিঞ্চিথানায় মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রা ও সংস্কৃতি রক্ষায় Relief International's-UK (RI-UK) EU এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রজেক্ট 'Promotion of Local Culture in the Sundarbans Impact Zone in Bangladesh through Cultural Eco-tourism and Entrepreneurship' নানা দিক তুলে ধরা হয়।[৪৩৭] প্রজন্ম ধরে বাস করে মুণ্ডা জনগোষ্ঠী সুন্দরবনের একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিতে ভূমিকা পালনকারী এই মুণ্ডা আচারকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য সকলের এগিয়ে আসা উচিত।[৪৩৮]

সুন্দরবন-সংলগ্ন সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মুণ্ডা সম্প্রদায় ধীরে ধীরে অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন। জায়গা-জমি থেকে শুরু করে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি পর্যন্ত হারিয়ে যাচ্ছে। একসময় অনেক জমি থাকলেও এখন তাদের বেশির ভাগই ভূমিহীন। সাতক্ষীরার সুন্দরবন আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থা 'সামস' এর তথ্যমতে, প্রায় আড়াই শ বছর আগে ভারতের ঝাড়খণ্ড এলাকা থেকে মুণ্ডাদের এই অঞ্চলে আনা হয়। বর্তমানে শ্যামনগরের মুণ্ডাদের ৪৫০টি পরিবারের জনসংখ্যা ২ হাজার ৩০০ জন। এসব পরিবারের ৯৫ শতাংশ ভূমিহীন। অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও অভাবকে পুঁজি করে ভূমিদস্যুরা তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে। কাশিপুর গ্রামের ষাটোর্ধ্ব অশ্বিনী কুমার মুণ্ডার ভাষ্যনুযায়ী, এই বয়সেও দুই ছেলের সঙ্গে দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালাতে হয় তাকে। ৫ শতাংশ জমিতে তাঁদের ১১ সদস্যের পরিবারের বাস। তাঁদের ১৩ বিঘা জমির সবই প্রভাবশালীরা জাল দলিল তৈরি করে আত্মসাৎ করেছে। সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করায় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের রোষানলে পড়ে একের পর এক মিথ্যা মামলায় হয়রানি হতে হয়। একই গ্রামের তারক মুণ্ডা বলেন, তিনি ১৯৯৬ সালে গ্রামের হেমনাথ মুণ্ডার কাছ থেকে ৭ শতাংশ জমি কেনেন। কিন্তু স্থানীয় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হেমনাথ মুণ্ডার স্বজনদের কাছ থেকে ওই জমি বন্ধক নেওয়ার অজুহাতে জাল দলিল তৈরি করেন। জমির দাবিতে আদালতে গেলে প্রতিপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে ১৬টি মিথ্যা মামলা দেয়। এসব মামলায় তার ভাই কৃষ্ণ মুণ্ডাকে একাধিকবার গ্রেপ্তার হতে হয়েছে। এমন ঘটনা শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই ঘটেনি, ধুমঘাট পল্লির যাদব, আনল, মন্টু মুণ্ডাসহ মুন্সিগঞ্জ ও গাবুরা এলাকায় বাসরত মুণ্ডা সম্প্রদায়ের প্রায় প্রতিটি পরিবারের সঙ্গেই ঘটেছে। জমির মালিকানা ও দখল নিশ্চিত করতে অশ্বিনী,

---

৪৩৫. ঐ।

৪৩৬. ঐ।

৪৩৭. Naveed Naushad in Resort review feature at The Daily Star, 1 December 2015. As cited in https://www.thedailystar.net/lifestyle/travelogue/the-munda-people-the-sundarbans-180325, 12-04-2020 at 12:25 am.

৪৩৮. ঐ।

দেবেন, জলক, গোলক, আনন্দ ও অরবিন্দ মুণ্ডার মতো মুণ্ডা সম্প্রদায়ের আরোও অনেককে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। 'সমাস'- এর নির্বাহী পরিচালক কৃষ্ণপদ মুণ্ডা বলেন, তাদের আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। বাঙালিদের সঙ্গে ওঠা-বসা ও লেখাপড়ার কারণে নিজেদের 'সাদরী' ভাষা ভুলতে বসেছে বর্তমান প্রজন্ম। প্রথমিক পাঠ শেষে শিশুরা ঝরে যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না থাকায় মুণ্ডারা তাঁদের দীর্ঘদিনের লালিত সংস্কৃতিচর্চাও করতে পারছে না। জমি ও ভাষার পাশাপাশি নিজস্ব সংস্কৃতি বিলীন হওয়ার পথে। সাড়ে চার শ পরিবারের মধ্যে তিনজন গ্রামপুলিশ এবং ১৩ জন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। অন্য সদস্যরা দিনমজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।[৪৩৯]

চিত্র-১৬: মুণ্ডাপাড়ার অধিবাসী, স্থান: বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, কলাবাড়ি, সাতক্ষীরা

৩.৮. সুন্দরবনের জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের উৎস:

সুন্দরবন সংলগ্ন শ্যামনগর, কয়রা, দাকোপ, পাইকগাছা ও শরণখোলা উপজেলার অধিবাসীদের জীবনধারণের প্রধান উৎস কৃষিকাজ, চিংড়ি চাষ, চিংড়ি রেণু সংগ্রহ, সুন্দরবন হতে কাঠ, গোলপাতা ও মধু আহরণ। সাতক্ষীরার প্রায় ৪,৩৬,১৭৮ টি পরিবারের মধ্যে ২,৫২,০৩৬ টি পরিবারই কৃষিকাজে নিয়োজিত। তবে কৃষিপণ্য ও নানা আবাদী ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি সুন্দরবনের বনজ দ্রব্য ও মৎস্য আহরণে এই অঞ্চলের

৪৩৯. 'অস্তিত্বের সংকটে মুণ্ডা সম্প্রদায়', দৈনিক প্রথম আলো, ২১ মে ২০১৬, ঢাকা।

অধিকাংশ জনগণ সংশ্লিষ্ট। শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলার প্রায় ৮ হাজার ৪৭০ জন গোলপাতা, কাঁকড়া ধরা, মধু সংগ্রহ করা ও জাল দিয়ে মাছ ধরা প্রভৃতি কাজ করে থাকেন বনজীবীরা। বনবিভাগের তথ্যমতে, সুন্দরবনে মাছ ধরার জন্য বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট রয়েছে ১০২০টি। এর মধ্যে প্রতি বিএলসিতে রয়েছেন ৩ জন জেলে। মোট ৩০৬০ জন। ২৬০ টি মধুর বিএলসির প্রতিটিতে মৌয়াল ৬ জন। মোট ১৫৬০ জন। কাঁকড়া ধরার জন্য ১৭৯০টি বিএলসির মধ্যে প্রতি বিএলসিতে ২ জন জেলে। মোট ৩৫৮০ জন। গোলপাতা সংগ্রহকারীদের জন্য রয়েছে ৪৫টি বিএলসি। প্রতিটিতে ৬ জন। মোট ২৭০ জন।[৪৪০] সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের বন সংরক্ষকের তথ্যমতে, সাতক্ষীরায় সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল বনজীবী রয়েছেন আট থেকে দশ হাজার। বিএলসি রয়েছেন ৩ হাজারের। তবে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।[৪৪১]

উপকূলবর্তী অঞ্চলে চিংড়ি চাষ এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উৎস। যা বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার অধিবাসীদের জন্য জীবিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[৪৪২] পাশাপাশি সামান্য পরিমাণে তাঁত, বস্ত্র, রাইস মিল, অটো ও সেমি রাইস মিল, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, বাঁশ, স'মিল, বেকারি, তেল মিল, মৃৎ শিল্প, ছাপাখানা, কাঠের আসবাবপত্র তৈরি প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত।[৪৪৩] তবে বর্তমানে দেশব্যাপী শিক্ষাবিস্তারের ফলে এসব অঞ্চলের অধিবাসীরাও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি চাকুরী ও স্বাধীন ব্যবসায় নিয়োজিত হচ্ছেন।[৪৪৪] সুন্দরবন এক কথায় জীবিকার আধার। সুন্দরবনকে ঘিরে যাদের বেঁচে থাকার পন্থা পরিচালিত হয় তারা কোনোভাবেই সুন্দরবনের ক্ষতি মেনে নিতে চান না। জীবিকার এই উৎস তাদের কাছে শ্রদ্ধাস্বরূপ। বনে কাজ করার মৌসুম না থাকায় মাটি কাটায় কাজ করা কয়রার গাববুনিয়ার এক বনজীবী সংবাদকর্মীদের উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন-

> *"গাছের কথা কিছু লেখেন। আমরা খালি এ জঙ্গলডার লইগ্যা বাঁইচ্যা আছি। হেই জঙ্গল কাইটা শেষ কইরা দিচ্ছে।"*[৪৪৫]

সুন্দরবনের আয়তন হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ নির্বিচারে গাছ কাটা। নিরীহ বনজীবীদের বনে যেতে নানা বিধি নিষেধ থাকলেও চোরাইভাবে বনের কাঠ সংগ্রহকারীরা তাদের কাছে বাঘের মতই আতঙ্কের।[৪৪৬]

---

৪৪০. একের পর এক দুর্যোগে দিশেহারা সুন্দরবনের পেশাজীবীরা, জাগো নিউজ, ২০ জুন ২০২০।

৪৪১. ঐ।

৪৪২. District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-4.

৪৪৩. Industry and Labour Wing, BBS, District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-49-55.

৪৪৪. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, (http://shyamnagar.satkhira.gov.bd/site/page), সাইটেশন ১৮-০২-২০২০ সাইটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছে ৩১-১২-২০২০।

৪৪৫. সুন্দরবনের বনজীবী, কষ্টই যেন জীবীকা, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ১৮ নভেম্বর ২০১৩।

৩.৯. সুন্দরবনের মৌসুমঃ সুন্দরবনের গরান, গোলপাতা, শুটকি, মাছ, কাঁকড়া, প্রভৃতি সম্পদ প্রাপ্তির নির্দিষ্ট সময়কালের উপর ভিত্তি করে বন বিভাগ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যে সময়সীমা নির্ধারণ করে তাকে সুন্দরবনের মৌসুম বলা হয়। মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারনে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সুন্দরবন উপকূলীয় এলাকায় ঝড়, জলোচ্ছাস, প্রবল স্রোত কম থাকায় এসময় সম্পদ সংগ্রহে বনজীবীদের জন্য নিরাপদ মৌসুম শুরু হয়। এক্ষেত্রে বনজ দ্রব্য আহরণের জন্য সুন্দরবন বন বিভাগ কর্তৃক বি এল সি (বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট) ও পাস পারমিট সংগ্রহ করতে হয়। নির্ধারিত সময়ের পর আবার সেই পারমিট বনবিভাগের কাছেফিরিয়ে দিতে হয়।[৪৪৭] সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বনবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা নিম্নে ছকের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো-

সারণি-৭: সুন্দরবন মৌসুম

বনজ সম্পদের নাম	**ইংরেজি মৌসুম**	**বাংলা মৌসুম**
গরান ও গোলপাতা	নভেম্বর - মার্চ	১৫ কার্তিক - ১৫ চৈত্র
মাছ	প্রায় সারাবছর	প্রায় সারাবছর
শুটকি	অক্টোবর - ফেব্রুয়ারি	১৫ আশ্বিন - ১৫ ফাল্গুন
এধু	এপ্রিল - মে	১৫ চৈত্র - ১৫ জৈষ্ঠ্য
কাঁকড়া	মার্চ - ডিসেম্বর	১৫ ফাল্গুন - ১৫ পৌষ

তথ্যসূত্র: সুন্দরবন ফ্লিপ চার্ট, উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা, পৃ. ৯।

৩.১০. বাওয়ালিঃ

সুন্দরবনে কাঠুরে ও গোলপাতা সংগ্রহকারীদের বাওয়ালী বলা হয়। উল্লেখ আছে যে বনের হিংস্র পশু থেকে আত্মরক্ষার জন্য ওঝা, গুণীন বাউলেদের সাথে করে নিয়ে যেতেন কাঠুরে আর মৌয়ালরা। এই বাউলে শব্দেরই বিবর্তিত রূপ বাউয়ালি।[৪৪৮] দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জনগণের পেশা ছিল গোলপাতা সংগ্রহ। বরিশালের (তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলা) স্বরুপকাঠি, পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া, পাথরঘাটা প্রভৃতি এলাকা থেকে অনেক বাওয়ালি গোলপাতা ও কাঠ সংগ্রহের জন্য সুন্দরবনে এসে বাস করতেন।[৪৪৯] এছাড়া বর্ষাকাঠি, সোহাগদল, বলদিয়া, সুতিয়াকাঠি, বলিহারী, জগন্নাথকাঠি প্রভৃতি এলাকার অধিবাসী বাওয়ালি কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিল। যশোর, খুলনা অঞ্চলের অনেকের বাওয়ালিই ছিল বারোমাসি পেশা। নদী বেষ্টিত এসব এলাকা থেকে ছোট বড়

---

৪৪৬. ঐ।

৪৪৭. সুন্দরবন ফ্লিপ চার্ট, উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।

৪৪৮. এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭।

৪৪৯. ঐ, পৃ. ১৮৮।

বিভিন্ন ধরনের নৌকা নিয়ে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে সুন্দরবনে জীবিকার জন্য কাঠ সংগ্রহের কাজ করতে চলে আসতেন।[৪৫০] সাতক্ষীরা রেঞ্জভুক্ত কাশিমাড়ী, নওয়াবেকী, বুড়িগোয়ালিনী প্রভৃতি গ্রামে অধিকাংশ বাওয়ালিদের বসবাস। বনবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পাতা সংগ্রহের সময় নভেম্বর থেকে মার্চ। আশ্বিন-কার্তিক মাসের দিকে গোলপাতা কাটে। এসময় বনবিভাগ পাস দেয়। পাস পেয়ে ৫ জন, ৬ জন, ৭ জন, ৮ জন করে গোল পাতা কাটতে যায়।[৪৫১] গোলপাতা সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত ৭টি গোলপাতা মৌসুমী কূপ থেকেই পাতা সংগ্রহ করা হয়। গোলগাছ পাঁচ থেকে ছয় বছরে পরিপক্ক হয় এবং বছরে তিন থেকে পাঁচটি পাতা দিয়ে থাকে। গোল গাছে ফুল ও ফল হয়। এপ্রিল-মে মাসে ফুল আসে এবং ফল পাকে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে। পাতা কাটার সময় ফুল ও ফলের ক্ষতি করা হয় না। মাটি থেকে নয় ইঞ্চি উপরে পাতা কাটা হয়। মাঝের পাতা ও ঠেস পাতা কাটা হয় না। কাটলে জরিমানা দিতে হয়। গোলপাতাকে গরীবের ঢেউটিন বলা হয়। তবে নির্বিচারে এই পাতা কাটা হচ্ছে বলে এর মজুদ দিন দিন কমে যাচ্ছে।[৪৫২]

ঘর ছাউয়া ও বেড়ার কাজে গোলপাতা দরকার।
রাজস্ব আয় করে অনেক বাংলাদেশ সরকার।।
ঠেস পাতারা মাঝ পাতা না কাটে বাওয়ালগণে।
টেকসই পদ্ধতিতে নৌকা ভরে চলেছে আপন মনে।।[৪৫৩]

গোলপাতা সংগ্রহ প্রক্রিয়া: প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময়ে বনবিভাগের অধীন কাঠ কাটার জন্য নির্দিষ্ট এলাকা নিলামে ইজারা দেয়া হয়। বনবিভাগ থেকে পাস নিয়ে সাধারণত সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাওয়ালিরা সুন্দরবনে অবস্থান করেন। তবে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর সুন্দরবনের কাঠ কাটার মৌসুম। আর নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি গোলপাতা কাটার মৌসুম।[৪৫৪] নির্ধারিত ঘেরের বাইরে গাছ কাটা নিষেধ। নির্ধারিত কাঠ কাটার স্থানগুলোকে বলা হয় ঘের। এই নিলামে ঘোষিত ঘের স্থানীয় মহাজনেরা ক্রয় করে। দাদন দিয়ে অথবা অর্থ লগ্নি করে মহাজন কাঠুরিয়াদের বনে প্রেরণ করে। গোলপাতা সংগ্রহ করতে আটজনের একটি দল বনে প্রবেশ করে। আটজনের মধ্যে চারজন পাতা নির্বাচন করে সেই পাতা কেটে আনে তাদের বলা হয় কাটা বাউলি। বাকিদের কাজ হল

---

৪৫০. ঐ, পৃ. ১৮৮।

৪৫১. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: সাহেব মণ্ডল, পেশা: বাওয়ালী, মৎস শিকারি, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ৯নং বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়ন। গ্রাম: বনবিবিতলা, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১১ টা ৪১ মিনিট।

৪৫২. সুন্দরবন ফ্লিপ চার্ট, উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা, পৃ. ১০।

৪৫৩. ঐ, পৃ. ১০।

৪৫৪. সুন্দরবনে যত পেশাজীবী, ডয়চে ভেলে, (https://www.dw.com/bn/), citation 10:48 am, 25-03-2021.

কাটা পাতাগুলো ফেঁড়ে নৌকায় রাখা। এদের বলা হয় ফাঁড়া বাউলি।[৪৫৫] সাথে থাকেন বাওলে বা ফকির। তার কাজ বাঘের বিপদ থেকে মন্ত্র পড়ে বাকীদের রক্ষা করা। সুন্দরবন সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে-

> *আক্রাম (বাউলে) একটু কড়া গোছের ফকির। বৃদ্ধও হয়েছে। সহসা ওকে কেউ আজকাল বাওয়ালি করে বাদায় ওঠে না। তাছাড়া ওর দস্তুরিও একটু বেশি। সাধারণ একজন বাওয়ালিকে খাইখোরাক ও জন-মজুরি দিলেই হয়। হাতে-নাতে তার কিছুই করতে হয় না। শুধু নৌকায় বসে থাকবে আর বাঘের বিপদ থেকে কাঠুরিয়াদের রক্ষা করবে। শর্তের বাইরে অবশ্য আরেকটা কাজ আছে, গল্প ও গান করা।*[৪৫৬]

সুন্দরবনে দূর দূর জেলা থেকে শীতের মৌসুমে গোলপাতা বা কাঠ কাটতে আসে সবাই। বড় নৌকা নিয়েই আসে তারা। এক এক নৌকায় ছয় থেকে দশজন লোক, আর মাস দেড়েকের খোরাকি। খোরাকি চাল ও মিষ্টি জল, আর কিছু মশলাপাতি। খালে ও নদীতে অজস্র মাছ; কাজেই আহারের অন্য কোন উপকরণই বাহুল্য। জাল ফেললে মাছের ওজনে টেনে তোলাই দায়।[৪৫৭]

নানা জায়গা থেকে নৌকাগুলি এককভাবে এলেও, পাস নেবার জন্য বাদার মুখে বন-কর অফিসগুলিতে প্রথমে একে একে এরা দল বেঁধে, বলতে গেলে নৌকার বহর বানিয়ে বনের গভীরে গাছ কাটবার ঘেরগুলিতে এসে উপস্থিত হয়। ঘেরের এক এক জায়গায় দেখা যাবে–দশ বিশ খানা নৌকা পরপর নোঙর করে দাঁড়িয়ে থাকে। রোদ উঠতেই সবাই দল বেঁধে বাদায় ওঠে, আবার বেলা থাকতেই নৌকায় ফিরে আসে। তখন আর কিছু কাজ নেই। কয়েকজন মাত্র রান্না বাড়িতে ব্যস্ত, বাকি সবাই মাতে গানে ও গল্প-গুজবে। এই সময় বাওয়ালি ফকিরদের কাছে গান ও গল্প শুনতে সবাই যেন আকুল হয়ে থাকে। মন্ত্রের বলে ফকিরদের দল বাঘকে কতটা মোহগ্রস্ত করতে পারে তা পরের কথা, গল্প-গুজবে কাঠুরিয়াদের কতটা মোহগ্রস্ত করা যায় তারই ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে হয় ফকিরদের এ-সময়ে।[৪৫৮]

বাওয়ালিয়াদের পারিশ্রমিক খুব সামান্য।[৪৫৯] জীবনের শঙ্কাকে জয় করে তারা কুড়াল, করাত আর দা নিয়ে বনের গভীরে চলে যায় কাঠ সংগ্রহ করতে। বাওয়ালিদের বনের নিয়মকানুন সম্পর্কে ধারণা থাকতো স্পষ্ট। তারা ছোট ছোট গ্রুপ হয়ে এক একটি নৌকা নিয়ে বনে প্রবেশ করে। নৌকা পাহারা দেয়া, রান্না করা, নৌকা চালানো ও পথ নির্দেশনা দেয়া প্রভৃতি কাজ নিজেরা ভাগ করে নেয়। একজনকে রেখে বাকিরা গভীর বনে প্রবেশ করে

৪৫৫. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, ৫ মে ২০১৮, ঢাকা।

৪৫৬. শিবশঙ্কর মিত্র, সুন্দরবন সমগ্র, পূর্বোক্ত, ১২২-১২৩।

৪৫৭. ঐ, পৃ. ১২৪।

৪৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

৪৫৯. এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭।

নির্ধারিত সাইজে কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে আসে।[৪৬০] সন্ধ্যায় সকলে এক স্থানে একত্র হয়। বন্য পশুর হিংস্রতার ভয়ে সকল নৌকা একসাথে করে রাত্রিযাপন করে। গোলপাতা সংগ্রহ সম্পর্কে গল্পের আলোকে শিবশংকর মিত্র উল্লেখ করেন-

> *অনেক দূর থেকে এসেছিল কজনে মিলে গোলপাতা কাটতে। সাত দিন হল এসেছে। ঝাপসী নদীতে নৌকা রেখে গোলপাতা কাটছিল। গোলপাতা কাটার নৌকাগুলি প্রায় সবটাই খোলা। মাত্র হালের পাশে ছোট্ট একটি খুপরি থাকে। তাতে কোনমতে চেপেচুপে তিনচার জনে শুতে পারে। নৌকার বাকি জায়গাটা গোলাপাতায় বোঝাই হয়। ওরা গত সাতদিনে অর্ধেকের বেশি বোঝাই করে ফেলেছিল। তাকে কড়াল বলে। সেই কড়ালে একজন বসেছিল। তার পাশেই খাবার জলের বড় একটা মাটির জালা। বনে কাজ করতে এলে জালা-ভর্তি মিষ্টি জল নিয়ে আসতে হয়। নদীর জল এত লোনা যে মুখে দেবার উপায় নেই। জালায় পাশে হাত দুই ফাঁকা, তারপরই শোবার খুপরি। এই খুপরির ভিতরে একজন বসে ছিল। সে কিন্তু ভয়ানক ভীতু। নৌকা ছেড়ে একদিনও বনে নামেনি। পারতপক্ষে সে খুপরিও ছাড়তে চায় না।খুপরির পরে গোলপাতা রাখবার দশ-বারো হাত জায়গা। তখন খুপরির ছই বরাবর উঁচু হয়ে পাতা বোঝাই হয়ে গেছে। তারপর নৌকা গলুই। তৃতীয় জন একটি লগি হাতে করে গলুইতে দাঁড়িয়ে নৌকা ঠিক-ঠাক করে নোঙর করছিল। কড়ালের লোকটি তামাক ধরিয়েছে। তার সঙ্গে বসে আরামে তামাক খাবার আশায় গলুই-এর লোকটি তাড়াতাড়ি হাতের টুকটাক কাজ সেরে নিচ্ছে।*[৪৬১]

সুন্দরবনের গোলপাতা আর কাঠ সংগ্রহ সম্পর্কে জানার পর তাদের এই অপরিসীম সাহসিকতা আর শ্বাপদ সঙ্কুল জীবন অতিবাহিত হওয়ার পর জাতীয় জীবনে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে তা হলো নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড ফ্যাক্টরি, করাতকল ও ম্যাচ ফ্যাক্টরিতে হাজার হাজার সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান।[৪৬২] প্রতিবছর গোলপাতা যদি না সংগ্রহ করা হয়, গোলের ঝাড় পরিষ্কার না করা হয় তাহলে পরের বছর গোলপাতা কম জন্মাবে। পাতা না কাটলে মরে পচে শুকিয়ে গিয়ে নতুন পাতা গজানো আর বিকাশে বাধা হয়। গোলপাতা কাটার নিয়ম এর মাঝের পাতা রেখে কাটতে হয়।[৪৬৩] সুন্দরবনে এমন অনেক গাছপালা আছে, যা বিকশিত হতে মানুষের সহায়তা লাগে। গোলপাতার ঝাড় প্রতিবছর ঝুড়ে (ডালপালা কেটে পরিষ্কার করা) না দিলে বাড়ে না।

---

৪৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮।

৪৬১. শিবশঙ্কর মিত্র, সুন্দরবন সমগ্র, পূর্বোক্ত, ২৮০-২৮১।

৪৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০।

৪৬৩. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ*, *পূর্বোক্ত*, ঢাকা।

তাল ও নারকেলের মত গাছ যেমন প্রতিবছর পরিষ্কার করতে হয় গোলপাতাকেও পরিষ্কার করতে হয়। মানুষ ছাড়া সে কাজ সম্ভব হয় না।[৪৬৪]

এভাবে পরিবার স্বজন ছেড়ে বাওয়ালিরা মাসেরও অধিক বনের নির্জন পরিবেশে কাটিয়ে দেয়। কারো কারো হয়তো বাঘের থাবার কবলে পড়ে আর গৃহে ফেরা হয় না। জীবিকা চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় মানসিকতায় এসব বাওয়ালিরা তবুও হেরে যায় না।[৪৬৫] *"বাওয়ালির দুঃখময় ইতিহাস বিজড়িত। নিরীহ বাওয়ালিরা মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্রের মুখে জীবন বিসর্জন দেয়। এতদসত্ত্বেও তাহারা কাঠ ও গোলপাতা সংগ্রহে বিরত হয় না। আঘাতে তাহারা হয় শক্ত এবং বিপদে অসমসাহসী দৃঢ় চিত্ত"*।[৪৬৬] বাঘের শিকার হওয়া এমনই এক বাওয়ালির করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে শিবশংকর মিত্রের স্মৃতিকথায়-

> *কলিম ধরাশায়ী। থাবার আঘাতে কানের পিঠের খানিকটা মাংস উড়ে গেছে। রক্ত ঝরে পড়ছে। সুন্দরবনের বাঘ কখনও যেখানে শিকার করে সেখানে খেতে বসে না। কলিমের কোমরে গোটো করে কাপড় পরাই আছে। তারই উপর দিয়ে কামড়ে ধরে মুখে তুলল। মুখে নিয়ে গরগর করতে করতে এগিয়ে চলল বনের ভিতর।*[৪৬৭]

বনের সর্বত্র কোথায় কি আছে সকল কিছু বাওয়ালিদের নখদর্পনে। বন্য পশুর অভয়াশ্রম, বনের ফল পাতা প্রভৃতি। সঙ্গে করে নিয়ে আসা সামগ্রী দিয়ে নৌকাতেই খাবার তৈরী হয় তাদের।[৪৬৮] বনের ভেতর অবস্থানকালীন বনজীবীরা বনপুই ও কলমীগাছের শাক খেয়ে থাকে।[৪৬৯] ঘন অন্ধকার, ব্যাঘ্র-শ্বাপদ আচ্ছাদিত জঙ্গলে ভয়-ভীতি আর জীবনে ছন্দ ফিরিয়ে আনতে সন্ধ্যায় তারা নানা গীত, কাহিনী আর ছড়ায় মাতিয়ে তোলে নির্জন এই বন। বিস্বাদময় এই বনে রোগ ব্যাধির জন্য নেই কোনো ব্যবস্থাপনা। এভাবেই তারা অনিশ্চিত জীবন জেনেও জীবিকার তাগিদে বার বার ফিরে যায় বনে এবং বন্য জীবন কে বেছে নেয়।[৪৭০] দাদনের দেনা মেটাতে বাঘের ভয় তাদের থাকে না। বাওয়ালির ভাষায়-

> *দূর দূরান্তর থেকে যারা কাঠুরিয়ার দলে জোটে, তারা সবাই যে বনের নেশায় বা পয়সা দাঁও মারার তালে আসে, তা নয়। আনেকই আসে দাদনের বাঁধনে। অভাবের সময় দাদনের টাকায় এইসব চাষীদের মহাজনেরা বেঁধে ফেলে বনে যাবার শর্তে। কোনমতে*

---

৪৬৪. গওহার নঈম ওয়ারা, ঘূর্ণিঝড় ইয়াস: সুন্দরবনকে পরের ঝড়ের জন্য তৈরি করতে হবে, দৈনিক প্রথম আলো ২ জুন ২০২১। (https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment),

৪৬৫. এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮।

৪৬৬. ঐ, পৃ. ১৮৯।

৪৬৭. শিবশঙ্কর মিত্র, *সুন্দরবন সমগ্র*, পূর্বোক্ত, ২৮০-২৮১।

৪৬৮. ঐ, পৃ. ১৯০।

৪৬৯. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, পূর্বোক্ত*।

৪৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০।

বনের খেপ তুলতে পারলেই দাদনের ধার থেকে এদের মুক্তি। তাই বনের নোঙর তুলবার জন্য দলের লোকজন উশ্‌খুশ্‌ থাকে।[৪৭১]

গোলাপাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের আক্রমণের শিকার হওয়া সাহেব মণ্ডলের স্মৃতিভাষ্য-

আমি এই যে পাটা জাললে গেছি, মাছ ধরতে গেছি। এবারে মাছ ধরতি যায়ি, মানে ঐ গোলফল আছেনা, গোল গাছের যে গোলফল কাটতি যেয়ে আমার মানুষ এট্টা মানে লাফ দিয়ে মানে গরা বেড্ডে এইখানে গলা বেড্ডে ধরিছে। গলা বেড্ডে নে ধরে আমার ঐ নৌকার গোইলির, মানে ঐ বাড়ে গে পড়িছে। খালের ভিতরে পড়িছে। এভাবে খালের ভিতরে পড়ে মানে দুয়োজন এক ঘণ্টার মতো হয়ে যাচ্ছে দুই জনের কেউ উঠতি পারেনা। বাঘও উঠতারেনা মানুষও উঠতারেনা। তার মানে এই জলের ভিতরে, পানির ভিতরে ঐ মানে গলা বেড্ডে ধরতিছেতো আর এসব জাগায় এই নলি-টলি মারিছে, বুকে-টুকে এসব জাগায় নলি-টলি মারিছে। তা মানে এরাম ফাঁক হইগে ছিড়ে। এখন আমি দেখতেছি যখন ঐ নৌকায় মানুষ যখন পড়িছে তখন আমি একা কী করি, তখন আমি এই লুঙ্গি কাছা দিলাম, কাছা দিয়া আমি তখন মানে ঐ গোইলির মাথায় এইরাম পা দিয়ে ঐরাম ঐ গোরানের এই মানে গোইলির মাথায় দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে মানে উঠে ইঠে মানে এইরকম তিন-চারটে বারি দিলামযে আমার লাশ নিয়ে যাতি পারবিনা, ছাড়ি দিয়ে যাবে। কিন্তু লাশ কিন্তু ছাড়িনি। এবারে ঐজই নিয়ে যখন মানে এইরাম ঘুরি মানে মালে উঠি গেছে, গিয়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে, তখন আমিও ঐ লাফ দিয়ে পড়লাম। নে ঐ ফাঁকা দিয়ে, চটক দিয়ে এইরাম নে দৌড়াচ্ছেতো আর আমি ঐ মাটিতে এইরাম চড়াত-চড়াত করে বাড়ি দিছি আর ঐ হাকাহাকি করতিছি। এখন এই বাঘ করিছে কি, ঐ লাশ থুয়ে মানে ঐ মানুষ থুয়েছে আরকি। থুয়ে বাঘ চলি গেছে দৌড়িয়ে। বাঘ যখন দৌড়িয়ে চলি গেছে তখন আমি একা একা তখন আমার এই গলার ডাক মানে আর উঠতারেনা মানে বসি গেছে। তখন আমি আন্দাজে এগাছে বাড়ি, ওগাছে বাড়ি এরকম মকরতেছি। কিন্তু লাশ কিন্তু আমার পেছনে আছে। কিন্তু আমি লাশের আগে। এখন আমার আর দুজন মানুষ ছিলো মালে। তারা ঐ অজ্ঞান হয়ে এরাম দাড়িয়ে নুয়ে, তখন আমি বলতেছি এই তেরা ব্যস্ত আমার কোলের কাছে আয়, আমিতো একা, আমি লাশ যেখন ছাড়াই নিছি তোরা ব্যস্ত আমার কোলের কাছে আয়। এবারে উকিনতে আধা ঘণ্টা পথে আমার কোলের কাছে আসতিছে। এবার আমি ঐ ইকা নে বেড়ু-বেড়ু করতেছি। আমার ধারে কোন মানুষ ছিলোনা। আমি একাই ছাড়াই নিলাম।[৪৭২]

তবে পূর্বের তুলনায় গোলপাতার চাহিদা অনেক কমে গেছে। গোলপাতা পচনশীল আর পাকা ঘর-বাড়ি টেকসই হওয়ায় এর চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া পাসের ফি বেশি এবং পূর্বের মত বড় নৌকা বেশি তৈরি হয় না।[৪৭৩] মৎস্যজীবী গোপাল সানার ভাষায়-

---

৪৭১. শিবশঙ্কর মিত্র, সুন্দরবন সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯।

৪৭২. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: সাহেব মণ্ডল, পেশা: বাওয়ালী, মৎস শিকারি, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ৯নং বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়ন। গ্রাম: বনবিবিতলা, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১১ টা ৪১ মিনিট।

৪৭৩. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশা: মৎসজীবী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ৯ নং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, গ্রাম: কলবাড়ি, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

আর তা বাদে এখন পাসের রয়েলিটি বেশি। যার কারনে বড় বড় নৌকো ছিলো সেইসব বড় বড় নৌকো আর নাই। ঐ আছে হয়তো দেখা যাচ্ছে শতকরায় হয়তো পঁচিশখান দশখান এইরাম আছে।[৪৭৪]

৩.১১ মৌয়াল:

সুন্দরবনের মধুর খ্যাতি রয়েছে সারা বিশ্বজুড়ে। যারা মধু সংগ্রহ করেন তাদের বলা হয় মৌয়াল, মাওয়াল, মৌলে বা মৌয়ালী। বন বিভাগের পাস নিয়ে প্রতিবছর ১ এপ্রিল থেকে সুন্দরবনে শুরু হয় মধু সংগ্রহের কার্যক্রম। সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশে হাজারো মৌয়াল ওই কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকেন। মধু সংগ্রহ করা হয় ১৫ জুন পর্যন্ত।[৪৭৫] প্রতিবছর ১লা এপ্রিল বনবিভাগ মিলাদ ও বন্দুকের গুলি ফুটিয়ে মধু সংগ্রহের পাস প্রদান শুরু করে। অজানা আশঙ্কায় মৃত্যুর পূর্বেই এই মিলাদ করা হয়। মৌয়ালরা প্রতিযোগিতা করে বনে প্রবেশ করে। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই মাসের ভিতরে মধু বেশি পাওয়া যায়। এই সময়ের মধু ভালো ও খাঁটি থাকে।[৪৭৬] একটি মৌসুমে ৫ জনের দলে প্রায় ৬/৭ মণ পাওয়া যায়। গাছের ফুল অনুযায়ী মধুর সময় দুইটি। প্রথম পর্যায়ের যেসব ফুল থেকে মধু হয় সেই মধুর চাহিদা বেশি। পরবর্তী ফুলের মধুর চাহিদা কম। এসময়টাকে বলে ফুলেন। গোপাল সানার ভাষায়- এখানে তোমার দুইটা ফুলেন। তা দুইটা ফুলেনেও প্রথম ফুলেনের মধুটা মানুষ ধার্য করে। তার পরের ফুলেনের মধুটা মানে খুব একটা ধার্য করেনা।[৪৭৭] এই সংগৃহিত মধু মহাজনেরা মৌয়ালদের কাছ থেকে ক্রয় করে। বাজারে যদি দুইশো টাকা চলে তাহলে তাদের দেওয়া হয় দেড়শো টাকা। তারপর তারা বাজারজাত করে। এই মধু অনেক সময় ঔষধ কোম্পানির কাছে বিক্রি করে।[৪৭৮]

মধুর প্রকার: বাদায় তিন রকমের মৌ পাওয়া যায়- ফুলপট্টি মধু, বালিহার মধু, আর লাল মধু। ফুলপট্টি মধু হলো খলসিলতার ফুল আর হেঁতাল বা বোগড়া গাছের ফুলের মধু; দেখতে সাদা ও গাঢ়। বালিহার মধু হলো বাইন ও কেওড়া গাছের ফুলের মধু; দেখতে সাদা ও হালকা। আর লাল মধু গরান বা গর্জন গাছের ফুলের মধু; দেখতে লালচে।[৪৭৯] খলসি, বাইন আর গোরান গাছ থেকে মধু বেশি পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো খলসি।[৪৮০]

---

৪৭৪. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পূর্বোক্ত।

৪৭৫. সুন্দরবনে মধু সংগ্রহকারীদের সুরক্ষায় প্রশিক্ষণ, প্রথম আলো, ৩ এপ্রিল ২০২১, ২০ চৈত্র ১৪২৭।

৪৭৬. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পূর্বোক্ত।

৪৭৭. ঐ।

৪৭৮. ঐ।

৪৭৯. শিবশঙ্কর মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

৪৮০. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পূর্বোক্ত।

সুন্দরবনে মধু সংগ্রহের সময় ও বনবিভাগের অনুমতিঃ

সুন্দরবনে মধু সংগ্রহের জন্য বনবিভাগ জুলাই মাসের ১ম পক্ষে বি.এল.সি. প্রদান করে। এ জন্যে মৌয়ালের ২কপি ছবি এবং স্থানীয় চেয়ারম্যানের নিকট থেকে একটি সার্টিফিকেটের/প্রত্যায়ন পত্রের প্রয়োজন হয়। বি.এল.সি. গ্রহন করার সময় মৌয়ালকে তার নৌকা প্রস্তুত রাখতে হয় এবং প্রতি নৌকায় ইউনিট প্রতি ৩ টাকা করে রাজস্ব জমা দিতে হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বি.এল.সি প্রদান/নবায়ন করে থাকেন। এরপর প্রতিবছর ১লা এপ্রিল থেকে শুরু হয় মধু সংগ্রহের সময়। ১লা এপ্রিল থেকে যে কোন সময় বি.এল.সি. দেখিয়ে পাস সংগ্রহ করে মধু সংগ্রহের জন্য মৌয়ালরা বনে প্রবেশ করতে পারেন। মধু সংগ্রহ করতে মৌয়ালদের পুঁজির প্রয়োজন হয়। সেই টাকা সংগ্রহের জন্য মহাজনের কাছ থেকে ধার নিতে হয়।[৪৮১] কারণ প্রতি মন মধুর জন্য ৪৪০ টাকা রাজস্ব প্রদান করতে হয়। প্রতি মন অপরিশোধিত মোমের জন্য ৬২০ টাকা এবং প্রতি মন পরিশোধিত মোমের জন্য ১২৪০ টাকা রাজস্ব দিতে হয়।[৪৮২]

তবে পরিবেশ বিপর্যয়, মৌচাক সম্পূর্ণ পুড়িয়ে ফেলা এবং মৌচাক নিংড়িয়ে সংগ্রহ করার কারণে দিন দিন মধু সংগ্রহের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।[৪৮৩] পাসাপাশি চোরাইভাবে মধু সংগ্রহের আশঙ্কাও থাকে। কালিঞ্চি গ্রামের হাফিজুর রহমান ও চাঁদনীমুখা গ্রামের নওহর আলী বলেন,

> *এলাকায় কাজ নেই। এ বছর মাছ ও কাঁকড়া শিকারের আড়ালে প্রচুর বনজীবী সুন্দরবন থেকে চোরাইভাবে মধু কেটেছেন। তার আতঙ্ক বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবার মধু অনেক কম জুটবে।*[৪৮৪]

মধু সংগ্রহের যাত্রাঃ শীতের শেষে সুন্দববনে নানা গাছে ফুল ধরে। গরান গাছের ছোট ছোট ফুল। হলদে রং। সকাল থেকে ফুলের গন্ধে, হলুদ রঙে আর মৌমাছির গুঞ্জনে বন মেতে উঠে। পাঁচ-সাত দিন আগেই নৌকা সাজানোর কাজ শেষ করেছেন খোকন গাজী (৬০)। লোকজনও প্রস্তুত রয়েছে। অবশেষে পাস (অনুমতিপত্র) হাতে পেয়েই তিনি মধু সংগ্রহের জন্য সুন্দরবনে রওনা হন।[৪৮৫] খোকন গাজীর বাড়ি সুন্দরবন-সংলগ্ন সাতক্ষীরার

---

৪৮১. ঐ।

৪৮২. Mr. Michael Burgett, An illustrated Manual for Honey Hunters, International Notes in No.59, ARCADIS Euroconsult Netherlands, Winrock International, USA & Nature conservation Management Bangladesh, March 2002.

৪৮৩. সুন্দরবন ফ্লিপ চার্ট, উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০, ২০০৮।

৪৮৪. অনুমতি পেয়েই সুন্দরবনে গেলেন মৌয়ালেরা, প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০২১, ১৯ চৈত্র ১৪২৭।

৪৮৫. ঐ।

শ্যামনগর উপজেলার দাতিনাখালী গ্রামে। খোকন গাজীর মতো কালিঞ্চি, মীরগাং, সোরা, গাবুরাসহ সুন্দরবন-সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য মৌয়াল সুন্দরবনে ঢুকতে শুরু করে।[৪৮৬]

বনবিবির ভরসায় রওনা হয় সবাই। সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহের সময় মৌয়ালদের বনবিবির কাছে অনুমতি নিতে হয়। গুনিন বাওয়ালিরাও বনে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়। অনুমতির জন্য বিভিন্ন মন্ত্র পড়া হয় যাতে বনে তাদের কোনো বিপদ না হয়। *বনবিবি, গাজী কালু, চম্পাবতী, আলীবদর, খোয়াজখিজির, দুখে, শাহ জঙ্গলি, দক্ষিণরায়, রায়মণি, বড় খাঁ* এদের কাছে প্রার্থনা করা হয়। সারা বছরের খাবারের যোগান যেন তারা সংগ্রহ করতে পারে। বনজ দ্রব্য সংগ্রহের অনুমতির জন্য প্রথম কৃত্য হল খিলান মন্ত্র, ছুঁকে মন্ত্র, চালান মন্ত্র দিয়ে সুন্দরী গাছের গায়ে 'মাল' করা। ফলে বনবিবি এই 'মাল' অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন যাতে এর সীমানার ভেতরে কোনো বিপদ না হয়।[৪৮৭]

মধুর চাক পেলে অবশ্য তিন জনের কাজ ভাগ করাই আছে। কিন্তু তার আগে সবাইকে চাক খুঁজে বেড়াতে হয়। চাক খুঁজবার পন্থা হল, মৌমাছি ফুল থেকে মধু নিয়ে কোনদিকে ছুটে চলেছে তা লক্ষ্য করা এবং তার পিছু পিছু সেদিকে যাাওয়া। এই ভাবে খুঁজতে গিয়ে সকলের প্রায়ই একত্রে থাকা সম্ভব হয় না। এদিক ওদিক ছিটকে পড়তেই হয়। সবাই এগিয়ে চলে প্রায় এক লাইনে। কারো হাতে কাস্তে আর চট। মাথায় মধুর কলসটা। আর ডান হতে একটা মোটা লাঠি। সারা বনে শূলো। শূলো ডিঙিয়ে তার ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলতে গিয়ে হোঁচট খাবার সম্ভাবনা। হয়ত তাতে কলসটা পড়ে যেতে পারে। তাই হোঁচট সামলাবার জন্য একখানা লাঠি নেওয়া হয়। মধু কাটতে তিনজন লোক চাই। একজন চট মুড়ি দিয়ে গাছে উঠে কাস্তে দিয়ে চাক কাটে। আর একজন লম্বা কাঁচা বাঁশের মাথায় মশাল জ্বেলে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়ায়। আর তৃতীয় জন একটা বড় ধামা হাতে চাকের নিচে দাঁড়ায়, যাতে চাক কাটা শুরু হলে সেগুলি মাটিতে না পড়ে ধামার মধ্যেই পড়ে। মধুর চাক কাটা সম্পর্কে বলা হয়-

> *যে-সে কিন্তু মৌচাক কাটতে পারে না। লোকে বলে, মন্ত্র জানা চাই। নয়ত মৌমাছি ছেঁকে ধরে তাকে কামড়ে শেষ করে দেবে। ধনাই মন্ত্র জানে। ধনাই নিজে তাই বলে, কিন্তু লোকে তা বিশ্বাস করে না। তারা ভাবে ধনাই মামু গোঁয়ার, তাই গোঁয়ারতুমি করেই মধু কাটে। দলের সঙ্গে একটা কলসও থাকে। এক ঘণ্টা চাক কাটা হলে, মধু ঝেড়ে ঝেড়ে তাতে বোঝাই করা হয়। মধুর চাক খুঁজতে খুঁজতে গভীর বনে কোথায় গিয়ে হাজির হতে হবে, তার কোন ঠিকানা নেই।* [৪৮৮]

---

৪৮৬. ঐ।

৪৮৭. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, পূর্বোক্ত*।

৪৮৮. শিবশঙ্কর মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ-২৪৫-২৪৬।

বনে মধু সংগ্রহ: বাওয়ালিদের ন্যায় এরাও ছোট-বড় নৌকায় দলবদ্ধভাবে বনের ভেতরে প্রবেশ করে।[৪৮৯] বনে উঠেই দলের সব ভাগ-ভাগ হয়ে গোটা বনের চাতারে ছড়িয়ে পড়বে। একজন নৌকায় থাকে, রান্না করা, নৌকার দেখাশুনা আর মধু সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকেন তিনি। বাকিরা বনের ভেতরে মৌমাছির পিছনে ছুটতে থাকেন মৌচাকের সন্ধানে। এক-এক ভাগে তিনজন করে। তিনজন না হলে মৌ-ভাঙা যায় না। একজনে লম্বা লাঠির মাথায় হেঁতালের কচি ও শুকনো পাতা মেশানো মোড়ায় বা পোলেনে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়ার সাহায্যে চাক থেকে মৌমাছি তাড়াবে, দ্বিতীয় জনে মন্ত্র পড়ে, মানে বনবিবিকে স্মরণ করে, ছালা দিয়ে মাথা ও দেহ ঢেকে গাছে উঠে কাস্তের সাহায্যে চাক কাটবে; আর তৃতীয় জনে নিচে ধামা পেতে চাকের খণ্ডগুলি ধরবে। তিনজনের এই নির্দিষ্ট কাজ বাঁধা। কিন্তু তার আগে সবাইকে লাইন ধরে গাছের ডালে ডালে বা ঝোপের আড়ালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁজে বের করতে হবে কোথায় চাক আছে। তিনজনেরই কাছাকাছি থাকার কথা এবং সে চেষ্টাও তারা করে। কিন্তু বনের চাতাল, তাও আবার সুন্দরবনের চাতাল–কোথাও সিক্ত কাদামাটি, কোথাও পিচ্ছিল পলিমাটির প্রলেপ, কোথাও বা ঝোপঝাড়, আর সর্বত্র শূলো।[৪৯০] 'উঁকো বা তড়পা' দিয়ে ধোঁয়া তৈরি করা হয় এবং এদের অবলোকন করার সাথে মৌমাছিরা মৌচাকের দিকে ছুটে চলে মৌচাক রক্ষার জন্য। এভাবে মৌয়ালরা মৌচাকের সন্ধান করে।[৪৯১] মধুর চাকের মৌমাছিকে স্থানীয়রা দুইভাগে ভাগ করে। বোঝাই পোকা ও খালিন পোকা। গাছ থেকে মধু খেয়ে যেসব মৌমাছি চাকে ফিরে আসে তাদের বোঝাই পোকা বলে। বোঝাই পোকা বলার কারণ এসময় তাদের শরীর ভারী থাকে। তাই এরা এসময় অন্য কোথাও যায় না। চাকবরাবর উড়ে চলে আসে। এদের পেছন পেছন আসলে মধুর চাকের সন্ধান পাওয়া যায়। আর খালিন পোকা চাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে বের হয়। এরা চাকের চারপাশে ঘুরতে থাকে এবং অন্যদের মধুর উৎসের সন্ধান দেয়।[৪৯২] নতুন পাতা গজাতে শুরু করলেই বোঝা যায় মধুর মৌসুমের সূচনা হয়।[৪৯৩]

বাওয়ালিদের ন্যায় মৌয়ালরাও মহাজনের দাদন নিয়ে বা মজুরীর ভিত্তিতে বনে মধু সংগ্রহ করতে আসে। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে সুন্দরবনে মধু সংগ্রহকারী খুলনার কয়রার পাঁচ নং এলাকার অধিবাসী খলিল ঢালীর মতে- মধু আহরণের জন্য বনবিভাগ থেকে মধু সংগ্রহের জন্য বাংলা সনের চৈত্র মাসের ১৮ তারিখে পারমিট দেওয়া হয়। আটজনের একটি দল একমাসের জন্য মধু সংগ্রহে যায়। একমাস পর পর ১৫ দিনের বিরতিতে বছরে তিন মাস মধু আহরণের সুযোগ আছে।[৪৯৪] মৌয়ালদের প্রধানকে বলা হয় সাজুনী। এছাড়া কাটনি বাউলি থাকে দুজন।

৪৮৯. এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২।

৪৯০. শিবশঙ্কর মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ-২৪৫-২৪৬

৪৯১. এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২।

৪৯২. ঐ।

৪৯৩. ঐ।

৪৯৪. সুন্দরবনের বনজীবী, কষ্টই যেন জীবীকা, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ১৮ নভেম্বর ২০১৩।

কাটনি বাউলিরা প্রধানত মধুর চাক কাটে। মৌয়ালের একটি দলে দুজন আড়ি বাউলি থাকে। এরা মধু কাটার সময় বাঁশ বা বেতের আড়ি নীচে ধরে রাখে। তারপর তারা বন থেকে মধু ও চাক বহন করে নৌকায় নিয়ে আসে। সুন্দরবনের ভারতীয় অংশে মৌয়াল দলের প্রধানকে বলা হয় দোহাসি। এছাড়া যারা গাছে উঠে তাদের গাছি, নৌকায় যে রান্না করে তাকে গাঙ নেয়ে, গুনিনকে বলা হয় বগরদার এবং মধুপাত্র বহনকারীকে আড়িদার বলা হয়।[৪৯৫]

মৌমাছির তৈরি চাকের প্রাথমিক পর্যায়ে দেখতে বাঁকা কাস্তে বা অর্ধচন্দ্রাকৃতির মতো। এই চাককে তাই চান চাক বলা হয়। বনজীবীদের কাছে এটি পবিত্র চাক। কোনোভাবেই এই চাকের ক্ষতি করা হয় না।[৪৯৬] চাক তৈরির সময় ডালে একধরণের প্রলেপ দেয়া হয়। এটা মূলত বসতির চিহ্ন। পরের বছর আবার চাক তৈরির ক্ষেত্রে কাজে লাগে। মৌয়ালরা এই প্রলেপের চিহ্ন যাতে মুছে না যায় তাই খুব সাবধানে চাক কাটে।[৪৯৭] কিছু কিছু চাক আছে জোয়ারের কারণে পানিতে ডুবে যায় এগুলোকে বলা হয় ডুবি চাক। এসব চাক থেকে কাঁকড়া রস খেয়ে ফেলে।[৪৯৮] মৌয়ালদের মতে প্রতিবছর নিয়ম করে চাক না কাটলে পরের বছর চাকের পরিমাণ কমে যাবে। কারণ চাক থেকে মধু সংগ্রহ করা হয় বলেই মৌমাছিরা আবার স্থল থেকে মধু সংগ্রহ করতে যায়। মধু সংগ্রহ করা না হলে চাকে জমানো মধু খেয়েই তারা সময় কাটাত। এতে করে অলস ও ভারী পোকা হয়ে যেত এবং এ কারণে তাদের শক্তিও কমে যেত। আর মৌমাছিরা যদি অলস সময় কাটায় এবং বনে বনে গিয়ে ফুলে ফলে না যায় তাহলে গাছের মিলন বন্ধ হয়ে যাবে।[৪৯৯]

সুন্দরবনের মধু সংগ্রহের এমনই একটি বিস্তারিত প্রক্রিয়া নিম্নে তুলে ধরা হলো-

০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ সকাল ১০টার দিকে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় বুড়িগোয়ালিনী স্টেশন এলাকায় আনুষ্ঠানিকতা শেষে অন্যদের মতো সুন্দরবনের উদ্দেশে রওনা দেয় সিংহড়তলী গ্রামের মৌয়াল দলটি। মালঞ্চ নদীতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা নৌকা চালিয়ে বেলা তিনটার দিকে ফিরিঙ্গির চরে পৌঁছায় তারা। দলনেতা আজিবার রহমান প্রায় ৭০ হাজার টাকা খরচ করে ১৪ দিনের চালান নিয়ে তাঁর ৭ সদস্যের দলটি সুন্দরবনে ঢুকে। মধু মৌসুম শুরুর আগে কমবেশি বৃষ্টি হওয়ায় বিগত বছরের তুলনায় বেশি মধু সংগ্রহের প্রত্যাশা তাঁর। আজিবারের মতো ইউনস গাজী, শামছুর রহমান ও আশরাফ গাজীসহ আরও অনেক মৌয়াল দল মধু মৌসুমের শুরুতে সাতক্ষীরা রেঞ্জ দিয়ে সুন্দরবনে ঢুকে। ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ সকালে বন বিভাগের আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাঁরা প্রত্যেকে সুন্দরবেনর নির্ধারিত গন্তব্যের উদ্দেশে লোকালয় ছাড়েন। প্রথম দফায় পাস নিয়ে বনে ঢোকে এসব মৌয়াল দল ১৪ দিন সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করবে। প্রতিটি দলে ৭ থেকে ১৪ জন মৌয়াল রয়েছেন। দাতিনাখালী গ্রাম থেকে আসা দলের সাজোনি সামছুর

---

৪৯৫. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, পূর্বোক্ত।*

৪৯৬. ঐ।

৪৯৭. ঐ।

৪৯৮. ঐ।

৪৯৯. ঐ।

রহমানের অভিযোগ, তিনটি বনদস্যু দলকে ৪০ থেকে ৮০ হাজার টাকা দিয়ে বনে ঢুকতে হয়েছে। তার ভাষায়, বাঘের উপদ্রহ করলেও বনদস্যুদের হাত থেকে রেহাই মিলছে না। মধু সংগ্রহরে পাস নেওয়ার আগেই বনদস্যুদের নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করে বিশেষ 'রসিদ' নিতে হয়।

চোখ-কান সতর্ক রেখে বাঁ হাতে দা ও ডান হাতে থাকা লাঠি দিয়ে ঝোপঝাড় আর লতাপাতা সরিয়ে এগোতে থাকেন সাজোনি (দলপতি) আজিবার রহমান। তাঁর পেছনে নিশ্বাস ফেলা দূরত্ব এক হাত দা ধরা কাটুনি বাবলে (গাছে উঠে চাক কাটতে নির্ধারিত ব্যক্তি) জহুরুল ইসলাম আরও সতর্ক। সামনের দুজনকে অনুসরণ করে আড়িয়ালা (হাঁড়ি অথবা পাতিল ধরা ব্যক্তি) কেরামত আলী এগোতে থাকেন সমানতালে।[৫০০] এভাবে মিনিট ত্রিশের পথ চলার পর কাটুনি বাবলে জহুরুল ইসলাম 'আল্লাহ আল্লাহ' চিৎকার দিতেই দাঁড়িয়ে যান সবাই। সাজোনির দেখানো পথ ধরে এগিয়ে আসা দ্বিতীয়, তৃতীয় আড়িয়ালা ও তাঁদের দুই সহকারীসহ সবাই একত্র হন। দলের সপ্তম সদস্য (ভল লেইয়ে) নৌকা পাহারার দায়িত্বে থাকলেও কড়চালক (দিক নির্ণয়ক) জাহিদ হোসেনের সংকেত পেয়ে সমবেতরা তৈরি হয়ে যান বছরের প্রথম মৌচাক কাটতে। লতপাতা দিয়ে তৈরি কাড়ুতে (চাকের ধোঁয়া মৌমাছি তাড়ানোর কাজ ব্যবহৃত) আগুন জ্বালনি চাকের নিচে ধোঁয়া দিতে শুরু করেন মনিরুল ও জবের আলী। সাজোনিকে পাহারার দায়িত্বে রেখে মুহূর্তের মধ্যে প্রায় ৩০ ফুট উচ্চতায় থাকা চাকের কাছে পৌঁছে যান কাটুনি বাবলে জহুরুল। নিচে দাঁড়িয়ে ধামা (বেত দিয়ে তৈরি পাত্রবিশেষ) পেতে সমদূরত্ব থেকে আসা মৌচাক ধরে নেন আড়িয়ালা কেরামত আলীসহ সঙ্গী দুজন। আধা ঘণ্টারও কিছু বেশি সময় নিয়ে প্রথম চাক সংগ্রহের পর এইভাবেই দলটি এগিয়ে চলে নতুন মৌচাকের সন্ধানে।[৫০১]

মধু সংগ্রহ সম্পর্কিত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ-

প্রতিবছরের মতো ১ এপ্রির থেকে বন বিভাগের অনুমতি নিয়ে মৌয়াল দলগুলোর মধু সংগ্রহের জন্য সুন্দরবনে যাচ্ছে। গতকাল সকাল ১০টার দিকে বুড়িগোয়ালিনী ষ্টেশন অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে মৌয়ালদের হাতে মধু সংগ্রহের পাস দেওয়া হয়। বুড়িগোয়ালিনী ষ্টেশন কর্মকর্তা সুলতান আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক এম এ হাসান। নির্দেশনামূলক বক্তব্যের পর মৌয়ালদের হাতে 'পাস' তুলে দেন এম এ হাসান। পশ্চিম সুন্দরবনের চারটি ষ্টেশন থেকে প্রথম পর্যায়ে দুই শতাধিক মৌয়াল দলকে অনুমতিপত্র দেওয়া হয়েছে। মৌয়ালদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতিটি দলে সাতজন থেকে নয়জন সদস্য থাকেন। প্রথম পর্যায়ে তারা ১৫দিন সুন্দরবনে মধু ও মোম সংগ্রহ করে ফিরে আসবেন। পরে আবার সুন্দরবনে যাবেন। এভাবে টানা দুই মাস ৩১ মে পর্যন্ত সুন্দরবন থেকে মধু ও মোম সংগ্রহ করা হবে। এদিকে এবার আশানুরূপ মধু পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ের কথা জানিয়েছেন মৌয়ালেরা। তাঁরা বলেন, আগাম বৃষ্টি না হওয়ায় এবং চোরাইভাবে মধু সংগ্রহ করায় এবার মধু কম পাওয়া যেতে পারে এদিকে গত কয়েক বছর সুন্দরবনে বাঘের উপদ্রব না থাকায় মৌয়াল দলগুলো অনেকটা বির্বিঘ্নে মধু সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু এ বছর গোলপাতা মৌসুমের শেষ দিকে পশ্চিম সুন্দরবনের পায়রাটুনি এলাকায় বাঘের আক্রমণে এক বনজীবী নিহত হন। এ ঘটনায় মৌয়াল দলের সদস্যরা কিছুটা আতঙ্কে রয়েছেন।[৫০২]

মধু সংগ্রহে বাঘের আক্রমণ: দুই ভাগে ভাগ হয়ে বনে ছড়িয়ে পড়া মৌয়ালদের বিপদজ্জনক পরিস্থিতি যোগাযোগের জন্য কু ধ্বনি ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে করে আনা লাঠি বা হাতিয়ার দিয়ে আক্রমণের হাত থেকে

৫০০. সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ শুরু, প্রথম আলো ২০ চৈত্র ১৪২৫, ৩ এপ্রিল ২০১৯।

৫০১. ঐ।

৫০২. অনুমতি পেয়েই সুন্দরবনে গেলেন মৌয়ালেরা, প্রথম আলো, পূর্বোক্ত।

বাকিরা চেষ্টা করলেও অনেকে হয়তো চিরতরে বিলীন হয়ে যায় বনের পরাক্রমশালীর থাবায়।[৫০৩] সংগ্রহীত মধু পাশ্ববর্তী বাজারে তারা বিক্রি করে। এক্ষেত্রে বাওয়ালি, মৎসজীবী বা অন্যান্য জীবিকার মানুষের চেয়ে মৌয়ালরাই সবচেয়ে বেশি বাঘের আক্রমণের শিকার হয়।[৫০৪]

> *"তাহারা উর্ধ্বমুখী হইয়া মৌচাকের নেশায় ছুটিবার সময় অসাবধান মুহূর্তে বাঘে আক্রমণ করে। মৌয়ালদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র থাকে না এবং অগম্য ও ভসঙ্কুল জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে অতিকষ্টে মধু সংগ্রহ করতে হয়। ইহারা কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। তাহাদের নিকট জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য।"*[৫০৫]

তাছাড়া তারা মধু সংগ্রহের জন্য গাছের শাখায় চড়ে বেড়ায়। মৌমাছির আক্রমণ অনেক সময় বাঘের ভয়কেও হার মানায়। তাই বলা হয় বনের বাঘ-হরিণ সমৃদ্ধশালীদের জন্য সৌখিনতা আর বনের কাঠ ও মধু হলো দীন-দরিদ্রের জীবিকা।[৫০৬] মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের শিকার হওয়া এমনই একটি ঘটনা নিম্নরূপ-

> *নরখাদক উল্লম্ফলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গেঁয়ো গাছটার গোড়ায় ছিলো হাতদুই উই-এর ঢিবি, তারই উপর দাঁড়িয়ে ভজহরি গুড়ি জাপটে ধরেছিলো। বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝুলেই আবারও লাফ দিয়ে তার কাঁধ ও গর্দান কামড়ে ধরে টেনে নিতে চায়। প্রথমে এক থাবা পিঠে মেরে আমূল নখবিদ্ধ করেছে। আরেক থাবা ভজহরির ডান বাহুর উপর।ভজহরি যেমন 'মা-মা-মা' করছে, তেমনি তা শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিষ্ঠ হাত দুটোকে কিছুতেই মুক্ত হতে দেবে না, মরে গেলেও না–এই তার পণ।নরখাদক তার গলা এগিয়ে এবার ভজহরির ঘাড়কে করাল গ্রাসের মধ্যে আনতে চায়। কিন্তু আনবে কি! পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়েই তো গলা বাড়াতে হবে। ইউ-এর ঢিবির মাটি ওর সুচোলো বক্র নখের চাপে ঝুরঝুর করে ঝড়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নরখাদকও ঝুলে পড়ে।*[৫০৭]

মৌয়ালদের প্রশিক্ষণ:

বনের মধ্যে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে প্রাই হারায় মৌয়ালরা। অন্যদিকে মৌচাকে দেওয়া তাঁদের আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হয় বন। তাই মধু সংগ্রহ করতে নামার আগে বন ও মৌয়ালদের সুরক্ষায় বনবিভাগ কর্তৃক বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। ২০১৯ সালে খুলনার কয়রা উপজেলার ৬ নম্বর কয়রা গ্রামে সচেতনতা ও

৫০৩. এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২।

৫০৪. ঐ, পৃ. ১৯৩।

৫০৫. ঐ।

৫০৬. ঐ, পৃ. ১৯৪।

৫০৭. শিবশঙ্কর মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ-৭৬।

সুরক্ষামূলক এরকম প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।[৫০৮] সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি না করে ও মৌয়ালরা নিরাপদে থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বন থেকে যাতে মধু সংগ্রহ করতে পারে, সে বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মৌচাকে শুধু ধোঁয়া ব্যবহার করা, চাক কাটার দা-ছুরি পরিচ্ছন্ন রাখা, চাক থেকে মধু বের করার সময় হাতে গ্লাভস ব্যবহার করা, পরিষ্কার পাত্রে মধু সংরক্ষণ করা এবং মধুর পাত্র ঢেকে রাখার জন্য মৌয়ালদের পরামর্শ দেওয়া হয়।[৫০৯]

সংরক্ষিত সুন্দরবন বনাঞ্চলের মধু এবং মোম উন্নতকরনে করনীয়: মাওয়ালদের জন্য ছবি সহ একটি সহায়িকা

সুন্দরবনের মধুতে বেশী মাত্রায় পানি থাকে। এই কারণে মধুতে প্রাকৃতিকভাবে যে ইষ্ট থাকে তা খুব অল্প সময়ের মধ্যে মধুকে গাঁজিয়ে তোলে এবং মধুতে অল্প পরিমান অ্যলকোহল তৈরী হয়। এজন্য মধু থেকে খারাপ গন্ধ পাওয়া যায়। এমনকি যে মধু পরিপক্ক মৌ-চাক হতে সংগৃহীত হয় তাতেও প্রচুর পানি থাকে। যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ২৪% এর উপরে। কিন্তু অপরিপক্ক চাক হতে যে মধু নির্যাস পাওয়া যায় তাতেও উচ্চমাত্রার পানি থাকে। মধু পানিগ্রাহী পদার্থ, তাই এটি বাতাস থেকে পানি সংগ্রহ করে। আহরিত মধু সবসময় বায়ু নিরোধক পাত্রে রাখা উচিৎ।[৫১০]

তাই বন থেকে আহরিত মধুর গুণাগুণ ভাল রাখার জন্য এবং তা থেকে অধিক মুনাফা পাওয়ার জন্য, ARCADIS Euroconsult Netherlands, Winrock International, USA & Nature conservation Management Bangladesh ভাল গুণাগুণ সম্পন্ন মধুর জন্য একটি ম্যানুয়াল তৈরি করেছে। নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করলে মধু আহরণ পদ্ধতি মৌ মাছির জন্য ক্ষতিকর হবে এবং ভালো মধু পাওয়া যাবে।-

৫০৮. সুন্দরবনে মধু সংগ্রহকারীদের সুরক্ষায় প্রশিক্ষণ, ৩ এপ্রিল ২০২১, ২০ চৈত্র ১৪২৭

৫০৯. ঐ।

৫১০. Mr. Michael Burgett, An illustrated Manual for Honey Hunters, International Notes in No.59, ARCADIS Euroconsult Netherlands, Winrock International, USA & Nature conservation Management Bangladesh, March 2002.

<u>ধাপ-১:</u>

কোন ধরণের মৌ-চাক আপনি সংগ্রহ করবেন।

- শুধুমাত্র মৌ-চাকের পরিপক্ক অংশ কাটুন।

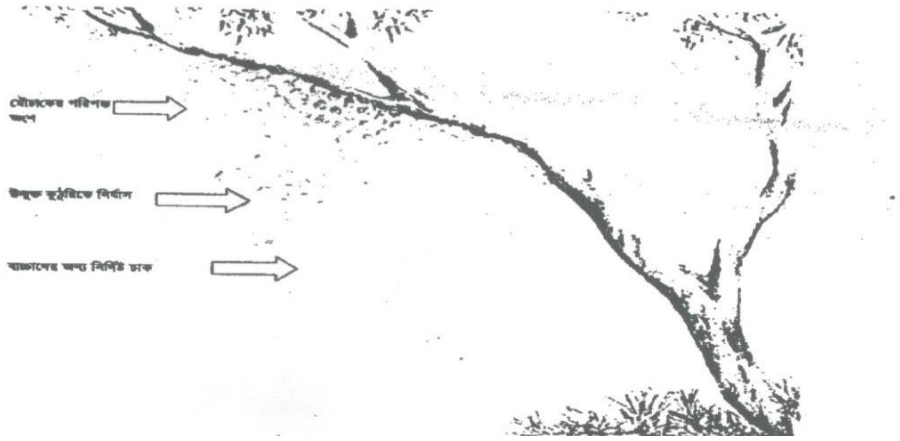

<u>ধাপ-২</u>

- এটি থেকে যে মধু আপনি পাবেন তাতে সব থেকে কম পানি থাকবে।
- অপরিপক্ক চাক হতে নির্যাস সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকুন।
- মৌ-চাকের যে অংশে ডিম, লার্ভা এবং পিউপা থাকে সে অংশ কাটা থেকে বিরত থাকুন।

<u>ধাপ-৩</u>

❖ মৌ-মাছি এবং মৌচাক সরাসরি আগুন দিয়ে পোড়ান থেকে বিরত থাকুন। একাজে শুধুমাত্র ধোঁয়া ব্যবহার করুন।

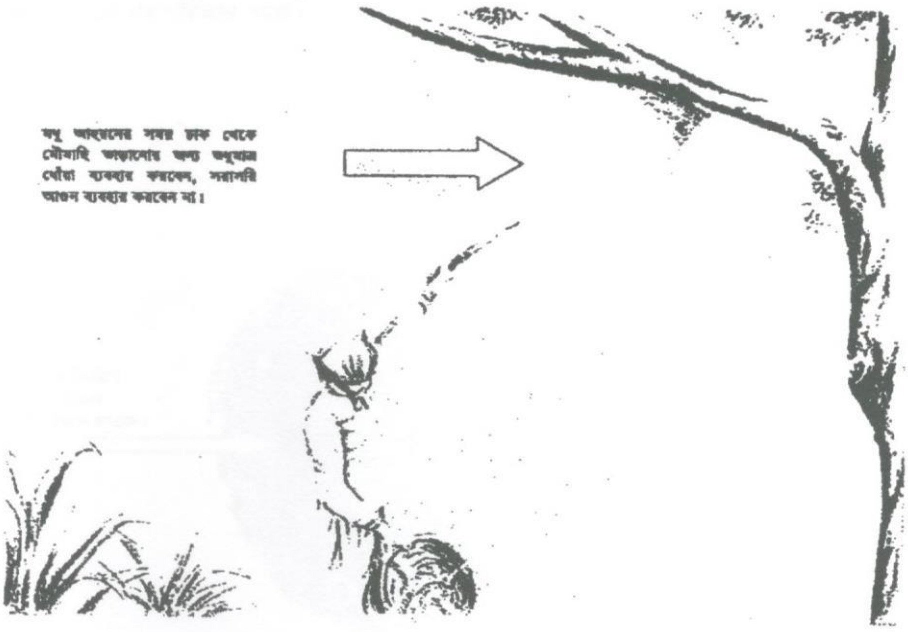

<u>ধাপ-৪</u>

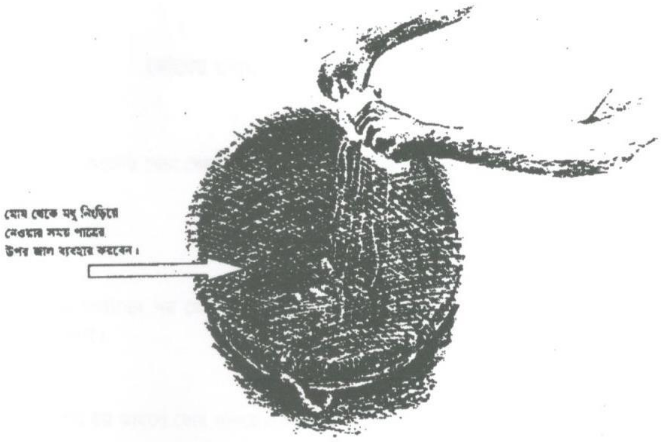

মধু সংরক্ষণে করনীয়: প্রচলিত যে পাত্র মধু সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয় তা বাহিরের বাতাস থেকে মধুকে ভাল রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। মধু সংরক্ষণে পরিষ্কার এবং বায়ু নিরোধক পাত্র ব্যবহার করতে হয়। যেহেতু মধু বাতাস হতে পানি শোষণ করে, তাই মধু কোন ভাবেই যেন বাতাসের আর্দ্রতার সংস্পর্শে না যায় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

মোম আহরণে করনীয়: সুন্দরবনের মৌচাক হতে যে মোম পাওয়া যায় তা অত্যন্ত উচ্চমানের। তবে মোম যত সাদা হবে তার গুণাগুণ তত ভাল এবং মূল্যও বেশি পাওয়া যায়। মোমের গুণাগুণ ভাল রাখতে নিম্নলিখিত পদ্ধতি গ্রহন করতে হবে-

গাঢ় অংশের মোম থেকে সাদা অংশের মোম আলাদা করে রাখতে হবে। মধু সংগ্রহের পর মোমকে যথাসম্ভব বেশী পানি দিয়ে ধৌত করুন যা অবশিষ্ট মধু, মোম থেকে আলাদা করবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে গলিয়ে একটি সুক্ষ জালের উপর দিয়ে প্রবাহিত করুন। জঙ্গলে এটি আপনার জন্য কষ্টকর হলে, আপনি বাড়িতে একটি সৌর শক্তি চালিত মোম গলক বসাতে পারেন। তখন জঙ্গল থেকে ফিরে এসেও আপনি মোম আলাদা করার কাজ করতে পারবেন।

জাতীয় জীবনে মৌয়ালদের গুরুত্ব হলো- গ্রীষ্ম ও বসন্তে দলবদ্ধ হয়ে পরিবার পরিজনের জীবিকায় তারা বনে প্রবেশ করে। মৌয়াল বা মাওয়ালিরা যখন মধু আর মোম সংগ্রহের জন্য গাছে উঠে, তখন তারা গাছ বেয়ে উঠা লতা ও পরগাছাগুলো পরিষ্কার করে। এতে গাছের উপকার হয়।[৫১১] সাতক্ষীরা রেঞ্জের বুড়িগোয়ালিনী ষ্টেশন কর্মকর্তা মো. কবিরউদ্দিনের মতে ২০১৯ সালে মধু সংগ্রহ চলেছে ১ এপ্রিল থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত। সেই মৌসুমে সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ হাজার ৫০ কুইন্টাল আর মোম ২৬৫ কুইন্টাল।[৫১২] সুন্দরবনের মৌয়ালদের নিয়ে তাই জনশ্রুতিতে বলা হয়-

মৌয়ালীদের জীবন চলে মোম আর মধুর পরে্
সুন্দরবনের মধুর ক্যাতি আছে জগৎ ভরে।।
মরার আগে মিলাদ দিয়ে মৌয়ালীদের দলে।
জীবন বাজি রেখে তারা মধুর খোঁজে চলে।।[৫১৩]

মৌয়ালের সাক্ষাৎকার: নিম্নে মৌয়ালের সাথে মধু আহরণ সম্পর্কিত একটি সাক্ষাকার তুলে ধরা হলো-[৫১৪]

---

৫১১. গওহার নঈম ওয়ারা, ঘূর্ণিঝড় ইয়াস: সুন্দরবনকে পরের ঝড়ের জন্য তৈরি করতে হবে, দৈনিক প্রথম আলো ২ জুন ২০২১। (https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment),

৫১২. সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ শুরু, প্রথম আলো ২০ চৈত্র ১৪২৫, ৩ এপ্রিল ২০১৯

৫১৩. সুন্দরবন ফ্লিপ চার্ট, উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

পাভেলঃ মধু সংগ্রহের সময় কখন?

সঞ্জয়ঃ সুন্দরবনে মধু সংগ্রহের মৌসুম চৈত মাস থেকে দুই মাস সংগ্রহ করা যায়। অন্য সময় এটা পাওয়া যায়না।

পাভেলঃ সচারচর কত জনের দলে সুন্দরবনে ঢুকেন মধু সংগ্রহের জন্য?

সঞ্জয়ঃ মনে করেন যে আট থেকে নয় জন অথবা কম আছে চার-পাঁচ জনও যায় কখনো।

পাভেলঃ মৌচাকের অবস্থানটা খুঁজে পান কিভাবে, যে এই স্থানে মৌচাক আছে?

সঞ্জয়ঃ অনেক সময় পোকার দিক ধারণা করে যেতে হয়। আবার অনেক সময় পুন্ন কান বসে। আমাদের যে, মানে দেখা থাকে আরকি। প্রতোক বছর বছর যে সব জায়গায় বসে, সেসব জায়গাগুলো অনেক সময় বসে। তখন ওসব গুলো দেখলে অনেক সময় পাওয়া যায়। আবার মনে করেন যে ঘুরে ঘুরে খুঁজতে হয় আরকি এ মৌগুলো।

পাভেলঃ মধু সংগ্রহের পদ্ধতিটা কী?

সঞ্জয়ঃ জঙ্গল থেকে হচ্ছে পাতা, মানে গাছের পাতা নিয়ে, শুকনো পাতা নিয়ে ধোঁয়া করে দিতে হয়। ধোঁয়ায় পোকাগুলো উঠে গেলে আমরা কাটি।

পাভেলঃ মধু সংগ্রহের সময় বাঘের সতর্কটা কিভাবে নেন? বাঘ হঠাৎ আক্রমন করলে এ জন্য বাজি-পটকা ফুটান, এর বাইরে আর কী কী করেন?

সঞ্জয়ঃ এর বাইরে মনে করেন যে আমাদেও হাকাহাকি ছাড়া জঙ্গলে উপায় নেই। বাজি, পটকা অনেকে ড্রাম বা অন্য কিছু নিয়ে যায়।

পাভেলঃ ড্রাম বা থালাবাটি দিয়ে শব্দ করে?

সঞ্জয়ঃ শব্দ করে।

পাভেলঃ মধুর কত প্রকারভেদ আছে আপনারা যে মধু সংগ্রহ করেন?

সঞ্জয়ঃ মধু মনে করেন যে তিন থেকে চার প্রকারের আছে।

পাভেলঃ কী কী?

সঞ্জয়ঃ খলসির মধূ, বানীর মধু, গরান মধু এবং গেওয়া মধু।

পাভেলঃ মধু চাক যে গাছে থাকে সেই গাছের নামে মধু?

সঞ্জয়ঃ না, না এটা হচ্ছে ফুলের সাথে সম্পর্কিত।

পাভেলঃ এর মধ্য থেকে কোন মধুটা সব থেকে ভালো হয়?

সঞ্জয়ঃ খলসির মধু।

পাভেলঃ বনের ভিতরে অবস্থানকালে ঝড়-বৃষ্টি হলে তখন কি করেন?

---

৫১৪. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: সঞ্জয় কুমার, পেশা: মৌয়াল, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: মো. আসাদুল্লাহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ৯ টা ৪৮ মিনিট।

সঞ্জয়ঃ সে সময় আমরা ছোট নদীতে চলে আসি। মানে ছোট ছোট খালের ভিতরে।

পাভেলঃ তারপর নৌকার ভিতরেই থাকেন?

সঞ্জয়ঃ নৌকার ভিতরে ঐ ছেই, কাগজ মুড়ি দিয়ে থাকতে হয়।

পাভেলঃ মধুগুলো আনার পর কি করেন?

সঞ্জয়ঃ মধুগুলো রস বের করে বেচি দেই।

পাভেলঃ প্রত্যেক চাক থেকে কী পরিমাণ মধু পাওয়া যায়?

সঞ্জয়ঃ চাক ছোট-বড়তো আছে। এখন ওর থেকে মনে করেন যে, কোনটায় ৫ কেজি, ৭ কেজি আবার ১ কেজি এই রকম।

পাভেলঃ কেওড়ার কোন মৌসুম আছে?

মিলন সরদারঃ এটা হচ্ছে আপনার এই তৃতীয় সময়। মানে প্রথম হচ্ছে খলসি, দ্বিতীয় হচ্ছে তোমার গোরান, তৃতীয় হচ্ছে আপনার বাইন, চতুর্থ আপনার কেওড়া, পঞ্চম হচ্ছে আপনার গেবো। এই মধুর সিজন শেষ। কেওড়া আর মধুটা এই দুই সময়ের ভিতরে। এগুলো একের পর এক গাছে ফুল ফোটে। ফুলের ধারনায় তোমার হচ্ছে ফলও হয়। এবার একেক সময় যে ফলটা হয়, যে ফুলটা ফোটে, ঐ ফুলের সময়, একেক সময় ফুল থেকে রস নিয়ে পোকা মধু তৈরি করে চাকে ভরে।

৩.১২ জেলেঃ

সমুদ্র উপকূলবর্তী, বিভিন্ন নদী ও খালের সংমিশ্রণে এই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের মাছ পাওয়া যায়। পেশে মাছ, চিংড়ি মাছ, ভেটকী মাছ, দেতনি মাছ, পায়রা মাছ, ফেসা মাছ, জাবা মাছ, কাইন মাছ বিভিন্ন রকমের মাছ পাওয়া যায়।[৫১৫] তাই দেখা যায় অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী মৎস্য আহরন ও মৎস্য ব্যবসায় নিয়োজিত। বন বিভাগের তথ্য মতে, ৬ হাজার ৬০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের পূর্ব ও পশ্চিম সুন্দরবনের ৫২ শতাংশ এলাকা অভয়ারণ্য। নিষিদ্ধ বন এলাকায় প্রবেশে প্রশাসনের রয়েছে ব্যাপক নজরদারী। বনে ৪৮ শতাংশ জায়গার নদী ও খাল জেলেরা সাধারণত মাছ, মধু ও কাঁকড়া আহরণ করেন।[৫১৬] অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চলে পুকুর, জলাশয় ও দিঘীর পরিমাণ অধিক। আশাশুনি, দেবহাটা, কলারোয়া, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা সদর ও তালা উপজেলার তুলনায় সুন্দরবন সংশ্লিষ্ট শ্যামনগর এলাকায় মৎস্যজীবীর সংখ্যা বেশি। ২০০৯-২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় এই অঞ্চলে মৎস্যজীবীর সংখ্যা ছিল ২,৯২০ জন এবং ৬,৫০৪ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয়। ২০১০-২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী মৎস্যজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২,৯৩০ জনে এবং মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬,৮১৪ মেট্রিক টন।[৫১৭] খুলনার দাকোপ উপজেলার অর্থনীতি মূলত কৃষি

---

৫১৫. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: কাঞ্চন সরদার, পেশা: গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়ন। গ্রাম: বনবিবিতলা, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৫১৬. জেলেদের মানবেতর জীবন, প্রথম আলো ২৬ আগস্ট ২০১৯, ১১ ভাদ্র ১৪২৬।

৫১৭. Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh 2011, District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p. 45.

এবং চিংড়ি চাষের উপর নির্ভরশীল। এই অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে চিংড়ি ঘেরগুলোতে বাগদা চিংড়ির চাষ হয়।[৫১৮] ২০০৯-১০ সালে দাকোপে জেলের সংখ্যা ছিল ২,৪৯২ জন এবং উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ছিল ৩,৬৯৬ মেট্রিক টন। ২০১০-১১ সালে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,৭৮৮ মেট্রিকটন। ২০০৯-১০ সালে কয়রা উপজেলায় জেলের সংখ্যা ছিল ১৬৬৫০ জন এবং উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ছিল ১১,৮০০ মেট্রিক টন। ২০১০-১১ সালে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২,২০০ মেট্রিকটন এবং জেলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭,১৭৫ জন। তবে পাইকগাছা উপজেলায় জেলে ও উৎপাদিত মাছের পরিমাণ তুলনামুলক কিছুটা কম।[৫১৯]

চিত্র-১৭ (ক): সুন্দরবনে মাছ ধরার দৃশ্য (সূত্র: জাগো নিউজ)

বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, প্রতি মাসে পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় গোন মাছ বেশি ধরা পড়ে। এ কারণে পূর্ণিমার আগে ও পরে মিলে সাত দিন এবং অমাবস্যার আগে ও পরে মিলে সাত দিন জেলেদের মাছ ধরার অনুমতি (পাস) দেওয়া হয়। আর ওই সময় জেলেরা সুন্দরবনে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে যান। প্রতি গোনে ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার জেলেকে মাছ ও কাঁকড়া ধরার পাস দেওয়া হয়। ওই মাছ ধরা পেশার সঙ্গে যুক্ত সুন্দরবন সংলগ্ন খুলনার পাইকগাছা, কয়রা, দাকোপ এলাকার জেলেরা। এ ছাড়া সাতক্ষীরার শ্যামনগর, আশাশুনি এবং বাগেরহাটের মোংলা, শরণখোলা এলাকাসহ সুন্দরবন সংলগ্ন বেশির ভাগ এলাকায় মানুষ মাছ ও কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে।[৫২০] কয়রা উপজেলার ৫ নম্বর কয়রা গ্রামের আবদুল জলিলের পেশা সুন্দরবনে মাছ ধরা। তিনি বলেন, সুন্দরবনে মাছ ও কাঁকড়া ধরে তাঁরা প্রতি গোনে ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা আয় করতে পারেন। এতে মাসে দুটি গোনে তাদের আয় হয় ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা।

৫১৮. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, (http://shyamnagar.satkhira.gov.bd/site/page), সাইটেশন: ১৮-০২-২০২০, সাইটটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছে ৩১-১২-২০২৮।

৫১৯. District Statistics 2011: Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-54.

৫২০. জেলেদের মানবেতর জীবন, প্রথম আলো ২৬ আগস্ট ২০১৯, ১১ ভাদ্র ১৪২৬।

চিত্র-১৭ (খ): নারী ও পুরুষ যৌথভাবে মাছ ধরার দৃশ্য

মাছ ধরার জালের কয়েক প্রকার রয়েছে। চরপাটা জাল, চরে ধরা জাল ও খালে ধরা জাল।[৫২১] মাছ বরফে রেখে ৬-৭ দিন বাড়িতে এনে বাজারে বিক্রি করা হয়।[৫২২] মাছ বেশি পাওয়া যায় ভাটার সময়। আর গোনে বড়শির দোন ফেলেও পাওয়া যায়। বড়শিতে ধরে জাবা মাছ, গাঙা টেংরা মাছসহ বিভিন্ন ধরনের মাছ। একেকজন তিন-চারশো বড়শি ফেলেন। নারীরাও মাছ ধরার কাজে যুক্ত হয়। স্বামী-স্ত্রী-সন্তান মিলে অনেকেই মাছ ধরেন। আবার ঘাই জালে টেনে চিংড়ি মাছ ধরা হয়। বাগদার পোনাও ধরা হয়।[৫২৩] মাছ ধরতে গেলে ৫ দিন ৬ দিন সময় থাকা লাগে। বর্তমানে বেশি সময় ধরে থাকতে হয় কেননা মাছের পরিমাণ কমে গেছে বনে। জেলে কাঞ্চন সরদারের আক্ষেপ-

> *আর আগে মেলা মাছ ছিলো, টক্করে (তাড়াতাড়ি) বাড়ি আসতো। এখন টক্করে আসতে পারেনা।*[৫২৪]

বনের পাস নিয়ে জেলেরা এক ভাটার পর যেতে পারে। বেশিদূর যেতে পারেনা। পাস খরচ নেওয়া হয় ৪০০ টাকা (জনপ্রতি)। মাছ, কাঁকড়া ও মধু সব পাসে একই খরচ। ৪০০ টাকা খরচ প্রতি পণ্যের।[৫২৫] জেলেরা বারো

---

৫২১. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: কাঞ্চন সরদার, পূর্বোক্ত।

৫২২. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: কাঞ্চন সরদার, পূর্বোক্ত।

৫২৩. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: পূর্ণিমা রানী, পেশা: মৎসজীবী এবং গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইত্তিয়াক পাভেল, সাক্ষৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৫২৪. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: কাঞ্চন সরদার, পূর্বোক্ত।

৫২৫. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পূর্বোক্ত।

মাস মাছ শিকার করেন। তবে গরম কালে মাছ পাওয়া যায় বেশি। তবে সেই সময় মাছ সংরক্ষণে খরচ পড়ে যায় বেশি। বরফ দিয়ে নিয়ে আসতে হয়। আর শীতকালে মাছ খুব কম। গোনমুখে তো মাছ বেশি পড়ে। এক এক নৌকায় দুইজন, তিনজন, চারজন করে মাছ ধরতে যাওয়া হয়। ৭ দিনের জন্য বা তিন দিনের জন্য যাওয়া হয়। মাছ প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে মাছ যদি আমদানি হয়ে যায় তখন চলে আসে। মাছ ধরে আড়তে বিক্রি করা হয়।[৫২৬]

চিত্র-১৮ (ক): বাগদিপাড়া জেলে পল্লী, চুনা গ্রাম, সাতক্ষীরা

চিত্র-১৮ (খ): বাগদিপাড়া জেলে পল্লী, চুনা গ্রাম, সাতক্ষীরা

৫২৬. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পূর্বোক্ত।

মাছ ধরার সময় ঝড় উঠলে সেই সময় আবডাল জায়গায় নৌকা বেধে রেখে আশ্রয় নিয়ে থাকে। অনেক সময় পানি বৃদ্ধি পেলে বা পশুর আক্রমণ হলে বাধ্য হয়ে গাছে উঠতে হয়। পানিতে থাকলে বাঘের সতর্কও বোঝা যায় না। বাঘ জোয়ারের সময় পানিতে ডুবে থেকে জেলেদের আক্রমণ করে। বাঘের আক্রমণ সবাইকে জানানো এবং তাড়ানোর জন্য পানিতে না হয় নৌকায় আঘাত করে শব্দ করা হয়। এতে অনেক সময় বাঘ চলে যায়।[৫২৭]

তবে ঝড় ও বাঘের আক্রমণ কোনো কিছুই তাদের এই পেশা থেকে পিছু হটাতে পারে না। বলা হয়-

> *এদের দুশো ঘরের মধ্যে পৌনে দুশো ঘরেই বিধাব সৃষ্টি হয়েছে মানুষ-খেকোর দৌরাত্মে। বাঘের দৌরাত্ম্যেই বা বলি কি করে! এদের যুবকদের বনে ওঠার নেশা আর মাছ মারার তাগিদ ও টানই কি কম দায়ী!*[৫২৮]

চিত্র-১৯: মাছ ধরতে যাওয়ার পূর্বমুহূর্ত (তথ্যসূত্র: জাগো নিউজ)

জেলে গোপাল সানার আক্ষেপ-

> *বাঘের সতর্ক দেখা যাচ্ছে যে বাঘ ডাকাডাকি করলি হয়তো দেখা যাচ্ছে ওপারে ডাকা-ডাকি করতি আমরা এপারে আসি। আবার অনেক সময় বাঘের ভয় আমরা করিনা। কেননা আমাদের জীবন-জীবিকা হচ্ছে উরির পরে। অনেক সময় বাঘের কবলে পড়ে কত মানুষ প্রান হারিয়েছে। আমাদের বাপ-দাদারা অনেক লোক চলি গেছে ঐ জঙ্গলের বাঘের পেটে।*[৫২৯]

বনবিভাগ কর্তৃক মাছ ধরার পাস বন্ধ রাখার নির্দিষ্ট সময়: সাম্প্রতিক সময় শত শত অসাধু জেলে সুন্দরবনে বিষ দিয়ে মাছ শিকারের ফলে মাছের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। সুন্দরবনে মৎস্য সম্পদ রক্ষা করতে ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহার নিষিদ্ধসহ ২৫ ফুট চওড়ার ৪৫০টি খালে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।[৫৩০] বন

---

৫২৭. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: পূর্ণিমা রানী, পেশা: মৎসজীবী এবং গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৫২৮. শিবশংকর মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২১।

৫২৯. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পূর্বোক্ত।

৫৩০. জেলেদের মানবেতর জীবন, প্রথম আলো ২৬ আগস্ট ২০১৯, ১১ ভাদ্র ১৪২৬।

বিভাগের কর্মকর্তাদের মতে, প্রতি বছরের এই সময়ে সমুদ্রের মাছগুলো ডিম পাড়ার জন্য সুন্দরবনে বিভিন্ন খালে আশ্রয় নেয়। তখন জেলেরা বেশি মাছ পান। তবে কিছু কিছু অসাধু জেলে আরও বেশি মাছ পাওয়ার আশায় খালে বিষ প্রয়োগ করেন। এতে অন্যান্য মাছের ডিমও নষ্ট হয়ে যায়, মারা যায় অনেক জলজ প্রাণিও। প্রভাব পড়ে জীববৈচিত্র্যের ওপরও। এজন্য ১ জুলাই থেকে মাছ ধরা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।[৫৩১] সুন্দরবন পশ্চিম বিভাগের বিভাগীয় বন সংরক্ষক (ডিএফও) মো. বশির আল মামুন বলেন, বছরের দুটি সময় ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তের পর দেশে ইলিশের উৎপাদন অনেক বেড়েছে। তেমনই প্রজনন মৌসুমে সুন্দরবনে মাছ ধরা বন্ধ করতে পারলে অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের উৎপাদনও বাড়বে। আগে সুন্দরবনের আশপাশের নদীতে প্রচুর মাছ ধরা পড়ত। কিন্তু এখন তা পাওয়া যায় না। এর কারণ মাছের পরিমাণ কমে যাওয়া। আগামী কয়েক বছর যদি এভাবে দুই মাস সুন্দরবন বন্ধ রাখা যায়, তাহলে মাছের উৎপাদন কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে।[৫৩২]

চিত্র-২০: জেলেনী কাঞ্চন সরদারের বাড়ি, বনবিবিতলা, সাতক্ষীরা।

পাস বন্ধকালীন জেলেদের মানবেতর জীবন: প্রতিবছর ১লা জুলাই থেকে দুই মাস সুন্দরবনে সব ধরনের মাছ ও কাঁকড়া ধরা বন্ধ করে দিয়ে থাকে বন বিভাগ। তবে অনেক সময় কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই নিষেধ দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল শত শত জেলে পরিবারে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। তারা অনাহরে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন কাটায়।[৫৩৩] সুন্দরবনে মাছ ও কাঁকড়া আহরণের পাস দেওয়া বন্ধ থাকায় তাঁদের পরিবারগুলোতে নেমে আসে চরম দুর্দশা। অন্য কোনো আয়ের উৎস না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা

৫৩১. ঐ।

৫৩২. ঐ।

৫৩৩. ঐ।

বেকার হয়ে ঘরে বসে থাকেন। সংসার চালাতে অন্যের কাছ থেকে টাকা ধার করেন। ধর্মীয় উৎসবে কোনো জেলে পরিবারেই স্বস্তি থাকে না। ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু করতে পারেনা জেলেরা।[৫৩৪] জেলেদের অভিযোগ, কোনো পূর্বঘোষণা না থাকায় তাঁরা অন্য কোনো পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন না। ফলে এ সময়টাতে তাঁদের অলস বসে থাকতে হয়।[৫৩৫] কিন্তু জেলে কার্ডে এক হাজার টাকার কম মূল্যের চাল পাওয়া যায়। এ চালে তাঁদের সংসার চলে না। এ ছাড়া দীর্ঘদিন মাছ ধরতে না পারায় হাতে কোনো টাকা থাকে না। দীর্ঘদিন ধরে পাস বন্ধ থাকায় তারা অলস সময় কাটায়। দুর্গম এলাকা হওয়ায় তাদের ওই এলাকায় অন্য কোনো কাজের সুযোগও নেই। প্রায় টানা দুই মাস বসে খেতে খেতে গচ্ছিত টাকা ফুরিয়ে যায়।[৫৩৬]

৩.১৩ কৃষিঃ কৃষি পরিসংখ্যান ২০১১ অনুসারে দেখা যায় এই অঞ্চলে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য যথা-ধান, পাট, গম, আখ, ডাল, দানাদার শস্য ও শাকসবজি প্রভৃতি অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে তুলনামুলক কম পরিমাণে উৎপাদিত হয়।[৫৩৭] পাশাপাশি সুন্দরবন অঞ্চলে কর্মসংস্থান হিসেবে মুরগির খামার, দুগ্ধ খামার, উদ্যান, হর্টিকালচার, ইট ভাটা ও ডেকোরেটর সার্ভিসসহ বিভিন্ন পেশায় অপরাপর অন্যান্য উপজেলা সমূহের মধ্যে সংলগ্ন উপজেলা সমূহের অবস্থান সর্বনিম্নে।[৫৩৮] জেলা পরিসংখ্যান ২০১১ প্রদত্ত সারণীর সাহায্যে বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়-

৫৩৪. ঐ।

৫৩৫. ঐ।

৫৩৬. ঐ।

৫৩৭. District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p. 34-46.

৫৩৮. District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p. 17-22.

সারণি-৮: গ্রোথ সেন্টার, হাট-বাজার, মুরগীর খামার, দুগ্ধ খামার, উদ্যান, ইট ভাটা ও ডেকোরেটর পরিসংখ্যান

সাতক্ষীরা:

Upazila	**Growth Centre**	**Hat/ bazar**	**Poultry Farm**	**Dairy Farm**	**Nursery**	**Horticult-ure Centre**	**Brick Kiln**	**Decorator**
Assasuni	6	38	120	221	13	0	9	15
Debhata	4	15	220	150	20	0	7	12
Kalaroa	5	35	122	265	15	0	17	40
Kaliganj	6	49	1032	125	176	1	8	29
Satkhira Sadar	6	52	671	260	92	1	26	39
Shyamnagar	6	45	165	131	16	1	8	25
Tala	6	40	260	67	14	1	16	19
Total	39	274	2590	1219	346	4	91	179

Source: District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013

খুলনা:

Upazila/city corporation	**Growth Centre**	**Hat /Bazar**	**Poultry Farm**	**Dairy Farm**	**Nursery**	**Horticulture Centre**	**Brick kiln**	**Decorator**
Batiaghata	3	34	200	29	7	0	3	12
Dacope	7	13	500	23	2	0	1	9
Dighalia	3	17	125	158	17	0	3	23
Dumuria	8	54	353	136	10	0	17	40
Khulna City	0	27	270	149	11	2	0	54
Koyra	5	29	33	4	5	0	4	16
Paikgachha	7	38	247	40	89	1	6	23
Phultala	2	4	176	134	550	0	6	10
Rupsa	6	21	159	87	17	0	42	19
Terokhada	4	24	143	161	1	0	4	11
Total	45	261	2206	921	709	3	86	217

Source: District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-23.

মোলঙ্গী, কাগচী, ঢালী ও সানা: লবণ তৈরীর জন্য মাটির তৈরি ভার বা পাত্রকে বলা হয় মোলঙ্গা। আর এই মোলঙ্গা দ্বারা যারা জীবিকা নির্বাহ করতেন তাদের বলা হয় মোলঙ্গী।[৫৩৯] সুন্দরবনে লবণ তৈরি ছিল প্রাচীন কালের এক বহুল প্রচলিত ও লাভজনক ব্যবসা। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত লবণ তৈরীর চুল্লিতে এর প্রমাণ মেলে। এরা সুন্দরবনের প্রাচীন অধিবাসী। আজও অনেকে লবণের ব্যবসায় নিয়োজিত আছেন। নালা কেটে, গর্ত করে বা গাবুরা কেটে মিহি সাদা লবণ তৈরির খ্যাতি রয়েছে এই অঞ্চলের।[৫৪০]

কাঁকড়া শিকারি: দাকোপের কালাবগী গ্রামের নদীর অপর পাশেই সুন্দরবন। এই গ্রামের পাঁচ শতাধিক মানুষ সুন্দরবনে কাঁকড়া ও মাছ ধরার সঙ্গে যুক্ত। তাঁদেরই একজন ভবতোষ মণ্ডল। তিনি সুন্দরবন থেকে কাঁকড়া ধরেন। ভবতোষ বলেন, কাঁকড়া ধরা সুবিধাজনক হওয়ায় এই এলাকার বেশির ভাগ মানুষ কাঁকড়া ধরা পেশার সঙ্গে যুক্ত।[৫৪১] কাঁকড়া বারো মাস ধরা হয়।[৫৪২] তবে কাঁকড়া শিকারের মৌসুম গণমুখীর একাদশী সময়। এই সময়ে কাঁকড়া বেশি পাওয়া যায়। গণমুখীর সকালে একাদশী হয়। একাদশীতে কাঁকড়া ধরতে যাওয়া হয়। সাত দিন কাঁকড়া মারা যায় তার পরের থেকে কাঁকড়া হয়না। গণ ভাটীগা পড়ে যায়। কাঁকড়া অল্প পাওয়া যায়। এর পর কাঁকড়া ধরতে যাওয়া হয় না।[৫৪৩] দুইজন করে দলে দলে শিকার করতে যায় কাঁকড়া শিকারিরা। এছাড়া বাদা থেকে গেলে তিন-চার জন করে যাওয়া হয়। কাঁকড়াটা শিকার করা হয় খাঁচা দিয়ে। জঙ্গলের ভিতরে খাঁচা পেতে রাখা হয়। খাঁচা পেতে দিয়ে রেখে আসার পরে জোয়ার হয়ে গেলে খাঁচাটা তুলে নিয়ে আসেন শিকারিরা।

কাঁকড়া এমনি থোপায় ধরে, আটলে ধরে। বেনধে (বেঁধে) থুই গনের বেলায়। থুয়ে ভাটি সরে গেলে আটল তোলে।[৫৪৪]

কাঁকড়া শিকারের পদ্ধতি হিসেবে খাঁচার ভিতরে মাছ রাখা হয়। তারপর কাঁকড়া মাছ খাওয়ার জন্য যখন খাঁচার ভিতরে ঢুকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তারপর যখন জোয়ার হয়ে যায় তখন খাঁচাটা তুলে আনা হয়। এসে খাঁচাটা খুলে কাঁকড়া বের করে দেওয়া হয়। প্রতিদিন ৬-৭ কেজি করে কাঁকড়া ধরা হয়। কাঁকড়া দুই ধরনের হয়। বড় কাঁকড়া এবং ছোট কাঁকড়া। দেড়শো গ্রাম ওজনের কাঁকড়া নেওয়া হয় ছোটগুলো অনেকেই ধরেন না।

---

৫৩৯. এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫।

৫৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬।

৫৪১. জেলেদের মানবেতর জীবন, প্রথম আলো ২৬ আগস্ট ২০১৯, ১১ ভাদ্র ১৪২৬।

৫৪২. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মহেন্দ্র, পেশা: মৎসজীবী, কাঁকড়া শিকারি ও চাষী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: মো. আসাদুল্লাহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৫/১০/২০২২, স্থান: ৯ নং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: চুনা। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১২ টা ৪৮ মিনিট।

৫৪৩. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: জনি সরদার, পেশা: কাঁকড়া শিকার, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: মো. আসাদুল্লাহ, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৮/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৫৪৪. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: কাঞ্চন সরদার, পেশা: গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়ন। গ্রাম: বনবিবিতলা, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

ছোটগুলো দেখা যায় অনেক সময় নিয়ে আবার বিক্রি করা হয় পার্শ্ববর্তী উপকূলীয় জায়গায় চাষ করার জন্য। বড়গুলো শহরে পাঠানো হয়।[৫৪৫] ছোট কাঁকড়া ৩০০ টাকা, ৪০০ টাকা করে কেজিতে বিক্রি করা হয়। বড়গুলো আকার অনুযায়ী ২০০ টাকা, ২৫০ টাকা, ৪০০ টাকা, ৫০০ টাকা।[৫৪৬] এছাড়া উপকূলেও কাঁকড়ার চাষ করা হয়। প্রতিবিঘাতে ৫০০০ খাঁচা বসিয়ে চাষ করা হয়।[৫৪৭] কাঁকড়া বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। শীতের সময় চাষ বন্ধ থাকে। ফাল্গুন থেকে আবার শুরু হয়। মাছ ধরার পর-পরই কাঁকড়া চাষ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে দিন দিন। গোল পাতাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অনেকেই গোলপাতা কাটতে যায়না। সেই জায়গায় কাঁকড়া চাষ বেছে নিচ্ছেন অনেকে।[৫৪৮]

কাঁকড়া ধরার সময়ও বাঘের ঝুঁকি থাকে। নিচু হয়ে যখন খাঁচা রেখে যাওয়া হয় সারিতে সারিতে তখন নজর অন্যদিকে থাকে, খেয়াল থাকেনা সেই সময় ঝুঁকি থাকে।[৫৪৯]

চিত্র-২১: কাঁকড়া চাষ

৩.১৪ মহাজন: সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহকারী আরেকটি পেশা হলো মহাজনি ব্যবসা। মধু সংগ্রহ, গোলপাতা কাটা, কাঠ কাটা, কাকড়াঁ চাষসহ বিভিন্ন পেশায় পুঁজির প্রয়োজন হয়। স্বল্প আয়ের এসব বনজীবী মানুষের সামান্য আয় দৈনিক আহারের যোগানেই হিমশিম খায়। সেখানে পুঁজি থাকা বিলাসিতা পর্যায়ের। তাই বাধ্য হয়ে মহাজনের কাছ থেকে সুদে অর্থের সংকুলান করতে হয়। টাকা নিয়ে পরিবারের কিছু

৫৪৫. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: জনি সরদার, পূর্বোক্ত।

৫৪৬. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মহেন্দ্র, পেশা: মৎসজীবী, কাঁকড়া শিকারি ও চাষী, পূর্বোক্ত।

৫৪৭. ঐ।

৫৪৮. ঐ।

৫৪৯. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: জনি সরদার, পেশা: কাঁকড়া শিকার, পূর্বোক্ত।

খরচ মিটিয়ে রেখে যাওয়া হয় দুর্দিনের জন্য।[৫৫০] হাজারে ২০০ টাকা করে নেন অনেকেই।[৫৫১] অনেক সময় বনদস্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও সুদে টাকা নিয়ে ফিরিয়ে আনতে হয়। মহাজনি ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেন কাঁকড়া শিকারী মহেন্দ্র-

> *ধরেন আমি একটা অন্য বিদানে পড়ি গেছি বা আমার এই কাঁকড়ার প্রজেক্ট আমি আর চালাতি পারতিছিনা। এখন এই কাঁকড়ার প্রজেক্টটা মেলা টাকা, ব্যয়বহুল খরচতো, এখন এই টাকাটা আমি চালাতি পারতিছিনা। এখন আমার অন্য আরেকজনের কাছতে সুদে বা ধার করে নিয়ে তখন এ প্রজেক্ট চালানো লাগে।*[৫৫২]

মহাজনের টাকা অনেক সময় তাদের উপকারে আসে আবার অনেক সময় ব্যবসার ক্ষেত্রে যদি ক্ষতি হয়ে যায়, তখন উভয় দিকেই ঘাটতি টানতে হয়।[৫৫৩]

> *সোরা গ্রামের মোসলেম উদ্দীন ও আবুল হোসেন এবং কদমতলা গ্রামের আলম গাজী বলেন, ৭ থেকে ৯ জনের বহর নিয়ে বনে যেতে প্রতিটি চালানে ৬০-৭০ হাজার টাকা খরচ হয়। মহাজনের থেকে চোটাই (সুদে) টাকা নিয়ে সুন্দরবনে যাচ্ছি। যদি চালান মার যায়, তবে ঋণের বোঝা টেনে বেড়াতি হবে। কাজকাম না থাকায় বাধ্য হয়ে এ বছর মধু সংগ্রহে যাচ্ছি।*[৫৫৪]

জঙ্গল থেকে যে টাকা আসে মহাজনরে কিন্তু আবার শোধ করি দেওয়া হয় আর জীবিকার কাজে লাগানো হয়।[৫৫৫]

৩.১৫ বনবিভাগের কর্মচারীঃ কাঠ, মধু, বন্য পশু ও গোলপাতাসহ নানা বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ সুন্দরবন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে বনবিভাগের নিম্নপদস্থ কর্মচারীগণ। তারা খুব সাহসী ও দক্ষ হয়ে থাকে। বনে চলাচলের জন্য রয়েছে নৌকা। বিপদের আশঙ্কা হলেই বাঁশি ফুঁ দিয়ে সকলকে সতর্ক করে থাকে। নির্ধারিত ঘেরে'র বাইরে কেউ কাঠ সংগ্রহ বা বিচরণ করছে কি না প্রভৃতি কঠোর নজরদারীতে রাখে বনকর্মচারীগণ। বনের

---

৫৫০. *ঐ মহাজনের কাছতে টাকা নিয়ে হয়তো আমার বাড়ির খোড়াকি নাই, তালি আমার বাড়ি এক ব্যাগ চাল কিনে দিতে হয়, হাট-বাজার করি দিতে হয়। দিয়ে ঐ থুয়ে ১৫/১৬ জন লোকের হাট-বাজার করি থুয়ে ঐ টাকা নিয়ে, তারা জঙ্গলে চলি যায়।* হেন্দ্র, পেশাঃ মৎসজীবী, কাঁকড়া শিকারি ও চাষী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৫/১০/২০২২, স্থান: ৯ নং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: চুনা। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১২ টা ৪৮ মিনিট।

৫৫১. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশাঃ মৎসজীবী, পূর্বোক্ত।

৫৫২. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মহেন্দ্র, পেশাঃ মৎসজীবী, কাঁকড়া শিকারি ও চাষী, পূর্বোক্ত।

৫৫৩. ঐ।

৫৫৪. অনুমতি পেয়েই সুন্দরবনে গেলেন মৌয়ালেরা, প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০২১, ১৯ চৈত্র ১৪২৭

৫৫৫. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মহেন্দ্র, পেশাঃ মৎসজীবী, কাঁকড়া শিকারি ও চাষী, পূর্বোক্ত।

এই গার্ডের সাথে সহযোগী হিসেবে থাকে পিওনগন। পুলিশের ন্যায় তারাও খাকি পোশাক পরিধান করেন। বলা হয় খাকি পোশাক দেখে নাকি বাঘ আক্রমন করে না। এরকম একটি ঘটনার উল্লেখ-

> *"বগি ফরেস্ট অফিসে এক পিওন নাকি খাকি পোশাক পরিয়া প্রত্যহ শরণখোলা হইতে খাবার আনিয়া দিত। সে প্রায় জঙ্গলের একই স্থানে দুইটি বাঘের বাচ্চা দেখিতে পাইত। একদিন দেখিতে পাইল বাঘিনী বাচ্চাদের দুধ পান করাইতেছে।একদিন সে অন্য পোশাক পরিয়া সেই পথ দিয়া যায়। সেই দিন বাঘের বাচ্চা তাহাকে কামড় দিয়া আঘাত করে। চিকিৎসার পর সে আরাম পায়।"*[৫৫৬]

এছাড়া বন পরিচালনায় বোটম্যান বা বি.এম. সুন্দরবনে অবিরত নৌকা নিয়ে টহল দিয়ে বেড়ায়। ঝড়, ঝঞ্জা, জলোচ্ছাস প্রভৃতির সঙ্গে নিত্য সুন্দরবনে বিচরণ করে তারা। ভূমিহীন কৃষকেরা সামান্য বেতনের বিনিময়ে বোটম্যানের চাকরি করে। কর্দমাক্ত আর শুলোর কারণে জুতা ছাড়াই বনে প্রবেশ করেন তারা। এসকল কর্মচারীদের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মোকাবিলা ছাড়াও নিত্য লড়াই করতে হয় বন ও জলদস্যুদের সাথে।

বনবিভাগের কর্মচারীদের দুর্নীতিঃ

সুন্দরবনের আশীর্বাদপুষ্ট নানা পেশার মানুষের সাথে বনবিভাগের কর্মচারীদের বিরূপ আচরণও লক্ষ্য করা যায়। তাদের সাথে অকথ্য আচরণ ছাড়াও কর পরিশোধসহ বিভিন্ন অনুমোদনের অজুহাতে হয়রানি করা হয়।[৫৫৭] "*বহু কর্মচারী দুর্নীতিপরায়ণ ও মানবতাবোধহীন। কে জানে কবে এই জুলুমের অবসান ঘটিবে।*" বনবিভাগের কর্মচারীদের কর্ম তৎপরতায় ঘাটতি থাকায় কাঠ চোরাইকারীরা সহজেই বনে প্রবেশ করে যায়। আবার সাধারণ অসহায় বনজীবীরা বনের পারমিট নিয়ে গেলেও বনরক্ষীদের ঘুষ দিতে হয় বাধ্যতামুলকভাবে। যাদের কাছে পারমিট থাকে না তাদেরকে এই ঘুষের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিতে হয়।[৫৫৮] মৌয়ালদের অভিজ্ঞতারই এমন একটি উদাহরণ-

> *পরদিন ওদের বহর আড়পাঙাসিয়ার পৈঁখালি বন-কর অপিসে হাজিরা দিতে চলল। বনে প্রবেশ করার সময় যেমন, তেমনি বন ছেড়ে আসার সময়ও বনকর অপিসে সেলাম জানাতে হয়। সেলাম মানে সেলামীও বটে। পাস নেওয়া ও ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপার। সেলামীর দৌড়টা ঘটে, নৌকার মাপজোখে আর গুড়ির ঘেরের মাপে। নৌকোর মাপ হয় থোকে-পঁচিশ, একশ' বা হাজার মণী হিসেবে। থোকের মাপে ফাঁক ও ফাঁকিও আছে। এই কাজে বাউলেদেরও সাহায্য করতে হয়। বন-বাদাড়ে বাউলেদের খাতির সর্বত্র, মায় বনকর অপিসেও।*[৫৫৯]

---

৫৫৬. এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১।

৫৫৭. ঐ।

৫৫৮. সুন্দরবনের বনজীবী, কষ্টই যেন জীবীকা, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ১৮ নভেম্বর ২০১৩

৫৫৯. শিবশঙ্কর মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৩

বনজীবীদের মতে দিন দিন পাসের ফি বোঝা হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য।[৫৬০] পূর্বে পাস ছিল ১২০ টাকা তার পরবর্তীতে ২০০ টাকা করে।[৫৬১] পূর্বে ৩ জনে পাসে নিতো ৬০০ টাকা। আর বর্তমানে ৩ জনের পাসে নেওয়া হয় ১,২০০ টাকা। এর পাশাপাশি বনবিভাগের কর্মচারীদের অতিরিক্ত কিছু অর্থ দিতে হয়।[৫৬২] মৌয়াল, বাওয়ালি বা জেলেদের নানা সমস্যা বা অনিয়ম দেখিয়ে পাসের বাইরে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়। জেলে গোপাল সানার ভাষায়-

> *অবৈধভাবে টাকা লাগে। দেখা যাচ্ছে যে, নৌ-পুলিশ যাচ্ছে এই দুইশো টাকা দাও আমাদের ডিইটি খরচ। ফরেস্টার দেখা যাচ্ছে ধরিছে এই তোমার এই জাল ঘন জাল কেন? তা স্যার আমরা ঘন জালে বড়শির মাথায় মাছ মারবো, তা আধার (খাদ্য) জোগাড় করতি না পারলি তো মাছ মারা হয়না, তার জন্য ২০০ টাকা দাও। এভাবে আমাদের হয়রানি হচ্ছে।*

বনবিভাগের কর্মচারীদের আচরণসহ, নিজেদের আবদার আর নানা সুখ-দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করেছেন বাওয়ালিদের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত এক গ্রাম কবি তার "বাওয়ালিদের আক্ষেপ" কবিতায়।[৫৬৩]

আমরা কি ভাই, স্বাধীন দেশের
স্বাধীন মানুষ নইরে।
মোদের দুঃখ দেখে না
কার কাছে জানাইরে-

বন জঙ্গল কুড়ায়ে এনে
(সবার) ঘর বাড়ি সাজাইরে
এমন সোনার বনভূমি
কোথাও আর নাইরে।

পূর্ব বাংলার কলকারখানা
আমরা সবাই বালাখানা
মোদের পরে জুলুম চলে
কেউতো ফিরে দেখে না।

৫৬০. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মহেন্দ্র, পেশা: মৎসজীবী, কাঁকড়া শিকারি ও চাষী, পূর্বোক্ত।

৫৬১. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশা: মৎসজীবী, পূর্বোক্ত।

৫৬২. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মহেন্দ্র, পেশা: মৎসজীবী, কাঁকড়া শিকারি ও চাষী, পূর্বোক্ত।

৫৬৩. এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২।

সুন্দরবনে ব্যাঘ্রকুমির
সব সময় করছে ফিকির
সুযোগ পেলে প্রাণটি যাবে
মানে না রাজা, উজির।

এদের চেয়ে বড়ো বাঘ
বনকরের ঐ দারোগা সাব
দিনে রাতে শিকার করে
বাওয়ালি হাজার হাজার।

নজর ছাড়া কয় না কথা
সেলাম দিলে নাড়ে না মাথা
মানবতা ভূলে গেছে-
মোদের বলে ধরো ছাতা।

নালিশ করলে হয় না বিচার
পাস করে ভাই, বন্ধ সবার
পেটের জালায় কইনে কথা
সদাই ফেলি অশ্রুধার- ।”

বাওয়ালী, মৌয়াল, জেলে সকল পেশার লোকজনের কাছ থেকেই তারা নজরানা আদায় করে থাকে। চাঁদনীমুখা গ্রাম থেকে মধু সংগ্রহে আসা দলটির প্রধান আমির আলীর আক্ষেপ-

> *অনুমতি থাকার পরও প্রতিবার ফিরে পাস সারেণ্ডারের সময় বনরক্ষীদের ‘নজরানা’ পরিশোধ আর বনদস্যুদের চাহিদা মিটিয়ে মধু সংগ্রহের বিষয়টি বাঘের মোকাবিলা করার চেয়ে ভয়ংকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।*[৫৬৪]

বনজীবীদের ভাষায় বনদস্যুর উৎপাত কমলেও কর্মচারীদের অতিরিক্ত অর্থ দাবি কমেনি। কাঞ্চন সরদারের মতে, নৌ পুলিশদের পাসের বাইরেও ৫০০ টাকা দেওয়া লাগে। তিনি বলেন-

> *সে ডাকাতির চেয়ে বেশি সমস্যা। তার মানে বাদায় নামিবার আগে ওদের টাকা। না দিলি আমাদের জাল জোবড় সব বুটি নিয়ে যায়।*[৫৬৫]

৫৬৪. সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ শুরু, প্রথম আলো ২০ চৈত্র ১৪২৫, ৩ এপ্রিল ২০১৯।

৩.১৬ বনদস্যুঃ সুন্দরবনে মধ্যযুগ থেকেই বনদস্যুদের প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায়। মগ-ফিরিঙ্গি, পর্তুগীজরা পরিচিত ছিলো সুন্দরবনের জলদস্যু নামে। দেশভাগ পরবর্তী বাংলাদেশ সময়েও এই বনদস্যুদের বিচরণ থেকে যায়। কাঠ বোঝাই নৌকা বা মধু সংগ্রহকারী দলকে আক্রমণ, মাছ নিযে যাওয়া, নদীতে বিষ দিয়ে মাছ ধরা, চোরাইভাবে পাস ছাড়া বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা; অনেক সময় বনজীবীদের অপহরণ পর্যন্ত করে থাকে। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার মুক্তিপণ নিয়ে তখন ছেড়ে দেওয়া হয়। এদের ভয়ে মুক্তি পেয়েও কেউ বিচার প্রত্যাশী হয় না। বনদস্যুরা দল বেঁধে নৌকা নিয়ে নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করতে থাকে। হঠাৎ আক্রমণ করে অনেক দূরে বা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত সীমান্তে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে অনেক সময় ভারতীয় জলদস্যুরা সহযোগী হিসেবে কাজ করে।[৫৬৬]

২০১৯ সালে জুলাই মাসে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত বনদস্যু সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট-

বনদস্যু জোনাব বাহিনীকে সাড়ে তিন লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়েও পালিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন সাতক্ষীরার শ্যামনগরের তিন জেলে। পশ্চিম সুন্দরনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের ইলশেমারী ও দাড়গাং খাল থেকে বনদস্যু জোনাব বাহিনী তাঁদের জিম্মি করে। ফিরে আসা জেলেরা হলেন শ্যামনগরের পাতাখালী চণ্ডীপুর গ্রামের আবদুল মান্নান, কালিঞ্চি গ্রামের সুজন মুণ্ডা ও জয়াখালী গ্রামের জাহিদ হোসেন। ওই জেলেরা বলেন, তাঁদের দুজনের পরিবারের পক্ষ থেকে মুক্তিপণের টাকা পরিশোধের পরেও বনদস্যুরা জিম্মিদশা থেকে তাঁদের মুক্তি দেয়নি। আগামী কোরবানির ঈদ পর্যন্ত তাঁদের আটকে রেখে নৌকা চালানোর কাজে ব্যাবহারের পরিকল্পনা করেছিলো। একপর্যায়ে ৭ জুলাই বৃষ্টির সময় পালিয়ে তিন দিন ঘোরাঘুরির পর তাঁরা গত মঙ্গলবার রাত আটটার দিকে বাড়িতে ফিরেছেন। গত ৩ থেকে ৮ জুনের মধ্যে এসব জেলে মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ করা হয়। ফিরে আসা জেলে সুজন মুণ্ডা বলেন, ৩ জুন দাড়গাং এলাকা থেকে তাঁকে অপহরণ করে বাহিনীপ্রধান জোনাবের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের দল। পরের পাঁচ দিনে মান্নান, জাহিদসহ আরও কয়েকজনকে অপহরণ করে বনদস্যুরা। তিনি আরও বলেন, তাঁর পরিবার মুক্তিপণ বাবদ টাকা দিতে না পারায় তাঁকে আগামী কোরবানির ঈদ পর্যন্ত আটকে রেখে নৌকা চালানোর কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়। এছাড়া জোনাব বাহিনীর লোকজন কয়েকজনকে জেলেকে উঠিয়ে নিয়ে কয়েক ঘণ্টা করে জিম্মি রেখে বিকাশ নম্বরের মাধ্যমে মুক্তিপণের টাকা আদায় করে। তাঁদের মতো আরও এক জেলে ভারতীয় সুন্দরবনে অবস্থানের সময় চা আনার সুযোগে পালিয়ে যান বলেও তিনি নিশ্চিত করেন। জেলে মান্নান ও জাহিদ বলেন, তাঁদের মুক্তিপণ বাবদ যথাক্রমে ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা ও ৭০ হাজার টাকা বিকাশের মাধ্যমে পরিশোধ করে তাঁদের পরিবার। তবে মান্নানের জন্য ৫ লাখ ও জাহিদের জন্য ১ লাখ ২০ হাজার টাকার দাবি থাকায় তাঁদের মুক্তি দেয়নি বনদস্যুরা। ওই জেলেরা আরও বলেন, জিম্মি করার পর থেকে ১৪-১৫ দিন বনদস্যুরা ভারতীয় সুন্দরবনের মধ্যে অবস্থান করে। পরবর্তী সময়ে পুষ্পকাটি, মান্দারবাড়িয়া হয়ে মামুন্দো নদীর মুখেও প্রায় ১০-১২ দিন অবস্থান করে। এ সময় তাঁদের দিনে একবার খাবার দেওয়া হলেও সারা রাতনৌকা চালানোর কাজে লাগানো হতো। জিম্মি কয়েকজনকে গাছে তুলে মুঠোফোনের নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিয়ে মুক্তিপণ পেয়ে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তাঁদের তিনজনের জিম্মি হওয়ার

---

৫৬৫. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: কাঞ্চন সরদার, পেশা: গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়ন। গ্রাম: বনবিবিতলা, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৫৬৬. সুন্দরবন থেকে পালিয়ে ফিরলেন তিন জেলে, প্রথম আলো ১১ জুলাই ২০১৯, ২৭ আষাঢ় ১৪২৬।

বিষয়টি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের কারণে তাঁদের মুক্তি দিচ্ছিল না। বরং তাঁদের মুক্তিপণ বাবদ পরবর্তী সময়ে আরও বড় অঙ্কের টাকা দাবি করে বনদস্যু দলটি।[৫৬৭]

জেলে গৃহিণী কাঞ্চন সরদার বনদস্যু সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা বলেন-

এমনে ধরো মাছ ধরতি গেছে নৌকায় উঠে। গিলি ওই ডাকাতের দিকে হুলু তুলে নেলে একজন মানুষের। ধরো দুজন গেছে, একজনরে তুলে নিছে তা আরএকজনতো আর মাছ ধরতি পারেনা। সে লোক কি করবে, বাড়িতে আসবে। এসে বলবে, এইরকম এক ছেলে হোক কি বাইরের লোক হোক একজন তুলে নিছে। তা এত এত টাকা চেয়েছে। না দিলি ছাড়ি দিবে না। তা এত টাকার কি উপায় হবে? তা আরেক জনের কাছে ধার করতি যাবো, তারে বলবো খানিক (কিছু) টাকা দে, ঐ মানুষটারে তুলে নিছে। তা আমি তারে চাড়ি নিয়ে আসবো। এটা আবার কারো কাছে কলি হবেনা। গোপনে টাকা নিয়ে ডাকাতগো দিয়ে মানুষটারে বাড়ি আনবো।[৫৬৮]

তবে বনদস্যুর তৎপরতা পূর্বের তুলনায় কিছুটা কমেছে। পূর্বে ভয়ে জঙ্গলে যেতে পারতেন না বনজীবীরা। জিম্মি করে তুলে নিতো।[৫৬৯]

৩.১৭ সামাজিক জীবনধারাঃ

বৈবাহিক পরিষ্থিতিঃ বনজীবী সম্প্রদায়গুলোর অধিকাংশই স্বতন্ত্র বিবাহ রীতি রয়েছে। বিয়ে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ নিজেদের ভিতরেই হয়।[৫৭০] নিজস্ব একটা বিবাহ রীতি বা বিবাহ পদ্ধতি আছে সেই অনুযায়ী হয়। ইসলামে যেরকম কলেমা উচ্চারণ করে বিবাহ হয়। তারপরে হিন্দুদের যে অগ্নিসাক্ষী রেখে মন্ত্রপাঠ করে বিবাহ হয়। তেমনি মুণ্ডাদের মূল যে কাজটি হচ্ছে, ছেলের ছোট আঙুলের রক্ত এবং মেয়ের ছোট আঙুলের রক্ত কেটে তারপর একসাথে মিশ্রিণ করে দেওয়া হয়। মিশ্রণ দেওয়ার পরে রীতি অনুযায়ী মন্ত্র পড়া হয়। বিবাহরীতি সম্পর্কে নীলকান্ত মুণ্ডা বর্ণনা-

> *মনে করেন মেয়ে আসলো, আপনারা আসলেন তখন আমরা আগে বরণ করে নেব, বরণ করার পরে আমাদের কালচার কি জানেন: আমাদের প্রামাণিক লাগেনা, ব্রাক্ষণ না আমরা নিজেরাই করি। অগ্নি পরীক্ষা করি, অগ্নি পরীক্ষাকে বলি জবানবন্দী। ছেলে-মেয়ের জবানবন্দী নিয়ে কাজ করি। আগে আমরা*

---

৫৬৭. ঐ।

৫৬৮. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: কাঞ্চন সরদার, পেশা: গৃহিণী, পূর্বোক্ত।

৫৬৯. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশা: মৎসজীবী, পূর্বোক্ত; সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইসিতিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৬/১০/২০২২, স্থান: ৯ নং বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪ নং ওয়ার্ড, গ্রাম: খাগড়াঘাট। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১ টা ২৭ মিনিট।

৫৭০. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: রাজ প্রসাদ মুণ্ডা, পেশা: গ্রাম্য ডাক্তার, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৯/১০/২০২২, স্থান: ৮ নং ইশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: খাগড়াঘাট। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১২ টা ১৯ মিনিট।

দুটি পুকুর কাটবো, পুকুর কাটার পর হাতে দূবলা ঘাস প্রামাণিককে দিয়ে হস্তবন্ধন করি ঈশ্বরের কাছে। ছেলে-মেয়ে দুইজনের থেকে রক্তপাত করতে হয়। সূচ দিয়ে হোক বা যেভাবেই হোক এরপর ঐ রক্তটা আদান-প্রদান করবে। রক্তটা অদল-বদল করে যখন কপালে সিঁদুর তুলে দেবে তখন অঙ্গীকার করতে হবে। তুমি যতদিন জীবনে বেঁচে থাকবে ততদিন ভাত, জল, কাপড় ভরণ-পোষণ দিতে পারবেতো, ঠিক মত দিতে পারবে তো? বিভিন্ন দুঃখ-সুখ দেখতে পারবেতো? যদি না দিতে পারো তাহলে এখান থেকে বাদ দেও। আমার মেয়ে নেয়ার দরকার নেই। আর যদি পারো শেষ পর্যন্ত মরার আগ পর্যন্ত তাহলে তার কপালে সিঁদুর দিতে পারো।[৫৭১]

এছাড়া বিয়েতে মুরগি পূজা করা হয়। মুরগি পূজার রক্ত দিয়ে ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়। কোনো ছেলে বিয়ে দিতে গেলে, বাবা মা ভগবানের নামে সাদা মুরগি জবাই করে দিয়ে তার রক্ত এক পায়ে রক্ত ডুবিয়ে চলে যাবে। তাদের বিশ্বাস এর ফলে জীবনে যতদিন বেঁচে থাকবে কোন মন্দ হাওয়া-বাতাস, কাঁটা-খোঁচা লাগবে না।[৫৭২] সুন্দরবনের মুণ্ডা সমাজে মেয়ের পরিবারকে পণ দেওয়ার রীতি ছিল।

মুণ্ডাদের মধ্যে পণপ্রথা প্রচলিত আছে। পণ দিতে হয় কন্যার পিতাকে। পূর্বে পাঁচ শিকে পয়সা দিতে হতো পণ হিসেবে।[৫৭৩] নীলকান্ত মুণ্ডা বলেন-

মেয়েদের পাঁচশিকে পয়সা আর একটা কাপড় এতদিন মেয়েটাকে মানুষ করেছে কষ্ট করে এজন্য পাঁচশিকে পয়সা আর একটা কাপড় দিয়ে আসতে হয়। মেয়ের মাকে এখনও দেয়। ওই দুধের দামটা দেয়।

জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌতুক প্রথার প্রচলন রয়েছে। যৌতুক না দিলে মেয়েদের বিয়েই হয় না।[৫৭৪] মুণ্ডা সমাজে বাল্যবিবাহের পাশাপাশি বহুবিবাহ প্রচলিত। সাধারণত বৈশাখ ও ফাল্গুন মাসে বিয়ে হয়ে থাকে। মুণ্ডাদের ধারণা জন্মের অনতিপরেই বিয়ে বন্দোবস্ত করে রাখলে তারা জীবনটা দীর্ঘদিন উপভোগ করতে পারবে। বহুবিবাহ তাদের কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে। কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে দেবরের সাথেও বিয়ে দেয়া হয়। দেবর প্রাপ্ত বয়স্ক না হলেও এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে না। তবে কেউ পরিত্যাক্তা হলে সেই নারী আর দ্বিতীয় বারের মত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না, সারা জীবন এভাবেই কাটাতে হয়।[৫৭৫] শহর থেকে কিছুটা দুর্গম ও নিত্য যোগাযোগেহীনতা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তুলনামুলক পিছিয়ে থাকার কারণে এসব অঞ্চলে

---

৫৭১. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইসিতিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৬/১০/২০২২, স্থান: ৯ নং বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪ নং ওয়ার্ড, গ্রাম: খাগড়াঘাট। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১ টা ২৭ মিনিট।

৫৭২. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, পূর্বোক্ত।

৫৭৩. ঐ।

৫৭৪. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মহেন্দ্র, পেশা: মৎসজীবী, কাঁকড়া শিকারি ও চাষী, পূর্বোক্ত।

৫৭৫. রাইজিং বিডি, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪, https://www.risingbd.com/risingbd-special/news/84193, 29-03-2021, 12:49 pm

বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা কম। তবে ২০১১ সালের জেলা পরিসংখ্যানে দেখা যায় অপরাপর সদর উপজেলাসমূহ থেকেও এসব অঞ্চলে দশবছর এবং তদুর্দ্ধ বিবাহিত নারীর সংখ্যা তুলনামূলক কম। সাতক্ষীরা সদরে যেখানে ১,৮৮,০৭৯ জন নারীদের মধ্যে ৬৮% নারী বিবাহিত সেখানে অন্যদিকে, সুন্দরবন সংশ্লিষ্ট শ্যামনগর উপজেলার ১,৩১,৫৪৬ জন নারীর মধ্যে ৬৭.২% নারী বিবাহিত। একই পরিসংখ্যানিক চিত্র পাওয়া যায় খুলনার দাকোপ, পাইকগাছা ও বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলায়। ব্যতিক্রম শুধু খুলনার কয়রা উপজেলা, যেখানে প্রায় ৭০% নারী বিবাহিত।[৫৭৬] নিম্নে উপজেলাভিত্তিক মোট জনসংখ্যা এবং বিবাহিত-অবিবাহিত নারী পুরুষের পরিসংখ্যানিক তথ্য তুলে ধরা হল-

সারণি-৯: দশ বছর এবং তদুর্দ্ধ বয়সী জনসংখ্যার বৈবাহিক পরিসংখ্যান

সাতক্ষীরাঃ

Upazila	**Total**		**Unmarried (%)**		**Married (%)**	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Assasuni	105676	107791	34.6	21.2	64.5	68.7
Debhata	50266	51210	34.1	20.6	64.9	68.8
Kalaroa	94370	99602	34.3	21.1	65.0	68.4
Kaliganj	108450	112460	34.9	20.9	64.4	69.4
Satkhira Sadar	186814	188079	36.0	22.1	63.2	68.0
Shyamnagar	119082	131546	35.2	22.5	64.0	67.2
Tala	120741	123116	33.2	19.9	66.0	69.5
Total	**785399**	**813804**	**34.8**	**21.3**	**64.4**	**68.5**

Source: District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013

৫৭৬. Source: District Statistics 2011: Satkhira, Khulna, Bagerhat, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013

খুলনাঃ

Upazila	Total		Unmarried (%)		Married (%)	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Batiaghata	70169	69157	34.7	20.2	64.1	68.7
Dacope	63107	63117	35.1	21.7	63.7	65.4
Dighalia	47347	44886	39.2	24.8	60.0	65.5
Dumuria	123438	124114	33.3	19.0	65.7	69.1
Khulna City	386420	363302	37.5	23.2	61.6	66.8
Koyra	12836	13467	36.1	24.6	63.5	65.8
Paikgachha	100423	101584	33.8	20.1	65.4	70.0
Phultala	33578	34103	35.8	21.2	63.3	68.7
Rupsa	72133	71813	38.1	23.7	60.8	65.8
Terokhada	43161	43803	37.6	23.0	61.5	66.6
Total	**952612**	**929346**	**37.5**	**23.2**	**61.6**	**66.8**

Source: District Statistics 2011: Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-20.

বাগেরহাটঃ

Upazila	Total		Unmarried (%)		Married (%)	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Bagerhat Sadar	108671	36.3	22.4	62.7	64.1	67.0
Chitolmari	52598	39.1	25.0	59.9	63.7	64.7
Kachua	37655	34.8	21.9	63.8	60.0	66.4
Mollahat	49247	41.2	26.3	58.1	65.7	64.9
Mongla	59478	32.9	22.8	66.0	61.6	67.2
Morrelgonj	109721	34.0	22.3	64.9	63.5	68.3
Pakirhat	56250	36.2	21.8	62.9	65.4	67.0
Rampal	62991	34.3	20.1	64.6	63.3	68.4
Sharonkhola	49252	30.4	23.2	68.9	60.8	67.8
Total	**5858363**	**35.4**	**22.7**	**63.6**	61.5	**67.1**

Source: District Statistics 2011: Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-19

৩.১৮ পরিবার: বনজীবীদের অধিকাংশ পরিবারের প্রধান পুরুষ। মুণ্ডাসমাজ পিতা প্রধান।[৫৭৭] নারী রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। এখানে মা অত্যন্ত সন্তান বৎসল। পুত্র সন্তানের প্রতি বাৎসল্যের আধিক্য রয়েছে। যুক্তপরিবার দিন দিন লোপ পাচ্ছে। মুণ্ডা সমাজ ব্যবস্থাও মূলত পিতৃতান্ত্রিক। তবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। পুরুষ হাল, বৈঠা, জাল নিয়ে নিত্য কর্মে বেরিয়ে পড়ে। নারীরা মন দেয় গৃহ কাজে। মাঝে মাঝে নারী পুরুষ একসাথে মাঠে কাজ করে। পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও এগিয়ে রয়েছে সহশিক্ষা কার্যক্রমে। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করায় মুণ্ডা ছেলেমেয়েরা শিশুকাল থেকেই নাচ আর গান শিখে থাকে।[৫৭৮] মুণ্ডা নারী-পুরুষ একসাথে কাজ করে। তবে কৃষি কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরা বেশি দক্ষ। নারীরা মাছ ধরতেও বেশ পারদর্শী।[৫৭৯]

পোষাক: গ্রামাঞ্চলে মহিলারা শাড়ি পড়ে। কনেকে লাল শাড়ি পরানোর রেওয়াজ রয়েছে। মেয়েরা দুহাত ভরে কাঁকন পড়ে। মেয়েদের পর্দা করতেও দেখা যায়। স্বামী নিজ হাতে সিঁদুর পরালে মঙ্গল বেশী হয় বিবেচনায় হিন্দু নারীরা স্বামীর হাতে সিদুঁর পরতে পছন্দ করে। গ্রামাঞ্চলের পুরুষেরা লুঙ্গি পরে। পুরুষরা সর্বত্র শার্ট পরে।[৫৮০]

৩.১৯ শিক্ষা ব্যবস্থা:

মূলত বনজীবী গ্রামের অধিকাংশ শিশুরাই বিদ্যালয়ে যায় না। পড়ালেখা করার বয়সে তাদের বনের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। শিশুরা নারীদের সাথে চিংড়ির রেণু সংগ্রহে যায়। জীবিকার কারণে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করাতে পারেন না অনেকেই।[৫৮১] বাবা-মা, দাদা-দাদীর মত বনের পেশাকেই ভবিষ্যৎ জীবিকার উৎস বলে ভেবে নেয়।[৫৮২] ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্যমতে, সুন্দরবনে বসবাসরত মুণ্ডাদের মধ্যে মাত্র ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন।[৫৮৩] মাতৃভাষায় শিক্ষা চর্চার কোন ব্যবস্থা না থাকায় বাঙালিদের সাথে লেখাপড়ার কারণে নিজেদের ভাষা

---

৫৭৭. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৬/১০/২০২২, স্থান: ৯ নং বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪ নং ওয়ার্ড, গ্রাম: খাগড়াঘাট। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১ টা ২৭ মিনিট।

৫৭৮. রাইজিং বিডি, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪, https://www.risingbd.com/risingbd-special/news/84193, 29-03-2021, 12:49 pm

৫৭৯. ঐ।

৫৮০. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: পূর্ণিমা রানী, পেশা: মৎসজীবী এবং গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৫৮১. জেলেনী পূর্ণিমা রাণীর আক্ষেপ- *চিরঞ্জিত আমার বাচ ছাওয়ালডা স্কুলে যায়। বড় ছাওয়ালডা স্কুলে যায়না*, সাক্ষাৎকারদাতার নাম: পূর্ণিমা রানী, পেশা: মৎসজীবী এবং গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৫৮২. সুন্দরবনের বনজীবী, কষ্টই যেন জীবীকা, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ১৮ নভেম্বর ২০১৩

৫৮৩. রাইজিং বিডি, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪, https://www.risingbd.com/risingbd-special/news/84193, 29-03-2021, 12:49 pm

ভুলতে বসেছে মুণ্ডাদের বর্তমান প্রজন্ম। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা না থাকায় নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চাও করতে পারে না।[৫৮৪]

সমুদ্র উপকূলবর্তী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এই অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও এই শিক্ষার হার তুলনামুলক কম। শ্যামনগর আয়তনে সর্ববৃহৎ এবং জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম এই অঞ্চলের সাক্ষরতার হার ৪৮.২ % যা সাতক্ষীরা জেলার ৭ টি উপজেলার মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে আছে।[৫৮৫] শ্যামনগরে ১৯৮১ সালে সাক্ষরতার ২২.৯%, সর্বোচ্চ হার ছিল ২৭.৬%, ১৯৯১ সালে ২৮.২%, সর্বোচ্চ ৩৪.৬%।[৫৮৬] জনসংখ্যা ও গৃহায়ন গণনা ২০১১ এর তথ্যানুসারে এই সুন্দরবন সংলগ্ন শ্যামনগরের শিক্ষার হার ২০০১ সালে ছিল ৩৯.৭ % যা জেলার সর্বনিম্ন অবস্থানে ছিল। এর মধ্যে নারী-পুরুষের সাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৪৭.৭% ও ৩১.৩ %। ২০১১ সালে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও এর পরিমাণ তুলনাক্রমে পুনরায় সর্বনিম্নে অবস্থান করে। ২০০১ সালে খুলনায় সর্বোচ্চ শিক্ষার হার ছিল খুলনা সদরে ৭০.০৪% এবং দ্বিতীয় অবস্থানে ফুলতলায় ছিল ৫৮%। আর সুন্দরবন সংলগ্ন দাকোপে ২০০১ সালে মোট শিক্ষার হার ছিল ৪৯.৩৪%, কয়রায় ৪৪.৪৬% এবং পাইকগাছায় ৪৫.৮৪%। ২০১১ সালে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ অবস্থানে দেখা যায় খুলনা সদরে ৭২.৬৮% এবং দাকোপ, কয়রা ও পাইকগাছায় যথাক্রমে ৫৬%, ৫০.০৪% ও ৫২.৮%।[৫৮৭] সুন্দরবন অধ্যুষিত বাগেরহাটের শরণখোলায় দেখা যায় সর্বোচ্চ শিক্ষার হার ৬২.৪% এর তুলনায় সেখানে নারী-পুরুষ সম্মিলিত মোট শিক্ষার হার ৫৬%। ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেলেও অগ্রগতি ছিল নগন্য। মোট সর্বোচ্চ শিক্ষার ৬৩.৬% এর তুলনায় ৫৮.৯%।[৫৮৮] ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১ সালের আদমশুমারির আলোকে সাক্ষরতার হার সম্পর্কে নিম্নে ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হল-

৫৮৪. গাছকাটা ছেড়ে মাছ ধরে মুণ্ডারা, জাগো নিউজ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১, (https://www.jagonews24.com/country/news/646359, সাইটেশন ৩০-০৩-২০২১. ০৬:০১ পিএম।

৫৮৫. Population and Housing Census 2011, Source: District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p.59-64.

৫৮৬. District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013

৫৮৭. District Statistics 2011: Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-71.

৫৮৮. District Statistics 2011: Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-55.

সারণি-১০: সাক্ষরতার হার

সাতক্ষীরাঃ

Upazila	Population (000)				Literacy rate (%)				Number of voter (000)		
	1981	**1991**	**2001**	**2011**	**1981**	**1991**	**2001**	**2011**	**Male**	**Female**	**Total**
Assasuni	230	221	249	269	27.6	30.3	40.3	49.8	90	90	180
Debhata	81	99	119	125	25.4	30.9	49.9	54.8	40	40	81
Kalaroa	155	191	222	238	21.5	25.6	45.6	50.9	73	78	151
Kaliganj	208	226	256	275	27.6	32.3	46.8	51.8	89	89	179
Satkhira Sadar	254	344	410	461	27.4	34.6	50.7	56.5	144	149	292
Shyamnagar	243	265	314	318	22.9	28.2	39.7	48.6	102	104	207
Tala	228	251	294	300	20.8	29.7	45.7	50.9	100	102	202
Total	**1399**	**1597**	**1865**	**1986**	**24.7**	**30.5**	**45.5**	**52.1**	**639**	**652**	**1291**

Source: District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013

খুলনাঃ

Thana/	**Population**				**Literacy Rate (%)**				**Number of Voters**		
pazila Name	1981	1991	2001	2011	1981	1991	2001	2011	Male	Female	Total
Batiaghata	114	128	141	172	29.8	37.7	53.0	54.9	55	56	111
Dacope	111	143	157	152	30.8	37.7	49.3	56.0	52	52	105
Dighalia	107	108	121	116	32.9	39.4	55.2	54.3	46	46	91
Dumuria	226	256	280	306	25.2	36.1	48.7	52.6	102	104	207
Khulna City	515	615	884	751	49.8	59.6	59.9	72.7	217	207	424
Corporation											
Koyra	125	166	193	194	27.1	32.4	44.5	50.4	65	66	131
Paikgachha	176	225	248	248	24.3	32.6	45.8	52.8	88	89	177
Phultala	90	679	77	84	41.1	41.1	58.0	59.0	43	43	87
Rupsa	124	150	168	180	32.0	40.4	54.7	58.2	57	58	116
Terokhada	100	103	111	117	23.5	31.6	45.1	48.5	35	36	71
Total	**1688**	**2573**	**2380**	**2320**	**26.3**	**43.9**	**57.8**	**60.1**	**760**	**757**	**1520**

Source: District Statistics 2011: Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-19

বাগেরহাট:

Upazila	Population (000)				Literacy rate (%)				Number of voter (000)		
	1981	1991	2001	2011	1981	1991	2001	2011	Male	Female	Total
Bagerhat Sadar	208	236	257	266	44.5	49.9	60.9	63.6	88	90	177
Kachua	78	93	100	97	33.0	42.5	62.0	56.8	31	32	63
Rampal	145	167	179	155	39.0	46.0	57.3	58.0	52	54	106
Sarankhola	93	108	114	119	31.3	41.8	56.0	58.9	33	34	67
Chitalmari	106	127	139	139	27.8	37.0	58.7	56.2	41	41	82
Morrelgonj	273	321	350	295	27.8	49.5	62.4	60.7	88	91	178
Mongla	97	138	149	137	38.9	42.8	56.1	57.2	43	42	86
Mollahat	103	117	126	131	26.8	31.6	48.9	50.0	37	39	76
Fakirhat	108	123	134	138	36.0	43.0	58.8	62.0	44	43	87
Total	**1211**	**1430**	**1549**	**1476**	**36.0**	**41.2**	**58.7**	**59.0**	**457**	**465**	**922**

Source: District Statistics 2011: Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-18

তবে সুন্দরবন আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থা (সামস) নানাভাবে আদিবাসীদের কল্যাণে কাজ করছে। সংগঠনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, আদিবাসীদের বা মুণ্ডাদের সামগ্রিক উন্নয়ন। বাল্যবিবাহ, শিক্ষার প্রসার, সংস্কৃতি রক্ষা ও কাজের পরিবর্তন ঘটানো। পাশাপাশি যেন জীবিকার অভাবে অন্য দেশে না চলে যায় অর্থাৎ তাদের ধরে রাখার জন্য কাজ করা।[৫৮৯]

৩.২০ ধর্মীয় বিশ্বাস:

সুন্দরবনের ধর্মীয় বিশ্বাস-আচার অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে স্বতন্ত্র। দীর্ঘদিন ধরেই এখানে বসবাসরত হিন্দু-মুসলিম জনগোষ্ঠী ধর্মীয় ঐক্যের মধ্যদিয়ে সম্প্রীতিপূর্ণ অবস্থান করে আসছে। হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত বাহুবন্ধনে বসবাসকৃত শ্যামনগর অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ৩,১৮,২৫৪ জন। মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ২,৫২,৫৪৫ জন, হিন্দু ৬৪,৮১৬ জন, খ্রিষ্টান ৩০ জন, বৌদ্ধ ৩ জন ও অন্যান্য সম্প্রদায় ৮৬০ জন।[৫৯০] খুলনার দাকোপে মোট জনসংখ্যা ১,৫২,৩১৬ জনের মধ্যে মুসলমান ৬,৩৩৪ জন, হিন্দু ৮৬,১১৩ জন, খ্রিষ্টান ২,৮৬৯ জন। কয়রায় মোট জনসংখ্যা ১,৯৩,৯৩১ যার মধ্যে মুসলমান ১,৫২,৯৮০ জন, হিন্দু ৪০,১৯৭ জন, খ্রিষ্টান ৪৭৬ জন এবং অন্যান্য ২৭৮ জন। পাইকগাছা উপজেলায় মোট জনসংখ্যা ২,৪৭,৯৮৩ জন। এর মধ্যে মুসলমান ১,৬৬,৫৬৪

৫৮৯. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: রাজ প্রসাদ মুণ্ডা, পেশা: গ্রাম্য ডাক্তার, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৯/১০/২০২২, স্থান: ৮ নং ইশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: খাগড়াঘাট। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১২ টা ১৯ মিনিট।

৫৯০. District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p. 17-22.

জন, হিন্দু ৮০,৩৩২ জন, খ্রিষ্টান ১,০৮৭ জন। অভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বন্য-শ্বাপদ সঙ্কুলতা তাদের একটি সাধারণ সহাবস্থান তৈরি করেছে।[৫৯১] গ্রামগুলোতে হিন্দু মুসলিম উভয়ের বসবাস থাকলেও প্রকৃত অর্থে তারা মূলত সুন্দরবনের ঔরসজাত। মুসলমানেরা মসজিদে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আর হিন্দুরা নিয়মিত মন্দিরে আরতি দিলেও বনে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে উভয় সম্প্রদায় একত্রে বনবিবির পূজা করে।[৫৯২] এক্ষেত্রে একে অন্যের ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন থেকে বিনা সঙ্কোচে অনুশাসনাদি পালন করে। এমনকি যখন সমগ্র বাংলায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা অস্থিরতা তখন সুন্দরবনের হিন্দু মুসলমানেরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বসবাস করেছে। মুণ্ডারা প্রতিক ধর্ম অনুসরণ করে।[৫৯৩] প্রতিক ধর্ম বলতে মাটির একটা স্থান করে উপাসনা করা হয়। মাটির একটা স্থান করে তারা যে কোন দেব দেবীকে অনুসরণ করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের হলেও তাদের সংস্কৃতি পৃথক। বেশিরভাগ মুরগী পূজা করা হয়। এছাড়া দূর্গা পূজা, কালী পূজা ও মনসা পূজা করা হয়। প্রতিক পূজা ঘরে রাখা হয় এবং সকাল-সন্ধ্যা উপাসনা ও নাম ধ্যান করা হয়।[৫৯৪] এছাড়া বনবিবি পীর বদর ও গাজী কালু হিন্দু-মুসলিম সকলের কাছে উপাস্য। তাদের মতে গাজী কালু ওরা বনবিবির ভাই। বনবিবির সাথে তাদেরও স্মরণ করা হয়।

সাধারণত সর্বসাধারণের কাছে ধর্মীয় ভিত্তিতে 'মা' শব্দটি দ্বারা দেবী দুর্গাকে নির্দেশ করা হয়। কিন্তু সুন্দরবনে এই মা দেবী শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবী নন বরং মুসলমানদেরও। মা বনবিবিকে উভয় সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক হিন্দু ও নিবেদিত মুসলমানগন একত্রে মান্য করে। প্রচলিত আছে যে, বনবিবি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অবহেলা আর অবজ্ঞার কারণে বনের একটি হরিণ তাঁকে লালন পালন করেন। প্রকৃতির এই আশীর্বাদে কৃতজ্ঞ হয়ে মা বনবিবি বনের রক্ষাকর্তা হয়ে উঠেন। বনে প্রবেশের পূর্বে সবাই মা বনবিবির পূজা করে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন গ্রামে বনবিবির নামে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নিজ নিজ গ্রাম ও অধীবাসীদের রক্ষায় ভারতীয় সুন্দরবনের কুলতলী গ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে বাঘের উপর আসীন মা বনবিবির মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে ।[৫৯৫] ভারতীয় সুন্দরবনে এক রাত্রির ঘটনা বর্ণনায় প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নাম্নী এক পর্যটক তার ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন-

---

৫৯১. As cited in https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/176546/8/08_chapter%204.pdf, date and time: 25.01.2019 at 3:51 pm.

৫৯২. Chiara Peruca and Krisnapada Munda, *Social Water management Among Munda People in the Sundarbans,* University of Liberal Arts in Bangladesh as cited in https://ulab.edu.bd/wp-content/uploads/2015/09/Social-Water-chapter-3.pdf, 06-02-2019 at 1:56 pm.

৫৯৩. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, পূর্বোক্ত।

৫৯৪. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: পূর্ণিমা রানী, পেশা: মৎসজীবী এবং গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইশ্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৫৯৫. Prashanto Banerji, Lady of the legend – bonbibi, https://lokfolk.blogspot.com/2010/03/lady-of-legend.html, Uploaded on 30-03-2010 cited on 12-04-2020 at 5:03 pm.

এক রাত্রে কুলতলী গ্রামে যাত্রার আয়োজন করা হলো। যাত্রা অনুষ্ঠানে নানা গীত সঙ্গীত গাওয়ার পর সেখানে গিরি নামক এক অধিবাসী সবার জ্ঞাতার্থে বললেন আমাদের মুতালিব এখন মঞ্চে উঠবে। গিরি পর্যটককে বললেন যে মুতালিব হরি কীর্তন খুব ভালো পারে। মুতালিব তখন মঞ্চে উঠলেন। তার সঙ্গীত শুনে দলে দলে লোকজন এসে ভীড় করতে শুরু করলো। কুলতলী গ্রামের হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টানসহ সকলেই সেই রাতের আনন্দ আয়োজনে মেতে উঠলেন।[৫৯৬]

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সেই রাতকে বনে কাটানো একটি জাদুকরী রাত হিসেবে অভিহিত করেছেন। হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্যপূর্ণ এই সম্পর্ক নির্মাণে সুন্দরবনের ভূমিকায় তিনি বলেন-

> *"The forest forces us to remain human, remain humane and stay in touch with what religion was meant to be... a source of strength, a divine bond, with our Khuda, our soul and our neighbour. A night in the forest is enough to teach you that."*[৫৯৭]

সুন্দরবনের এক মিস্ত্রির বাড়িতে দেখা যায় যে- পুর্বদিকে আয়না মিস্ত্রির বাড়ি। বাড়ির পাশেই এক অশ্বত্থ গাছ। হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, সকলেই দূর গ্রাম থেকে এসে এই গাছের ঝুরি ও ডালে ইট বেঁধে মানত করে বনদেবীর নামে। লোনা দেশে অশ্বত্থ গাছ হওয়াই এক আশ্চর্য। তাই ভাটি-দেশের মানুষ অবাক হয়ে বিশ্বাস করে এই গাছের আশ্চর্য ক্ষমতা না থেকেই যায় না।[৫৯৮] এছাড়া বনজীবীদের মাঝে 'স্বার্না' ধর্মের প্রচলন রয়েছে। কেউ কেউ একে বলেন আদি ধর্ম।[৫৯৯] আদি ধর্মের নিজস্ব একটি ধর্ম গ্রন্থ আছে।[৬০০] এই ধর্মে 'শাহারুল' পূজা, 'সহরাই' পূজা, কারাম উৎসব ও ডাণ্ডি খরম এ রকম বিভিন্ন ধরনের পূজা-আর্চনা আছে।[৬০১] বনজীবীদের মতে সৃষ্টিকর্তাকে আরাধনা করা বা প্রকৃতিকে আরাধনা করা বা ঈশ্বরকে স্মরণ করাই পূজা। তাদের এক একটি পূজার অর্থ অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করা হয়।[৬০২] মারা গেলে সৎকার করার ক্ষেত্রে আগে মাটি দেওয়া হতো, পোড়ানোর নিয়ম নেই। এখনও মাটি দেওয়া হয়। কিন্তু হিন্দু ধর্মের সাথে সংমিশ্রণ এবং ভূমি না থাকায় পোড়ানো হয়।[৬০৩]

---

৫৯৬. ibid.

৫৯৭. ibid.

৫৯৮. শিবশঙ্কর মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ-৩২৫।

৫৯৯. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: রাজ প্রসাদ মুণ্ডা, পেশা: গ্রাম্য ডাক্তার, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৯/১০/২০২২, স্থান: ৮ নং ইশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: খাগড়াঘাট। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১২ টা ১৯ মিনিট।

৬০০. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: রাজ প্রসাদ মুণ্ডা, পেশা: গ্রাম্য ডাক্তার, পূর্বোক্ত।

৬০১. ঐ।

৬০২. ঐ।

৬০৩. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, পূর্বোক্ত; সাক্ষাৎকারদাতার নাম: রাজ প্রসাদ মুণ্ডা, পেশা: গ্রাম্য ডাক্তার, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৯/১০/২০২২, স্থান: ৮ নং ইশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: খাগড়াঘাট। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১২ টা ১৯ মিনিট।

চিত্র-২২: গরু পূজা

৩.২১ স্থানীয় লৌকিক আচার অনুষ্ঠান ও লোকসংস্কৃতি:

হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত ধর্মীয় সংস্কৃতি: বনজীবী মানুষের কাছে ধর্মের চেয়ে বেঁচে থাকা এবং প্রকৃতির সাথে টিকে থাকাটাই অধিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের আবাস এক, শত্রু এক, একই ঝড় ঝঞ্ঝা পরিবেশে জীবিকা নির্বাহ প্রভৃতি তাদেরকে সমন্বিত ধারায় বসবাস করতে শিখিয়েছে। তারই প্রতিফলন দেখা যায় সুন্দরবনের লোকজ সংস্কৃতিতে। মুসলমান ধর্মীয় ভাবধারার শব্দসমূহ গাজী, পীর, বিবি এবং দেবীসহ সকল হিন্দু ভাবধারার শব্দসমূহ নির্বিশেষে ব্যবহার করা হয়। যেমন: মুসলমান পীর বদর ও গাজী বনজীবী সকলের আরাধ্য পর। প্রতিকুল পরিবেশসহ সকল বিপদে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করে। জঙ্গলে বিপদমুক্ত থাকার জন্য নৌকার নোঙ্গর খুলার পরই তারা পীর বদরের নাম জপে। তারা বলতে থাকেন ***"আমরা আছি পোলাপান, গাজী আছে নিঘাবান, পাচঁপীর বদর বদর"*** । গাজী কালুর ভক্তে তারা শিরনি মানত করে। আলী, গঙ্গাদেবী ও জাহ্নবী সকলেই তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজনীয়। বনের সর্বপ্রধান রক্ষাকর্তা হলেন বনবিবি বা বনদেবী। বনবিবি, গাজী, মা মনসা ও গঙ্গাদেবীর নামে তারা জঙ্গলে মোরগ-মুরগী ছেড়ে দেন, পাঁঠা বলি দেন। তাদের বিশ্বাস

‘বনবিবির আশীর্বাদ আর মহাশক্তিশালী গাজী প্রতাপের নিকট বাঘ আসার সাহস পাবে না।’ বনে প্রবেশের পূর্বে তাদের আশ্রয় প্রার্থনামুলক অভিবাদন জানিয়ে প্রবেশ করে।[৬০৪]

৩.২২ ভাষা: সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকাগুলোর ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এসব এলাকার ভাষা ও সংস্কৃতিতে রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। পাইকগাছা উপজেলায় মিশ্র ভাষা চলমান দেখা যায়। অধিকাংশই নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে থাকেন।[৬০৫] অঞ্চলে একটি সাধারণ আঞ্চলিক ভাষা চিহ্নিত করা কঠিন। বনভূমি আবাদ ও অধিক রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অধিবাসীদের এখানে নিয়ে আসা হয়। তাই এখানকার ভাষার মধ্যে বিভিন্ন প্রভেদ দেখা যায়। বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলা অঞ্চলে বন সরিয়ে জনপদ গড়ে তোলা হয়েছিল। ফলে পার্শ্ববর্তী জেলা হতে আগত ব্যক্তিবর্গের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবে এই অঞ্চলের বিভিন্ন জনপদের আঞ্চলিক ভাষায় ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। শরণখোলা উপজেলার অধিবাসীদের মধ্যে বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব দেখা যায়।[৬০৬] মুণ্ডারা বাংলা, হিন্দি ও ফারসি ভাষার সংমিশ্রিত উপভাষা নাগুরাই ভাষা ব্যবহার করে।[৬০৭] বনজীবীর একেক শ্রেণির এক এক রকম ভাষা। যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষত্রীয় সমাজে অন্য একটি ভাষা, জেলে সমাজের মধ্যে আলাদা একটি ভাষা। মুণ্ডাদের নিজস্ব ভাষাকে বলা হয় আন্তেরিক ভাষা। এটা তাদের আদি ভাষা। এই ভাষারও বিভিন্ন শাখা রয়েছে একেক সমাজে। আবার বাঙালিদের বিভিন্ন জাতির সঙ্গে মিশে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে তারা।[৬০৮] সামাজিক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিয়ে মৃত্যু, কেউ মারা গেলে তখন তাদের যে আচারগুলো রয়েছে সেগুলো তাদের ভাষায় প্রকাশ করা হয়। তরকারীকে তিয়ান বলা হয়। তাদের ভাষায় বলা কথা যেমন:

“তোর নাম ক্যা? ঘর কাহা তোর?”[৬০৯] “আপনি সকালেতো ভাত খেয়ে আসছেন”, (বিহানে কা খায়া কালিমি, কা দিয়াকে খায় কালিশি?) “তয় বিহনে কাদিকে ভাত খায় কালিশি” অর্থাৎ “কি তরকারি দিয়ে খেয়েছেন?” [৬১০]

---

৬০৪. Prashanto Banerji, ibid.

৬০৫. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্যবাতায়ন, পাইকগাছা, খুলনা, *http://paikgasa.khulna.gov.bd/site/page), সাইটেশনঃ ১৮-০২-২০২১, সাইটটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছে ৩১-১২-২০২০।

৬০৬. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্যবাতায়ন, ভাষা ও সংস্কৃতি, (http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/pag), সাইটেশনঃ ১৮-০২-২০২১, সাইটটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছে ৩১-১২-২০২০।

৬০৭. Naveed Naushad in Resort review feature at The Daily Star, 1 December 2015. As cited in https://www.thedailystar.net/lifestyle/travelogue/the-munda-people-the-sundarbans-180325, 12-04-2020 at 12:25 am.

৬০৮. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, পূর্বোক্ত।

৬০৯. ঐ।

৬১০. ঐ।

এক্ষেত্রে নীলকান্ত মুণ্ডার বচন:

> *আমাদের ভাষায় আমরা বলি, "এ মেহমান আলাহে, বেসাক জাগা যান। কা জোগাড় হেয়। এ ভাত পানি কাহে না খায়ি জোগাড় করে রাখ। কে কে ইমাকেতো খা খাতে তো দুটা দেবে হেতেয়। এখন মনে করো বিদেশি মানুষ আলাহে। সে মান জেলে হয়তো ওমান ঘরে যেখানে আপনি হঠাৎ মাত্র যাবে মেহমান তা হাপনে কি সেবানা যন্ত কেরবায়ে আমনি যদি এখান পতি আমনি পরিচয় দেলেন, আপনি যদি সেই ভাবে সেবা যন্ত না কারিয়ে, অহমান সহমান হনি কেমনি কিকারবায়। আপনারা আইছেন তাই আমরা ভালো মন্দ কি হয়তো মুরগি, কি একটা হয়তো মাছ, কি যেকোন ইয়েতে আমাদের জোগাড় যন্তর করতে হয়।[৬১১]*

উল্লিখিত কথাগুলো বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করে নীলকান্ত মুণ্ডা বলেন-

> *আমি বলছি যে, আপনারা এইভাবে যে আইছেন, আপনারা এখানে আইছেন না? এখন আমরা আপনাদের জন্যি আমরা ডশ করতে পারি। এখন হঠাৎ মাত্র এখন পাশে দোকান নেই। তাই আমি বলছি পাশে দোকান নেই, কি খাতি দেবো! তখন বলি একটা চা হোক, বিস্কুট হোক, যেকোন একটা আপনাদের আপ্যায়ন করার একটা পান-বিড়ি দরকার। কিন্তু সেইটাই আমাদের= এই কা হেয় না খেয় দেখায় কোন জাগায় হেয় কেমন কোন পান-বিড়ি এগুলো জোগাড়। এ নেপাল এ মানতো মেহমান আলা হে, একটু চা-তা হেয় একটু গরম-তরম করে নে যেমন দেখ।[৬১২]*

তাদের মাঝে যে ভাষা চালু আছে সেটার ব্যবহার কমে যাচ্ছে দিনে দিনে। এ প্রসঙ্গে নীলকান্ত মুণ্ডা বলেন-

যে ছেলে মেয়েরা আছে, এখন স্কুল কলেজে যাচ্ছে বিভিন্ন জাতির ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বাংলা ভাষা প্রকাশ করছে, এখন আমাদের আদি ভাষাটা ছেলে মেয়েরা আস্তে আস্তে বাদ দিচ্ছে কিন্তু আমরা ধরে রাখছি ভাষাটা।[৬১৩]

তাদের মতে বাংলা ভাষা না জানার কারণে সম্পত্তিসহ অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয়েছে।

৩.২৩ বিনোদন ও খেলাধুলা:

পূর্বে এসব অঞ্চলে খেলাধুলা বেশ জনপ্রিয় ও বৈচিত্র্যময় ছিল। জনপ্রিয় খেলা হা-ডু-ডু, বল খেলা, ঘুরচণ্ডি, ঘুড়ি উড়ানো, লাফ দেয়া, গাদন খেলা, কুস্তি, দাঁড়িয়াবান্ধা বা গাদন, গোল্লাছুট, কানা মাছি, বুড়িরচু, ডাংগুলি, লাঠিখেলা, শাম্পর খেলা[৬১৪] মল্ল যুদ্ধ (কুস্তি) ও ভার উত্তোলন প্রতিযোগিতা বেশ জনপ্রিয় ছিল। ঘোড়া দৌড়, নৌকা বাইচ এখনো হয়।[৬১৫] পাশাপাশি মেলা হয়, পহেলা বৈশাখে মেলা হয়, কৃষি মেলা হয়, জঙ্গলে সাগর মেলা

---

৬১১. ঐ।

৬১২. ঐ।

৬১৩. ঐ।

৬১৪. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশা: মৎসজীবী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইসতিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ৯ নং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, গ্রাম: কলবাড়ি, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৬১৫. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মিলন সরদার, পেশা: মৌয়াল, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইসতিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল দুপুর ১২ টা ১০ মিনিট।

হয়, পূজার সময় মেলা হয়, পূজার সময় দোকান-পাট আসে।[৬১৬] নৌকা বাইচ, ঘোড়দৌড়, মোরগ লড়াই, ঘুড়ি উড়ানো প্রতিযোগিতা এখনো বিদ্যমান। বর্তমানে এসব খেলার তুলনায় ফুটবল, ক্রিকেট ও ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলা প্রাধান্য পাচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকেই বিনোদনের বিশেষ ঐতিহ্য বিদ্যমান সুন্দরবন অঞ্চলে। পূজাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় নাচ-গান হয়ে থাকে। যেমন- আদি গান, খেমটা সুরে গান, খেমটা নাচ, ঝুমুর সংগীত। [৬১৭]এছাড়া যখন কারাম উৎসব হয় তখন যে নৃত্যটা হয় তাকে কারাম নৃত্য বলা হয়। সহরাই উৎসব তখন বলা হয় সহরাই এর নাচ বা সহরাই এর গান।[৬১৮] যাত্রা, থিয়েটার, ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মৌসুমে মেলা, সার্কাস, পুতুলনাচ, ভ্রাম্যমান সিনেমা, নাগরদোলা প্রভৃতি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। কিশোর-কিশোরীমেলা, বৈশাখীমেলা, কৃষিমেলা আয়োজনের পাশাপাশি শীতের শুরুতে বিভিন্ন নাট্যদলের আয়োজনে যাত্রাপালা মঞ্চস্থ করা হয়। কবিগান, জারিগান, বালককীর্তন, রামায়ণ প্রভৃতি পালা অধিবাসীদের কাছে বেশ আনন্দপ্রিয়। বহু বছর ধরে এসব এলাকার বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের পারস্পরিক বসবাসের ফলে প্রধান অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দৃঢ় সম্প্রীতির মেলবন্ধন স্থাপিত হয়েছে এবং দীর্ঘকাল ধরে চলমান। এভাবেই তাদের মধ্যে বক্তিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটেছে।[৬১৯] ভাটি অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গীত বিশেষ করে ভাটিয়ালী গান অত্যন্ত প্রিয়। শিশুদের নাচ,গান, চিত্রাঙ্কন অভিনয় শেখানোর জন্য রয়েছে বেশকিছু সাংস্কৃতিক শিল্পগোষ্ঠি।[৬২০]

৩.২৪ লোকচিকিৎসাঃ

স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে বনই জীবনের চিকিৎসাঘর। তাদের কাছে বন পাঠশালার মত। সকল বিপদ সামলানোর পন্থা বনে আছে।[৬২১]

> *জঙ্গলে যদি কেটে যায় তাহলে ঐ জঙ্গলের ভিতরে যেকোন একটি পাতা ডলি দিলি ঠাকুরের ইচ্ছায়, মা বনবিবির ইচ্ছায় সব ভালো হয়ে যায়।*[৬২২]

---

৬১৬. ঐ।

৬১৭. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, পূর্বোক্ত।

৬১৮. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: রাজ প্রসাদ মুণ্ডা, পেশা: গ্রাম্য ডাক্তার, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৯/১০/২০২২, স্থান: ৮ নং ইশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: খাগড়াঘাট। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১২ টা ১৯ মিনিট।

৬১৯. বাংলাদেশের জাতীয় তথ্য বাতায়ন, শরণখোলা, বাগেরহাট (http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/pag), সাইটেশন: ১৮-০২-২০২১, সাইটটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছে ৩১-১২-২০২০।

৬২০. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্যবাতায়ন, ভাষা ও সংস্কৃতি, (http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/pag), সাইটেশন: ১৮-০২-২০২১, সাইটটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছে ৩১-১২-২০২০।

৬২১. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশা: মৎসজীবী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্‌ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ৯ নং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, গ্রাম: কলবাড়ি, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

বনজীবীদের ভেষজ পন্থায় চিকিৎসা করা অধিক প্রচলিত। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে খুব কম যাওয়া হয়।[৬২৩] কবিরাজ বা ওঝা বা গুণিনই তাদের কাছে বেশ জনপ্রিয়।[৬২৪] তাদের মতে যেকোন মুহূর্তে কোন অসুবিধা হলে পরিষদে যাওয়া কঠিন তাই কবিরাজের কাছে যায় তারা। বাঘের আঁচড় লাগলে বা কামড় দিলে হেন্তাল গাছের পাতার রস লাগালে ভাল হয়। গরান গাছের তলায় গরান ফুলের রেণু পড়ে হলুদ হয়ে থাকে। বনে হাত-পা কেটে গেলে গরানের শিকড় অথবা গরান ফুলের পরাগ রেণু কাটা ক্ষতে ব্যবহারে সাথে সাথে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। আমাশয় হলে খলসি গাছের ছাল বেটে রস খেলে সেরে যায়।

> *কালো লতার পাতা। ঐগুলো হাত দিয়ে কি দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ঐ কাটা জাগায় লাগিয়ে দিলি ঐটা রক্তটা বন্ধ হয়ে যায়। একটু পাতলা পায়খানা হলি খলসি গাছের ছাল চাবায় খাতি পারলি এক ঢোক দেখা যায় অনেক রোগেত্তে মুক্তি পাওয়া যায়।*[৬২৫]

জ্বর হলে পশুর পাতার রস গরম করে খেতে হয়। বনে পানি পিপাসা পেলে তেঁতুল গাছের মত দেখতে চিলেগাছের ডাঁটা ছুলে চিবিয়ে খেলে পিপাসা মিটে যায়।[৬২৬] সুন্দরবনে স্থানীয় অধিবাসীদের সুপ্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি রয়েছে। একধরণের প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতির নাম উলিক্ক করা বা ঠেংনা করা। যাদের লিভারে সমস্যা হয় তাদের এই চিকিৎসা দেয়া হয়।

> *সুন্দরবনে দেখা যাচ্ছে যে কেলু লতা আছে। কাজ করতি গিয়ে দা-এ একটা কোপ লাগলি কেলু লতা চিবিয়ে পানের মত ফিনিশ করে দিয়ে কোন রকম বেন্ধে নিয়ে আসি। আর পোকা-মাকড়ের কথা, ওতো বলা যায়না। সাপে কামড়ালো অথবা যে একটা পোকায় কামড় দিলো আমরা দেখা যাচ্ছে সেই তত্তে-তত্তে বাড়ি নিয়ে আসি।*[৬২৭]

বনজীবী চিকিৎসকদের বলা হয় গুনিন। গুণিনকে বিশ্বাস করেন সবাই।[৬২৮] কোথাও বাঘ মারা গেলে গুনিনেরা বাঘের জিবের একটু অংশ সংগ্রহ করে রাখে। কেউ লিভার জটিলতায় আক্রান্ত হলে কলার ভেতর শস্যদানার মধ্যে সেই মরা বাঘের জিবের মাংস ভওে পুড়িয়ে ঔষধ তৈরি করা হয়। এছাড়া চিকিৎসা হিসেবে হরগোজা গাছের শিকড় পুড়িয়ে বাম হাতে ঠেংনা দেয়া হয়।[৬২৯] অবৈধভাবে যারা মৃত বাঘের চামড়া, দাঁত, হাড়, পশম বিক্রি করে

---

৬২২. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: পূর্ণিমা রানী, পেশা: মৎসজীবী এবং গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৬২৩. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, পূর্বোক্ত।

৬২৪. ঐ।

৬২৫. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মিলন সরদার, পেশা: মৌয়াল, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল দুপুর ১২ টা ১০ মিনিট।

৬২৬. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, পূর্বোক্ত, ঢাকা।

৬২৭. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: পূর্ণিমা রানী, পেশা: মৎসজীবী এবং গৃহিণী, পূর্বোক্ত।

৬২৮. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশা: মৎসজীবী, পূর্বোক্ত।

৬২৯. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, পূর্বোক্ত, ঢাকা।

তাদের কাছ থেকে কবিরাজরা সেগুলো সংগ্রহ করে। অনেকের পূর্ব পুরুষের আমলে রাখা দাঁত বা হাড় টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে। বিশ হাজার বা ত্রিশ হাজার টাকায়ও বিক্রি হয়। কবিরাজেরা এগুলো দিয়ে নিজ পেশা চালিয়ে যায়।[৬৩০]

নৌকা মায়ের গর্ভের মত: ভারত বাংলাদেশ উভয় সুন্দরবন অংশে নৌকা তৈরি ও ব্যবহারে একধরণের আচার লক্ষ করা যায়। নৌকার জন্য কাষ্ঠ দেবীর পূজা করা হয়। কাষ্ঠ দেবী তাদের আপদ-বিপদের থেকে, নদী-নালা, সমুদ্র, বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, পোকা-পোকড় সেখান থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসে তাদের।[৬৩১] স্থানীয়দের বিশ্বাস অনুযায়ী নৌকার সামনের দিক আর মাঝামাঝি অংশ হল দুটি পবিত্র জায়গা। এ দুটি স্থানে পা ফেলা যাবে না। বলা হয় যখন নৌকা তৈরি করা হয় তখন তুলসী, সোনা, রুপা ও তামা দিয়ে মঙ্গলকামনায় পূজা করেন। নৌকা যদি নতুন তৈরি করা হয় তখন পূজা-আশ্রয় না করে নৌকায় উঠা হয় না। নৌকার মাথায় দুধ দেওয়া হয়, সিঁদুর দিয়ে ঠাকুর আঁকা হয় এবং পূজা করে নৌকা নদীতে নামানো হয়।[৬৩২] গল্লাবাড়ি, বেতনা, মধু কাটার নৌকা, ডিঙে, মাছ ধরার নৌকা, খেওয়া ও বাইচের নৌকাগুলোতে এই আচার মেনে চলা হয়। সুন্দরবনের জেলেরা মাছ ধরার প্রধান বাহন নৌকাকে মায়ের গর্ভ হিসেবে দেখে। মধু, গোলপাতা, কাঠ ও মাছ সংগ্রহের সময় বনে অবস্থানকালীন নিরাপদ স্থান হল এই নৌকা। তাঁদের বিশ্বাস মায়ের গর্ভ থেকে যেমন কখনোই সন্তানের ক্ষতি হয় না, নিরাপদ থাকে ঠিক তেমনি তারাও নৌকায় নিরাপদ থাকে। নৌকায় তাই তারা উপুর হয়ে ঘুমায় না, চিত হয়ে ঘুমানোর নিয়ম। এছাড়া চিত হয়ে ঘুমালে খাল ও জঙ্গলের সবকিছু সহজে পর্যবেক্ষণও করা যায়।[৬৩৩] নৌকা মূলত তাদের কাছে মায়ের গর্ভের মত।

তা মা বলতি আমাদের এই নৌকো।[৬৩৪]

মৌয়াল মিলন সরদারের ভাষায়-

> *নৌকা যে ব্যবহার করবে তার নাম হিসেবে পূজা করা হয়। নৌকার মাথা আমরা মার চোখে দেখি, পূজার সময় মাথায় জল দিতি হয়। দুধ, গঙ্গা জল ছিটাই জঙ্গলে যাওয়ার আগে।*[৬৩৫]

গোণ ও ভাটিকা: সুন্দরবনের অধিকাংশ নিয়মই চন্দ্র নির্ভর। বনজীবীরা নিত্য গোণ ও ভাটিকা হিসাব করে চলে। প্রতি ছয় ঘণ্টা পর পর জোয়ার-ভাটা হয়। প্রতি মাসে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথির তিন দিন পূর্ব থেকে তিন দিন

---

৬৩০. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশা: মৎসজীবী, পূর্বোক্ত।

৬৩১. ঐ।

৬৩২. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: পূর্ণিমা রানী, পেশা: মৎসজীবী এবং গৃহিণী, পূর্বোক্ত।

৬৩৩. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, পূর্বোক্ত, ঢাকা।

৬৩৪. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশা: মৎসজীবী, পূর্বোক্ত।

৬৩৫. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মিলন সরদার, পেশা: মৌয়াল, পূর্বোক্ত।

পর পর্যন্ত প্রায় এক সপ্তাহ সময় হচ্ছে গোণমুখ। এসময় বনজীবীরা বনে থাকে। প্রতি মাসে দুটি গোণমুখ আসে। প্রতি দশমী তিথিতে একটি নতুন গোণমুখের জন্ম হয়। চতুর্দশী পর্যন্ত গোণমুখ থাকে। সবচেয়ে বড় গোণমুখ হলো কলাকাটা গোণমুখ। এটি ভাদ্রসংক্রান্তি থেকে শুরু করে আশ্বিনের শুরুতে হয়। ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহে হয় পান্তাভাসান গোণ। গোণ ও ভাটিকা এখানকার জনজীবনে গভীরভাবে জড়িত। গোণমুখের সময় মহাজনের কাছ থেকে যে টাকা ধার করে তাকে বলা হয় গোণ দাদন বা গোণমুখী দাদন। এসময় চিংড়ি ও কাঁকড়া বেশি পাওয়া যায়। কোকো পাখির কু-কু-কু ডাকে বনজীবীরা বুঝতে পারে যে ভাটিকা লাগার সময় হয়েছে।[৬৩৬]

রাতে বন ঘুমায়: বনজীবীরা বিশ্বাস করেন রাতের বেলা বন ঘুমায়। দিনের ভাগে বনের গাছ জেগে থাকে এবং রাতে ঘুমায়। তাই রাতে গাছের শরীরে হাত দিতে নেই। এতে গাছ বিরক্ত হয়। এসময় এমনকি গাছের ফল, পাতাও ছিঁড়তে নেই। এতে গাছ খুব কষ্ট পায়। এই ধারণায় রাতের বেলায় গাছের চাক থেকে মধুও সংগ্রহ করা হয় না। দিনের বেলায় সব কাজ করতে হয়। বনজীবীরা মনে করেন, রাতের বেলা বনবিবি, দক্ষিণরায় বনে ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণরায় বাঘের রূপ ধরে মানুষকে আক্রমণ করে থাকে।[৬৩৭]

সাপের মন্ত্র:

"কেঁচো ধরো, কুঁচে ধরো;
ওস্তাদের নাম জাহির করো,
শালা কেউটে ধরেছো কি মরেছো।"
"এই বলেই পিঠেই তিন চাপড়,
ভাণ্ডারের বিষ আপছে নেমে আসবে।"[৬৩৮]

সুন্দরবনের ডিঙিই প্রশান্তির বাহন: সুন্দরবনের মানুষ ডিঙি-বৈঠাতেই যেন মনের জোর পায়। তার উপর যদি ডিঙি নিজের হয়, তাহলে তো কথাই নেই। যেমন খুশি, যেদিকে ইচ্ছে সাঁইসাঁই করে চলে যেতে পারবে। যখন ইচ্ছে হয়, শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারবে, আবার যখন ইচ্ছে হয়, বৈঠার খোঁচে তরতর করে চলে যাবে। সঙ্গে হাঁড়ি আর চুলা, তো খাবারেরও ভাবনা নেই।[৬৩৯]

৬৩৬. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ*, *অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, পূর্বোক্ত, ঢাকা।

৬৩৭. ঐ।

৬৩৮. শিবশঙ্কর মিত্র, *সুন্দরবন সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।

৬৩৯. ঐ, পৃ. ৩১-৩২।

বাদার মানুষের জীবন: সুন্দরবনের অধিবাসীর কাছে বনই জগতের অন্য একটি দিক। উন্নত সভ্যতার চেয়ে এই বনই তাদের প্রশান্তি আর আস্থার জায়গা। তাদের সকল নিয়ম চলে বনকে কেন্দ্র করে। বলা হয়

বাদার মানুষের চলাচল নদী ও খালের স্রোত ধরে। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ওদের জীবন কখনও মেপে চলে না।[৬৪০]

মৌচাকের আলসী মৌপোকা পবিত্র প্রাণ: মৌচাকে নানা ধরণের পোকার মধ্যে একটি প্রধান পোকা থাকে। এই পোকাটি আকারে অন্যদের চেয়ে বড়। এই পোকা মধু সংগ্রহে বের হয় না এবং এর একমাত্র কাজ শুধু বাচ্চা জন্ম দেয়া। এই পোকা স্থানীয়দের কাছে মাইয়ে পোকা বা আলসী পোকা নামে পরিচিত। মৌয়ালদের কাছে এই পোকা খুবই পবিত্র প্রাণ। তারা চাক ভাঙার সময় খুব সতর্কতার সাথে আলসি পোকা ও বাচ্চাদের বাঁচায়। আলসি পোকা মারা যাবে না এই শিক্ষা মৌয়ালদের পরিবার থেকে খুব ছোটকাল থেকেই দেয়া হয়। তাদের বিশ্বাস আলসি পোকা ও বাচ্চা পোকাদের মারলে পাপ হয় এবং বনের দেবী বনবিবি অসন্তুষ্ট হন। এছাড়া এসব পোকা না থাকলে চাক হবে না আর চাক না থাকলে মধুও সংগ্রহ করা যাবে না।[৬৪১]

বাঘ ও কুমির বন্দনা: সুন্দরবনে বাঘ ও কুমির আরাধনা ও বন্দনার অন্যতম অংশ। সুন্দরবনের রক্ষাকর্ত্রী মা বনবিবির বাহন হল বাঘ। বাঘকে মনে করা হয় দক্ষিণরায়। বনবিবির উপাসনার সময় মাটি দিয়ে বাঘ বানিয়ে তার উপর বনবিবিকে বসানো হয়। চৈত্র মাসে সুন্দরবনে ধর্মদেল উৎসবে মাটি দিয়ে কুমির, ধনামনা, সাগরপিড়ি, সূর্যপিড়ি, কামদেব, নীলদেব, মালঞ্চ প্রভৃতি মাটি দিয়ে বানানো হয়। সুন্দরবনে কুমিরকে গন্ধকালী হিসেবে মানা হয়। ধানের জমি বা পুকুরের নরম কাদা মাটি দিয়ে কুমির বানানো হয়। কুমিরের সারা গায়ে খেজুরের ফল গেঁথে দেয়া হয়। বনবিবি পূজা ও ধর্মদেল উৎসবে বাঘ ও কুমিরের সুস্থ থাকার জন্য প্রার্থনা করা হয়। এরপর তারা যেন মানুষের ক্ষতি না করে সে জন্য আবদার করা হয়। জনশ্রুতি আছে যে, গন্ধকালী নাচতে নাচতে একদিন ধনপতি কুবেরের বাড়ি যায়। কিন্তু নাচতে নাচতে একসময় তার পা লেগে যায় কুবের মুনির শরীরে। মুনির অভিশাপে তখন গন্ধকালী কুমির হয়ে গন্ধমাদন থেকে সুন্দরবনে চলে আসে।[৬৪২]

বাদায় পড়া: সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণের শিকার হলে স্থানীয়রা বাঘে মেরেছে বা বাঘে পেয়েছে এই বাক্য ব্যবহার করেন না। সবাই বলেন মানুষটি বাদায় পড়েছে। সাধারণত জেলে বা বাওয়ালির চেয়ে মৌয়ালরা বেশি বাদায় পড়ে। কারণ চাকের জন্য তাদের দৃষ্টি উপরে থাকে বলে বাঘ পেছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে। তবে

৬৪০. শিবশঙ্কর মিত্র, *সুন্দরবন সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।

৬৪১. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ*, *পূর্বোক্ত*, ঢাকা।

৬৪২. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ*, *পূর্বোক্ত*।

স্থানীয়দের মতে নারীদের খুব কমই বাঘ আক্রমণ করে। জঙ্গলে বাঘের উপস্থিতিকে বলা হয় ***'বাদা গরম'।*** এক্ষেত্রে কখনো বলা হয় না জঙ্গলে বাঘ আছে।[৬৪৩]

বাঘরূপী দক্ষিণরায়: সুন্দরবনে বাঘের অস্তিত্ব বাস্তব ও কল্পনা উভয় ক্ষেত্রে। বনজীবীদের বিশ্বাস বাঘরূপী দক্ষিণরায় বা অতৃপ্ত আত্মা মানুষকে আক্রমণ করে। মূলত বাঘ মানুষকে খায় না। পূর্বে বাঘ বা কুমিরের আক্রমণে কারো যদি মৃত্যু হতো যেমন জেলে, বাগদি বা বনজীবী যে কেউ, তাহলে মৃত্যুর পর লাশ চরেই সমাধি দেয়া হতো। তাদের ধারণা মৃতদেহের আত্মা বাঘের রূপ ধরে জলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। সুন্দরবন গবেষক পাভেল পার্থের নেয়া সাক্ষাৎকারে মলয় দাস নাম্নী স্থানীয় অধিবাসী বলেন- ভারতীয় সুন্দরবনে যাদের বাঘের হাতে মৃত্যু হয় তাদের আত্মা 'বেঘোমুড়ি' হয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। বাঘ রূপ ধরে এসে এরা 'কুই' শব্দ দিয়ে মানুষকে তাদের দিকে নিয়ে যায়। [৬৪৪]

বনে বাঘের নাম মুখে আনা বারণ: বনে পা দিতেই সুন্দরবনের লোকেরা বাঘ নামটা মুখে আনে না। তখন ওরা বাঘকে 'বড়মিঞা', 'বড় শেয়াল', 'বড় হরিণ', 'ভোঁতড়', 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি বলে পরিচয় দেয়।[৬৪৫]

হরিণ শিকার: সুন্দরবনের মানুষ এই ব্যাপার লক্ষ্য করে হরিণ শিকারের সহজ পথ বের করেছে। এই পদ্ধতিকে 'গাছাল শিকার' বলে। কেওড়া গাছ সাধারণত নদীর তীর ধরে হয়। খুব ভোরে, না হয় বেলা তিনটার সময় এমনি একটা গাছে চুপেচুপে উঠে বসবে। সুন্দরবনের প্রায় সব নদীই উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে গেছে। কাজেই সূর্য পুর্ব আকাশে বা পশ্চিম আকাশে থাকলে নদীর কূলে এই সব কেওড়া গাছের তলায় রোদ বেশ ভাল ভাবেই পড়ে। হরিণের পাল তখন গাছের তলায় আসে সেই রোদ আর কেওড়া পাতার লোভে। সুযোগ বুঝে শিকারীরা গাছে বসে বানরের মত ডাকে বা বানরের মত কিচিরমিচির শব্দে ঝগড়ার নকল করে; আর সেই সঙ্গে ডাল ভেঙে মাটিতে ফেলতে থাকে। হরিণের তখন মতিভ্রম ঘটে। হরিণ উপর দিকে দৃষ্টি দিতে অক্ষম। তারা দল বেঁধে অতি নিশ্চিন্ত মনে এই গাছের তলায় পাতা খেতে আসে। শিকারীরা সেই সুযোগে দেখে ও বেছে দল থেকে পুরুষ-হরিণ মারে। 'মায়া-হরিণ মারা সুন্দরবনের মানুষেরা আত্মগৌরবের মনে করে।[৬৪৬]

বছরের প্রথম মধুচাক বা ফুলপটি মধু: সুন্দরবন থেকে বছরের প্রথম সংগৃহীত মধুচাককে বলা হয় ফুলপটি মধু। সাধারণত খলিসা ফুল থেকে প্রথম মধু পাওয়া যায়। ফুলপটি মধু পূজা, কৃত্য বা ঔষধের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা

৬৪৩. ঐ।

৬৪৪. ঐ।

৬৪৫. শিবশঙ্কর মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭।

৬৪৬. শিবশঙ্কর মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ-২৩৮।

হয়। এছাড়া বছরে যাতে অনেক মধু সংগ্রহ করা যায় সে জন্য নৌকা পূজা করা হয়। সেই নৌকা পূজায় ফুলপটি মধু দিয়ে নতুন নৌকাকে স্নান করানো হয়। এই নৌকায় থাকলে বিপদ মোকাবিলা করা যায়।[৬৪৭]

মেথানি: বিভিন্ন প্রজাতির গাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ঝরে যাওয়া পাতা জোয়ার-ভাটার কারণে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে স্তুপ হয়। এই স্তুপীকৃত পাতা একসময় নরম কালচে মণ্ড আকার ধারণ করে। এই অবস্থাকে বলে মেথানি। এই মেথানি থেকেই চিংড়ি মাছের উৎপত্তি। মেথানিকে সুন্দরবনের চিংড়ির আঁতুড়ঘর বলা হয়। জোয়ার-ভাটার কারণে এই চিংড়ির পোনা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বাণিজ্যিক চিংড়িঘেরগুলোর জন্য এসব স্থান থেকেই পোনা সংগ্রহ করা হয়। মেথানিতে চাপড়াজাতীয় চিংড়ি বেশি পাওয়া যায়। সুন্দরী, খলিসা, বাইন, পশুর, কাঁকড়া, গেওয়া ও জানাগাছের ঝরা পাতা জমে অধিক মেথানি তৈরি হয়।[৬৪৮]

৩.২৫ বনে অবস্থানকালীন রীতিনীতি:

নিয়ম আছে, যারা করে তারা জানে। ধরো, আমরা জঙ্গল করিতো কম-বেশি হলেও আমরা জানি যে জঙ্গলের বিষয়ডা কি, খারাপ কি ভালো। যেরাম মানি চলবা সেরাম সবদিকতে ভালো। আর যে মানবেনা তার ক্ষতি হবে, জঙ্গলে এমন নিয়ম। আমরা স্বামী-স্ত্রী যাই দুজন যা হয় কম বেশি মা বনবিবির নাম করি মালে পা দেই। আর ঐখানতে মাটি তুলি আমরা মাথায় দেই। মালে পা দেয়ার সাথে সাথে বনবিবির নাম করি মাটি মাথায় তুলে দেবো কিন্তু সারাদিন যদি নদীতে থাকো মালের ভিতরে কোন টু শব্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু মাল ছাড়ি যখন গাঙে আসি পড়বো তখন গা-টা ঝাড়বো। চলি আসলি তখন নদীতি আসি পড়লি গা ভার হয়ে যায়। তার মাল ছাড়ি দিয়ে আইছিতো। তার ইউনিয়নের ভিতরে যদি থাকো তা মা বনবিবির ইচ্ছায় কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়না।[৬৪৯]

বনে অবস্থানকালীন পারিবারিক রীতিনীতি: বনে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহের যাত্রাকে বলা হয় মালযাত্রা। যেহেতু বন থেকে ফিরে আসতে প্রায় একসপ্তাহ- পনেরদিন সময় লাগে তাই এই যাত্রার পূর্বে পুরুষেরা পরিবারের জন্য বাজার, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রেখে যান। পরিবারের নারী সদস্যরাই এসময় পরিবার পরিচালনা করে থাকেন। বনজীবী সনাতন হিন্দু পরিবার ও অন্যান্যরা মালযাত্রার আগে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলে। যারা বনে যায় তারা এ সময় তেল-মসলা ও নেশাজাতীয় খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। এছাড়া যাত্রার পূর্বে ভারী কাজ করা হয় না। শুক্রবারে সুন্দরবনে বনবিবি ঘুরে বেড়ায় বলে এদিন কেউ বনে প্রবেশ করে না এবং বন থেকে কিছু সংগ্রহও করা হয় না। বনে যাওয়ার পূর্বে শুক্রবারের দিন হিন্দু পরিবারের লোকজন উপবাস করে। যতদিন পুরুষেরা বনে থাকে ততদিন হিন্দু-মুসলিম পরিবারের নারীরা রোজা রাখে উপোস করে। এসময় নারীরা মাথায় তেল দেয় না, সাবান ব্যবহার করে না, চুলার ছাই বাইরে ফেলে না, মাটিতে দা বা ধারালো কিছু দিয়ে আঁচড়

৬৪৭. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ*, *পূর্বোক্ত*।

৬৪৮. ঐ।

৬৪৯. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: পূর্ণিমা রানী, পেশা: মৎসজীবী এবং গৃহিণী, পূর্বোক্ত।

দেয় না, কোনো ধার-কর্জ করে না। মালযাত্রায় যাওয়ার সময় পরিবারের নারীরা গুনগুনিয়ে গান গায়। এই রীতি পালনে বাংলাদেশ ও ভারত অংশে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। যারা বনে যায় তারা ফিরে আসবে কিনা এই আশঙ্কায় নারীরা হাঁড়িতে চাল দেয় না, কাপড় কাচে না, সিঁদুর পরে না এবং আয়নায় মুখ দেখে না। কোথাও কোথাও বনে যাওয়ার সময় নারীদের শাঁখা খুলে দিয়ে যাওয়া হতো। বনে গিয়ে স্বামী নিখোঁজ হলে নারীরা বারো বছর শাখা-সিঁদুর পরে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে। কাঠুরেরা বনে ঢুকে কাষ্ঠ বুড়ি বিশালাক্ষীর পূজা করে, বনে নখ চুল কাটা হয় না।[৬৫০] এই রীতিকে বলা হয় *বাচত* করা।[৬৫১] পূর্ণিমা রাণীর ভাষায়-

> *ও লোক যদি জঙ্গলে যায় তা আমরা হলো মাথা ডলিনা, কাপড়-চোপড় কিছু কাচিনা, ঘর-বাড়িও লেপিনা, খেতা সেলাই করিনা। উনুনে তিন বেলা গোবর দিবো, উঠুনে গোবর দিবো। কাপড়-টাপড় বাড়ি দিলি, মাথা যদি ঘষি তাহলে ওলোকের জঙ্গলে ডালের পালা মুখে লাগে। আর যদি খেতা (কাঁথা) ঢাকা দিই তা ঐ জঙ্গলের যে শুলু পায়ে ফোঁটে। লোকেরা (স্বামী) যদি জঙ্গলে যায় তাহলে আমরা এইসব কাজ করিনা।*[৬৫২]

এ সময় বনবিবির কাছে তাদের প্রার্থনা থাকে নিম্নরূপ-

> *আর বনবিবির ধরো আমাদের থান আছে। ওখানে বলি কী যে বাচ্ছা-কাচ্ছা কডা গেছে মা তোমার কাছে তুমি একটু দেইখো। কোন ভয়-ভীতি দেখাইয়ো না। নাই ওরা দুটো মাছ না পালি আমাদেরেতো পেটে খাবার আনতে হবে, তা তুমি যদি ভয় দেখাও তা ওরাতো কিছু আনতি পারবিনা। তা তুমি ভয় দেখাইয়োনা। আসলি তোর এখানতে মাছ-টাছ বেচি তোমায় একটু খয়রাত দেবো। এইভাবে আমরা এই বাড়ি আসলে তখন ঐ ভোগ-টোগ কিনে মার ওখানে খয়রাত দিই।*[৬৫৩]

মাইয়ে মাছের আত্মা: সুন্দরবনের ডিমওয়ালা মা মাছকে পবিত্র হিসেবে ভাবা হয়। জালে ধরা পড়লেও এই মাছ ছেড়ে দেয়া হয় সকলের ধারণা মা মাছ ধরে খেলে সেই মাছের আত্মা বনে ঘুরে বেড়ায় এবং ক্ষতি করে।[৬৫৪]

বনে অধিক মধু প্রাপ্তির স্থান নির্ণয়: মধুর মৌসুমে বনের কোথায় বেশি মধু পাওয়া যাবে সেই স্থান নির্ণয়ের জন্য মৌয়ালরা শ্রীপঞ্চমীর দিন ঘরের কোণে মাটির প্রদীপ সলতে দিয়ে জ্বালিয়ে রাখে। সারা রাত ধরে সেই প্রদীপ জ্বলতে থাকে। প্রদীপের শিখা যেদিকে যাবে তার উল্টোদিকে বেশি মধু পাওয়া যাবে।

---

৬৫০. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, পূর্বোক্ত*।

৬৫১. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: কাঞ্চন সরদার, পেশা: গৃহিণী, পূর্বোক্ত।

৬৫২. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: পূর্ণিমা রানী, পেশা: মৎসজীবী এবং গৃহিণী, পূর্বোক্ত।

৬৫৩. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: কাঞ্চন সরদার, পেশা: গৃহিণী, পূর্বোক্ত।

৬৫৪. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, পূর্বোক্ত* ।

চিত্র-২৩ (ক): বনবিবির মন্দির, কলাবাড়ি, সাতক্ষীরা

৩.২৬ বনবিবি: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাঘের থাবা থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য বনজীবী মানুষ বনবিবির উপাসনা করে। কোনো অধিবাসীই বনবিবির আশীর্বাদ না নিয়ে বনে প্রবেশ করে না। বিশেষ করে মধু ও কাঠ সংগ্রহকারীরা এই নিয়ম মেনে চলেন।[৬৫৫] তাদের বিশ্বাস বনবিবির প্রধান শত্রু দক্ষিণের রাজা ডেমন (Dakkhin Rai) বাঘের ছদ্মবেশে এসে মানুষকে আক্রমণ করে। ১৭ শতকে কৃষ্ণরাম দাস প্রথম দেব-দেবীর এই পৌরাণিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে বনবিবি বনদুর্গা নামে পরিচিত ছিল। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয়দের মধ্যে এখনো এই নামটির প্রচলন রয়েছে। মধ্যযুগে মুসলমান সেটেলাররা এই এলাকায় আসার পর বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের মধ্যে যুদ্ধের গল্প প্রচলিত হয়।[৬৫৬] পরবর্তীতে ১৯ শতকে আব্দুর রহিম বনবিবি জহুর নামা নামে পুনরায় বাংলায় লিপিবদ্ধ করেন। কাহিনীকল্পটিতে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের চমৎকার সংমিশ্রণ রয়েছে।[৬৫৭] প্রকৃতিগত দিক দিয়ে হিন্দু আচার হলেও এই রীতি শুরু করা হতো বিসমিল্লাহ বলে। কল্প চরিত্র Archangel Gabriel মক্কা থেকে তার মাতা বনবিবি ও ভাইকে সুন্দরবনে পাঠান কদর্য রাজা দক্ষিণ রায়কে পরাজিত করার জন্য।[৬৫৮] আবদুর রহিম কর্তৃক আরবি হরফের ন্যায় ডান দিক থেকে বামদিকে বাংলায় লিখিত ***বনবিবি জহুরনামা***-তে উল্লেখ আছে যে, জঙ্গলের এই দেবী ইব্রাহিম নামের এক মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ

৬৫৫. Chiara Peruca and Krisnapada Munda, *Social Water management Among Munda People in the Sundarbans,* University of Liberal Arts in Bangladesh as cited in https://ulab.edu.bd/wp-content/uploads/2015/09/Social-Water-chapter-3.pdf, 06-02-2019 at 1:56 pm. P.18

৬৫৬. রাসমেলা: সুন্দরবনের গভীরে লোক উৎসব, দি ডেইলি স্টার, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬।

৬৫৭. Chiara Peruca and Krisnapada Munda, *Social Water management Among Munda People in the Sundarbans*, ibid, P.18

৬৫৮. ibid, P.19.

করেন। ইব্রাহিম দ্বিতীয় স্ত্রীর অভিলাষে তার প্রথম স্ত্রী কে বনবাসে যেতে বাধ্য করেন। বনের মধ্যে গর্ভবতী এই নারী জমজ সন্তান জন্ম দেন। তিনি কন্যা সন্তানটিকে প্রকৃতির কাছে ফেলে রেখে পুত্র সন্তানকে সাথে নিয়ে চলে যান। বনবিবি তখন বনের একটি হরিণের কাছে পালিত হন। কৃতজ্ঞতাস্বরুপ তিনি বন ও বনবাসীর প্রাণ রক্ষা করে থাকেন। ধূর্ত ও দুষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যাঘ্ররূপী দক্ষিণ রায়কে তিনি দমন করে গ্রামবাসীদের রক্ষা করেন। বনবিবি তার স্বর্গীয় লক্ষ্যে হারিয়ে যাওয়া ভাই ও ফাতিমার আশীবার্দ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদিনায় যান এবং ফেরার সময় কিছু পবিত্র মাটি নিয়ে এসে সুন্দরবনের মাটির সাথে মিশ্রিত করে দেন। বনবিবির সুন্দরবনে ফিরে আসায় দক্ষিণ রায় ক্রুদ্ধ হন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। বনবিবির কাছে পরাজিত হয়ে দক্ষিণ রায় বনবিবিকে 'মা' সম্বোধন করে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। বনবিবি তখন তার বিদায়কালে সবাইকে শর্ত দিয়ে গেলেন যে, সবাই যেন পবিত্র ও বিশুদ্ধ মনে ও শূন্য হাতে বনে প্রবেশ করে।[৬৫৯] এখনো সুন্দরবনের অধিবাসীরা জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে বনবিবির নামে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। একই কাহিনী অন্যভাবে উল্লেখ আছে- পাঠান আমলের কথা। সুন্দরবনের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ও যোদ্ধা দক্ষিণা রায়। সুন্দরবনে আধিপত্য করে ব্যাঘ্রের দেবতা বলে পরিচিত হয়েছিলেন। আজও তিনি পূজিত একাধিপত্য। বনবিবিকে স্মরণ করে, বনবিবিকে সেলাম দিয়ে আজও সুন্দরবনে প্রতিটি মানুষ বনে প্রবেশ করে। বনকে এদেশের মানুষ যেমন ভালোবাসে, তেমনি ভয়ও করে। জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে এদেশে মানুষ বনের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। এই ভয়ঙ্কর অথচ রোমাঞ্চময়ী বনের অধিপতিকে নারী রূপেই দেখে এদেশের মানুষ হয়ত মনের সাধ মিটিয়েছে।[৬৬০]

বনবিবির নামে অজস্র প্রবাদ ও গল্প ছড়িয়ে আছে। 'বনবিবির জহুরা' নামে মুসলমানী কিতাবে যে গল্প আছে, তাই এদেশের লোকে বিশ্বাস করে। মক্কাবাসী বেরাহিমের স্ত্রী গুলালবিবি। সতীনের কৌশলে তাঁকে সুন্দরবনে নির্বাসন করা হয়। নির্বাসনের সময় তিনি সন্তান-সম্ভবা ছিলেন। বনেই সা জঙ্গুলী ও বনবিবি নামে তাঁর যমজ পুত্র ও কন্যা হয়। ভাটি দেশের রাজা দক্ষিণা রায়ের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য আল্লার আদেশে বনবিবি ও তর ভাই এই আবাদ অঞ্চলেই থেকে যান। অল্পদিনের মধ্যে আশেপাশে অনেক পরগণাই বনবিবির দখলে এল। দক্ষিণা রায় এই আধিপত্য সহ্য করতে রাজি নয়। তিনি যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু যুদ্ধ কি করে করবেন। পুরুষ হয়ে নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাঁর সম্মানে বাধে। আবশেষে তিনি তার মা নারায়ণীকে বনবিবির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। যুদ্ধে নারায়ণী পরাজিত হয়ে বনবিবির সঙ্গে সন্ধি করলেন। কিন্তু সন্ধি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এই সময় বরিজহাটিতে ধোনাই, মোনাই নামে দুই ভাই। এরা একদিন সাত ডিঙি সাজিয়ে বনে মধু কাটতে আসে। এদের সঙ্গে এক দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র 'দুঃখে' ছিল। সপ্তডিঙি গড়ডিঙি গড়খালি নদীতে

---

৬৫৯. Prashanto Banerji, *Lady of the legend – bonbibi,* https://lokfolk.blogspot.com/2010/03/lady-of-legend.html, Uploaded on 30-03-2010 cited on 12-04-2020 at 5:03 pm.

৬৬০. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: রাজ প্রসাদ মুণ্ডা, পেশা: গ্রাম্য ডাক্তার, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৯/১০/২০২২, স্থান: ৮ নং ইশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: খাগড়াঘাট। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১২ টা ১৯ মিনিট।

এলে দক্ষিণা রায় এদের কাছে নরবলি দাবি করেন। মহাপূজায় দক্ষিণা রায় নরবলি দেবেন। তিনি বেছে ‘দুঃখে’কে নেবার আদেশ দিলেন। বেগতিক দেখে ধোনাই মোনাই ‘দুঃখে’কে দিয়ে দিল। খবর পাওয়া মাত্র বনবিবি ‘দুঃখে’কে রক্ষা করার জন্য দক্ষিণা রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দক্ষিণা রায় বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করলেন। ‘দুঃখে’কে দিয়ে দিল। খবর পাওয়া মাত্র বনবিবি ‘দুঃখে’কে রক্ষা করার জন্য দক্ষিণা রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ করলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দক্ষিণা রায় বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করলেন। ‘দুঃখে’ রক্ষা পেল; শুধু রক্ষা পেল না, বনবিবির কৃপায় ‘দুঃখে’র বিধবা মার অন্ধত্ব ও বধিরত্বও ঘুচে গেল। ‘দুঃখে’র বহু সম্পদ মিলল এবং ধোনাইয়ের মেয়ে চম্পার সঙ্গে বিয়ে হল। সেই অবধি বনবিবি বনের দেবী। বসন্তের আগমনে তারই পূজা বা তারই উৎসব। বেলা বেশ হয়েছে। পঞ্চাশ-ষাট্ খানা ডিঙি এসে বনের কূলে চেপেছে। তিন চার শ’ লোক জমে নিস্তব্ধ বনকে মেলায় পরিণত করেছে। যে যার গল্প আমোদ ও উৎসবে ব্যস্ত।

গোপাল সানার লোকবিশ্বাসে বনবিবি আর দক্ষিরায়ের গল্প স্পষ্ট হয়ে উঠে। যথা-

“বনজীবীদের মতে দক্ষিণরায়ের চরিত্র হচ্ছে সুন্দরবন এক সময় তার হাতে ছিলো। তিনি ছিলেন জঙ্গলের বাদশাহ। আর ইব্রাহিম খলিলের স্ত্রী হচ্ছে বনবিবি। তার প্রসব যন্ত্রণা যে সময় শুরু হয় সে সময় রাক্ষসী রাণী বুদ্ধি দেয় এই রাণীকে বনবাসে দিয়ে আসতে হবে। তখন ইব্রাহিম খলিল বুদ্ধি করে রাণীকে বলেন ‘রাণী চলো অনেক দিনতো তোমার বাপের বাড়ি যাওনা, তুমি চলো তোমার বাপের বাড়ি নিয়ে যাই।” তখন ঐ রাণী গর্ভাবস্থায় থাকতে রওনা হলেন এবং জঙ্গল দিয়ে হাটতি লাগলো। হাটতে হাটতে অনেক দূর চলি আসে। যাওয়ার পর রাণী ক্লান্ত হয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে গিয়ে রাণী বাদশ কে বলেন ‘আপনি একটু বসেন আমি একটু আপনার উরুর উপর মাথা দেই। দিয়ে আমি একটু বিশ্রাম করে নেই।’ তখন রাণী উরুর উপর মাথা রেখে শুয়ে বেহুশ হয়ে যায়। তখন পাতা-লতা জোগাড় করে রাণীর মাথায় দিয়ে বাদশা সেখান থেকে চলে আসে। আসার পরে উনার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। সন্তান হয়ে গেলে রাণী উঠে দেখে স্বামী নাই। সেই সময় হায় আল্লাহ, হায় আল্লাহ করে কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহ উনার সহায় হলেন। হওয়ার পরে বলতেছে দেখো তোর স্বামী তো তোরে রেখে চলি গেছে। তা তুই এই জঙ্গলে আল্লাহর নাম স্মরণ কর। করতি করতি ঐ গর্ভপাত হলো। গর্ভপাত হয়ে ঐ বনবিবি আর জঙ্গলি জন্মগ্রহণ করলো। করে ওখানে থাকে, থাকতি থাকতি ছয় রাণী একদিন বলতিছে যে তুমিতো ছোট রাণীকে বনবাসে দিয়ে আইলে তা তুমি একটু যাওতো গে দেখি আসো সেখানে কি করে সে? গে দেখে যে দুই মেয়ে আর ছেলে লায়েক হই গেছে। গিলি একটা মসজিদ বানিয়ে জঙ্গলি আযান দেছে। আর বনবিবি নামাজ পড়তিছে। পড়তি-পড়তি, পড়তি-পড়তি ঐ বাদমা গে উঠিছে। উঠি গে বলতিছে রাণী তুমি বেঁচে আছো? তা বলতি হ্যা আমি বেঁচে আছি এখনো। তারপরে কান্ন-কাটি করতি লাগলো। কান্না-কাটি করার পর ঐ ছাবাল আর মাইয়ে কোলের কাছ আসি বলতিছে আম্মাজান ও কে? তা বলতি তোমার আব্বাজান। তা বললো কিরাম আব্বাজান! আব্বাজান থাকতি আমরা জঙ্গলে কেন! তা বললো যে তোমার ছয় মার যুক্তি শুনি আমাকে বনবাসে দিয়েছে। সে সময় বললো যে মা আব্বাজান যখন তোমাকে নিতে আইছে তুমি দেশে চলি যাও বাপের সাথে। আমরা আর দেশে যাবোনা। আমরা এই জঙ্গলের অধিপতি হই থাকবো। এইবার যে সময় অধিপতি হই থাকলো আযান যে সময় দেচ্ছে সন্ধ্যার সময়ে, ফজরের আযান দেচ্ছে। সেই সময় দক্ষিণরায়ের কানে কিন্তু সংবাদ চলি

গেছে। সংবাদ চলি গেলি কি ফেরা! আমার এই জঙ্গলে আযান দেয় কে! দক্ষিরায় এসে দেখে যে এই একটা মানে তোমার সন্তান আযান দেচ্ছে। জঙ্গলি আযান দেচ্ছে আর বনবিবি কিন্তু পাশের রুমে আছে। থাকলি বললো যে তুমি কে? তা বললো যে, আমি জঙ্গলি। আর উনি কে? উনি বনবিবি। তা বললো যে আমার মানে সাত ভাটির পথে এসে তোমরা দখলে। এ দখল তো আমি দেবোনা। সেই সময় বনবিবির সাথে আর দক্ষিরায়ের সাথে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ হতি হতি বিশাল ধরনের যুদ্ধ হচ্ছে। হতি-হতি যে সময় রায়মনি পারেনা সেই সময় ওর মানে ধরি ফেলালু। ধরি আঘাত করতি লাগলো। সেই সময় বলে যে তুমি আজকে থেকে আমাকে মেরোনা। এখানে তখন বনবিবির সাথে আর দক্ষিরায়ের মার সাথে সঁই পাতানো হয়। সঁই যে সময় পাতানো হয় সেইসময় বলে যে, সঁই তুমি আজকে থেকে আমার ধর্ম সঁই। সঁই বলি যখন এ করলো তখন যুদ্ধ থেমে গেলো। থামার পরে ঐ জঙ্গলডা বললো যে রায়মনি বুঝায়ে দিলো জঙ্গলির হাতে আর ঐ বনবিবির হাতে যে এই সাত ভাটির পথ তোমরা ভাই-বুনে দখল করবা।[৬৬১]বনবিবি সেইসময় ঐ জঙ্গল রাজত্ব করতি লাগলো। আর ঐ তোমার জঙ্গলি দেশে চলি আসলো।"

চিত্র-২৪ (ক): বনবিবির পালা

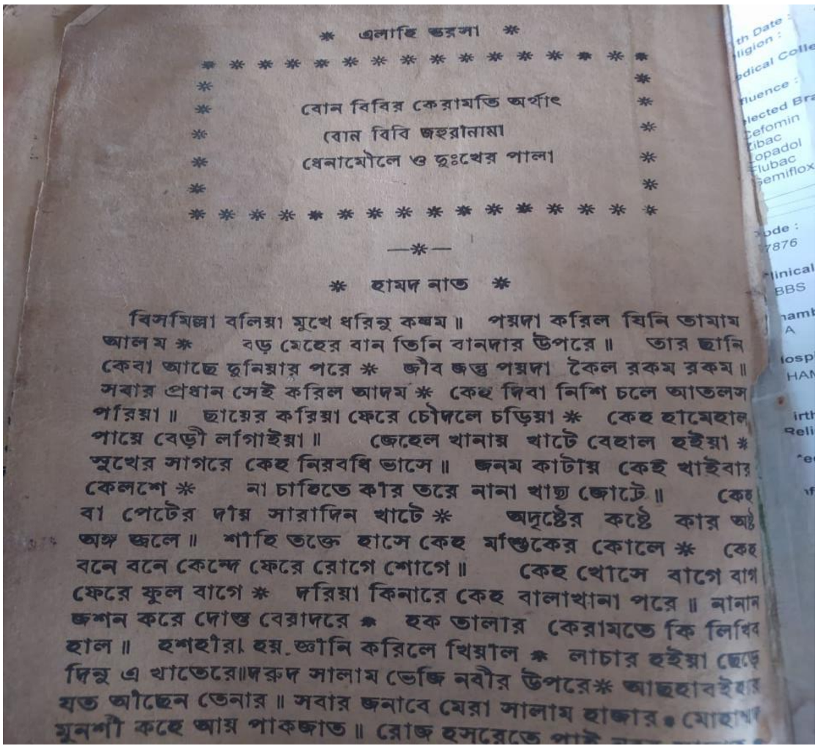

* এলাহি ভরসা *

বোন বিবির কেরামতি অর্থাৎ
বোন বিবি জহুরানামা
ধেনামৌলে ও দুঃখের পালা

—*—

* হামদ নাত *

বিসমিল্লা বলিয়া মুখে ধরিনু কলম ॥ পয়দা করিল যিনি তামাম আলম * বড় মেহের বান তিনি বানদার উপরে ॥ তার ছানি কেবা আছে দুনিয়ার পরে * জীব জন্তু পয়দা কৈল রকম রকম ॥ সবার প্রধান সেই করিল আদম * কেহ দিবা নিশি চলে আতলস পরিয়া ॥ ছায়ের করিয়া ফেরে চৌদলে চড়িয়া * কেহ হামেহাল পায়ে বেড়ী লাগাইয়া ॥ জেহেল খানায় খাটে বেহাল হইয়া * সুখের সাগরে কেহ নিরবধি ভাসে ॥ জনম কাটায় কেহ খাইবার কেলশে * না চাহিতে কার তরে নানা খাদ্য জোটে ॥ কেহ বা পেটের দায় সারাদিন খাটে * অদৃষ্টের কষ্টে কার অষ্ট অঙ্গ জ্বলে ॥ শাহি তক্তে হাসে কেহ মাশুকের কোলে * কেহ বনে বনে কেন্দে ফেরে রোগে শোগে ॥ কেহ খোসে বাগে বাগ ফেরে ফুল বাগে * দরিয়া কিনারে কেহ বালাখানা পরে ॥ নানান জশন করে দোস্ত বেরাদরে * হক তালার কেরামতে কি লিখিব হাল ॥ হশহীরা হয় জ্ঞানি করিলে খিয়াল * লাচার হইয়া ছেড়ে দিনু এ খাতেরে॥দরুদ সালাম ভেজি নবীর উপরে* আছহাবইহার যত আছেন তেনার ॥ সবার জনাবে মেরা সালাম হাজার * মোহাম্মদ মুনশী কহে আয় পাকজাত ॥ রোজ হসরেতে

চিত্র-২৪ (খ): বনবিবির পালা

৬৬১. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশা: মৎসজীবী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ৯ নং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, গ্রাম: কলবাড়ি, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

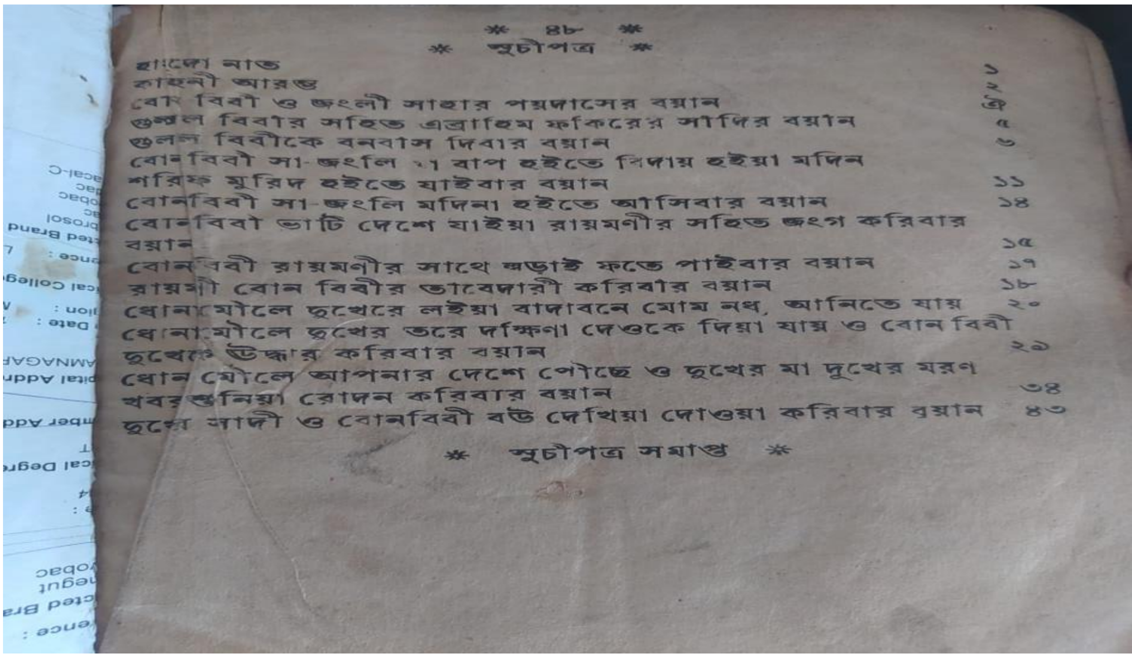

* ৪৮ *

* সূচীপত্র *

হামদো নাত ১
কাহিনী আরম্ভ ২
বোন বিবী ও জংলী সাহার পয়দাসের বয়ান ঐ
গুলাল বিবীর সহিত এব্রাহিম ফকিরের সাদির বয়ান ৫
গুলাল বিবীকে বনবাস দিবার বয়ান ৬
বোনবিবী সা-জংলি মা বাপ হইতে বিদায় হইয়া মদিন
শরিফ মুরিদ হইতে যাইবার বয়ান ১১
বোনবিবী সা-জংলি মদিনা হইতে আসিবার বয়ান ১৪
বোনবিবী ভাটি দেশে যাইয়া রায়মণীর সহিত জংগ করিবার
বয়ান ১৫
বোনবিবী রায়মণীর সাথে লড়াই ফতে পাইবার বয়ান ১৭
রায়মণী বোন বিবীর তাবেদারী করিবার বয়ান ১৮
ধোনা মৌলে দুখেরে লইয়া বাদাবনে মোম মধু আনিতে যায় ২০
ধোনা মৌলে দুখের তরে দক্ষিণা দেওকে দিয়া যায় ও বোন বিবী
দুখেরে উদ্ধার করিবার বয়ান ২৯
ধোনা মৌলে আপনার দেশে পৌছে ও দুখের মা দুখের মরণ
খবর শুনিয়া রোদন করিবার বয়ান ৩৪
দুখে বাদী ও বোনবিবী বউ দেখিয়া দোওয়া করিবার বয়ান ৪৩

* সুচীপত্র সমাপ্ত *

বনবিবির পূজা: বনবিবির পূজায় বনজীবীরা, জঙ্গলে যাওয়ার পূর্বে তার আরাধনা করে। তারা পূজো-আশ্রয় করে এক থেকে তিন হাজার লোককে সেখানে পায়েস খাওয়ানো হয়। তারপরে তারা বনবিবি মায়ের গান দুঃখী যাত্রা, এই যাত্রাগান দিয়ে তারা সুন্দরবনে প্রবেশ করে।[৬৬২] পূজার প্রতি অগাধ বিশ্বাস প্রসঙ্গে গোপাল সানার উক্তি-

> *অবশ্যই বিশ্বাস আছে। সুন্দরবনে দেখা যাচ্ছে যে মা'র আমরা আরাধনা করি। ওর না করি গেলি হয়তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দিনের পেটটা চলতো না। আর কথা হচ্ছে যে আমার এই পর্যন্ত পূজা-আশ্রয় করে আমাদের এখানে কোন আপদ-বিপদও হয়নি। বড় বড় বিপদের মুখোমুখি হইছি। কিন্তু কোন আপদ-বিপদ হয়নি। তার নাম করে স্মরন করে আমরা বনে যাই।*[৬৬৩]

চিত্র-২৩ (খ): বনবিবির মন্দির

৬৬২. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশা: মৎসজীবী, পূর্বোক্ত।

৬৬৩. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশা: মৎসজীবী, পূর্বোক্ত।

বছরের শুরুতে একবার জৈষ্ঠ্য মাসে বনবিবির পূজা করা হয়। জৈষ্ঠ্য মাসে সবাই আনন্দ করে এই বনবিবির পূজা করে থাকে। তাদের মতে তারা সবাই বনবিবির উছিলায় জঙ্গলে যায়।[৬৬৪]

> *সুন্দরবনে আমরা বনবিবির পূজা করি। জৈষ্ঠ্য মাসে প্রথম নতুন চাঁদ উঠলি পূজা করি আমরা। শহর থেকে ঠাকুর তৈরি করে নিয়ে জঙ্গলে আমরা হচ্ছে ঘর বান্ধি। ঘর বেঁধে ঐখানে আমরা বাড়ি থেকে কিছু খাদ্য-খাবার নিয়ে যাই। পূজার সরঞ্জাম নিয়ে যাই। মাইক নিয়ে গিয়ে এক-দুই ঘণ্টা পূজা আশ্রয় করে আমরা আবার বাড়ি ফিরে আসি সবাই মিলে।*[৬৬৫]

চিত্র-২৩ (গ): বনবিবির মন্দির

৬৬৪. ঐ।

৬৬৫. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মিলন সরদার, পেশা: মৌয়াল, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৭/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল দুপুর ১২ টা ১০ মিনিট; সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মহেন্দ্র, পেশা: মৎসজীবী, কাঁকড়া শিকারি ও চাষী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৫/১০/২০২২, স্থান: ৯ নং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: চুনা। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১২ টা ৪৮ মিনিট।

বনবিবির উপর আস্থার প্রকাশ স্পষ্ট উচ্চারণ কৌশল্যা মুণ্ডার ভাষায়-

আমরা যদি এখন বনে যাই, চোখ বন্ধ করে আসবো কিছু হবেনা। এটা আমাদের বিশ্বাস বনবিবি আছে। কথায় বলেনা, বাঘের লেখা আর সাপের দেখা, সাপ আর বাঘ কারো বাবা-চাচা না।

নীলকান্ত মুণ্ডার ভাষায়-

আমরা বনবিবির নামে স্মরণ করে যাবো যে, মা আমরা যাচ্ছি।[৬৬৬]

মৌয়াল মহেন্দ্রের ভাষায়-

হ্যা, ঐ যে সময় জঙ্গলে ওঠে সে সময় কিন্তু মারে স্মরণ করতে হয়, যে আমারে মধু দিও।[৬৬৭]

জেলে মিলনের ভাষায়-

মা'র নাম করে যেতে হয়। স্মরণ করে যেতে হয়। বনবিবির পূজা করি না করলেও, আমরা বনবিবিকে স্মরণ করে আমরা হচ্ছে নৌকায় উঠি। আর জঙ্গলে উঠার সময়ও বনবিবিকে স্মরণ করি আমরা। এ সময় এ একটা ভরসায় আমরা চলি।[৬৬৮]

---

৬৬৬. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, পূর্বোক্ত।

৬৬৭. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মহেন্দ্র, পেশাঃ মৎসজীবী, কাঁকড়া শিকারি ও চাষী, পূর্বোক্ত।

জেলেনী পূর্ণিমা রানীর ভাষায়-

> *হ্যা, উরির তো স্মরণ করিই আমরা জঙ্গলে যাই। আর মা বনবিবিই তো আমাদের দেখে ও উদ্ধার করে আমাদের।*[৬৬৯]

বনবিবির পাশাপাশি গাজী কালু, পীর বদর, পীর মদন ও দক্ষিণ রায়ের উপাসনা করা হয়। তাদের মতে বনবিবির ভাই গাজী কালু।[৬৭০]

জঙ্গলে মুরগী ছেড়ে দেওয়া বা মুরগী পূজা: বনের অধিবাসীরা রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বনে মুরগী অবমুক্ত করার মান্নত করে থাকে। পাশাপাশি মুরগী-পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।[৬৭১] বনবিবির নামে সবসময় পূজা না করা হলেও তার নামে আরাধনা করা হয় সবসময়। ডালা সাজানো হয়। জেলে সম্প্রদায় বনে জঙ্গলে সবসময় থাকে, নদী খালেই সময় কাটে তাদের, তাই তারা বনবিবির মূর্তি নিয়ে উপাসনা করে। মুণ্ডা সম্প্রদায় মূর্তি নিয়ে পূজা না করলেও বছরে যখন চৈত্র মাস শেষ হয়, তাদের যে দেব-দেবী আছে অথবা তারা যাদের উপাসনা করে সেই সময় তারা একটা করে মুরগি দেব-দেবীর নামে, বনবিবির নামে ছেড়ে দেয়।[৬৭২] দক্ষিণ রায়ের নামেও মুরগী পূজা করা হয়।[৬৭৩] নীলকান্ত মুণ্ডার ভাষায়-

> *সারা বছর আয় উন্নতি করবো বছর সালে চৈত্র মাসের ভিতরে আমরা এই মুরগি পূজা সর্ব দেব-দেবীর নামে আমরা যে যে দেব-দেবীর নামে উপাসনা করি।*[৬৭৪]

চিত্র-২৫: মুরগী পূজা

---

৬৬৮. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মিলন সরদার, পেশা: মৌয়াল, পূর্বোক্ত।

৬৬৯. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: পূর্ণিমা রানী, পেশা: মৎসজীবী এবং গৃহিণী, পূর্বোক্ত।

৬৭০. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, পূর্বোক্ত।

৬৭১. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মিলন সরদার, পেশা: মৌয়াল, পূর্বোক্ত।

৬৭২. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, পূর্বোক্ত।

৬৭৩. ঐ।

৬৭৪. ঐ।

বনবিবির ঘের: বসতবাড়ি, পূজার স্থানসহ সকল স্থান নিরাপদ রাখার জন্য মন্ত্র পড়ে ঘের দিয়ে রাখা হয় যাতে বাঘ আক্রমণ করতে না পারে। এটাকে বলা হয় বনবিবির ঘের। তাদের বিশ্বাস বাঘ এই ঘের অতিক্রম করে আসতে পারবে না, বনবিবিই রক্ষা করবে তাদের।

> *মাত্র আশেপাশের গ্রামের দুচারজন এসে ঘরখানা বানিয়েছে। ইতিমধ্যে বাউলে কলিম এসে ধুলো পড়ে মন্ত্র দিয়ে 'ঘের' দিয়ে গেছে। সবাই নিশ্চিত, কোনও বাঘ আজ আর এই ঘেরে'র মধ্যে আসবে না।*[৬৭৫]

> *–বলছি, বাঘ কি কখনও বাউলের বাড়ি ডিঙিয়ে আসতে পারে না, বনবিবি তা করতে দেবে? বল!*[৬৭৬]

বনবিবির আদেশ: বনের ভিতরে বা নিকটে কেউ বিপদে পড়েছে জানলেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। আবাদের মানুষ সৈনিকের মত এই নিয়ম মেনে চলে। না মানলে গ্রামের সবাই তাকে ঘৃণা করবে। এটা ওদের বনবিবির আদেশ। বনের দেবী বনবিবি। তাঁর আদেশ ওরা কেউ অমান্য করতে চায় না। সাহসও নেই।[৬৭৭]

বনবিবির মন্ত্র: বনে পথের বিপদের পর আছে বাঘের বিপদ। বাউলেরা বনবিবির উপাসক। ওদের কাছে বনবিবি বনের দেবী। আর সে দেবীর বাহন হচ্ছে বাঘ। কাজেই এই বাহনের হাত থেকে কাঠুরিয়াদের রক্ষা করে বনবিবির সাধকেরা। মন্ত্র আউড়ে বাউলেরা কাঠ কাটার ঘেরকে আগুন করে দিতে পারে বলে দাবি করে; সে আগুনে নাকি বাঘেরা আর এগিয়ে আসতে পারে না। আবার মন্ত্রের জোরে যেখানকার বাঘ সেখানেই আটক করে বন্দী করে

---

৬৭৫. শিবশঙ্কর মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১।

৬৭৬. ঐ, পৃ. ১৬৫।

৬৭৭. ঐ, পৃ-২৪৭।

দিতে পারে; এতটুকুও তার নড়বার ক্ষমতা থাকে না নাকি। তেমনি মন্ত্রের দাপটে বাঘের চোয়ালে খিল লাগিয়ে দেয়; সে খিল খুলে বাঘকে নাকি আর হাঁ করতে হয় না। আবিশ্বাসীদের এসব মন্ত্রে বিশ্বাস না হলে কি হবে, বনের উপকূলবাসীরা আজও পূর্ণ আস্থা রাখে এই সব মন্ত্রে।[৬৭৮]

মঙ্গল বাউলের মুখ থেকে এই সব মন্ত্রের পদ শুনেছি। শুনিয়েছে একটা শর্তে–লিখে নিতে পারবো না। ঝড়ের বেগে বলে গেছে মন্ত্রের পদ। বাঙলা ভাষায় পদগুলি। যেটুকু বুঝেছি তাতে বলা যায়, কিছু হিন্দু দেব-দেবী, কিছু মুসলমান পীর-পয়গম্বর, আর কিছু লোক-সাহিত্যের মানুষ যেমন চাঁদ সওদাগর, লক্ষ্মীন্দর বা দক্ষিণা রায়–এদের সবার নামে শপথ ও কিরে মাত্র।[৬৭৯]

কেষ্ট দেবীঃ বাদায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবার কাছে কেষ্ট মানে কিন্তু বনবিবি। বনবিবির দয়া হলে কেউই মারতে পারবে না। বাওলেদের কাছে এটা প্রায় বীজমন্ত্র। সেকথা স্মরণ করেই বাউলেরা বিপদে এই নির্ভয়বাণী মা-র কাছে বসে উচ্চারণ করে।

"এমন সময়ে বেদে বাউলে নিজেই এসে হাজির। এসেই ভজহরির মা-র পাশে বসতে বসতে বললো,– মা, জানো, 'রাখে কেষ্ট মারে কে? মারে কেষ্ট রাখে কে?[৬৮০]

বাউলেঃ সুন্দরবেন এক ধরনের মানুষ আছে, তাদের বলে–বনওয়ালি বা বাওয়ালি বা সহজ ভাষায় বাউলে। এই সব বাউলেরা আবার ফকিরও বটে। এদের ফকিরদের মতো শুদ্ধ ও সৎ জীবন যাপন করার আদেশ মানতে হয়। মানুষের প্রতি ভালবাসাও এদের অপরিসীম। সুন্দরবনে তো বিপদ-আপদের অন্ত নেই। প্রতি বিপদ-আপদে এরা তেজো-বীর্য নিয়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়ায় বলেই তো এরা বাউলে বা ফকির।[৬৮১] বাউলের কাজ মানে, প্রায়ই বনে যেতে হয়। বাঘ তাড়াবার কাজ। কাঠ, মধু বা গোলপাতা কাটবার দলের রক্ষক হয়ে বাউলেদের সুন্দরবনে যাওয়া মানে এক এক সময় একমাস দু'মাস কাটিয়ে আসা।[৬৮২]

বনে কাঠ কাটার ঘেরঃ সুন্দবনের আবাদে বাওয়ালির সম্মান সর্বত্র। বনের সর্বত্র কাঠ কাটতে দেওয়া হয় না। তাই যদি দেওয়া হত তাহলে এতদিনে বন উজাড় হয়ে যেত। এক-এক বছর এক-এক জায়গায় কাঠ কাটার হুকুম দেওয়া হয়। একেই বলে 'ঘের'। ঘেরে আবার সব গাছ কাটা যায় না। বড় বড় গাছে মার্কা মেরে দেওয়া হয়। কেবল মাত্র এই মার্কা মারা গাছ কাটা যায়।[৬৮৩]

---

৬৭৮. ঐ, পৃ. ৪৬১।

৬৭৯. ঐ।

৬৮০. ঐ, পৃ-৭৩

৬৮১. ঐ, পৃ. ৪৬০।

৬৮২. ঐ, পৃ. ৩২৬।

৬৮৩. ঐ, পৃ. ২৫২

বনে বাউলে না নিলে বাঘের ভয়: গোলপাতা, মধু ও মাছ আহরনে সাথে বাওলে নিয়ে যাওয়ার রীতি রয়েছে। বাওলে মন্ত্র পড়ে বাঘ তাড়ানোর কাজ করে। এরকম একটি ঘটনার উল্লেখ আছে যে-

> *কালিম শুনে নেয় ঘটনাটি। দলটি এসেছে বরিশাল থেকে। বড় নৌকা নদীতে নোঙর করে দলের তিনজনে ছোট্ট ডিঙি চেটে ছোট খালের ভিতর অনেক দূর এগিয়ে যায়। ছোট খাল দিয়ে যাবার সময় একবার মট্ করে শব্দ হয়। সন্দেহ হওয়াতে ওরা ডিঙি থেকে উঁচু হয়ে বনটা একবার দেখে নিল। কিন্তু পরিষ্কার বনে কোথাও কিছু দেখে না। তারপর ডিঙি করে আরও এগিয়ে গিয়ে ডাঙ্গায় ওঠে। তিনজনে এক সঙ্গেই উঠেছিল। উঠে দেখে দূরে বড় একটা দল কাঠ কাটতে এসেছে। তাদের কাছে গিয়েই কাঠ কাটবে মনে করে তিনজনে আবার ডিঙিতে উঠতে যায়। দুজনে ডিঙিতে উঠেছে, একজন বাকি। ঝড়ের মত বেগে আক্রমণ করে বাঘ তাকেই যেন ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। তখন ধারে কাছে যারাই ছিল তারা সব চলে এসেছে ফরেষ্ট আপিসে খবর দিতে।*
>
> *কলিম একমনে শুনছিল। কাহিনী শেষ হলে ঠোঁটের কোণে হেসে বলল– বুঝলাম! তোমার বুঝি বাউলে নেওনি? তা নেবে কেন? দুটো পয়সা খরচ করতে বাধে! যেমন কর্ম তেমনি ফল। চলো দেখি।*[৬৮৪]

ভরাপেটে বাঘ কাউকে আক্রমণ করে না: বনজীবীদের বিশ্বাস ভরাপেটে বাঘ মানুষকে আক্রমণ করে না। এমনই একটি ঘটনার উল্লেখ আছে যে-

> *মাঝি মাল্লার দিকে তাকিয়ে বলল–তোমরা এখানেই বোট ভিড়িয়ে থাকো। কোন ভয় নেই। 'বড়-মিঞা'র খাওয়া হয়ে গেছে আজকের মত; তোমাদের পেছনে আর লাগছে না! কোনও ভয় নেই। ভরা পেটে বনবিবির বাহন কাউকে কিছু বলে না! –বাঘের প্রতি কলিমের কেমন যেন একটা মমতা আছে।*[৬৮৫]

বাঘ যে পথে যায় সে পথে ফিরে আসে: সুন্দরবনের অধিবাসীদের বিশ্বাস শীতের শেষ দিকে বাঘ ডাকতে শুরু করে বাঘিনীর জন্য। বাঘিনীর দেখা পাবার জন্য বাঘ বন থেকে বনান্তরে ডাকতে ডাকতে যায়। কিন্তু যে পথে যাবে, ঠিক সেই পথেই ফিরবে। নিজের পদচিহ্ন দেখে দেখে ফিরবে। এতটুকু এপাশ ওপাশ হবে না। এরই সুযোগে সুন্দরবনের মানুষেরা 'কল-পাতা' শিকার করে। বাঘ যে-পথ দিয়ে চলে গেল সেখানে একটা বন্দুক রাখা হয় একটা তে-কাঠার উপর এক বিঘৎ আট আঙুল উঁচু করে বন্দুকের নল রাখে। তারপর টিপলে সঙ্গে কালো সুতো বেঁধে বাঘের পথের উপর আড়াআড়িভাবে একটু উঁচু করে টানা দিয়ে আসে। ফেরার সময় বাঘের পায়ে লেগে সুতোয় টান লাগতেই বন্দুকে চোট হয়ে যায়। এই পন্থাকে এদেশে 'কল-পাতা' বলে। এতে কোন সময় বাঘ মারা পড়ে, কখনও বা পড়ে না। মাপজোখ একটু গোলমাল হলেই চোট হলেও গুলি বাঘের গায়ে লাগে না।

---

৬৮৪. ঐ, পৃ. ২৫৩।

৬৮৫. ঐ, পৃ. ২৫২।

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও আবাদের লোকে বলে– এই জানোয়ার এমন চতুর যে কল-পাতা হয়েছে সন্দেহ করলেই সে মুখে ডাল-পালা নিয়ে এগুতে থাকে। তাতে কালো সুতোটা কাঠিতে লেগে আগেই চোট হয়ে যায়।[৬৮৬]

ফাওঃ সুন্দরবনের সাইদিররা যখন আইনমাফিক বনের পাশ দিয়ে সম্পদ আহরণ করে তখন তারা নিজের দরকারি কিছু একটা বন থেকে ফাও হিসাবে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু এমনিতে বিনা পাসে কোনও গাছ তো দূরের কথা, গাছের একটা পাতা আনাও বে-আইনী এবং শাস্তিযোগ্য। বন-কর বাবুরা যেন এটা দেখেও দেখেন না। একে বলে ফাও। উপকূলবাসীদের বনের উপর তাদের স্বাভাবিক অধিকারের একটা স্মৃতি হয়ে আজও বুঝি বহাল আছে।

> মনসুর বলে– ভাই, আমার যে একটা ‘ফাও’ নেবার ছিলো। মাত্র একটা মঠ্‌-গরানের খুঁটি আমার ঘরখানির জন্য। তা না হলে সামনের বোশেখী ঝড়ে ঘরখানি ভেঙে পড়বে! চলো সবাই খালের ধারে ডিঙির কাছাকাছি। একটা খুঁটি দেখেও রেখেছি। ডিঙিতে উঠবার মুখেই সবাই মিলে তুরন্ত কেটে নেবো।[৬৮৭]

নিশানাঃ বনের পথে বাঘ যাওয়ার কোনো চিহ্ন পেলে অন্যকে সতর্ক করার জন্য একটি সরু ডাল কেটে তারই মাথায় সাদা কাপড়ের ফালি ঝুলিয়ে সেই স্থানে পুঁতে রাখা হয়। একে সাদা নিশানা বলে।[৬৮৮] সুন্দরবন সংক্রান্ত সাহিত্যে উল্লেখ আছে-

> *ইসমাইল শ্বশুরের বকুনি অনুমান করেই মোড়লের দিকে তাকিয়ে ছিল। বকুনিতে কান না দিয়ে মোড়লকে বুঝিয়ে বলল– বুঝলে না মোড়ল! এখানে আর কেউ আসবে না। আর কেউ সন্ধান পাবে না এই সুন্দরী গাছের লাটের বনে-বাদাড়ে এ ধরনের নিশানা এক মর্মান্তিক সঙ্কেত। বনের কোনও লাটে বাঘে মানুষ নিলে, দলের বাকি লোকেরা ফিরবার সময় খালের মুখে এমনিধারা সঙ্কেত রেখে যায়। নতুন কোন দল এসে এই নিশানা দেখলে, আর সেই খালে প্রবেশ করে না।*

হাপরঃ হাপর দেখতে যেন নদীতে উপুড়-করা ডিঙি অর্ধেক থাকে ডুবে, অর্ধেক ভেসে। বড় গাছের গুঁড়ির মতো লম্বাটে ও গোল। তবে চারিদিকেই ঢাকাটা গোলপাতার মতো ফাঁক ফাঁক, যাতে নদীর জল এর মধ্যে অতি সহজেই আসা-যাওয়া করতে পারে। রাত্রে এইসব জেলে-নৌকা কিনারা থেকে অনেকখানি দূরে নোঙর করে প্রায় মাঝ দরিয়ায়। নৌকার লোকেরা

দিনের পর দিন মাছ ধরে, আর সঙ্গে সঙ্গে পুরে রাখে এই হাপরে। বেশ ক'দিন ধরে মাছগুলোকে জ্যান্ত রেখে অবশেষে নিয়ে যায় দূর-দূরান্তে।[৬৮৯]

---

৬৮৬. ঐ, পৃ.৩১৮।

৬৮৭. ঐ, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪।

৬৮৮. ঐ, পৃ. ৩৩৫।

৬৮৯. ঐ, পৃ. ৩৩৬।

বাঘের হাড়: লোনা পানির কারণে মাঝে মাঝে গরুর মড়ক হয়। গরুর তেমন একটা অসুখে বাঘের দাঁত বা মাথার হাড় ঘষে কলা পাতায় মোড়ক করে খাইয়ে দেয়। তাতে নাকি অসুখ সেরে যায়।[৬৯০]

কু শব্দ: সুন্দরবনে 'কু' দেওয়া এক অভিনব ব্যাপার। বনে নাম ধরে কেউ কাউকে ডাকাডাকি করে না। পাখির ডাকের মত জোরে 'কু' দেয়। হিংস্র জন্তু থেকে লুকানোর কত পন্থাই না মানুষ জানে!

> *কলিম বয়েকবার 'কু' দিল। দূরে বাবুর কাছ থেকে এবং বোট থেকেও 'কু'র উত্তরে 'কু' আসতে লাগল। বোটের লোকে সবাই মিলে উৎসাহে 'কু' দিতে লেগেছে।*[৬৯১]

সততা: গোটা সুন্দরবনের অন্তরের মর্মকথা হলো–সততা। এই সততার ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী প্রকৃতি ও মানুষ মিলেমিশে। প্রকৃতির সৃষ্টি –বন ও বাঘ। তারই আওতায় বন যেমন বাঘের রক্ষক, তেমনি বাঘও বনের রক্ষক। মানুষের বেলায়ও এই সততা তাগিদ সংক্রমিত। বনে পা রেখে কথনও মিথ্যা না বলার অঙ্গীকার, বনে কখনও কাউকে বঞ্চনা না করার অনুজ্ঞা, বা বনে কারও বিপদে ছুটে যাবার দায়বদ্ধতা থাকে সবার। সুন্দরবনে বনওয়ালিদের জন্য এই বিধি অমোঘ। বনওয়ালি, বা বাউলে, বা গুণিন–যাই বলি না কোন, এদের কোনও ধর্মের ভেদাভেদ নেই। মুসলমান গুরুর শিষ্য হিন্দু, আবার হিন্দু গুরুর শিষ্য মুসলামান। এদের কাছে একমাত্র ধর্ম হলো-সুন্দরবন।[৬৯২]

> *বনের সম্পদ আহরণে দল বেঁধে যাওয়া যেন উপকূলবাসীদের এক মহোৎসব। সবার আগে বৃদ্ধ বাউলে হাজিরুদ্দিনের কাছে 'আশে' বা আশীর্বাদ মাগুতে গেলো। মন্ত্রের মতো বাউলে তখন যেন বলে– এসো তা হলে, মনে রেখো, বনে পা রেখে কখনও মিথ্যা কথা বলবে না, কথনও মিথ্যাচার করবে না, না কখনও না; কেউ বিপদে পড়লে ছুটে এগিয়ে যেতে ভুলো না, না কখনও মিথ্যাচার করবে না, না কখনও না; কেউ বিপদে পড়লে ছুটে এগিয়ে যেতে ভুলো না, না কখনও না।...একটু থেমে যেন ব্যাখ্যার মতো করে আবার বলে,–দেখো, তোমাদের যদি কারও মনের তলে বিবাদ-বিসম্বাদ থাকে তবে গ্রামে এসে ফ্যারাজ সালিশী করে নিও। বনে কাউকে বঞ্চনা করার কথা মনেও ভাববে না। দেখো তাতে বনাবিবির রোষই মিলবে।...ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো। তোমাদের কাজ সফল হোক!*

৩.২৭ সুন্দরবনের রাসমেলা: দূর্গা পূজা পরবর্তী কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে রাস মেলা হয়। এ মেলায় রাসের পূজো হয়।[৬৯৩] শ্রী কৃষ্ণের সম্মানে নভেম্বর মাসে রাসমেলার আয়োজন করা হয়। কিন্তু এখানে শ্রী কৃষ্ণের পাশাপাশি

---

৬৯০. ঐ, পৃ. ২৯০।

৬৯১. ঐ, পৃ. ২৫৮।

৬৯২. ঐ, পৃ-৪৩১ ও ৪৩২।

৬৯৩. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশা: মৎসজীবী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ৯ নং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, গ্রাম: কলবাড়ি, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

সমান ভক্তি নিয়ে বনবিবি, গাজি কালু, দক্ষিণ রায়, গঙ্গাদেবীসহ প্রকৃতির অনেক দেব দেবতার পূজা করা হয়। প্রকৃতি তার আপন মনে গড়ে তুলেছে সুন্দরবনের সমাজ ব্যবস্থাকে। এই বনের ভেতরে ঈশ্বর ও প্রকৃতি যেন এক হয়ে যায়। সে কারণে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য এখানে অনেকটাই ঘুচে গেছে। দুই সম্প্রদায়ের মানুষই সমানভাবে প্রকৃতি ও প্রকৃতির দেবতাদের আরাধনা করেন সুন্দরবনে। এখানকার ভক্তদের মধ্যে একটা ভিন্ন উত্তেজনা নিয়ে আসে সুপার মুন। নৌকা নিয়ে চরের সৈকতের দিকে যাওয়ার সময় প্রত্যেকের গলাতেই থাকে স্থানীয় জনপ্রিয় গান। তারা সবাই চান দেবতাদের মাধ্যমে নিজেদের মনের সাধ পূরণ করতে। এখনাকার অধিবাসীদের স্থানীয় দেব-দেবীদের এতোটা ভক্তি আরাধনার মূলে রয়েছে সুন্দরবনে বেঙ্গল টাইগারের উপস্থিতি। বাঘের ভয়ে স্থানীয়রা সবসময় ভীত-সন্ত্রস্থ থাকেন। পাশাপাশি প্রকৃতির প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানানোর উপায় হিসেবে এসব আয়োজন করা হয়। উৎসবে প্রতিমায় দেখা যায় বনবিবির কোলে একটি শিশু থাকে যিনি হলেন দক্ষিণ রায়, স্থানীয়রা দক্ষিণ রায়কে বাঘ বলে মনে করেন। এই প্রতিমা থেকেও উপলব্ধি করা যায় যে, রাসমেলা কিভাবে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সম্মিলন ঘটিয়েছে। পাশাপাশি একই স্থানে বনবিবি, শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে গাজী কালু, গঙ্গা দেবী, শিবসহ অনেক দেব দেবীর প্রতিমা এই সম্প্রীতিকে প্রতিফলিত করে।

রাসমেলায় 'নমিতা সম্প্রদায়' নামের বাগেরহাটের লোক শিল্পীদের একটি দল রাস লীলা, পদাবলী ও বনবিবির জহুরনামা তথা দেব-দেবীর গল্প সম্বলিত গান পরিবেশন করেন। দলের অভিনেতারা বনবিবির পৌরাণিক গল্পের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে দেখিয়ে থাকেন যে কিভাবে বনবিবি ও তাঁর ভাইকে সুন্দরবনের মানুষ ও প্রকৃতিকে রক্ষার জন্য মক্কা থেকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। স্থানীয় অধিবাসী সুন্দরবনের কয়রা উপজেলার জেলে অতুল সুরের রাসমেলার যাত্রা বর্ণনায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। মাঝরাতে ছোট্ট একটি নৌকা বোঝাই বাতাসা, মোমবাতি, ধূপকাঠি ও নারকেল নিয়ে সুন্দরবনের দ্বীপ দুবলার চরে পৌঁছান কয়রার জেলে অতুল সুর। প্রতিবেশী রফিকুল হককে নিয়ে সেখানে যেতে বনের ভেতরের ছোট ছোট নালাগুলো দিয়ে প্রায় ষাট কিলোমিটার পাড়ি দিতে হয়েছে তাকে। অতুল সুর তার বিশ্বাস অনুযায়ী বনের রক্ষক দেবী বনবিবি ও শ্রী কৃষ্ণকে উৎসর্গ করার জন্য এই অর্ঘ্য এনেছিলেন। সুন্দরবন ব-দ্বীপ এলাকার সবচেয়ে বড় উৎসব হওয়ায় তাদের চোখে মুখে ফুঠে উঠেছিল আনন্দ। অতুলের ন্যায় বনের রক্ষক বনবিবি, গাজি কালু ও দক্ষিণ রায়কে উৎসর্গ করার জন্য রফিকও মিষ্টি এনেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের এই সম্মিলিত উৎসব সুন্দরবনের গহীনে ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। রফিক বলেন, "বনের গভীরে গেলে মানুষ সবসময় বাঘের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। কারণ সব সময় বাঘ আগে আপনাকে দেখে ফেলে। বনবিবি ছাড়া আর কোন দেবী বাঘের নজর থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারবেনা।" ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে বনবিবি বনদুর্গা নামে পরিচিত ছিল। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয়দের মধ্যে এখনো এই নামটির প্রচলন রয়েছে।

চিত্র-২৬ (ক): সুন্দরবনের রাসমেলা, সংগ্রহ: বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর.কম

চিত্র-২৬ (খ): সুন্দরবনের রাসমেলা, সংগ্রহ: বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর.কম

চিত্র-২৬ (গ): সুন্দরবনের রাসমেলা, সংগ্রহ: বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর.কম

চিত্র-২৬ (ঘ): সুন্দরবনের রাসমেলা, সংগ্রহ:: ট্যুর বিডি

রাসমেলার পটভূমিতে স্থানীয় বিশ্বাস ও ধারণা: সাগরস্নাত সুন্দরবনের মধ্যে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানের নাম দুবলারচর। ধু-ধু বালুকাময় এই চর সংলগ্ন বনে শত শত চিত্রা হরিণের অবাধ বিচরণ এবং অন্যদিকে সমুদ্রের তরঙ্গমালার হাতছানি যে কোন পর্যটককে বিমুগ্ধ করে। বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার সুন্দরবন পূর্ব বনবিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এটি। এর অবস্থান মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে সুন্দরবনের দক্ষিণে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে। কুঙ্গা ও মরা পশুর নদের মাঝের দ্বীপ এই দুবলার

চর। দুবলার চর সুন্দরবনের ৪৫ এবং ৮ নং কম্পার্টমেন্টে অবস্থিত।[৬৯৪] সুন্দরবনের দুবলার চরের মোট আয়তন ৮১ বর্গমাইল। প্রধানত মৎস্য আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের দ্বীপ আলোরকোল, ককিলমনি, হলদিখালি, কবরখালি, মাঝিরকিল্লা, অফিসকিল্লা, নারকেলবাড়িয়া, ছোট আমবাড়িয়া, মেহের আলির চর এবং শেলারচর নিয়ে দুবলার চরের বিস্তৃতি। কবে থেকে জেলেরা এখানে মৎস্য আহরণ করতে আসে এবং কবে থেকে এখানে রাসমেলা শুরু হয় অথবা দুবলার চরের নামকরণ নিয়ে নানা মত রয়েছে। স্থানীয়দের ভাষায়, 'রস' থেকে 'রাস' কথাটির উৎপত্তি। রস 'আস্বাদনের' জন্য পালিত হয় বলে এর নামকরণ হয় রাসমেলা। আবার কেউ কেউ মনে করেন- বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক রাসলীলার অনুকরণে রাসমেলার উদ্ভব হয়েছে। মণিপুরী সমাজে রাস উৎসবের প্রবর্তক মনিপুরের রাজা মহারাজ জয়সিংহ (শাসনকাল ১৭৬৪-১৭৯৯)। বাংলাদেশে মণিপুরীরা স্থায়ী বসতি স্থাপনের পর ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর জোড়ামণ্ডপে নিয়মিতভাবে এ উৎসব পালিত হয়। পাশাপাশি আদমপুরের তেহাইগাঁও হবিগঞ্জের জয়শ্রী গ্রামেও এ উৎসব পালিত হয়। কুয়াকাটা, দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির ও ভারতের কুচবিহারে আড়ম্বরপূর্ণভাবে রাসমেলা অনুষ্ঠিত হয়।[৬৯৫] মৌলভীবাজার অঞ্চলের রাসমেলার প্রধান দিক হলো- চিরাচরিত মণিপুরী পোশাকে শিশুদের রাখাল নাচ ও তরুণীদের রাসনৃত্য। এছাড়া মণিপুরী সংগীত ও নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে কৃষ্ণ-অভিসার, রাধা-গোপী অভিসার, রাগ আলাপন ইত্যাদি অভিনীত হয়ে থাকে। অনকেই একে 'মগদের মেলা' বলেও অভিহিত করে থাকেন। মেলার শেষ দিন প্রত্যূষে প্রথম জোয়ারে পুণ্যস্নান সমাপনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এ উৎসব।

সুন্দরবনের রাসমেলা সম্পর্কে বলা হয় রাসমেলা মূলত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের একটি পুণ্যোৎসব। হিন্দু পৌরাণিক তথ্যমতে, রাস হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণের মিলন। স্থানীয়দের ধারণা, দুইশত বছর আগে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক ক্রান্তিলগ্নে বৃহত্তর ফরিদপুরে (বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার কেওড়াকান্দি গ্রামে) জন্ম হয় মতুয়া সাধক ব্রাহ্মণপুত্র হরিঠাকুরের। তিনি বৃদ্ধ বয়সে 'স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দুবলারচরে পূজা-পার্বণ শুরু করেন'। তিনি অনুসারীদেরকে তাঁর পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। সেই থেকে প্রতিবছর বাংলা কার্তিক মাসের রাসপূর্ণিমা তিথিতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সনাতন সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ দুবলারচরে আসে। অন্যমতে, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে হরিচাঁদ ঠাকুরের হরিভজন নামে এক বনবাসী ভক্ত এই মেলা চালু করেন।[৬৯৬] প্রায় দুই যুগ ধরে তিনি সুন্দরবনে গাছের ফলমূল খেয়ে অলৌকিক জীবন-যাপন করতেন। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শত বছর আগের কোনো এক পূর্ণিমা রাতে পাপমোচন ও পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে স্বপ্নে গঙ্গাস্নান করেন। সেই থেকে রাসমেলা শুরু হয়। কারও কারও মতে, শারদীয় দুর্গোৎসবের পর পূর্ণিমার রাতে বৃন্দাবনবাসী গোপীদের সঙ্গে রাসনৃত্যে

৬৯৪. Bangladesh Tourism Corporation: Public & Government Service, official website, December 09, 2014.

৬৯৫. মাহমুদুল হাসান, *কেন, কিভাবে জনপ্রিয় হলো সুন্দরবনের রাসমেলা?*, ট্যুর বিডি, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮। (https://tour.com.bd/blog)

৬৯৬. মাহবুবুর রহমান, *সুন্দরবনের রাসমেলায় যেতে চাইলে*, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ২৩ অক্টোবর ২০১৯।

মেতেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এ উপলক্ষেই দুবলার চরে রাসমেলা হয়ে থাকে। স্থানীয় লোকজনের কাছে এই মেলা নীল কমল নামে পরিচিত।[৬৯৭]

প্রতিবেশি দেশ ভারত, মিয়ানমার ও আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ভক্তরা এই মেলায় অংশ নেয়।[৬৯৮] 'পাপমোচন ও পার্থিব জীবনের কামনা-বাসনা পূরণের লক্ষ্যে' পুণ্যস্নানের মধ্য দিয়ে এ উৎসব পালন করে আসছেন তারা। তবে কারও কারও মতে, বার ভূঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্য এ পূজা ও মেলার প্রবর্তন করেন। মৎস্য আহরণের মৌসুমে এটি হয় বলে অনেকে দুবলার চরের এই মেলাকে মৎস্য আহরণ শুরু উৎসবও মনে করা হয়। প্রাচীনযুগে নানা কারণে সমুদ্রযাত্রা ও মৎস্য আহরণ করার সময় মানুষ তীরে পূজা-অর্চনা করে সমুদ্রে নামতেন। দুবলার চর মূলত সমুদ্রের একটা বড় প্রবেশদ্বারে নদীসংলগ্ন মোহনা। এ কারণেই হয়তো এই নদী মোহনাসংলগ্ন দ্বীপে পূজা প্রচলিত হতে পারে-যা ধীরে ধীরে রাসমেলায় রূপ নিয়েছে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।

রাসমেলায় আগত এই নমিতা সম্প্রদায়ের প্রধান নমিতা মিস্ত্রি একটি দৈনিক পত্রিকার সাক্ষাতকারে বলেন- 'দক্ষিণ রায় তখন জঙ্গলে শাসন করতেন। রায়ের মা নারায়ণীর সাথে বনবিবির যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে নারায়ণীর সাথে বনবিবির মিত্রতা গড়ে ওঠে। তখন থেকেই বনবিবি ও দক্ষিণ রায় সুন্দরবন শাসন করছেন।' অবশ্য সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে প্রচলিত রয়েছে এই গল্পগুলো। বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত গল্পে বড়খান গাজি, শাহজাংলি, গঙ্গা দেবীর মতো চরিত্র রয়েছে। বলা হয় যে, একই গল্পের যতই রকমফের হোক না কেন, এর সবগুলোই একটি জিনিসকে প্রতিফলিত করে আর তা হলো প্রকৃতির বাস্তবতার মুখে ধর্মের ভেদাভেদ মুছে যায়।[৬৯৯]

মেলার বর্ণনাঃ রাসমেলায় বঙ্গোপসাগরের সৈকত সুপার মুনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আধ্যাত্মিক সাধনায় হাজার হাজার স্থানীয় ভক্তরা এখানে সমবেত হয়।[৭০০] মেলায় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের দেবতা নীল কমল ও গঙ্গা দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দেন। দুবলারচরের যে স্থানটিতে মেলা হয় তার নাম আলারকোল। সেখানে মেলার তিনদিন আগে থেকে অনেক অস্থায়ী দোকানপাট বসে। দোকানে বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি, খেলনা, ফলমূল, মাটি ও ঝিনুকের তৈরি অলঙ্কার পাওয়া যায়। মেলা উপলক্ষ্যে অস্থায়ী মন্দির তৈরি করে পূজার্চনা করা হয়। প্রতিদিন বিকাল থেকে শুরু হয় বাউল, কবিগান, কীর্তন, জারি, গাজীরগানসহ বিভিন্ন রকম লোকজ অনুষ্ঠান। রাস পূর্ণিমায় সারারাত অনুষ্ঠান দেখার পরে খুব ভোরে প্রথম জোয়ারে সবাই পূণ্যস্নান করতে সমুদ্রের পাড়ে

---

৬৯৭. সুন্দরবনের রাসমেলা, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২০ নভেম্বর ২০১৫।

৬৯৮. সম্পচারিত সময় নিউজ, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা, ০৯-১১-২০২০।

(https://www.somoynews.tv/pages)

৬৯৯. শচীন শুভ্র, সুন্দরবনে রাসমেলা শুরু রবিবার, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ৮ নভেম্বর ২০১৯।

৭০০. রাসমেলাঃ সুন্দরবনের গভীরে লোক উৎসব, দি ডেইলি স্টার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬।

আসেন। এ সময় মন্ত্র উচ্চারণ করে ডাব, মিষ্টি, ফলমূল, জীবজন্তু উৎসর্গ করা হয়। অনেকে সন্তানাদি লাভের জন্যও মানত করেন এবং ডাব, আগরবাতি ও বাতাসা সামনে রেখে আঁচল পেতে বসে থাকেন। তাদের ধারণা, ঢেউয়ের সঙ্গে ডাবটি আঁচলে ধরা দিলে তারা সন্তান লাভ করবেন। হাতের থালায় প্রদীপ, ফুল, মিষ্টিসহ অন্যান্য অর্ঘ্য নিয়ে বন্দনামূলক গান গাইতে গাইতে সহস্র ভক্ত সৈকতে বসে পড়েন। এদের মধ্যে কেউ কেউ বলি দেওয়া প্রাণী ও বনবিবিসহ অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তি এনেছিলেন। সৈকতে রাখা প্রদীপগুলো সাগরের ঢেউয়ে ভেসে যাওয়ার পর নিজেদের আত্মাকে পরিশোধের জন্য ভক্তরা স্নান করেন।[৭০১] সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পূর্ণিমায় সাগরের জোয়ারের নোনাজলে স্নানের মধ্য দিয়ে পাপমোচন এবং মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সময়ের ব্যবধানে রাসমেলা নানা ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। তাছাড়া এ মেলাকে কেন্দ্র করে সমুদ্র দর্শন, দুবলারচর থেকে সুর্যোদয় ও সূর্যাস্ত নিখুঁতভাবে দেখা যায়। বর্তমানে এ মেলায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পূর্ণ্যার্থী ছাড়াও আসেন দেশি-বিদেশি বিপুল সংখ্যক পর্যটক। মেলার দিনগুলোতে সুন্দরবনের অভ্যন্তরের নির্জন দুবলারচর বর্ণীল আলোয় আলোকিত থাকে। দেখতে ছোট শহরের মত মনে হয়। মেলার তীর্থ যাত্রীরা পানির অভাবে পড়লে দুবলার বালুচরের কূপ থেকে মিষ্টি পানি সংগ্রহ করেন, এটিও দর্শনার্থী ও পর্যটকদের জন্য এক বড় আকর্ষণ। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রায় তিন মাস বিরতির পর আনুষ্ঠানিকভাবে মাছ ধরা শুরু হয়।[৭০২] বিশ্বখ্যাত ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের ঘন শ্যামল গাছপালা ও পশুপাখির আকর্ষণে এই মেলায় দিন দিন দর্শনার্থী বৃদ্ধি পায়।[৭০৩]

রাসমেলার ছড়াঃ

কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে পূণ্য তিথি ধ'রে।
বছর শেষে রাসের স্নান দুবলার চরে পরে।।
কামনার ধন পেতে ভক্ত মানত করছে তাই।
সবাই মিলে আনন্দ পায় জাতির বিভেদ নাই।।[৭০৪]

তবে সুন্দরবনের এই ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব স্থায়ীভাবে বন্ধ করার পরিকল্পনা হয় ২০২০ সালে। নির্দিষ্ট সময়ে পুণ্যস্নান বা রাসপূজা অনুষ্ঠিত হলেও প্রতিবছর মেলা উপলক্ষ্যে যে কয়েক হাজার মানুষ হিন্দু-মুসললমান নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারবে না।[৭০৫] পূজা উপলক্ষ্যে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে সেখানে

৭০১. শচীন শুভ্র, সুন্দরবনে রাসমেলা শুরু রবিবার, পূর্বোক্ত।
৭০২. DW, 07.11.2017, (https://p.dw.com/p/2n7xE)
৭০৩. শচীন শুভ্র, সুন্দরবনে রাসমেলা শুরু রবিবার, পূর্বোক্ত।
৭০৪. সুন্দরবন ফ্লিপ চার্ট, উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা, পৃ. ১৪।
৭০৫. বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের রাস উৎসব, দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ অক্টোবর ২০২০, ঢাকা।

যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। প্রধান সংরক্ষক মো. আমীর হোসাইন চৌধুরীর মতে- যে স্থানে রাসমেলা হয় সেটি একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। মেলা উপলক্ষ্যে হাজারো মানুষ সেখানে যাওয়ায় একদিকে যেমন বন্য প্রাণীর ক্ষতি হয়, অন্যদিকে ওই স্থানে মানুষের ফেলে দেয়া আবর্জনায় বনের ক্ষতি হয়। বন, বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে রাস উৎসব বন্ধ করা হয়।[৭০৬] বনবিভাগের সূত্রমতে, প্রতিবছর রাসমেলা উপলক্ষে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ সুন্দরবনের দুবলার চরে ভিড় করেন। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ সেখানে যান। এ সময় প্রচুর হরিণ শিকার করা হয়। পুণ্যার্থীদের সাথে দুবলার চরে প্রবেশ করে চোরাকারবারী ও শিকারিরা।[৭০৭] বনবিভাগের স্বল্প লোকবলে তা নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হয় না। সে সময় শুধু হিন্দু সম্প্রদায় পূজা ও স্নান করতে যেতে পারবেন। রাস উদযাপন কমিটির মতে- এ দেশ বহু সম্প্রদায়ের দেশ। রাসমেলা উপলক্ষ্যে সব সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে সমবেত হন। এতে এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। মেলায় আসার জন্য হাজার হাজার মানুষ উন্মুখ হয়ে থাকেন। তাই রাসমেলা বন্ধ করে দেয়া হলে সেটা আর উৎসবে পরিণত হবে না।[৭০৮]

৩.২৮ লোক সঙ্গীত, ছড়া, কবিতা ও প্রবাদঃ

"মা তোর সন্তান গেল বনে
থাকে যেন মনে
বাঘ ভালুক বাঁধে সব
রাখবি বাদার কোণে
দোহাই মা বনবিবি।"

"আকাশে তারা বন্ধন
পাতালে বারী বন্ধন
সাতষট্টি কোটি দেবতা বন্ধন
নদীতে কুমির বন্ধন
ডাঙ্গায় বাঘ বন্ধন
আমার এই বন্ধ যদি নড়ে-
বনবিবির মস্তক ছিঁড়ে যেন জমিনেতে পড়ে।"

৭০৬. বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের রাস উৎসব, দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ অক্টোবর ২০২০, ঢাকা।

৭০৭. শ্যামনগরের পীযুষ বাওয়ালিয়া বলেন, পূর্ণিমার জোঁয়ারে নোনা জলে স্নানের মধ্য দিয়ে পাপ মোচন হয় আর মনের কামনা পূরণ হয় এ বিশ্বাসে পূণ্যস্নানে যোগ দেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। তবে সময়ের ব্যবধানে মেলায় নানা ধর্মের মানুষও আসেন। বিদেশী পর্যটকরাও আসেন। এসময় চোরাকারবারিরাও সক্রিয় থাকে। হরিণ শিকারের সন্ধানে থাকে তারা।তবে করোনার কারনে দর্শনার্থী ও পর্যটকদের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। বাংলা ট্রিবিউন, সাতক্ষীরা, ২৮ নভেম্বর ২০২০।

৭০৮. বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের রাস উৎসব, দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ অক্টোবর ২০২০, ঢাকা। শ্যামনগরের মুন্সিগঞ্জের বাসিন্দা শিক্ষক তাজুল ইসলামের ভাষায়, অন্যান্য বছরে হাজার হাজার পুন্যার্থীর আগমনে মেলা উৎসবমুখর হয়ে উঠে। মেলাকে কেন্দ্র করে সুন্দরবন উপকূলবর্তী মানুষের মধ্যে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মেলায় যেতে পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়। তবে করোনার কারণে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাড়া রাস মেলায় অন্য কারো যাওয়ার অনুমতি না থাকায় হাজারো লোকের মধ্যে হতাশা বিরাজ করে। বাংলা ট্রিবিউন, সাতক্ষীরা, ২৮ নভেম্বর ২০২০।

"সংকট পথে একটি দাড়
কে আছিস ভাই পথ ছাড়
হাত আমার গরুড়
পা আমার গরুড়
গরুর আমার সহোদর ভাই।
ধর্মের আজ্ঞে ব্রহ্মার কাছে যাই।
আস্তিক আস্তিক মুনির মাতা
জাহ্নবী মা মনসা দেবীর পদে নমস্কার।

"নাদে আলীয়ান
মাজহারেল আজায়েবে তাজেদোহু
আওয়ানাল্লাকা ফিন্নাওয়ায়েবে
কুল্লো হামমেও গামমেও
শায়েন জালী বে-আজমাতেকা
ইয়া আল্লাহু বে-নবুয়াতেকা
ইয়া আলী ইয়া আলী
লা ফাল্লা ইল্লা আলী
লা শায়েফা ইল্লা জুলফিককার।"

"আস্তিকস্য মুনির মাতা
ভগ্নি বাসুকিস্ততা
জরাতকারু মুনি পত্নী
মনসা দেবী নমস্ততে।"

"হাম লোহু অ ফেছা লোহু
শানা শুনা ও শাহারা
হাত্তা এজা বালাগা
আশাদ্দাহ বালাগা
আরবাইনা ছানাতা।"

"আগে যায় দূর্গা
পিছে যায় দূত
আমি চলেছি চণ্ডির পুত
চলে কুমির ডাঙ্গায় চলে সাপ
আমরা পঞ্চ ভাই, পথ ছেড়ে দাও,
অর্মের নিকট যাই। ইত্যাদি।"

"দেবী গো মা সংগ্রাসের ঝি
উবরা রক্তে পয়দা হইছে বাঘের বাচ্চাটি
আইখ লড়ে আইখ খিলাই
লেজ লড়ে লেজ খিলাই
বত্রিশ দন্তওয়ালা জিহ্বার নাই অন্ত
-লা-এলাহা- ইল
বাঘ বাঘিনীর মুখে তুলে দিলাম
বাইশ মণ লোহার খিল।"

"রক্তে টগবগ রক্তে কুড়িয়া
তোর মা তোরে থুইছে, ধামা দিয়া মুড়িয়া।
অমাবশ্যা প্রতিপদে জন্মিয়াছি খুঁ
এককই থাপ্পড়ে খিলাইরাম
টায় টাগরা আলাজী।"

"আকাশে বাঁধলাম আকাশ কুণ্ডলী
পাতালে বাঁধলাম নাগ,
ডাইনে বাঁধলাম খান্দান ছুরি,
বামে বাঁধলাম ভূত,
এই পথে চললাম মা,

আমি জয়কালীর পুত।”

“আয়তাল কুরছি কোরান

আল্লা মে নেঘাবান।

আগুপিছে আল্লা আবেশ্বর,

আমারে বেড়ে লাগ লোহার কেওড়

ধড় নিলে রসুল

ছের নিলে হযরত

কম্বল নিলে আলী

কেহ নাইক খালি

শাহ মুর্তজা আলী

আছিবুল্লা আলী

দোহাই খোদা।”

দৃঢ়চেতা আদিবাসীঃ

রক্তে ভেজা মাটি সোনার চেয়ে খাঁটি

দিনে রাতে খাটি করছি পরিপাটি।

জান দেবো তবু ধান দেবো না,

মাটির দাবি ছাড়বো না।

বাঘের সাথে লড়াই করে হটিনি

মোরা হটবো না।[৭০৯]

৩.২৯ বিধবাপল্লী

বিধবাপল্লী, এ এক অভিনব নাম। কোনও বসতির এমন নাম অন্য কোথাও মেলা দায়। নামের মধ্যে যেন একটা চাপা বেদনার ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে ওঠে। না, সেটাই শুধু নয়। সুন্দরবনের জীবন যুদ্ধে লড়াকু মানুষের বিক্রমও প্রতিষ্ঠিত এই নামকরণে। সুন্দরবনে সবচেয়ে সাহসী শ্রেণী বোধহয় জেলেরা। ডিঙি ও জাল নিয়ে ওরা যায় সুন্দরবনের নদী, খাল, পাশ-খাল ও শিষের মুখে, রাতে ও দিনে। শুধু শিষের মুখে নয়, এরা যায় সাগরের মুখেও ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে। এরা একমনে নিজের শিকারের প্রতি বোধহয় অর্জুনের মতো স্থির, অপলক ও একাগ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দুনিয়া ভুলে থাকে। আর সেই সুযোগে বনের হিংস্রতম জীবও আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের লক্ষ্য করে। চলে হাতাহাতি। কারণ, এদের তো বন্দুক নেই। থাকলেও বন্দুক উঁচিয়ে রেখে আর যাই হোক মাছ

৭০৯. শিবশঙ্কর মিত্র, সুন্দরবন সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।

মারা দায়। এই হাতাহাতির ফলে কখনও বাঘ পালায়, কখনও বা জেলেদের আক্রমণ করে। সংসার ভাঙার মতো এমন 'সব্বনেশে' অবস্থাতে জেলে-বধূরাও বীরের মতো লড়ে যায়। কখনও নিজেরাই পরিশ্রম করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে, কখনওবা বিধবা বিবাহ মেনে নিয়ে নতুন করে সংসার গড়ে।[৭১০]

হেমিল্টন কর্তৃক প্রথম বিধবাপল্লী স্থাপন: সাতজেলে প্রথম বিধবাপল্লী সৃষ্টি করেন হেমিল্টন সাহেব। নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে জেলে-বিধবাদের প্রতি মঙ্গল কামনায় এই বিধবাপল্লীর অবতারণা। সমবায়ে কাজকর্ম করা এদের যেন সহজতর প্রবণতা। সে সমদ্দুরে মোহনাই হোক, আর বনের নদীর ত্রিমোহনাই হোক-বিস্তৃত জাল চাই আর দলবব্ধ মানুষ চাই মাছের লাটকে ডাঙায় তুলতে। কাজেই হেমিল্টন সাহেবেরও এদের প্রতি টান ছিল। সহজে এদের নিয়েই বুঝি সমবায় পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাবে।[৭১১]

বিধবাদের সংগ্রাম: সাতজেলের পুর্বে নদীর ছড়াছড়ি-গোমর নদী, গাড়াল নদী, কর্জরা নদী, কচুখালি নদী, মেলমেলে নদী। এই সব নদীর মুখে ও চরে সাতজেলের বিধবাপল্লী। বিধবা নারীরা ছেলে-মেয়ে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করে চলে নিরন্তর। মাছ ধরাকেই বেছে নেয় অধিকাংশ। তবে সেখানেও বিপত্তি। এদের মূল সমস্যা খাতকের। যখনই দল বেধে এর মাছ ধরতে যায়, তখনই এরা মহাজনের খপ্পরে পড়ে। মহাজনেরা যেন কত কৃতার্থ হয়ে এদের টাকা ধার দেয়, মোটা টাকাই দেয়। জেলেরা তখন নিজের হাত-খরচা বাবদ সামান্য একটা অংশ রেখে বাকিটা বউদের হাতে সংসার খরচ বাবদ দেয়। তাহলে কি হবে। ডিঙি ভর্তি মাছ ধরে আর বাড়ি ফিরতে হয় না ওদের। মহাজনেরা সুদে-আসলে দেখিয়ে মাঝপথেই সব মাছ নিয়ে যায়। দুটো মাছও খাওয়ার বাবদ এরা আনতে পায় না বাড়িতে। এদিকে সুদের হিসাব বড় কড়া; ডাবল সুদ দিয়েও এদের হাত থেকে বাঁচা দায়।[৭১২]

মহাজনের খপ্পর থেকে বাঁচাই জেলে-পল্লীর প্রধান সমস্যা। সমবায় পথে কিভাবে এগুনো যায় তারই প্রচেষ্টা বিধবাপল্লীর সমবায়গুলির। হেমিল্টন সাহেবও মাছের সমবায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি এখন মহাজনদের এবং চকদারদের খপ্পরে পড়েছে। নিজেদের স্বার্থে কি করে সহকারী সমবায়-ঋণ আদায় করা যায় তা মহাজনের ভালই জানা আছে। মরতে-মরণ খোদ জেলেদের ও জেলে পরিবারের।[৭১৩]

৩.৩০ আদিবাসীদের লড়াই ও বনজীবী জনজীবনের বিপন্নতা ও অস্তিত্বের সংকট: বলা হয় দূর দূরান্ত থেকে আদিবাসীরা এসেছে, ভাগ্যের টানে, এসেছে তাদের ধৈর্যের জোরে, এসেছে সুন্দরবনের টানে।

---

৭১০. ঐ, পৃ. ৬৩- ৬৫।

৭১১. ঐ।

৭১২. ঐ।

৭১৩. ঐ।

বনবাদাড়ের রাজ্য, অসংখ্য নদী-নালার জাল এবং সবার ওপরে অসংখ্য গরীব চাষীর লড়াকু মানুষ সব। এদের সারা জীবনটাই লড়াই করে চলে। জীবন-মৃত্যুকে উপেক্ষা করে, বাঘের ও কুমিরের মুখোমুখি হয়ে, ঝড়-জলের দাপটকে অগ্রাহ্য করে, তেষ্টা জলের দুর্ভিক্ষকে অবহেলা করে লোনা জলের মধ্যে দাপাদাপি করে এরা জীবন-যুদ্ধ চালায়, কাজেই এমন সুফলা মাটি আর কোথায় পাবে এই বিপ্লবীরা।[৭১৪] হয়তো তাই। কিন্তু সুন্দরবনের কোলে বসবাসকারী মানুষকে সংগ্রামী না হয়ে তো কোন উপায় নেই। খরস্রোতা নদী, গভীর বনাঞ্চল, জোয়ারের প্লাবনকারী উত্তুঙ্গ ঢেউ, প্রবল ঘূর্ণীবার্তার দাপট, বিধ্বংসী ঝড়-ঝাপটা, আর সর্বোপরি ডাঙার ও জলের হিংস্রতম জীবের মুখোমুখি না হয়ে জীবিকা অর্জন করা শুধু দায়ই নয়, বেঁচে থাকাও দায়।[৭১৫]

পাশাপাশি সুন্দরবন সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলোতে বসবাসকারী বনজীবী অধিবাসীদের দারিদ্র্যের সাথে নিত্য লড়াই করে চলতে হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে দিশোহারা হয়ে যান তারা। একটি দূর্যোগ মোকাবেলা করে পূনর্বাসিত হওয়ার সাথেই দেখা দেয় আরেকটি। জীবন ও জীবিকা হয়ে যায় অনিশ্চিত। কারো মাছ ধরার জাল নষ্ট হয়ে যায়, কারো নৌকা হারিয়ে যায়, পুঁজি সম্বল হারিয়ে যায় মৌয়ালের।[৭১৬]

বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ এবং বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবে বনজীবীদেরর নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়ার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।[৭১৭] সুন্দরবন সংলগ্ন জনপদে মাঝে মাঝে রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও কুমিরের আক্রমণ ঘটে।[৭১৮] পরিশ্রম আর পরিবারের সকল সদস্যদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতেও অনেক সময় তিনবেলা খাবার সংকুলান করতে না পারায় অনেকে বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে যাচ্ছেন।[৭১৯] কেউ কেউ চলে যান এলাকার বাইরে, কেউ কেউ শহরাঞ্চলে আশ্রয় নিচ্ছে। কয়রা উপজেলার মঠবাড়ি গ্রামের অধিবাসীদের মতে সরকারের নানা নিষেধাজ্ঞা আর প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয়ে বন এখন আর তাদের জীবিকার সংস্থান করতে পারছেনা। দীর্ঘদিন ধরে বনের কাজে জীবিকা নির্বাহ করে আসা প্রায় ৯০ শতাংশের অধিক মানুষ বছরের বড় একটা সময় ধরে জীবিকার সংকুলান করতে পারে না।[৭২০] জীবন সংগ্রামে দিশেহারা থাকেন খুলনার কয়রা উপজেলার শাকবাড়িয়া নদী সংলগ্ন মঠাবাড়ি, কাশিয়াবাদ, পাথরকালী, মাটিকাটা, গাববুনিয়া, শাকবাড়িয়া, হরিহরনগর, গাতিঘেরি, বীনাপানি, জোড়শিং, আংটিহারা, গোলখালী প্রভৃতি এলাকায় বসবাসকারী বনজীবীগণ। *রাইজিং বিডি* সংবাদ প্রতিবেদনে এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, কাজ না পেয়ে অনেক কর্মহীন মানুষ গাছের ছায়া, দোকানে, মাঠে হতাশায় সময় গুনেন। বনের অনিশ্চিত

---

৭১৪. ঐ, পৃ. ৬৬।

৭১৫. ঐ, পৃ. ৭৩।

৭১৬. একের পর এক দূর্যোগে দিশেহারা সুন্দরবনের পেশাজীবীরা, জাগো নিউজ, ২০ জুন ২০২০।

৭১৭. রাইজিং বিডি, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪, https://www.risingbd.com/risingbd-special/news/84193, 29-03-2021, 12:49 pm

৭১৮. সুন্দরবনের বনজীবী, কষ্টই যেন জীবীকা, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ১৮ নভেম্বর ২০১৩।

৭১৯. ঐ।

৭২০. ঐ।

জীবিকার কারণে অনেকে কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বল্প মজুরির মাটিকাটা, রাস্তা ও বিভিন্ন নির্মাণ কাজে অংশ নেয়। বনজীবী কৃষ্ণপদ মণ্ডল ও চপল গাইনের ভাষ্যে অনিশ্চিত জীবিকা সম্পর্কে হতাশার ছাপ ফুটে উঠে। কখনো বাড়িতে বাড়িতে চুক্তিভিত্তিক কাজ, কখনো চিংড়ির ঘেরে আবার কখনো বনে কাজ করেন তারা। যৎসামান্য মজুরীতে সংসার চালাতে হিমশিম খাওয়ার পাশাপাশি জীবিকার অনিশ্চয়তা তাড়িয়ে বেড়ায় নিত্য।[৭২১] সাধারণত বাংলাদেশের আদিবাসীরা সকল ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগাম, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসীদের দুঃখ কষ্টের সামান্য ধারণা রাখলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করা আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন ব্যাথা সম্পর্কে কারো দৃষ্টিগোচরই হয় না। সুন্দরবনের বনজীবী আদিবাসীরা তাদেরই অন্তর্গত।[৭২২] সুন্দরবনের আদিবাসীরা খুব পরিশ্রমী হওয়ায় বনবিভাগ ও বহিরাগত ব্যবসায়ীরা স্বল্পমূল্যে তাদেরকে বনের কাঠ কাটা ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত করে। সুন্দরবনে বসবাসরত মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে ৪০-৫০ বছর পূর্বের অধিবাসীর সংখ্যা অনেক কম। তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সুন্দরবন অঞ্চল পরিত্যাগ করে স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।[৭২৩] বসবাসকারীদের নানা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সমস্যায় ভুগতে হয়। জীর্ণ-শীর্ণ দেয়াল আর খড়ের ছাউনি দিয়ে তাদের নিবাস তৈরি। নোনা জল থাকায় সেখানে সুপেয় পানীয় জলের অভাব বিদ্যমান। দূরবর্তী স্থান থেকে নারীরা খাবার পানি নিয়ে আসেন। পাশাপাশি অনেকের গৃহেই স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নেই। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত আচার অনুষ্ঠান আর খাদ্যাভ্যাসের কারণে বাঙালি জনগোষ্ঠী কর্তৃক নানাভাবে অবহেলিত ও বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়। মুণ্ডাদের প্রিয় ভোজ ইঁদুরের মাংস এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আবশ্যক পঁচানো ভাত দিয়ে তৈরি মদ পান করায় স্থানীয় বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুদের দ্বারা তারা নিগৃহিত হয়।[৭২৪] সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে তাদের সাথে উঠা বসা, পারস্পরিক যাতায়াতকে এড়িয়ে চলে। এভাবে দেখা যায় সারা বিশ্ব যেখানে এগিয়ে যাচ্ছে, আমূল ধারায় পরিবর্তিত হচ্ছে সেখানে সুন্দরবনের আদিবাসীদের কোনো পরিবর্তন লক্ষণীয় হয় না।[৭২৫] সমাজের উঁচু শ্রেণিতে যারা আছে তাদের সাথে বনজীবীরা চলতে পারেন না।[৭২৬] মুণ্ডা বা আদিবাসী বলে তাদের ঘৃণা করে। ধীরে ধীরে অবশ্য তা কমে আসছে। অনেকে মিশছে আবার অনেকে মিশছেনা, মনে ক্ষোভ রেখে মিশছে। মদ খাওয়ার কারণেও তাদের সাথে মিশে না।[৭২৭] বাংলার লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ধারায় পৌঁছে দেয়ার অন্যতম উপাদান এসব বনজীবীদের চর্চিত সংস্কৃতি হলেও কথিত 'সভ্য' শ্রেণীর অধিবাসীরা মনে করেন এদের রীতিনীতি, যাপিত জীবন, সংস্কৃতি অসভ্য। এ প্রসঙ্গে ভারতে

---

৭২১. ঐ।

৭২২. রাইজিং বিডি, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪, https://www.risingbd.com/risingbd-special/news/84193, 29-03-2021, 12:49 pm

৭২৩. ঐ।

৭২৪. ঐ।

৭২৫. ঐ।

৭২৬. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, পূর্বোক্ত।

৭২৭. ঐ।

এই লোকসংস্কৃতি দমন করার সরকারি পন্থার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে আক্ষেপ করে পরিবেশ কর্মী তুহিন ঘোষ বলেন- "ওদের লোকসংস্কৃতি ছিল ওদের ধ্যান-জ্ঞান, জীবন। সেই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারটা ধ্বংস করা অন্যায়। ওদের জীবন ও জীবিকা বনসম্পদের ওপর নির্ভরশীল।" এ প্রসঙ্গে তাঁর আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয় মন্তব্য- "ওদের বনভূমি থেকে উৎখাত করলে বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন মানুষ সেই সম্পদকে ছিনিয়ে নেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। আদিবাসী ও জনজাতিদের সামাজিক ন্যায়বিচার বা তাঁদের মানবাধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।"[৭২৮]

বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা

বন্যপ্রাণীর ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩-এর আওতায় সরকার 'বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা ২০১০' প্রনয়ণ করেন।[৭২৯] ক্ষতিপূরণের ধরন ও নির্ধারণের হার নিম্নরূপঃ

সারণি-১১: বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	ক্ষতিপূরণের পরিমান
০১	বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মানুষ মারা গেলে	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)
০২	বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মানুষ পঙ্গু হলে	৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা)
০৩	গবাদি পশু, ঘর-বাড়ি, গাছপালা, ফসল ইত্যাদি সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হলে	সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা)

৭২৮. অনিল চট্টোপাধ্যায়. অরণ্যের থেকে বঞ্চিত জনজাতি, (নতুন দলিল), সাইটেশন ২৩-০৪-২০১৯। (https://www.dw.com/bn/)

৭২৯. তথ্য কনিকা ২০২০, বন অধিদপ্তর: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ২০২০, পৃ. ১৭।

সারণি-১২: এ পর্যন্ত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমান

ক্র.নং	আর্থিক বৎসর	মোট ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	বন্যপ্রাণী আক্রান্তের সংখ্যা						বাড়িঘর ও ফসলে ক্ষতি (সংখ্যা)	মোট প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ (লক্ষ টাকায়)
			বাঘ		হাতি		কুমির			
			পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত		
১	২০১১-১২	৪৮	৮	২২	৩	১৫	-	-	১	৪২.৫
২	২০১২-১৩	৫২	১	১৬	১	৩১	-	২	১	৪৯.২৫
৩	২০১৩-১৪	২১	১	৫	৩	১৬	-	-	-	২২
৪	২০১৪-১৫	২১	-	-	৮	২০	-	১	-	২৫
৫	২০১৫-১৬	১৯৪	১	-	৯	২৬	-	২	১৫৭	৫৯.১৯
৬	২০১৬-১৭	৭৫	-	-	১	২৪	-	-	৫০	২৯.৫
৭	২০১৭-১৮	৩১২	-	২	১	২০	-	-	২৮৯	৪৬.২৫
৮	২০১৮-১৯	১১৫	৫	১	৭	১৬	-	১	৮৫	-
৯	২০১৯-২০	১২৩	-	-	১২	৩১	-	-	৮০	৫৪.৩৫
		৯৬১	১৬			১৯৯	০	৬	৬৬৩	৩৭১.০৯

তথ্যসূত্র: তথ্য কনিকা ২০২০, বন অধিদপ্তর: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ২০২০, পৃ. ১৭।

সুন্দরবনের বনজীবীদের চিকিৎসাসেবা পরিস্থিতি:

সুন্দরবন ঘিরে জেলে, বাওয়ালি, মৌয়ালসহ লক্ষাধিক বনজীবীর জীবিকা। বনজীবীদের অধিকাংশ সময় বনে, পানিতে থাকতে হয় বলে পানি বাহিত নানা রোগসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়।[৭৩০] তাঁদের চিকিৎসাসেবায় সুন্দরবন এলাকায় নেই কোনো হাসপাতাল। ২০১০ সালে বন বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দুটি ভাসমান হাসপাতাল নির্মাণের প্রস্তাব পাঠালেও তার কোনো অগ্রগতি নেই। মৎসজীবী সমিতির নেতা ও জেলে এবং মহাজনেরা ফেব্রুয়ারি মাসে সুন্দরবনের দুবলার চরে জেলেদের এক সমাবেশে দুবলার চর-সংলগ্ন এলাকায় দুটি ভাসমান হাসপাতাল স্থাপনের দাবি জানান। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় হাসপাতাল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে।[৭৩১]

সুন্দরবনের পূর্ব ও পশ্চিম বিভাগের আওতাধীন চারটি রেঞ্জে ও সাগর উপকূলে সাধারণত মৌসুমভিত্তিক বনজীবীদের আগমন ঘটে। এর মধ্যে ইলিশ, শুটকি, গোলপাতা, মধু ও মোম আহরণ মৌসুম উল্লেখযোগ্য।

৭৩০. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: পূর্ণিমা রানী, পেশা: মৎসজীবী এবং গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইশতিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৭৩১. প্রথম আলো ৪ এপ্রিল ২০১৯, ২১ চৈত্র ১৪২৫, ২৭ রজব ১৪৪০।

সুন্দরবন ও সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে প্রতিবছরের অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুটকি মৌসুম, এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত ইলিশ, মধু ও মোমের মৌসুম এবং বছরের অন্য সময় গোলপাতা আহরণ মৌসুম। তাই প্রায় বছরজুড়েই জীবিকার টানে ছুটে আসে জেলে, বাওয়ালি, মৌয়ালসহ নানা পেশার লোকজন। সুন্দরবনে এসে বিশুদ্ধ পানি, প্রাণির আক্রমণ ও অন্যান্য কারণে আনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। মংলা থেকে নদী পথে দুবলা জেলেপল্লির দূরত্ব প্রায় ৯০ নটিক্যাল মাইল। প্রত্যন্ত এসব স্থান থেকে আহত বা অসুস্থ বনজীবীদের ট্রলারে করে হাসপাতালে নিতে প্রায় ১৫ ঘণ্টা সময় লাগে। একারণে অনেকে পথেই মারা যান।[৭৩২]

বনের অধিবাসীদের সুপেয় পানির অভাব দীর্ঘকাল থেকে। পানির সমস্যা খুব প্রকট।[৭৩৩] সরকারি ব্যবস্থাপনায় কিছু ফিল্টারের ব্যবস্থা করা হয়। চারটা গ্রাম মিলে এক জায়গা থেকে পানি নেওয়া হয়। পানি নিতে হলে এক দেড় কিলোমিটার যেতে হয়। আসমানের পানি পুকুরে ভর্তি হয়, এখান থেকে পানিটা ফিল্টার করে পানি পরিষ্কার করে খেতে হয়। উপকূলে পানিবাহিত রোগ ও জ্বর বেশি হয়।[৭৩৪]

বন বিভাগের তথ্যমতে এসব অবহেলিত মানুষের কথা চিন্তা করে ১৯৯৩ সালে আন্তঃমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত এক বৈঠকের সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকায় ০৩টি মিনি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণের কথা বলা হয়। এরপর দীর্ঘ ১৭ বছরেও এ নিয়ে বন বিভাগ সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেয় হয়নি। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বন বিভাগ সুন্দরবনের পূর্ব ও পশ্চিম বিভাগে দুটি ভাসমান হাসপাতাল নির্মাণের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব পাঠায়। ৯ বছর পার হলেও এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতির খবর জানাতে পারেনি বন বিভাগ।[৭৩৫]
সুন্দরবনের দুবলার চরের জেলেরা বলেন, মেহের আলীর চর আলোর কোল, অফিস কিল্লা, মাঝের কিল্লা, শেলার চর, নারিকেল বাড়িয়া, ছোট আমবাড়িয়া, বড় আমবাড়িয়া, মানিকখালী, কবরখালী, ছাপড়াখালীর চর, কোকিলমনি ও হোলদেখালী চরে কোনো চিকিৎসক নেই। শুধু পাঁচ-ছয়টি ফার্মেসি আছে। সেখানে জ্বর ও ডায়রিয়ার ওষুধ ছাড়া আর কিছু পাওয়া না। ফলে কেউ মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকা ছাড়া তাঁদের আর কোনো উপায় থাকে না। শরণখোলা মৎসজীবী ও মালিক সমিতির সভাপতি আবুল হোসেন বলেন,

> *'সারা বছর বিভিন্ন মৌসুমে লক্ষাধিক বনজীবী সুন্দরবনে আসেন। কিন্তু তাঁদের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই। বহু আগে শুনেছিলাম হাসপাতাল হবে। কিন্তু তা যে কবে হবে, কেউ তা বলতে পারে না।'*[৭৩৬]

---

৭৩২. প্রথম আলো ৪ এপ্রিল ২০১৯, ২১ চৈত্র ১৪২৫, ২৭ রজব ১৪৪০।

৭৩৩. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশা: মৎসজীবী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ৯ নং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, গ্রাম: কলবাড়ি, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৭৩৪. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মিলন সরদার, পেশা: মৌয়াল, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল দুপুর ১২ টা ১০ মিনিট।

৭৩৫. প্রথম আলো ৪ এপ্রিল ২০১৯, ২১ চৈত্র ১৪২৫, ২৭ রজব ১৪৪০।

৭৩৬. ঐ।

দুবলা ফিশারম্যান গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, সুন্দরবন থেকে রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে এই অবহেলিত বনজীবীদের অবদান সবচেয়ে বেশি। তাঁদের স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা দেয়া সরকারের মৌলিক দায়িত্ব। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে এলেও কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু বনজীবীরা নন, চিকিৎসা সেবা পেতে দুর্ভোগে পড়তে হয় বনরক্ষীদেরও।

> *'চিকিৎসার জন্য বনরক্ষীদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যেতে হয়। নৌকা বা ট্রলার ছাড়া যাতায়াতের কোনো পথ না থাকায় তাঁদের নিদারুণ দুর্ভোগে পড়তে হয়।'* [৭৩৭]

বনের কাছেই আবাস থাকায় অনেক সময়, বিশেষ করে শীতকালে বাঘ গৃহের কাছেই চলে আসে। এছাড়া বনে অবস্থানকালীন ঝড়ের প্রকোপে পড়েন অনেকেই। গাছে উঠেন জীবন রক্ষায়।[৭৩৮] আদিবাসীরা আদিবাসীর মতো জীবন-যাপন করতে পারেনা। ভাষা বড় একটি সমস্যা। আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় লেখা-পড়া করার তেমন সুযোগই নেই। নিজস্ব ভাষার কোন বিদ্যালয় নেই। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারেনা।[৭৩৯] নিজস্ব ভূমি নেই বললেই চলে। খাস জমিতে বসবাস করেন। বনে অনেকেই কম যাচ্ছেন। অনেকেই দিনমজুরের কাজ করেন; ধান চাষ করেন পরের জমিতে।[৭৪০] বনজীবীরা তাদের পেশা থেকে বাইরের দিকে যাচ্ছে । শ্রমিক, দিনমজুর অনেকে ইটের ভাটায় কাজ করছে।[৭৪১] মহেন্দ্র বলেন-

> *জঙ্গলে যে সময় আস্তে আস্তে চতুর্দিকে বন্ধ করি দেছে, সে সময় মানুষ এদিকে জঙ্গলে আয় করি (ইনকাম) যে সময় না পারতিছে সে সময় আস্তে আস্তে কেউ ভাটায় যাতিছে, কেউ মজুরির কাজে যাচ্ছে, কেউ জন দেচ্ছে। আবার ও দিক থেকে ফিরে আসি আবার জঙ্গলে তারা যাচ্ছে।*

সুন্দরবনে নিষেধাজ্ঞার সময় দিন মজুরি খাটতে হয়।[৭৪২] নীলকান্ত মুণ্ডার আক্ষেপ-

> *আমাদের প্রধান সমস্যা কর্ম নিয়ে। আগের মত যদি জমি-জায়গা ধান চাষ থাকতো তাহলে এক বিঘা জমি আমি ভাগে করলাম সেটা থেকে ছয় মাসের খোরাকি থাকলো। বাইরে হয়তো জন-মজুরি খাটলাম। আগে জমি চাষ ছিল, নদীতে মাছ ছিল প্রচুর। এখন নদীতেও মাছ নাই, দেশেও ধান নাই, জমিতে ধান নাই। আমাদের ঐ বিদেশে কর্ম ছাড়া... হয় ভাটা করতে যাবো না হয় ভুঁই রোয়ার (চাষ) সময় ভুঁই*

৭৩৭. ঐ।

৭৩৮. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: গোপাল সানা, পেশা: মৎসজীবী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্ৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ৯ নং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, গ্রাম: কলবাড়ি, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৭৩৯. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: রাজ প্রসাদ মুণ্ডা, পেশা: গ্রাম্য ডাক্তার, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৯/১০/২০২২, স্থান: ৮ নং ইশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: খাগড়াঘাট। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১২ টা ১৯ মিনিট।

৭৪০. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, পূর্বোক্ত।

৭৪১. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: মহেন্দ্র, পেশা: মৎসজীবী, কাঁকড়া শিকারি ও চাষী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৫/১০/২০২২, স্থান: ৯ নং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: চুনা। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১২ টা ৪৮ মিনিট।

৭৪২. ঐ।

রুইতে যাবো, ধান কাটার সময় ধান কাটতে যায়। তাছাড়া আমাদের এখানে কর্ম নাই। এখানে য়ারা জেলে সম্প্রদায়ের আছে নদীতে মাছ মারতে যায়, নদীতেও এখন মাছ নাই। জঙ্গলে যাচ্ছে জঙ্গলেও পাশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মাছ মারতি দেচ্ছে না। এরকম আমরাও নদীর ধারে বাস করি। সময়গতি আমরা হয়তো এদের সাথে যাতাম মাছ মারতে। এখন সেও বন্ধ সব দিক থেকে রাস্তা বন্ধ, এখন কর্মহীন। মনে করেন কোন আয় রোজগার নেই কি খাবো! [৭৪৩]

৭৪৩. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: নীলকান্ত মুণ্ডা, সন্তোষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, পূর্বোক্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

সুন্দরবনের রাজনৈতিক-অর্থনীতি

৪.১. প্রাককথন: অর্থনীতির যে শাখায় রাষ্ট্রের বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে রাজনৈতিক অর্থনীতি বা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বলে। একটি আধুনিক রাষ্ট্র সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন কার্যসম্পাদন করে। তবে রাষ্ট্রের এ ধরনের সকল কাজই রাজনৈতিক অর্থনীতির পরিধিভুক্ত নয়। রাষ্ট্রের ঐসব কাজই শুধু রাজনৈতিক অর্থনীতির পরিধিভুক্ত যার মাধ্যমে সরকার নাগরিকের কল্যাণে সম্পদ সংগ্রহ করে এবং তা যথাযথভাবে বণ্টন করে। যে শাস্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার সীমিত সম্পদের বিচক্ষণতাপূর্ণ ব্যবহার করে অসীম অভাবের অগ্রাধিকার ভিত্তিক সমাধানপূর্বক নাগরিকের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন করে তাকে রাজনৈতিক অর্থনীতি বলে।[৭৪৪] সেই সীমিত সম্পদের মাধ্যমে অসীম অভাব পূরণ এবং নাগরিক কল্যাণের অধিকাংশই পূরণে সুন্দরবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। রাজনৈতিক অর্থনীতির বিভিন্ন কার্যাবলি পালনে সুন্দরবন রাষ্ট্রকে সহায়তা করে আসছে। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে রাজনৈতিক অর্থনীতি অনুধাবন এবং গুরুত্ব পর্যালোচনার মাধ্যমে। তাই এই অধ্যায়ে প্রথমেই রাজনৈতিক অর্থনীতির সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুন্দরবনের রয়েছে অপার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা আর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি এই বনভূমি দেশের অর্থনীতিতে রেখে চলেছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। গবেষণাকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য সুন্দরবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা । তাই এই অধ্যায়ে সুন্দরবনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে বর্ণনা করা হলো।

৪.২ রাজনৈতিক অর্থনীতি: রাজনৈতিক অর্থনীতি বর্তমানে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা। রাজনীতি ও অর্থনীতি মূলত দুইটি আলাদা বিষয়। মানুষ যেসকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে রাষ্ট্র হলো এদের মধ্যে সর্বোপেক্ষা সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Political Economy' সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন বিশিষ্ট ফরাসী অর্থনীতিবিদ এন্টনিক ডি মন্টেরেস্টিন (Antonic de Montehrestein)তাঁর 'Traite Deleconomic Politique' নামক গ্রন্থে।[৭৪৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর কতিপয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের পরিধি কম থাকা উচিত বলে মনে করতেন। অর্থনীতিবিদ Adam Smith তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Wealth of Nations' এ আর্থিক

---

৭৪৪. গোলাম মাওলা ও মোহাম্মদ ওমর ফারুক, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি, গ্রন্থকুটির, ঢাকা, পৃ. ৩।

৭৪৫. ঐ, পৃ. ২।

ক্ষেত্রে অবাধ নীতির (Laissez) সমর্থন করেন। তাঁর মতে, অবাধ বাণিজ্যের সুযোগই কোন জাতির অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার প্রকৃষ্টতম পন্থা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পুরোধা হচ্ছেন John Stuart Mill। তিনি বলেন, কেবল অপরের অনিষ্ট করা থেকে নিবৃত্ত রাখা ছাড়া রাষ্ট্র কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করতে পারে না। দার্শনিক Herbert Spencer তাঁর 'The Man Versus The State' গ্রন্থে মানুষের স্বাধীন কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের কাজ মাত্র তিনটি। এগুলো হচ্ছে: বিচারকার্য সম্পন্ন করা, নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা।[৭৪৬]

কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দিকে রাষ্ট্র সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের উপর্যুক্ত ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। "সেই সরকারই ভালো যে কম শাসন করে" (That government is best which govern least). রাষ্ট্র এখন আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের এমন ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার বন্ধু, দার্শনিক ও পরিচারক (Friend, Philosopher and Guide) হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে ত্রিশের দশকের মহামন্দা (Great depression) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সরকারের অংশগ্রহণের বিষয়টি স্বীকৃত হয়ে পড়ে। এরই সূত্র ধরে উদ্ভব হয় মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (Mix economy)। সরকার তার পুলিশি রূপ পাল্টে জনগণের সামগ্রিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। নাগরিক কল্যাণে সরকারকে এখন আয়ের উৎস সন্ধান করতে হয়, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যয়ের খাত চিহ্নিত করতে হয় এবং প্রয়োজনে নানা উৎস থেকে ঋণও গ্রহণ করতে হয়। আর এভাবেই রাজনৈতিক অর্থনীতির বিকাশ হতে থাকে।[৭৪৭]

৪.৩ রাজনৈতিক অর্থনীতির সংজ্ঞা:

'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র সংজ্ঞা নিয়ে লেখক ও পণ্ডিতগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। রাজনৈতিক অর্থনীতির জনক Adam Smith রাজনীতি ও অর্থনীতিকে একত্রে Political economy হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যার অর্থ যুগপৎভাবে রাজনৈতিক অর্থনীতি বা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ' The Wealth of nations' এ বলেন, " Political economy is considered as a branch of the science of a statesman, legislator which purpose to enrich both the people and the sovereign" অর্থাৎ, রাজনৈতিক অর্থনীতি হলো একজন রাষ্ট্রনায়ক বা আইনপ্রণেতার বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণ শাসনকর্তা

৭৪৬. ঐ।

৭৪৭. ঐ, পৃ. ৩২।

উভয়ের কল্যাণ সাধন করা।[৭৪৮] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Seeley বলেন- "রাজনৈতিক অর্থনীতি যেমন সম্পদ নিয়ে, জীববিজ্ঞান যেমন জীবন নিয়ে, এলজেবরা যেমন সংখ্যা নিয়ে, জ্যামিতি যেমন স্থান বা আয়তন নিয়ে আলোচনা করে তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান সরকারের প্রপঞ্চ নিয়ে অনুসন্ধান করে।"

Alfred Marshall এর মতে, Political economy or economics is a study of mankind in ordinary business of life; it examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being. অর্থাৎ, রাজনৈতিক অর্থনীতি বা অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে; এটি মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাজের সেই অংশ নিয়ে আলোচনা করে যা কল্যাণ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু উপাদানগুলোর অর্জন ও ব্যবহারের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।[৭৪৯]

Michael P. Todaro বলেন, "Political economy is concerned with the relationship between politics and economics, with a special emphasis on the role of power in economic decision making" অর্থাৎ রাজনৈতিক অর্থনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ পূর্বক রাজনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।[৭৫০]

চার্লস এ রিয়ার্ড বলেন- "উৎপাদন ও উৎপাদিত সম্পদের সুষম বণ্টন ও মানবসমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালা সম্পর্কিত আলোচনাই হচ্ছে রাজনৈতিক অর্থনীতি।"

J.B. Say'র মতে, "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হলো এমন একটি সমন্বিত বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে।"[৭৫১]

অধ্যাপক কোয়েনিগ'র মতে- "রাষ্ট্রীয় আইন ও সিদ্ধান্ত নির্ধারণে যে সংস্থা নিয়োজিত তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক আলোচনাই হচ্ছে রাজনৈতিক অর্থনীতি।"

Recardo'র মতে, "Political economy deals the nature and causes of wealth of states."[৭৫২]

---

৭৪৮. ঐ, পৃ. ২১।

৭৪৯. ঐ, পৃ. ৩১।

৭৫০. ঐ, পৃ. ২৩।

৭৫১. ঐ, পৃ. ৩২-৩৫।

৭৫২. ঐ, পৃ. ২১।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Seeley বলেন- "রাজনৈতিক অর্থনীতি যেমন সম্পদ নিয়ে, জীববিজ্ঞান যেমন জীবন নিয়ে, এলজেবরা যেমন সংখ্যা নিয়ে, জ্যামিতি যেমন স্থান বা আয়তন নিয়ে আলোচনা করে তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান সরকারের প্রপঞ্চ নিয়ে অনুসন্ধান করে।

৪.৪ রাজনৈতিক অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু: আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মপরিধি যত বৃদ্ধি পাচ্ছে রাজনৈতিক অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু তত সম্প্রসারিত হচ্ছে।[৭৫৩] রাজনৈতিক অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্র এবং এর জনগণ। এক্ষেত্রে জনগণের কর্মসংস্থানে সুন্দরবন হাজার বছর ধরে রেখে আসছে মুখ্য ভূমিকা। নাগরিকের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধনে সম্পদ আহরণ এবং বণ্টনের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উৎস হলো সুন্দরবন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রাজনৈতিক অর্থনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্যবিষয়। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার প্রাপ্ত সম্পদ, সামর্থ্য এবং প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনা করে বহুমুখী অভাব পূরণের প্রয়াস চালায়। তাই রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সব সময় স্থান পায় সুন্দরবন। কৃষি ও বনায়ন যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।[৭৫৪] আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের দায়িত্বই হচ্ছে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি নানা অর্থনৈতিক ব্যাধি সরকারের উক্ত কল্যাণমূলক কাজে বাধার সৃষ্টি করে। কিভাবে এবং কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে উক্ত উপসর্গ দূর করে নাগরিক কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় সেক্ষেত্রে সুন্দরবন রাষ্ট্রের আলোচনায় স্থান পায়।[৭৫৫] সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটে বাজেটের মাধ্যমে। সরকারে রাজস্ব বাজেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো সুন্দরবন।[৭৫৬] রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্যে রাজনীতি, ধর্ম, আইন, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল দিক কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। সুন্দরবনকেন্দ্রিক সমন্বিত জীবন ব্যবস্থা, লোকসংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস, উৎসব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্র এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ঐতিহ্য হিসেবে পর্যটনকে আকর্ষণ করে থাকে ।[৭৫৭]

৪.৫ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বনায়ন খাতের গুরুত্ব:

দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা: বনায়ন খাত ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখে। দারিদ্র্য নিরসন বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে সরকার এপ্রিল ২০০৩-এ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগে 'দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র' 'Poverty Reduction Strategy Paper' (PRSP) গ্রহণ করা হয়।

৭৫৩. ঐ, পৃ. ২১।

৭৫৪. ঐ।

৭৫৫. ঐ।

৭৫৬. ঐ।

৭৫৭. ঐ, পৃ. ৪।

সেখানে বনায়ন খাতকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। দারিদ্র্য বিমোচনে দরিদ্র ও ভূমিহীনদের একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় বনায়নের জন্য। বনবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ১৯৯৮ সাল থেকে বনায়ন খাতে মোট বরাদ্দ ছিল অবশেষে ৩৫.৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অর্থের বেশির ভাগই প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় ব্যয় করা হয়েছে। এফডি প্রকল্পের সময়কালে মোট ১০৪,৪১,৪৮,৭৫৬ টাকা ৬৮,৩৭২ জন সুবিধাভোগীকে বিতরণ করেছে। সময়ের সাথে সাথে এই সংখ্যা বাড়তে থাকে। এর আওতায় ৩৫ টিরও বেশি অংশগ্রহণকারী হিসেবে ১,৭৭,০০০ মানুষ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, বেশিরভাগই দরিদ্র এবং ভূমিহীন। এই প্রকল্পের অধীন ১৬৬.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়, যার ৫০% সরাসরি গরীবদের কাছে যায়। পরিকল্পনায় বলা হয় যে বৃক্ষ আবাদে একটি নির্দিষ্ট সময়ের আবর্তনে প্রত্যেকের তহবিল তৈরি হবে। কাঠের ক্রমবর্ধমান দামের কারণে আয় আরো বেশি হবে। এইভাবে ১,৭৭,০০০ এরও বেশি মানুষ (অংশগ্রহণকারী যারা আগে ভূমিহীন ছিল) আর দরিদ্র থাকবে না। অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে বনায়ন খাতটি দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট সহায়তা করতে সক্ষম হবে।[৭৫৮] Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change কর্তৃক পরিচালিত **Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory** শীর্ষক রিপোর্টে বনায়নের আর্থিক গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয় বৃক্ষ ও বন নারীদের কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দেশের মোট নারী জনসংখ্যার প্রায় ৬৫% প্রাথমিক গাছ এবং বনজ পণ্য সংগ্রহের সাথে জড়িত। সংগৃহীত প্রাথমিক গাছ এবং বনজ পণ্যের মোট মূল্য হল বর্তমান মূল্যে পরিমাপ করা ২০১৭-১৮-এর জাতীয় মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) এর ৩.১১%। বাজার মূল্যে পরিমাপ করা ২০১৭-১৮-এর জাতীয় মোট জাতীয় আয়ের (GNI) ১.২৯% অবদান রাখে গাছ এবং বন। জাতীয় ফলমূল প্রাথমিক গাছ এবং বনজ পণ্যের মোট মূল্যের প্রায় ৪৭% অবদান রাখে।[৭৫৯] এক্ষেত্রে সুন্দরবন অন্যতম ভূমিকা পালন করে। বলা হয়- *From the Hill and Sundarban periphery zones, households collect a larger variety of products, whereas the variety collected in Sal and Coastal zones is relatively limited.*[৭৬০]

---

৭৫৮. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, 2019, p: 170; Junaid K. Choudhury and Md. Abdullah Abraham Hossain, BANGLADESH FORESTRY OUTLOOK STUDY, ASIA-PACIFIC FORESTRY SECTOR OUTLOOK STUDY II, Working Paper No. APFSOS II/ WP/ 2011/ 33, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, REGIONAL OFFICE FOR ASIA AND THE PACIFIC, Bangkok, 2011, p. 35.

৭৫৯. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, 2019, p: 170.

৭৬০. ibid, p: 174.

বনজ দ্রব্যের বাজার মূল্য:

গ্রাম অঞ্চল মোট সংগৃহীত পণ্যের বেশিরভাগই সরবরাহ করে সুন্দরবনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক বন। বলা হয় জ্বালানি হিসেবে প্রায় ৮১% কাঠ এবং ৯০% পাতা সরবরাহ করে বনগুলো। বনজ সম্পদের আর্থিক গুরুত্ব নির্ণয়ে দেখা যায় বাংলাদেশে সংগৃহীত প্রাথমিক গাছ ও বনজ পণ্যের মোট মূল্য বছর প্রতি ৬,৯৯,৮৯৪ BDT/বছর, এবং গড়ে প্রতিটি পরিবার ২১,১৭১ BDT/বছর সংগ্রহ করেছে। সুন্দরবন এলাকায় পরিবার প্রতি জীবিকার ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ গড় মূল্য রয়েছে যেখানে গ্রাম অঞ্চলে সর্বোচ্চ মোট মান দেখা যায় মৎস্য পণ্য সংগ্রহে। সুন্দরবনের পরিধি এবং পার্বত্য অঞ্চলে, জ্বালানি পণ্য (যেমন জ্বালানী কাঠ, পাতা, ডালপালা, শাখা এবং অন্যান্য শক্তি পণ্য) সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে, যা জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবদানকারী খাত।[৭৬১] বন থেকে সংগৃহীত ফল ছিল NWFP এর মোট মূল্যের ৪৯%, তারপরে বাঁশ (১৪%) এবং মধু (১১%)।[৭৬২]

সারণি-১৩: বনজীবী পরিবার কর্তৃক প্রাথমিকভাবে সংরক্ষিত বনজ পণ্য ও পণ্য দ্রব্যের মূল্য

Zone	All primary tree and forest products		Primary tree and forest products excluding Fisheries	
	Average value (BDT/hh/year)	Total value (million BDT/year)	Average value (BDT/hh/year)	Total value (million BDT/year)
Sundarban periphery	49,354	18,908	22,697	8,695
Coastal	30,113	28,336	26,402	24,844
Hill	20,509	17,851	18,644	16,227
Sal	13,828	54,784	13,822	54,762
Village	21,560	580,015	20,435	549,763
National	21,171	699,894	19,791	654,292

Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, 2019, p: 178.

৭৬১. *ibid*, p: 177.

৭৬২. *ibid*, p: 178.

সারণি-১৪: বন থেকে সংগৃহিত কাঠ ও অকাষ্ঠ জাতীয় দ্রব্যেও আর্থিক মূল্য

Values of different wood and non-wood primary tree and forest products collected by households across zones.

Primary tree & forest products	Unit	Sundarbans Periphery	Coastal	Hill	Sal	Villages	National
Timber	BDT/hh/year	3,703.02	6,723.58	3,469.82	2,137.80	2,841.72	2,894.37
	million BDT/year	1,418.69	6,326.78	3,020.08	8,469.71	76,450.65	95,685.91
Poles	BDT/hh/year	621.83	299.03	106.49		120.07	116.24
	million BDT/year	238.23	281.38	92.69		3,230.35	3,842.65
	million BDT/year	28.41	33.91	198.50	184.65	1,063.99	1,509.46
Medicinal plants	BDT/hh/year	87.10	10.78	16.12	44.65	59.07	55.16
	million BDT/year	33.37	10.14	14.03	176.89	1,589.28	1,823.72
Murta	BDT/hh/year	10.58	99.34	0.26	0.23	19.36	18.74
	million BDT/year	4.05	93.48	0.23	0.90	520.78	619.44
Tree seedlings	BDT/hh/year	143.18	441.25	10.22		16.51	27.92
	million BDT/year	54.86	415.21	8.89		444.08	923.04
Fodder	BDT/hh/year	7.19	41.86	251.40	7.15	42.00	42.93
	million BDT/year	2.76	39.39	218.82	28.33	1,130.05	1,419.34
Seeds	BDT/hh/year	27.64	19.78	26.93		8.44	8.46
	million BDT/year	10.59	18.61	23.44		227.20	279.83
Fuelwood	BDT/hh/year	3,180.84	4,440.25	4,693.30	507.50	2,543.18	2,417.22
	million BDT/year	1,218.63	4,178.21	4,084.99	2,010.67	68,418.94	79,911.44
Leaves	BDT/hh/year	3,193.63	1,489.44	562.91	1,927.53	3,515.61	3,186.15
	million BDT/year	1,223.53	1,401.54	489.95	7,636.65	94,580.08	105,331.75

Spices	BDT/hh/year	5.07	0.10	8.53	7.94	2.87	3.57
	million BDT/year	1.94	0.09	7.43	31.47	77.22	118.15
Other animal products	BDT/hh/year			23.23			0.61
	million BDT/year			20.22			20.22
Fish	BDT/hh/year	7,147.05	3,671.27	1,772.50	5.59	970.78	1,024.66
	million BDT/year	2,738.15	3,454.61	1,542.76	22.13	26,116.89	33,874.53
Shrimp	BDT/hh/year	13,940.19	39.45	72.31		150.71	287.22
	million BDT/year	5,340.71	37.12	62.94		4,054.49	9,495.25
Shrimp fry	BDT/hh/year	742.12					8.60
	million BDT/year	284.32					284.32
Crabs	BDT/hh/year	4,828.08		20.61		3.01	58.94
	million BDT/year	1,849.71		17.94		80.99	1,948.64

Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, 2019, p: 179.

সারণি-১৫: বন থেকে সংগৃহিত অন্যান্য সম্পদ

Rank	Name of NWFP	Quantity	Unit	Value (million BDT)	NWFP category
1	Fruits	22,810,916	kg/year	1,297.215	Plant Product
2	Bamboo	12,529,474	No/year	374.625	Plant Product
3	Honey	793,423	kg/year	303.190	Animal Product
4	Brooms	1,686,024	bundle/year	177.490	Plant Product
5	Thatching materials	297,534	bundle/year	114.507	Plant Product
6	Bamboo shoots	12,529,474	kg/year	107.373	Plant Product
7	Mushrooms	363,652	kg/year	69.175	Plant Product
8	Other vegetables	2,810,040	kg/year	76.985	Plant Product
9	Root tubers	1,024,838	kg/year	35.502	Plant Product
10	Fodder	8,330,943	kg/year	53.913	Plant Product
All other plant products				34.416	
All other animal products				18.907	
Total				2,663.300	

Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, 2019, p: 182.

বনজ দ্রব্য থেকে বার্ষিক আয়: বনবিভাগ কর্তৃক প্রাথমিক বৃক্ষ ও বনজ দ্রব্যের অনুরূপ, মোট বার্ষিক আয় মৎস্যজাত দ্রব্য থেকে আয় সহ এবং ব্যতীত অনুমান করা হয়েছিল। দেশের বেশিরভাগ অংশে, বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে, প্রাথমিক গাছ এবং বনজ দ্রব্য থেকে অর্জিত পরিবারের আয় কম। গড়ে, একটি পরিবার প্রাথমিক গাছ এবং বনজ পণ্য বিক্রি করে বার্ষিক ৬,৬৬৪ টাকা আয় করে এবং মোট জাতীয় আয় ২২০ বিলিয়ন এর বেশি। জাতীয় বার্ষিক আয় থেকে মৎস্যজাত পণ্য বাদ দেওয়া হলে, এটি প্রায় ৩৩ বিলিয়ন বা ১৫% হ্রাস পায়। বেশিরভাগ অঞ্চলে আয়ের ক্ষেত্রে ফল এবং কাঠ প্রধান অবদানকারী, তবে বিভিন্ন মাত্রায়। উল্লেখ্য যে সুন্দরবনের একটি অংশ সংরক্ষিত এলাকা যেখানে মাছ ধরা নিষিদ্ধ, কিন্তু সংলগ্ন সীমিত ব্যবহারের এলাকায় মৎস্য সম্পদ সরবরাহ করে। এইভাবে, সংরক্ষণ প্রচেষ্টা আশেপাশের সম্প্রদায়ের জেলেদের আয় প্রদান করছে। সুন্দরবনের পরিধির একটি পরিবার অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী তাদের সমকক্ষদের তুলনায় বেশি বিক্রি করে বেশি আয় করছে।

সারণি-১৬: প্রক্রিয়াজাত গাছ এবং বনজ পণ্য থেকে আয়

Zone	Average income (BDT/hh/year)	Total income (million BDT/year)
Sundarban periphery	45.18	17.31
Coastal	512.43	482.19
Hill	271.28	236.12
Sal	28.46	112.74
Village	42.60	1,146.11
National	60.33	1,994.47

Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, 2019, p: 186.

সারণি-১৭: বন এবং গাছ সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত জনসংখ্যা (বাৎসরিক)

Zone	Primary tree and forest product collection	Processing tree and forest products	Selling of the tree and forest products
Sundarban periphery	1,274,009	119,359	3,699
Coastal	2,578,732	184,299	38,317
Hill	2,244,640	197,518	14,934
Sal	6,634,689	79,075	11,720
Village	92,737,689	2,215,117	117,186
National	105,469,759	2,795,368	185,856
% of total population	64.04	1.70	0.11

Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, 2019, p: 187.

সারণি-১৮: বন এবং গাছ সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত নারীর সংখ্যা (বাৎসরিক)

Women involved with tree and forest related activities across zones (no. women/year).

Zone	Primary tree and forest product Collection	Processing the tree and forest products	Selling of the tree andforest products
Sundarban periphery	636,805	66,615	2,057
Coastal	1,283,972	159,970	18,406
Hill	1,074,525	62,176	8,357
Sal	3,561,057	35,012	2,088
Village	46,718,852	981,648	0
National	53,275,211	1,305,421	30,908
% of women population	65.53	1.61	0.04

Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, 2019, p: 187.

কাঠের আসবাবপত্র এবং হস্তশিল্প: উপকূলীয় অঞ্চলে সর্বাধিক পরিমাণে হস্তশিল্প বিক্রি হয়, তারপরে গ্রাম, পাহাড়, সাল এবং সুন্দরবনের পরিধি। গ্রাম অঞ্চলে, সর্বোচ্চ পরিমাণে কাঠের আসবাবপত্র বিক্রি হয়, প্রাথমিক গাছ এবং বনজ পণ্যগুলির মতো, পরিবারগুলি খুব কম প্রক্রিয়াজাত পণ্য বিক্রি করে, সম্ভবত সেগুলি পরিবারের ব্যবহারের জন্য। হস্তশিল্প অঞ্চল জুড়ে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে সাধারণ পণ্য। অন্যদের তুলনায় উপকূলীয় অঞ্চলে উৎপাদিত হস্তশিল্পের সংখ্যা বেশি। মোট পরিবারের বৃহত্তর সংখ্যার কারণে গ্রাম অঞ্চলে কাঠের আসবাবপত্র বিক্রির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।[৭৬৩]

বনজ দ্রব্য থেকে পারিবারিক বার্ষিক আয়: বনবিভাগের তথ্যমতে, যদিও উপকূলীয় অঞ্চলের একটি পরিবার অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী তাদের সমকক্ষদের তুলনায় বেশি উপার্জন করেছে তথাপি গ্রাম অঞ্চলে মোট আয় সবচেয়ে বেশি। গ্রাম অঞ্চল প্রক্রিয়াজাত পণ্য থেকে মোট আয়ের অর্ধেকেরও বেশি অবদান রেখেছে । গ্রাম অঞ্চলে, প্রক্রিয়াজাত পণ্য থেকে মোট পরিবারের আয় অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি। প্রক্রিয়াজাত গাছ এবং বনজ পণ্য থেকে মোট বার্ষিক জাতীয় আয় ১,৯৯৪ মিলিয়ন BDT। প্রক্রিয়াজাত গাছ এবং বনজ পণ্য বর্তমান বাজার মূল্যে পরিমাপ করা মোট জাতীয় আয়ের ০.০১% প্রতিনিধিত্ব করে।[৭৬৪] গাছ এবং বন থেকে মোট বার্ষিক আয়ের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক বা প্রক্রিয়াজাত পণ্য বিক্রি থেকে আয় এবং অন্যান্য পরিসেবা থেকে আয়। বৃক্ষ ও বন থেকে মোট জাতীয় আয় বছরে ৩০২,৮১২ মিলিয়ন BDT । সবচেয়ে বড় অবদান গ্রাম অঞ্চল থেকে যদিও

৭৬৩. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, opcit, p: 190.

৭৬৪. *ibid*, p: 192.

এটির সর্বনিম্ন গড় বার্ষিক আয়ও রয়েছে এর। সুন্দরবনের পরিধির একটি পরিবারের জাতীয় গড় আয় বৃক্ষ ও বন থেকে তিনগুণ বেশি। জাতীয়ভাবে একটি পরিবারের বার্ষিক আয়ের প্রায় ৩.৫% আসে গাছ এবং বন থেকে। বার্ষিক আয়ে বৃক্ষ ও বন থেকে অবদান সবচেয়ে বেশি (৯.০%) সুন্দরবন এলাকায় এবং সর্বনিম্ন সাল জোনে (২.৬%)। উপরন্তু, বার্ষিক আয়ের শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে গাছ ও বনে সুন্দরবনের পরিধিতে ১৫% এবং পাহাড়ে ১২%। জাতীয়ভাবে, মধ্য-আয়ের গোষ্ঠীভুক্ত পরিবার অন্যান্য কুইন্টাইলের তুলনায় গাছ ও বন থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি আয় করেছে। তবে জোন জুড়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, সুন্দরবনের পরিধিতে শীর্ষ কুইন্টাইল অন্যান্য কুইন্টাইলের তুলনায় কমপক্ষে ১.৫ গুণ বেশি আয় করেছে। বিশেষ করে মৎস্যজাত পণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ প্রাপ্ত করার এই কুইন্টাইলের বৃহত্তর ক্ষমতার কারণে এটি হতে পারে। সাল অঞ্চলে, বৃক্ষ ও বন আয়ের অবদান সবচেয়ে কম, যা তুলনামূলকভাবে উচ্চ স্তরের নগরায়নের কারণে হতে পারে । উচ্চ আয়ের শ্রেণীভুক্ত পরিবারগুলি গাছ এবং বনজ দ্রব্য থেকে বেশি উপার্জন করে, যা প্রস্তাব করে যে এই আয়ের স্তরগুলি গাছ এবং বনজ সম্পদ থেকে আর্থিকভাবে বেশি লাভবান হচ্ছে । বৃক্ষ ও বন থেকে মোট আয় বর্তমান বাজার মূল্যে পরিমাপ করা ২০১৭-১৮ এর জাতীয় GNI-এর ১.২৯%। যখন মৎস্য পণ্য বিবেচনা করা হয়, না তখন অবদান ১.১৫% এ কমে যায়। গ্রাম অঞ্চলই মোট জাতীয় বন আয়ের তিন চতুর্থাংশের বেশি অবদান রাখে। সুন্দরবনের পরিধির একটি পরিবার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় গাছ এবং বন থেকে সর্বোচ্চ আয় করেছে যখন মৎস্যজাত পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মৎস্যজাত পণ্য বাদ দিলে আয়ের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কমে যায়।[৭৬৫]

বন খাতে জড়িত লোকসংখ্যা: আর্থ-সামাজিক সমীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশ বনবিভাগ বিভিন্ন বৃক্ষ ও বন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে জড়িত পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা জানতে চেষ্টা করে। দেখা যায় যে পরিবারগুলি গাছ এবং বন সম্পর্কিত কার্যকলাপের সাথে জড়িত এমন পরিবারে প্রায় তিনজন সদস্য প্রাথমিক গাছ এবং বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করেছেন। প্রধান বৃক্ষ এবং বন সম্পর্কিত কার্যকলাপ প্রাথমিক বৃক্ষ এবং বনজ দ্রব্য সংগ্রহে মোট লোকসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় স্কেলে বার্ষিক ১০৫.৫ মিলিয়ন লোক জড়িত। এটি মোট জনসংখ্যার ৬৪% যা যথাক্রমে প্রক্রিয়াকরণ এবং বিক্রয় কার্যক্রমের জন্য মাত্র ১.৭% এবং ০.১% এর তুলনায়। জাতীয়ভাবে, ৫৩.৩ মিলিয়ন মহিলা প্রাথমিক গাছ এবং বনজ পণ্য সংগ্রহ করে। উপকূলীয় এবং পার্বত্য অঞ্চল, শালবনের গ্রাম অঞ্চলের তুলনায় বৃক্ষ ও বনজ পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিক্রয়ের সাথে সুন্দরবনে অধিক নারী জড়িত ছিল ।[৭৬৬]

৭৬৫. *ibid*, p: 190.

৭৬৬. *ibid*, p: 200-204.

বন ও গাছপালা থেকে সেবাগ্রহণ: একটি বন সম্পর্কিত পরিসেবা প্রাপ্ত একটি জোনে পরিবারের অনুপাত মোট পরিসেবা গ্রহীতা পরিবার এবং জোনে জরিপ করা পরিবারের মোট সংখ্যার অনুপাত হিসাবে বন থেকে প্রাপ্ত সেবার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। দেখা যায় পরিবারগুলি কেবল গাছ এবং বন থেকে তাদের জীবিকা অর্জন করে না, অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিসেবাগুলি থেকেও উপকৃত হয়। বিভিন্ন বৃক্ষ এবং বন সম্পর্কিত পরিসেবা থেকে উপকৃত পরিবারের একটি উচ্চ অনুপাত মানুষ, গাছ এবং বনের মধ্যে উচ্চ স্তরের মিথস্ক্রিয়া নির্দেশ করতে পারে। বিভিন্ন বৃক্ষ এবং বন সম্পর্কিত জীবিকার বিকল্পগুলির মধ্যে, পরিবারের সর্বাধিক অনুপাত প্রাথমিক গাছ এবং বনজ পণ্যের সাথে জড়িত ছিল। কিছু পরিবার সহ-ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক বনায়ন থেকে আয় করে। FD-এর কাছে সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণের রেকর্ডও রয়েছে যা নির্দেশ করে যে ২% পরিবার ১৯৮১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণ করেছে। সুবিধাভোগীদের সমস্ত পরিবার কমপক্ষে একটি গাছ এবং বন সম্পর্কিত পরিসেবা পেয়েছে যা বাংলাদেশে গাছ এবং বন এবং মানুষের মধ্যে খুব উচ্চ স্তরের মিথস্ক্রিয়া নির্দেশ করে। জীবিকা সংক্রান্ত পরিসেবাগুলির মধ্যে, প্রাথমিক বৃক্ষ এবং বনজ দ্রব্যের সংগ্রহ সবচেয়ে সাধারণ, বিশেষ করে সুন্দরবনের পরিধি, গ্রাম, পাহাড় এবং উপকূলীয় অঞ্চলে। প্রাথমিক গাছ এবং বনজ দ্রব্য প্রতি তিন পরিবারের মধ্যে একজনের আয়ে অবদান রাখে । ছায়া, প্রাকৃতিক বায়ু বিরতি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, মাটির গুণমান এবং উর্বরতা প্রভৃতি পরিবাগুলোর দ্বারা উপভোগ করা সবচেয়ে সাধারণ পরিসেবা।[৭৬৭]

সারণি-১৯

Percentage of HH receiving different services/benefits from tree and forest.

Services/benefits	% of HHs
Shade	94.51
Natural windbreak	86.93
Pollution control	65.33
Medicinal	53.29
Soil quality and fertility	51.26
Erosion control	40.09
Livestock grazing	25.16
Tourism	12.14
Recreation	15.09
Aesthetic	14.26
Religious/ spiritual	7.18
Freshwater/ water conservation	5.88
Others	21.47

৭৬৭. *Ibid*, p: 197-198.

জ্বালানির জন্য বন ও গাছপালার উপর নির্ভরশীলতা: জ্বালানি ব্যবহার ও মূল্য নির্ধারণে বন বিভাগ কর্তৃক জরিপে দেখা যায়, একটি পরিবার গরম এবং রান্নার উদ্দেশ্যে যে গাছ এবং বনজ পণ্য সংগ্রহ করে তার মূল্যের সাথে সংগ্রহ করা জ্বালানী কাঠ এবং পাতার পরিমাণকে গুণ করে অনুমান করা হয়েছিল। এখানে দাম ছিল গৃহস্থরা যে দামে পণ্য বিক্রি করত সেটি। জাতীয় পর্যায়ে রান্না এবং গরম করার জন্য ব্যবহৃত পণ্যের মোট মূল্য বছরে ২০২,৯২৭ মিলিয়ন BDT। জ্বালানির ব্যবহারে পার্বত্য অঞ্চলে গড় পারিবারিক স্তরের সংগ্রহ এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ, তারপরে সুন্দরবন। রান্না এবং গরম করার জন্য সংগ্রহ করা বনজ পণ্যের জাতীয় গড় পরিমাণ হল ১,৪৪২ কেজি/এইচএইচ/বছর। পার্বত্য অঞ্চলে বনজ পণ্য রান্না ও গরম করার গড় মূল্য জাতীয় গড় থেকে চার গুণ বেশি। শাল বন জাতীয় গড়ের তুলনায় রান্না এবং গরম করার জন্য ২.৪ গুণ কম বনজ পণ্য সংগ্রহ করেছে, সম্ভবত এই কারণে যে এই অধিক নগরায়িত অঞ্চলটি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার করছে। মোট জাতীয় মূল্যের ৮০% আসে গ্রাম অঞ্চল থেকে। পরিবারগুলিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'কোন শক্তির পণ্য কেনার জন্য প্রতি মাসে কত টাকার প্রয়োজন; পরিবারগুলি জ্বালানি কাঠ, পাতা এবং অন্যান্য গাছের বায়োমস, কাঠকয়লা, ব্রিকেট, এলপি গ্যাস, কেরোসিন, বায়োগ্যাস, গোবরসহ বিভিন্ন ধরণের শক্তি পণ্য ক্রয় করে। উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবারগুলি অন্যান্য অঞ্চলের পরিবারের তুলনায় গাছ এবং বনজ পণ্য থেকে জ্বালানি বেশি ব্যয় করে।[৭৬৮]

সারণি-২০: জ্বালানি কাজে ব্যবহৃত বনজ পণ্যের আর্থিক মুল্য

Zone	BDT/HH/year	million BDT/year
Sundarban periphery	1,695	649
Coastal	3,979	3,744
Hill	3,210	2,794
Sal	2,842	11,261
Village	2,452	65,970
National	2,554	84,419

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে যেমন, ঠিক তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতেও সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুন্দরবন দেশের বনজ সম্পদের একক বৃহত্তম উৎস। এই বন কাঠের ওপর নির্ভরশীল শিল্পকারখানায় কাঁচামাল জোগান দেয়। এছাড়াও কাঠ, জ্বালানি ও মণ্ডের মতো প্রথাগত বনজসম্পদের পাশাপাশি এখান থেকে নিয়মিত বিপুল পরিমাণে আহরণ করা হয় ঘর ছাওয়ার গোলপাতা, মধু, মৌচাকের মোম, মাছ,

৭৬৮. *ibid*, p: 200-204.

কাঁকড়া এবং শামুক-ঝিনুক। বৃক্ষরাজি পূর্ণ সুন্দরবনের এই ভূমি একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় আবাসস্থল, পুষ্টি উৎপাদক, পানি বিশুদ্ধকারক, পলি সঞ্চয়কারী, ঝড় তুফান প্রতিরোধক, উপকূল স্থিতিকারী শক্তিসম্পদের বিপুল আধার এবং দারুণ সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্র। এই বনে রয়েছে প্রায় ৩০০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৪২৫ ধরনের প্রাণী এবং ২৯১ জাতের মাছের আবাসস্থল। প্রায় ৩৫ লাখ মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল বর্তমানে। এই বিশাল জনগোষ্ঠী বেঁচে আছে সুন্দরবনকে ঘিরে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে বিশ্বব্যাপী এক ধরনের আগ্রহ এবং চাঞ্চল্য রয়েছে। বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের একমাত্র আবাসস্থল সুন্দরবন। পর্যটন কেন্দ্রের উপযোগিতা থেকেও সুন্দরবনের গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রতি বছর দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পর্যটক ভিড় করেন 'ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন'-এ। এখানে বিদেশি পর্যটকদের সমাগমের ফলে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রাও যোগ হয় আমাদের জাতীয় আয়ের হিসাবে। অবহেলার মতো অঙ্ক নয়।[৭৬৯] প্রায় ৩৫ লাখ দরিদ্র জনগোষ্ঠী জীবিকার জন্য পুরোপুরি বা আংশিকভাবে সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল। সমীক্ষা থেকে জানা যায়, সুন্দরবন ও এর আশপাশের পেশাজীবীরা প্রধানত আটটি পণ্য বন থেকে সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তারা প্রধানত জ্বালানি কাঠ, মধু ও মোম, গোলপাতা, মাছ, চিংড়ি ও চিংড়ি পোনা, কাঁকড়া আহরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এই সাত পণ্য আহরণের মাধ্যমে এক হাজার ১৬১ কোটি টাকার সমপরিমাণ আর্থিক সম্পদ পাওয়া যায় সুন্দরবন থেকে।[৭৭০]

সুন্দরবন সুরক্ষায় নানা অবহেলা থাকলেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই বনের আর্থিক অবদান বছরে পাঁচ হাজার ৪৫৬ কোটি টাকা। পর্যটন, দুর্যোগ থেকে রক্ষা ও জীবিকার মাধ্যমে এই অবদান রাখছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন।[৭৭১]

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (IFESCU) সুন্দরবনের ওপর একটি গবেষণায়। দেখা যায়, সুন্দরবন থেকে চার খাতে মোট ২২ ধরনের সেবা মেলে। উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, ইউএসএইড এবং জন ডি রকফেলার ফাউণ্ডেশনের কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় এই জরিপ পরিচালিত হয়েছে। ২০১৫ ও ২০১৬ সালের মধ্যে জরিপটি পরিচালনা করেন প্রখ্যাত বন্যপ্রাণী বিষয়ক জীববিজ্ঞানী ড. এ.এইচ.এম. রায়হান সরকার, পরিবেশ অর্থনীতিবিদ এম নূরনবী এবং ভৌগোলিক তথ্য বিজ্ঞান (জিআইএস) বিশ্লেষক এমরান হাসান।[৭৭২]

---

৭৬৯. রেজাউল করিম খোকন, *জাতীয় অর্থনীতিতে সুন্দরবনের অবদান*, *দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ*, ২ জানুয়ারি ২০২৩।

৭৭০. *ঐ*।

৭৭১. *ঐ*।

৭৭২. আনোয়ার হোসেন, *সুন্দরবনের অবদান বছরে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা*, বাংলাট্রিবিউন, ২৩ নভেম্বর ২০১৭

২২ ধরনের সেবা পেয়ে থাকে বলে জরিপ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এসব সেবাকে মোটাদাগে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়- খাদ্যসংস্থান, সাংস্কৃতিক, সুরক্ষামূলক ও সমর্থনকারী সেবা।[৭৭৩]সুন্দরবনের পর্যটন খাত থেকে বছরে আসে ৪১৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৫৩ মিলিয়ন ডলার। সুন্দরবন থাকার কারণে ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের সময় উপকূলীয় অঞ্চলের জীবন ও সম্পদ বড় ধরনের ক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই বনের কারণে বছরে তিন হাজার ৮৮১ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা পায়। জীবিকার মাধ্যমে বছরে এক হাজার ১৬১ কোটি টাকার সমপরিমাণ আর্থিক সম্পদ পাওয়া যায় এই বন থেকে।[৭৭৪]সুন্দরবনের আর্থিক মূল্য সম্পর্কে ধারণা না থাকায় সুন্দরবনের অর্থনৈতিক অবদান নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাছে দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়ন প্রশ্নে সুন্দরবনের চেয়ে মংলা বন্দর, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, শিল্পকারখানা স্থাপন বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু সুন্দরবনের আর্থিক মূল্য জানা থাকলে নীতিনির্ধারকদের এর গুরুত্ব বোঝানো সহজ হয়।[৭৭৫]

সুন্দরবনের মাধ্যমে সুরক্ষাসেবায় দেখা যায় যে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সাইক্লোন থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলকে প্রাকৃতিক সুরক্ষা দিচ্ছে সুন্দরবন। গত একশ বছরের মধ্যে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় ৫০৮টি সাইক্লোনের উৎপত্তি হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১৭ শতাংশ সাইক্লোন বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আঘাত হেনেছে। সাম্প্রতিক দুই বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' ও 'আইলা'র ধ্বংসযজ্ঞ থেকেও বাংলাদেশকে অনেকটা রক্ষা করেছে সুন্দরবন।[৭৭৬] সাইক্লোন সিডর ঘণ্টায় ২২৩ কিলোমিটার বেগে বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বড় একটি অংশ প্লাবিত হয়। সিডরের আঘাতে তিন হাজার ৪০৬ জন ব্যক্তি প্রাণ হারান এবং ৫৫ হাজার ২৮২ জন আহত হন। প্রলয়ঙ্করী এই ঘূর্ণিঝড়ে ওই এলাকার প্রায় ৮৯ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিডরের আঘাতে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মোট ক্ষতির পরিমাণ একশ ৬৭ কোটি মার্কিন ডলার।[৭৭৭] ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল বায়ুপ্রবাহ প্রতিহত করতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে সুন্দরবনের ঘন সবুজ বেষ্টনী। এই বেষ্টনী বাতাসকে কয়েকশ মিটার ওপরে ঠেলে দেয়। ফলে উপকূলীয় সুরক্ষায় সুন্দরবনের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীয় এলাকার বাড়িঘর ও সম্পদ সুরক্ষা করে সুন্দরবন প্রতিবছর অর্থনীতিতে তিন হাজার ৮৮১ কোটি টাকার অবদান রাখে। উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন কার্যক্রম বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া উচিত বলেও সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।[৭৭৮]

---

৭৭৩. ঐ।

৭৭৪. রেজাউল করিম খোকন, *জাতীয় অর্থনীতিতে সুন্দরবনের অবদান*, পূর্বোক্ত।

৭৭৫. ঐ।

৭৭৬. আনোয়ার হোসেন, *সুন্দরবনের অবদান বছরে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা*, পূর্বোক্ত।

৭৭৭. ঐ।

৭৭৮. ঐ।

সুন্দরবনের সম্পদের ওপর মানুষের নির্ভরতায় দেখা যায় স্থানীয় লাখ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস সুন্দরবন। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৩৫ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুন্দরবনের সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে কাঠ (আসবাবপত্রের কাঠ, জ্বালানি কাঠ এবং গোলপাতা) এবং বনজ সম্পদের (মৎস্য, মধু, কাঁকড়া ও ঔষধি গাছ) ওপর নির্ভরশীল স্থানীয়রা। সুন্দরবন থেকে সবচেয়ে বেশি সংগ্রহ হয় মধু, মোম, গোলপাতা, মাছ, চিংড়ি, চিংড়ি রেণু, কাঁকড়া ও জ্বালানি কাঠ। গত ২০ বছর ধরে সুন্দরবন থেকে জ্বালানি কাঠ ও চিংড়ি রেণু সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও স্থানীয়দের অনেকেই এই নিষেধাজ্ঞা মানেন না। স্থানীয়দের জীবিকা সরবরাহ করে সুন্দরবন অর্থনীতিতে বছরে প্রায় এক হাজার ১৬১ কোটি টাকার অবদান রাখছে।[৭৭৯]

৪.৬ বাজারঃ হান্টারের সময়কালীন সুন্দরবন পার্শ্বস্থ নদী তীরবর্তী কোনো শহর ছিল না তবে উত্তরে এবং দক্ষিণের স্থায়ী জেলাসমুহের সংলগ্ন নদী তীরবর্তী কিছু গ্রাম গড়ে উঠেছিল। এই সকল গ্রামে নির্ধারিত দিনে বাজার বসত এবং কৃষকরা ধান বিক্রি করে প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করত। চব্বিশ পরগণা সুন্দরবনের উত্তরে প্রধান বাজার ছিল বসরা এবং বসন্তপুর এবং নিকটবর্তী যশোর সুন্দরবনের প্রধান বাজার ছিল চাঁদখালী, মোড়লগঞ্জ এবং খুলনা বাজার।[৭৮০] যশোরের District Report-এ Mr. Westland কাবাদাক নদী তীরবর্তী চাঁদখালী বাজারের বর্ণনায় উল্লেখ করেন: 'এসকল গ্রামসমুহের মধ্যে চাঁদখালী ছিল প্রধান এবং সোমবার ছিল এর হাটবার। রবিবার থেকেই বিভিন্ন দিক থেকে বণিকরা আসতে শুরু করে।[৭৮১] বিশেষ করে কলকাতার বণিকরা এসে নদী ও খালে নোঙ্গর করে অবস্থান করে। বেঁচা কেনা শেষে কার্গো মাল বোঝাই করে কলকাতার ব্যবসায়ীগণ যাত্রা করতো।[৭৮২] শুধুমাত্র চাঁদখালী বাজারেই সপ্তাহে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ পাউণ্ড মূল্যের ধান ক্রয়-বিক্রয় হতো এবং মৌসুমে এর পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ ছিল। পাশাপাশি জ্বালানি কাঠ বিক্রি করা হত।[৭৮৩]

৪.৭ ব্যবসা-বাণিজ্যপথঃ হান্টারের তথ্যমতে সুন্দরবনের পূর্বাঞ্চল থেকে কলকাতার সাথে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে নৌ পথকেই ব্যবহার করা হতো। শতবছর পূর্বে থেকে ব্যবহার করে আসা এই পথ ১৮৭৬ সালেও একই থাকে।[৭৮৪] দুই দিকবর্তী পথ অন্তঃগমন ও বহিঃর্গমন (Inner passage and Outer Passage) ব্যবহার করা হত।[৭৮৫] ৫০ থেকে ৭০ মণ মাল বোঝাই কার্গো চলাচলের জন্য নদীতে পর্যাপ্ত পানি না

---

৭৭৯. ঐ।

৭৮০. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p. 18

৭৮১. *ibid,* p. 18

৭৮২. *ibid,* p. 19.

৭৮৩. *ibid,* p. 19.

৭৮৪. *ibid,* p. 16.

৭৮৫. *ibid,* p. 17.

থাকায় বহির্গমন পথে সাধারণত শীতকালে চলাচল করা হত। পাশাপাশি স্টীমার চলাচলের জন্যও ভিন্ন রাস্তা ব্যবহার করা হত। স্টীমারে কলকাতা-ঢাকা-আসামের চা উৎপাদনকারী জেলাসমুহে বাণিজ্য হত।[৭৮৬] কলকাতা থেকে আসা স্টীমার সুন্দরবনের চ্যানেল ক্রীক দিয়ে প্রবেশ করে হুগলীতে অবস্থান করত এবং যাওয়ার সময় দক্ষিণের নদী ও মোড়লগঞ্জের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে মধুমতী ও গড়াই নদী দিয়ে ফরিদপুরের গোয়ালন্দে প্রবেশ করত।[৭৮৭]

৪.৮ সুন্দরবনের বনজ সম্পদ ও অর্থনৈতিক গুরুত্বঃ

সুন্দরবনের সর্বত্রই জীবন ও জীবিকার নানা অনুষঙ্গ বিদ্যমান। হান্টার সুন্দরবনের বনজ সম্পদের উল্লেখ করতে গিয়ে তাই শুরুতেই বলেনঃ *The dense Sundarban jungle forms a very important article of export.* বাণিজ্যের প্রধান সামগ্রী ছিল জ্বালানি কাঠ। শুরুতে কাঠ কাটার জন্য সরকারি কোনো রাজস্ব নির্ধারিত ছিল না। পরবর্তীতে ১৮৬৬ সালে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানিকে যে সকল ভূমি তখন পর্যন্ত দখল করা হয়নি সেগুলো ইজারা প্রদান করে। এক্ষেত্রে কোম্পানির একাধিপত্য, এজেন্টদের ফি আদায় করতে গিয়ে জনসাধারণের উপর চালানো নির্যাতন প্রভৃতির কারণে স্থগিত করার পর পূনরায় দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে সরাসরি চাষীদের লিজ প্রদানের কথা চিন্তা করা হয়। এবিষয়টি বিবেচনার জন্য ১৮৭৩ সালের শুরুতে ডেপুটি কনজারভেটর পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে তিনি টোল কেন্দ্র স্থাপন এবং লাইসেন্স প্রদান প্রথা চালু করার প্রস্তাব করেন।[৭৮৮] যদিও পরবর্তীতে সরকার তার এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেনি। কাঠ কাটার সাথে যুক্ত ছিলো মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নশ্রেণি এবং হিন্দু শ্রেণির লোকজন। যথা- পোদ, বাগদি, কেওড়া, তিয়র, চণ্ডাল, কৈবর্ত ও কাপালি। এরা অবশ্য চাষাবাদ, মাছ ধরার কাজও করে থাকে। যদি কোন বছরে তারা কাঠ কাটতে যায় তাহলে অন্যকে উৎপাদিত ফসল প্রদানের বিনিময়ে চাষাবাদে নিযুক্ত করে।[৭৮৯]

নৌকা নির্মানের প্রধান এবং সহজলভ্য উপাদান ছিল সুন্দরী কাঠ। কিন্তু ধীরে ধীরে এটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। এর কয়েকটি কারণ আছে। যথা: শুধু লবণাক্ত পানিতেই সুন্দরী গাছ জন্মে না। নদীস্রোতে বয়ে আসা সুমিষ্ট জল আর অধিক পরিমানে পলি মিশ্রিত স্থানেই সুন্দরী গাছ ভাল জন্মে। সতীশ চন্দ্র এক্ষেত্রে বলছেন যে,

> *"পশ্চিম ভাগে যমুনা, ইছামতি, কপোতাক্ষ ও ভৈরব প্রভৃতি সমস্ত নদীগুলির সহিত গঙ্গার সংযোগ-স্রোত এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং পদ্মার জল কেবলমাত্র মধুমতি প্রভৃতি নদী দিয়া পূর্ববঙ্গে প্রবাহিত হয়। এজন্য পূর্বভাগে যেরুপ সুন্দরী গাছের বৃদ্ধি ও সংখ্যাধিক্য আছে, পশ্চিমভাগে তাহা নাই। অতি নিরবিচ্ছিন্ন লবণাক্ত*

---

৭৮৬. *ibid*, p. 13.

৭৮৭. *ibid*, p. 17.

৭৮৮. *ibid*, p. 21.

৭৮৯. *ibid*, p. 22.

স্থানে শুধু সুন্দরী কেন, অন্য ভাল কাষ্ঠের বৃক্ষও জন্মে না। সে অঞ্চলে কেবল গরান ঝোপ দেখিতে পাওয়া যায়।"

সুন্দরী গাছের দুষ্প্রাপ্যতার অন্য কারণ হিসেবে বলা যায় যে, কাঠুরিয়া বা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী কর্তৃক নির্বিচারে গাছ কাটায় এর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। আবাদ, শস্যক্ষেত্রের সীমাবৃদ্ধি, শিকারের কারণে হিংস্র জীব-জন্তুর বিনাশ এবং বনে অবাধ চলাচল প্রভৃতি যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে সুন্দরী গাছ ততই নষ্ট হচ্ছে।[৭৯০]

সুন্দরবন সম্পদের এক অমূল্য ভাণ্ডার। এছাড়া এর অবদান আর্থিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। সুন্দরবন সংশ্লিষ্ট জনবসতি এলাকার প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবার এ বন থেকে প্রাপ্ত কাঠ, গোলপাতা,মাছ ও চিংড়ি, মধু প্রভৃতি বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে।[৭৯১] বাংলাদেশের বন সম্পদের প্রায় ৪০ শতাংশ আসে সুন্দরবন থেকে। সুন্দরবনের সম্পদসমূহকে বন বিভাগ দুইভাবে ভাগ করেছে। এক, প্রধান বনজ দ্রব্য আর অন্যটি হলো অপ্রধান বনজ দ্রব্য। সুন্দরী, পশুর, ধুন্দল, গেওয়া ও কাঁকড়াসহ বিভিন্ন কাঠ জাতীয় বৃক্ষ প্রধান বনজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। আর অপ্রধান বনজ দ্রব্য গোলপাতা, গরান, হেঁতাল, মধু, মোম, মাছ, কাঁকড়া, শুটকি, হোগলামেলে ঘাস প্রভৃতি। এছাড়া সুন্দরবনের সম্পদ শুধু গাছপালা দিয়ে স্থলভাগে সীমাবদ্ধ নয়। জলজ সম্পদেও পরিপূর্ণ এই বন। সুন্দরবন বনবিভাগের তথ্যমতে, সুন্দরবন থেকে ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৭,০০,০৬,,৯০১ টাকা এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৫,৯৭,১৭,৬২৬ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়।[৭৯২] এর আর্থিক গুরুত্ব নিয়ে স্থানীয় উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, খুলনার ফ্লিপচার্টে পরিবেশিত ছড়ায় উল্লেখ করা হয়-[৭৯৩]

আমাদের এই সুন্দরবনটি সম্পদের ভাণ্ডার।
গাছে, মাছে, মোম, মধুতে, তুলনা নাই যার।।
ম্যানগ্রোভ বন রক্ষা করে দেশের ভূখণ্ডকে।
বাওয়াল, মৌয়াল, জেলে বাঁচে বনের সম্পদ থেকে।।

এছাড়া সুন্দরবনের প্রতিটি উপাদানে রয়েছে বনজীবীদের জীবিকার অবলম্বন। গনগনে মাছে প্রসূতি মায়ের বুকে দুধ বাড়ে। এছাড়া মেন মাছ পুরুষের শরীরের বল বাড়ায়।[৭৯৪] কেওড়া গাছের নিচে কাইন মাছ বেশি থাকে।

---

৭৯০. সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, খণ্ড-১, পূর্বোক্ত, পৃ-৮৬।

৭৯১. রাজিব আহমেদ (সম্পা.), সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, গতিধারা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৮২।

৭৯২. সুন্দরবন ফ্লিপ চার্ট, উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮।

৭৯৩. ঐ।

৭৯৪. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, পূর্বোক্ত, ঢাকা।

খালের গর্তে সেজি গাছের কষ ঢেলে দিলে কাইন মাছ কিছুটা দুর্বল হয়ে ঘোলা পানির উপরে উঠে আসে। জেলেরা এভাবে কাইন মাছ ধরে থাকে।[৭৯৫]

বর্তমানে সুন্দরবন সংলগ্ন শ্যামনগরের অধিবাসীদের সর্বোচ্চ পরিমাণে কাঠ ও কাঠের তৈরি আসবাবপত্র নির্মাণে নিয়োজিত দেখা যায়।[৭৯৬] ১৯৯৩ সালের গণনা অনুযায়ী সুন্দরবনের কাঠের মূল্য ১২০ থেকে ১৩০ কোটি ডলার।[৭৯৭] সাতক্ষীরার শ্যামনগরে অন্যান্য এলাকার তুলনায় এখানে ১,২৫৮টি পরিবার কাঠের আসবাবপত্র তৈরির কাজে নিয়োজিত। নিম্নে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো–

সারণি-২১: কাঠের আসবাবপত্র এবং একাজে জড়িত লোকসংখ্যা

সাতক্ষীরা

Upazila	**Unit**	**Person engaged**		
		Family	Hired	Total
Assasuni	145	145	300	445
Debhata	42	42	126	168
Kalaroa	165	165	247	412
Kaliganj	75	125	150	275
Satkhira Sadar	200	350	1500	1850
Shyamnagar	618	1258	1912	3170
Tala	107	107	287	394
Total	**1352**	**2192**	**4522**	**6714**

Source: Industry and Labour Wing, BBS, District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-51.

৭৯৫. ঐ।

৭৯৬. District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-51.

৭৯৭. রাজিব আহমেদ, পূর্বোক্ত পৃ. ৮৬।

খুলনা

Upazila	Unit	Person engaged		
		Family	Hired	Total
Batiaghata	22	22	66	88
Dacope	25	13	55	68
Dighalia	32	59	37	96
Dumuria	112	30	345	375
Khulna City Corporation	180	199	357	556
Koyra	22	25	50	75
Paikgachha	71	71	90	161
Phultala	76	96	218	314
Rupsa	73	142	113	255
Terokhada	32	32	128	160
Total	**645**	**689**	**1459**	**2148**

Source: Industry and Labour Wing, BBS, District Statistics 2011: Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-61.

বাগেরহাট

Upazila	Unit	Person engaged		
		Family	Hired	Total
Bagerhat Sadar	188	159	342	501
Kachua	33	29	68	97
Rampal	92	145	178	323
Sarankhola	52	145	18	163
Chitalmari	208	208	2232	2440
Morrelgonj	88	114	132	246
Mongla	112	98	274	372
Mollahat	41	46	131	177
Fakirhat	70	96	202	298
Total	**884**	**1040**	**3577**	**4617**

Source: Industry and Labour Wing, BBS, District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-48

সারণি-২২: কাঠমিল (স'মিল) এবং একাজে জড়িত লোকসংখ্যা (২০১১)

Upazila	Unit	Person engaged		
		Family	Hired	Total
Bagerhat Sadar	42	8	192	200
Kachua	28	12	84	96
Rampal	22	84	60	144
Sarankhola	29	5	87	92
Chitalmari	29	25	91	116
Morrelgonj	32	47	110	157
Mongla	20	0	80	80
Mollahat	27	30	82	112
Fakirhat	25	28	102	130
Total	**254**	**239**	**888**	**1127**

Source: Industry and Labour Wing, BBS, District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-48.

৪.৯ সুন্দরবনে জন্ম নেয়া বিভিন্ন বৃক্ষ ও গুল্মের আর্থিক গুরুত্ব:

১৮৭৩ সালের দিকে সুন্দরবনে প্রায় ৩০ প্রজাতির গাছ ছিল। সুন্দরবন কমিশনারের রিপোর্ট ও Mr. A. L. Home, Deputy conservator of Forest- এর রিপোর্টের ভিত্তিতে হান্টার এসব গাছের আকার ও ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

আমুরঃ Amur (amoora cucullata)। পশুর নদী তীরবর্তী অঞ্চলে জন্ম নেয়া লক্ষণীয় বৃক্ষ হলো আমুর (Amoor cucullata)। এটি খুব বেশি স্থায়ী ও টেকসই হয় না।[৭৯৮] গৃহে ব্যবহৃত নানা ছোট খুঁটি, খেলনা, হুঁকার নল, দাঁড়ি পাল্লার কাঠ প্রভৃতি তৈরিতে এই কাঠ ব্যবহার করা হয়।[৭৯৯] একটি পরিপক্ক আমুর গাছের কাঠ দৈর্ঘ্যে ১৫ ফুট এবং ব্যাস ৯ ইঞ্চি। এর কাঠ খুব শক্ত। স্থানীয় অধিবাসীদের গৃহ নির্মাণে খুঁটি ও জ্বালানি হিসেবে এই কাঠ ব্যবহার করা হয়। তবে এই গাছ সুন্দরবনের সব স্থানে পাওয়া যায় না। সাধারণত যশোর সুন্দরবনেই এর দেখা মেলে। বাজারে এর যোগানের সরবরাহ কম দেখা যায়।[৮০০]

বাইন কাঠ Bain (avicennia tomentosa): এর গড় ব্যাস ৩ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে ১৫ ফুট। এই গাছের কাঠ সাধারণত ভঙ্গুর প্রকৃতির। কাটার সময় ভেঙে যাওয়ার কারণে এটি দিয়ে কোন শক্ত কাঠ তৈরি করা যায় না।

৭৯৮. District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p: 6.

৭৯৯. রাজিব আহমেদ, পূর্বোক্ত পৃ. ৮৮।

৮০০. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p. 22.

প্রধানত জ্বালানি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এটি বাকেরগঞ্জ সুন্দরবনে বেশি দেখা যায় । তবে ২৪ পরগণা এবং যশোর সুন্দরবনেও কিছু পরিমাণে পাওয়া যেত। স্থানীয় বাজারে এই কাঠের বেশ সরবরাহ ছিল। সাধারণত ৫ ফুট দৈর্ঘ্যে ছোট ছোট খণ্ড করে বাজারে নিয়ে আসা হত।[৮০১] সুন্দরবনের সর্বোচ্চ ব্লকে অন্যতম হলো বাইন (Avicennia officinalis)। এটি উচ্চতায় প্রায় ৬০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। বৃহৎ ও দীর্ঘস্থায়ী বাইন কাঠ তুলনামুলক কম দামে বিক্রয় হয়। তবে বাইন কাঠের তক্তা খুব মজবুত। ঘরের বেড়া, দরজা, জানালা, বাক্স, পিঁড়ি, আলমারি, টেবিল ও ধান ভানার ঢেঁকি প্রভৃতি বাইন কাঠের তৈরি করা হয়। বরিশালের স্বরপকাঠির ইন্দিরহাটে বাইন কাঠ তৈরি অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা বেচা হয়।[৮০২] বাইন গাছের ফুল ছোট আকারের সুমিষ্ট ও সুঘ্রাণে পূর্ণ হলুদ বর্ণের। এই ফুল থেকে ভিন্ন স্বাদের মধু উৎপন্ন হয়।[৮০৩] জ্বালানি হিসেবে গেবু কাঠ, বাইন কাঠ ব্যবহার করা হয়।[৮০৪]

বালাই Balai (hibiscus tiliaceus): গড় ব্যাস ৬ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ৬ ফুট। এই কাঠ খুব বেশি শক্ত নয়। জ্বালানি হিসেবেই এর প্রধান ব্যবহার। এই গাছের ভেতরের অংশে বেশ শক্ত আঁশ থাকে। কাঠুরেরা জঙ্গল থেকে কাঠ টেনে আনা এবং নৌকার সাথে বাঁধার জন্য এই আঁশকে দড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। সুন্দরবনের সকল স্থানেই এই গাছ দেখা যায়। বাজারে এই কাঠ প্রচুর পরিমাণে নিয়ে আসা হয়।[৮০৫]

Bhaila: গড় ব্যাস ১২ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট। এই কাঠ কিছুটা শক্ত। সাধারণত ঘরের খুঁটি, বাঁধ নির্মাণে এবং হুঁকার দণ্ড তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। এই গাছ বিরল এবং যশোর সুন্দরবনেই প্রধানত পাওয়া যায়। এই গাছ ১৮৭৩ সালের দিকেই খুব বিরল হয়ে পড়তে থাকে। ফলে স্থানীয় বাজারে এর সরবরাহের পরিমাণও কমে গেছে।[৮০৬]

Bhara (rhizophora mucronata): দৈর্ঘ্যে ৬ থেকে ৮ ফুট। এর কাঠ সাধারণত জ্বালানি হিসেবে এবং মাঝে মাঝে গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।[৮০৭]

---

৮০১. *ibid,* p. 22.

৮০২. এফ.এম. আবদুল জলিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।

৮০৩. District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p: 7.

৮০৪. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: পূর্ণিমা রানী, পেশা: মৎসজীবী এবং গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষ্যৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৮০৫. W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p. 22.

৮০৬. *ibid,* p. 23.

৮০৭. *ibid,* p. 24.

বনজাম Bonjam (clerodendron inerme): এই কাঠ দুই থেকে ৪ ফুট দৈর্ঘ্যে কাটা হয়। এর কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এই গাছের পাতা স্থানীয় অধিবাসীরা লোকজ পদ্ধতিতে ঔষধ তৈরিতে ব্যবহার করেন।[৮০৮]

চাইল্লা (Chhaila): এর ব্যাস দুই থেকে আড়াই ফুট এবং দৈর্ঘ্য **১২** ফুট। এর কাঠ অপেক্ষাকৃত নরম এবং মূলত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চার ফুট খণ্ডে এই কাঠ বাজারে প্রচুর পরিমাণে নিয়ে আসা হয়। সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে এই গাছ প্রচুর দেখা যায়। তবে ২৪ পরগণা সুন্দরবন অঞ্চলে বেশি পাওয়া যায়।[৮০৯]

ডাবুর Dabur (cerbera odallam): জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার। দুই থেকে চার ফুট খণ্ডে বাজারে নিয়ে আসা হয়।

ডাল করমচা Dal Karamcha *(pongamia glabra)*: এই গাছ প্রস্থে ২ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে **১২** ফুট। এই গাছ সাধারণত কাঠকয়লা এবং জ্বালানিতে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের ফল থেকে স্থানীয়রা একধরণের তেল নিষ্কাশন করে ঔষধ তৈরিতে ব্যবহার করেন। এই গাছ যদিও বিরল তবে সুন্দরবনের সর্বত্র দেখা যায়। ৪ ফুট খণ্ড করে এই কাঠ বাজারে আনা হয় স্বল্প পরিমাণে।[৮১০]

ডিমাল (salacia prinoides): এই গাছের কাঠের গড় দৈর্ঘ্য ৪ থেকে ৬ ফুট। সাধারণত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়। তবে স্থানীয়রা মাঝে মাঝে এই গাছের ভেতরের অংশ দিয়ে যাদুমন্ত্র করার জন্য পুঁতি তৈরি করেন। [৮১১]

গরান Garan (ceriops Roxburghianus): গড় ব্যাস ৯ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য **১২** ফুট। স্থানীয় গৃহ তৈরির কাজে ছাড়াও কলকাতায় জ্বালানির জন্য এই কাঠ অধিক রপ্তানি করা হয়। এই বৃক্ষ সুন্দরবনের সর্বত্রই জন্মায় তবে ২৪ পরগণা সুন্দরবনে বেশি পাওয়া যায়। এই গাছের অনেক ধরন আছে–মঠ গরান, কালি গরান, জাত গরান ও ঝামটি গরান।[৮১২] এই গাছের কাঠ খণ্ড খণ্ড করা হয় না বরং সমস্ত অংশটুকুই বাজারজাত করা হয়।[৮১৩] গরানের বাকল দিয়ে চমৎকার রং তৈরি করা হয়। গরান গাছ মূলত বাঁশ ঝাড়ের ন্যায় গুচ্ছ আকারে জন্মায়। জ্বালানী ছাড়াও এই গাছ রুয়া, বেড়া, খুঁটি, নৌকার লগি, নলচে, দাড়ি-পাল্লার কাঠ, ছাতার বাট, ছড়ি, খাটের নোলা, রুটি তৈরির বেলুন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।[৮১৪] পাশাপাশি গড়ান গাছের কষ মাছ ধরার জালে ব্যবহার করলে জাল

---

৮০৮. *ibid*, p. 26.

৮০৯. *ibid*, p. 29.

৮১০. i*bid*, p. 20.

৮১১. ibid, p. 22.

৮১২. শিবশঙ্কর মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৯৩।

৮১৩. W.W. Hunter, A statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p. 24.

৮১৪. এফ.এম. আবদুল জলিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।

শক্ত হয়।[৮১৫] গরানের ডালের তিনটি ভাগের ভিন্ন ব্যভহার রয়েছে। কচা, ছিটে ও খুঁটি। কচা হলো চিকন ও ছোট ডাল। ঘরের বেড়া তৈরিতে কচা ব্যভহার করা হয়। শাঝারি আকারের ডালকে বলা হয় ছিটে। ঘরের পাইর ও চাল তৈরিতে এটা ব্যবহার করা হয়। সবচেয়ে মোটা ও বড় আকারের ডালকে বলা হয় খুঁটি। ঘরের খুঁটি তৈরিতে এই ডাল ব্যবহার করা হয়।[৮১৬]

গেওয়া Geoa (excoecaria agallocha): গেওয়া গাছ বেশ উঁচু হয়ে থাকে। এর গড় ব্যাস ২ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট। অপেক্ষাকৃত হালকা ও নরম এই কাঠ দিয়ে স্থানীয়রা বাদ্যযন্ত্র, ছবির ফ্রেম, খেলনা এবং মাঝে মাঝে খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। মগরা এই নরম হালকা কাঠের খণ্ড বালিশের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতো। এই গাছ সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশেই জন্মায় তবে ২৪ পরগণা সুন্দরবনে বেশি পাওয়া যায়। ৪ ফুট খণ্ড করে এই কাঠ প্রচুর বাজারজাত করা হয়।[৮১৭] সুন্দরবনের অর্থকরী গাছের অন্যতম হলো গেওয়া গাছ (Excecaria agallocha) । এটি সমুদ্র উপকূলবর্তী লোনা পানিতে ভালো জন্মায়। এই গাছও অধিক লম্বা ও সোজা হয়ে থাকে এবং এর কাঠ খুব হালকা সাদা বর্ণের। জ্বালানি ছাড়াও ঢোল, তবলা প্রভৃতির সুন্দর খোল তৈরি করা হয়।[৮১৮] তবে গেওয়া কাঠের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার হলো কাগজ তৈরি। গেওয়া কাঠ হতে উৎপন্ন কাগজ দেশ বিদেশের সংবাদপত্র ছাপানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।[৮১৯] উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন বিদেশি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখেন যে এই কাঠ দিয়ে কাগজ তৈরি সম্ভব। ফলে ১৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খুলনার খালিশপুরে একটি বৃহৎ নিউজপ্রিন্ট মিল তৈরি করা হয়।[৮২০] কাঠ সংগ্রহের জন্য তৈরি করা হয় কর্পোরেশন। ঠিকাদার ও কর্মচারীগন কাঠ সংগ্রহ করেন। এখানে দৈনিক শত শত টন কাগজ প্রস্তুত হয়। দেশের অসংখ্য সংবাদপত্র ছাড়াও শিক্ষা ও দাপ্তরিক কাজে এই কাগজ চাহিদা মেটাচ্ছে। এছাড়া ম্যাচ ফ্যাক্টরিতে প্রচুর পরিমাণে গেওয়া কাঠ ব্যবহৃত হয়।[৮২১] মধু সংগ্রহ করার সময় মৌমাছিকে চাক থেকে সরানোর জন্য হেঁতাল গাছের পাতা দিয়ে ধোঁয়া তৈরি করা হয়। খলসী ও গেওয়া কাঠ দিয়ে মধুর চাক কাটার জন্য বাঁট বা আছাড় বানানো হয়। গেওয়া ও সেজিগাছের আঠা মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করা হয়।

হেঁতাল Hental (phoenix paludosa): গড় ব্যাস ৪ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ১২ ফুট। এই গাছে কাঠের যোগান নেই বললেই চলে। কঁচি অবস্থায় এই গাছ হাঁটার জন্য লাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ভেলা তৈরিতেও ব্যবহার

---

৮১৫. রাজিব আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭।

৮১৬. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, পূর্বোক্ত, ঢাকা।

৮১৭. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p. 28.

৮১৮. এফ. এম. আবদুল জলিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।

৮১৯. ঐ, পৃ. ৮৭।

৮২০. ঐ, পৃ. ৮৯।

৮২১. ঐ।

হয়। এই গাছের পাতা (গোলপাতা) স্থানীয়রা ঘরের ছাদ ছাওনির কাজে ব্যবহার করে এবং এই উদ্দেশ্যে এই পাতা কলকাতায় প্রচুর পরিমাণে পাঠানো হয়। ২৪ পরগণা এবং যশোর সুন্দরবনে এই গাছ বেশি দেখা যায়।[৮২২]

ঝাউ Jhau (tamarix gallicia-uar-Indica): শুধুমাত্র জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়। স্থানীয় বাজারে ২ থেকে ৪ ফুট করে কেটে সরবরাহ করা হয়।[৮২৩]

জিন (Jin): দেখতে ঠিক বট গাছের মত এই বৃক্ষটির গড় ব্যাস ৪ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ২০ ফুট। সুন্দরবন কমিশনার তার রিপোর্টে এই গাছকে বটগাছেরই একটি প্রজাতি বলে উল্লেখ করেছেন। অপেক্ষাকৃত নরম এই গাছ মূলত জ্বালানি কাজে লাগে এবং ৪ ফুট খণ্ড করে বাজারে নেয়া হয়। সাধারণত বাকেরগঞ্জ সুন্দরবনে এই গাছ বেশি জন্মায়।[৮২৪]

কাকড়া Kankra (bruguiera gymnorhiza): সুন্দরী বৃক্ষের ন্যায় চাহিদাসম্পন্ন কাঠ হলো কাকড়া (Broguicra gyomosniza)। তুলনামুলক কিছুটা দীর্ঘ আকৃতির এই গাছ কাঠের জন্য ব্যবহার করা হয়।[৮২৫] এই কাঠ দিয়ে ছাদের কড়ি, বর্গা, দরজা-জানালা প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ব্যাস ২ ফুট এবং দৈর্ঘ্য **১**২ ফুট হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং স্থায়ী এই কাঠ স্থানীয় বিভিন্ন গৃহ তৈরি, তক্তা এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরির কাজে ব্যবহার হয়। সুন্দরবনের সব স্থানেই পাওয়া যায়। ৪ ফুট দৈর্ঘ্যে খণ্ড করে এই কাঠ বাজারে বিক্রি করা হয়।[৮২৬]

কড়ই Karai: ব্যাস ২ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট হয়ে থাকে। খুব শক্ত এই কাঠ খুঁটি ও স্থানীয় আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার হয়। সুন্দরবনের সব স্থানেই এর পরিমাণ খুব কম দেখা যায়। বাজারে খুব অল্প পরিমাণে ৬ থেকে ৮ ফুট খণ্ড খণ্ড করে নেয়া হয়।[৮২৭]

কেঙ্কি Kenkti (acanthus ilicifolous): শুধু জ্বালানিতে ব্যবহৃত হয় এবং ২ থেকে ৪ ফুট খণ্ড করে বাজারে নেয়া হয়।[৮২৮]

---

৮২২. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p. 30.

৮২৩. *ibid*, p. 29.

৮২৪. *ibid*, p. 7.

৮২৫. District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p: 7.

৮২৬. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p. 24.

৮২৭. *ibid*, p. 25.

৮২৮. *ibid*, p. 26.

কেওড়া Keora (sonneratia apetala): গড় ব্যাস ৩ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট। এই কাঠ অপেক্ষাকৃত নরম ও কম টেকসই। ভেজা ও স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থায় বাজারজাত করলে এর স্থায়ীত্বকাল আরো কমে যায়। ২৪ পরগণা অংশে এই গাছ বেশি দেখা যায়। তক্তা, তক্তপোশ, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি তৈরি করা হয় এই কাঠ দিয়ে। ৬ থেকে ৮ ফুট খণ্ড করে বাজারজাত করা হয়।[৮২৯] সুন্দরবনের নিম্ন ও কর্দমাক্ত ভূমিতে জন্ম নেয়া কেওড়া গাছের আর্থিক গুরুত্ব ও ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেওড়ার পাতা আর অম্ল স্বাদের এই ফল বনের হরিণ ও বানরের খুব উপাদেয় খাবার।[৮৩০] স্থানীয় জনগণ এর খোসা ফেলে লবণ মিশ্রণ করে জলপাইয়ের ন্যায় অম্ল হিসেবে ব্যবহার করে। সুন্দরবনে প্রাপ্ত এসব ফলই পাখি, হরিণ, বানর মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর বিশেষ খাদ্য যোগানের উৎস। বন্যপ্রাণীরা কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় এসব ফল খেতে পারে। কিন্তু পাকা অবস্থায় কোন ফল মানুষ খেতে পারে না। সবচেয়ে বেশি সহজলভ্য আহরিত ফল কেওড়া। কাঁচা অবস্থায় সুন্দরবনের অধিবাসীরা নোড়া, আচার ও টক জাতীয় বিভিন্ন খাবার তৈরি করে থাকে। কেউ কেউ অবশ্য ফল পাকা অবস্থায় খেয়ে থাকে।[৮৩১] কেওড়া ও গেওয়া গাছের পাতা ছাগলের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৮৩২]

শরৎকালের দিকে পরিপক্ক হওয়া এই ফল শত শত মণ গাছের নিচে পড়ে থাকে। কেউ কেউ কিছু পরিমাণে সংগ্রহ করে স্থানীয় হাট বাজারে বিক্রি করে।[৮৩৩] গবেষকদের মতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মানসম্মত উপায়ে যদি এই ফল প্রক্রিয়াজাত করে আচার, জেলি বা চাটনি তৈরি করা হয় তাহলে প্রচুর অর্থ আয়ের সম্ভাবনা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে চাহিদা মেটানোর সুযোগ রয়েছে।[৮৩৪] এছাড়া প্যাকিং সেন্টারিং, দরজা-জানালা ও দেয়াল নির্মাণে কেওড়া কাঠ ব্যবহার করা হয়।[৮৩৫]

খলসি/ খুলশী Khalsi (Aegiceras corniculata): গড় ব্যাস ২ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট হয়ে থাকে। জ্বালানি কাজেই মূল ব্যবহার। সুন্দরবনের সব স্থানে অধিক পরিমাণে এই গাছ পাওয়া যায়। ২৪ পরগণায় বেশি দেখা যায়। ৪ থেকে ৫ ফুট খণ্ড করে বাজারে নেয়া হয়।[৮৩৬] সুন্দরবনের অনেক গাছপালার ভিড়ে ছোট থেকে মাঝারি গড়নের একটি গাছ হলো খুলশী (Aegiceras corniculatum)। এটি গুল্ম বা ছোট বৃক্ষজাতীয় প্রকৃত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ।

---

৮২৯. *ibid*, p. 25.

৮৩০. এফ.এম. আবদুল জলিল, পৃ. ৮৫।

৮৩১. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, ৫ মে ২০১৮, ঢাকা।

৮৩২. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: সঞ্জয় কুমার, পেশা: মৌয়াল, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ৯ টা ৪৮ মিনিট।

৮৩৩. এফ.এম. আবদুল জলিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫।

৮৩৪. ঐ।

৮৩৫. রাজিব আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭।

৮৩৬. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p. 25.

প্রায় ৫-৭ মিটার পর্যন্ত বাড়ে। আমাদের সুন্দরবনে খুলশী সব জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় না। সংখ্যাও কমে যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করলে এটির বিস্তার ও প্রাচুর্য নির্ণয় করা সম্ভব। এ ফুলের মধু গুণে ও মানে ভালো। খুলশী ফুলের মধু সংগ্রহ করার জন্য সুন্দরবনে মৌয়ালদের আগ্রহ থাকে বেশি। খুলশী ফুল ফুটলে সারা দিন মৌমাছি মধু সংগ্রহের জন্য ভিড় করে। বহুদূর থেকে সৌরভ পেয়ে মৌমাছি, প্রজাপতি ছুটে আসে। সুন্দরবনের প্রজাপতিরও পছন্দের ফুল এটি। বিরল এই উদ্ভিদ সাধারণত সুন্দরবনে বিচ্ছিন্নভাবে জন্মে। সমষ্টিগতভাবে থাকে না। প্রচুর আলো পড়ে এমন পরিবেশে ভালো জন্মে। বনের অন্ধকার এলাকায় জন্মে না। লবণাক্ততার মাত্রা যেখানে বেশি সেখানে এরা ভালো থাকে। খুলশী ভারত, বাংলাদেশ, নিউগিনি, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ চীনসহ নানা দেশে জন্মে। পাতা গোলাকার বা ডিম্বাকার, ৪-৮ সেন্টিমিটার। পাতার রং হালকা সবুজ। পাতাগুলো একযোগে সাজানো থাকে। পাতায় কখনো মোমের আবরণ দেখা যায়। পত্রকোণ এবং শাখার আগায় ফুলের মঞ্জরিতে ফুল ধরে। সাদা রঙের ফুল ফোটে। ফুল ১-২ সেন্টিমিটার, গুচ্ছবদ্ধ ও ঘন আকারে থাকে। পাপড়ি সাদা বা ফ্যাকাশে গোলাপি। ফুল সুগন্ধি। কীটপতঙ্গ দ্বারা ফুলের পরাগায়ন হয়। ফল দেখতে কিছুটা মটর শুঁটির মতো। লম্বায় প্রায় ৫-৮ সেন্টিমিটার। প্রতিটি ফলে একটি বীজ থাকে। বীজ থেকে চারা গজায়। খুলশীর পাতা বিভিন্ন প্রজাতির মথ, ক্যাটারপিলারের খাবার। আদিবাসী কোনো কোনো গোত্রের লোকেরা পাতা কাঁচা বা তরকারি হিসেবে খায়। বাকল মাছ ধরতে ব্যবহার করা হয়। বাকল ও বীজ বিষাক্ত। স্যাপনিন নামের টক্সিনজাতীয় পদার্থ থাকে। সিঙ্গাপুরের আদিবাসী মেয়েরা খোঁপায় খুলশী ফুল গোঁজে।[৮৩৭]

এছাড়া গেওয়া, পশুর, বাইন, কেওড়া, ধুতল গাছে হওয়া ঢোঁড়ে মৌমাছিরা চাক বেশি বানায়। ঢোঁড় হলো গাছের খোঁড়ল বা গর্ত। ঢোঁড়ের মোমের রং কালচে হয়ে থাকে।[৮৩৮]

কিরপা Kirpa (lumnitzera racemosa): গড় ব্যাস ৯ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট। যশোর ও ২৪ পরগণায় বেশি পাওয়া যায়। শক্ত কাঠ খুঁটি হিসেবে ব্যবহার হয়। খণ্ড খণ্ড না করে কাঠের পুরো অংশটুকুই বাজারে নেয়া হয়।[৮৩৯]

লোহা কাইরা Loha Kaera: গড় ব্যাস ২ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট। নামের মতই এই গাছের কাঠও লোহার মত শক্ত। খাম্বা, খুঁটি, তক্তা ও জ্বালানিতে ব্যবহার হয়। সুন্দরবন কমিশনারের মত ছিল যে, এই গাছ যদি পরিপক্ক

৮৩৭. সৌরভ আহমেদ, খুলশী, প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর ২০১৭।

৮৩৮. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, পূর্বোক্ত, ঢাকা।

৮৩৯. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p. 25.

সময়ে কাটা হয় তাহলে এই শক্ত কাঠ দিয়ে ইংলিশ আসবাবপত্র তৈরি করা যাবে। এই গাছ সব স্থানে দেখা যায় না তবে বাকেরগঞ্জে অধিক জন্মায়। খুব অল্প পরিমাণে ৬ থেকে ৮ ফুট খণ্ড করে এই কাঠ বাজারে নেয়া হয়।[৮৪০]

পাঞ্চেওলি Pancheoli (dalbergia monosperma): জ্বালানির জন্য এই গাছ ৪ থেকে ৬ ফুট খণ্ড করে বাজারে পাঠানো হয়।[৮৪১]

পরস Paras (thespesia populnea): তক্তা ও খুঁটির জন্য এই গাছের কাঠ ৮ থেকে ১৬ ফুট খণ্ড করে কাটা হয়।[৮৪২]

পশুর Pasur (carapa obouta): ব্যাস ১ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট। খুঁটি ও তক্তার কাজে ব্যবহার হয়। ২৪ পরগণা ও যাশোরে বেশি জন্মায়। বাকেরগঞ্জে খুব বেশি দেখা যায় না। স্থানীয় বাজারে প্রচুর বিক্রি হয় এই কাঠ।[৮৪৩] সুন্দরী কাঠের তুলনায় অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে পশুর কাঠ। ভারী, লম্বা আর অধিক স্থায়িত্বের কারণে এই কাঠের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন।[৮৪৪] তাই এ কাঠের মূল্যও কেওড়া আর সুন্দরীর তুলনায় দ্বিগুণ। কালী পশুরের কাঠ পুরোটায় সারী হয়ে থাকে। পশুর গাছের বাকল দিয়ে তৈরি করা হয় চমৎকার রং। এই কাঠ থেকে পানিতে বা বৃষ্টির পানিতে ভিজিয়ে একধরণের রং তৈরি করা হয়। বিশেষ করে চামড়ার কারখানায় পশুর, গরান আর সুন্দরী গাছের বাকল রং তৈরি করার জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। *ফার্নিচার তৈরি হয় পশুর গাছ আর বাইন গাছ দিয়ে।*[৮৪৫] পাটাতন ও ছাদের বরগা হিসেবে পশুরের তক্তা খুবই মজবুত।[৮৪৬] তবে খুব ভারী হওয়ায় এই কাঠ দরজা-জানালায় কম ব্যবহার করা হয় এবং বক্র হয়ে যাওয়ায় এর দ্বারা ছাদের কড়িও খুব শক্ত হয় না। তবে পশুর গাছের খুঁটি মাটির নিচে দীর্ঘদিন মজবুত থাকে বলে সংলগ্ন অঞ্চলে গৃহে ব্যবহার করা হয়।[৮৪৭] প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এর প্রমাণ মিলেছে। শালের বৃক্ষের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী হিসেবে এই খুঁটি প্রচুর ব্যবহার করা হয়। সুউচ্চ হওয়ায় একটি গাছ থেকে সর্বনিম্ন চারটি এবং সর্বোচ্চ ছয়টি খুঁটি হয়ে থাকে। এছাড়া পশুর কাঠ দ্বারা গৃহের সাজ সরঞ্জামও তৈরি করা হয়।[৮৪৮] পশুর গাছের শুলো দিয়ে নারীরা চামচ, হাতা এসব নানা গৃহস্থালি জিনিস বানায়

৮৪০. *ibid*, p. 25.

৮৪১. *ibid*.

৮৪২. *ibid*.

৮৪৩. *ibid*, p. 26.

৮৪৪. এফ. এম. আবদুল জলিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫।

৮৪৫. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: সঞ্জয় কুমার, পেশা: মৌয়াল, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইন্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ। উপজেলা: শ্যামনগর। জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ৯ টা ৪৮ মিনিট।

৮৪৬. এফ. এম. আবদুল জলিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।

৮৪৭. ঐ, পৃ. ৮৬।

৮৪৮. ঐ।

এবং বাচ্চারা খেলনা গুটি বানায়।[৮৪৯] বারী পোকার কামড় থেকে সুরক্ষার জন্য বনে প্রবেশের পূর্বে বনজীবীরা শরীরে পশুর পাতার রস মেখে নেন।[৮৫০]

সিংড়া (Singra): ব্যাস ১ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ১২ ফুট। যশোর ও বাকেরগঞ্জে বেশি দেখা যায়, ২৪ পরগণায় তেমন পাওয়া যায় না। মূল ব্যবহার জ্বালানি।[৮৫১]

সিঞ্জ Sinz (cynometra bijuga): এই গাছটি বক্রাকৃতির। ৩ থেকে ৫ ফুট খণ্ড করে জ্বালানির জন্য বিক্রি করা হয়।[৮৫২]

সন্ধাল Sondal (afzelia bijuga): ব্যাস ৯ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট। খুঁটি, জ্বালানির পাশাপাশি এই গাছের বাকল দিয়ে চামড়া পরিষ্কার এবং এর ফল বিরোচক ঔষধ তৈরিতে ব্যবহার হয়। এই গাছ পূর্ব থেকেই বিরল ছিল। বাকেরগঞ্জে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যেত।[৮৫৩]

সুন্দরী Sundri (heritiera littoralis): গড় ব্যাস আড়াই ফুট এবং দৈর্ঘ্য ৩৬ থেকে ৪০ ফুট। এই গাছ বনের সর্বত্র পাওয়া যায়। বলা হয় এ থেকেই বনের নামকরন সুন্দরবন। এই গাছে বেশ শক্ত কাঠ হয়। খাম্বা, খুঁটি, বগী গাড়ি, বৈঠা, মেঝের তক্তা এবং স্থানীয় আসবাবপত্র তৈরিতে এই কাঠ ব্যবহার হয়। তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় নৌকা তৈরিতে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই নৌ-শিল্প বা নদীগামী নৌকার বিশেষ স্থান ছিল এই বাংলা। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে, প্রাচীন বাংলার লিপিমালা ও সংস্কৃতি সাহিত্যগুলিতে। নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, কালিদাস রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বাঙালিকে 'নৌসাধনোদ্যতান্' বলা হয়েছে। পাল ও সেন বংশের লিপিমালায় বাংলা সম্পর্কে ***নৌবাট*, *নৌবিতান* (Fleet of boats)** প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। নীহাররঞ্জন রায় নদীমাতৃক বাংলার নৌযানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, ***"সাধারণ লোকদের যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নৌযানের প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট, এই নদীমাতৃক, খাঁড়িপ্রধান, বারিবহুল এবং বহুলাংশে নিম্নভূমির দেশে ইহা তো স্বাভাবিক এবং সহজেই অনুমেয়।"***[৮৫৪] এই নৌযানের অন্যতম কাঠের যোগান আসে সুন্দরী কাঠ থেকে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে যশোর, বাকেরগঞ্জ ও ২৪ পরগণা সুন্দরবনের সকল নৌকাই সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সুন্দরী কাঠের তৈরি। লবণাক্ত পানিতে এই কাঠ টিকে থাকে তাই নৌকার

---

৮৪৯. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, পূর্বোক্ত, ঢাকা।

৮৫০. ঐ।

৮৫১. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p. 26.

৮৫২. *ibid.*

৮৫৩. *ibid.*

৮৫৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, ৼঝপযঅভলমশ, পৃ.১৫২।

তলদেশ এই কাঠে তৈরি হয়। ১০ থেকে ১২ ফুট খণ্ড করে অসংখ্য পরিমাণ কাঠ বাজারে আনা হয়।[৮৫৫] সুন্দরী গাছের পাতা আকারে ছোট, দেখতে লবঙ্গের পাতার মত এবং নিম্নে ধূসরবর্ণের। সুন্দরী গাছে ছোট ছোট হরিদ্রাবর্ণের ফুল হয়। গাছগুলি দীর্ঘ এবং স্থুল হয় তবে খুব বৃহদাকারের মত নয়। সুন্দরী গাছ অনেকটা জাম গাছের মত দেখতে। কচি বা অল্প বয়স্ক সুন্দরী গাছ দেখতে বাঁশের মত। এগুলোকে বলা হয় ছিট। এই ছিট দিয়ে নৌকার লগি প্রস্তুত করা হয়। গাছের উপরিভাগের পাতলা আবরণের নিচে গাব গাছের মত লাল রং দেখা যায়। এর কাঠও গাড় লাল বর্ণ। এর কাঠ যেমন শক্ত তেমন সুন্দর। আর সুন্দর বলেই একে সুন্দরী কাঠ বলে। নদী প্রধান দেশে নৌকা অন্যতম বাহন। আর এই নৌকা তৈরিতে একসময় প্রচুর সুন্দরী কাঠ ব্যবহার করা হতো।[৮৫৬]

বাংলাদেশের মোট বনাঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নিয়ে সুন্দরবনে সহজলভ্য ও বহুল পরিচিত বৃক্ষ হলো সুন্দরবন। কাঠের গৌরীয় বর্ণ আর সুউচ্চ দণ্ডায়মান এই বৃক্ষের সুন্দরী বৃক্ষ নামে পরিচিত লাভ অযৌক্তিক নয়।[৮৫৭] এই বৃক্ষের কাঠ বাণিজ্যিকভাবে চাহিদা মেটানো ছাড়াও অধিকাংশ গৃহের নানা কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সুন্দরী গাছ বেশ লম্বা, মোটা হয় এবং আম বা অন্যান্য গাছের মতো খুব বেশি ডালপালা না ছড়িয়ে শুধু বেড়ে উঠতে থাকে বলে এই গাছের কাঠ ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়।[৮৫৮] বাংলায় সুন্দরী গাছ সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ নৌকা তৈরির জন্য। এর কাঠ দিয়ে নৌকার শক্ত পাটাতন তৈরি করা যায়। আর যদি সুন্দরী কাঠ মাটির নিচে গেঁথে ও কাজে লাগানো হয় তাহলে 'শত শত' বছর ও এই কাঠ নষ্ট হয় না।[৮৫৯] নৌকার ডালি তৈরির জন্য সুন্দরী কাঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নৌকার লগী, দাঁড় ও বৈঠা তৈরির জন্য সুন্দরী গাছের চারাগাছ বা ছিট ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত ***জেলা পরিসংখ্যান ২০১১: সাতক্ষীরায়*** সুন্দরবনের অন্যান্য বৃক্ষের তুলনায় সুন্দরী গাছকে অধিক ব্যবহারযোগ্য, টেকসই এবং আকর্ষণীয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিসংখ্যানের তথ্যমতে-

> *The sundari (*Heritiera minor*) is the most important of the forest trees. The colour of its wood is reddish which is very soothing to the eye. Because of its durability it has a great demand. It can tolerate saline water but attains full height on the bank of sweet water rivers like `Sela' and `Passur' and available in large quantity. Its timber is very durable and hmas great demand for posts and planks.*[৮৬০]

---

৮৫৫. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p. 26.

৮৫৬. সতীশ চন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ-৮৬।

৮৫৭. এফ. এম. আবদুল জলিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

৮৫৮. ঐ।

৮৫৯. ঐ।

৮৬০. District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p: 5-6.

এছাড়া গৃহের দরজা জানালার কাজে ব্যবহারের পাশাপাশি অনেক অঞ্চলের জ্বালানি কাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।[৮৬১] গৃহের রুয়া, বাতা, পাইড় ও খুঁটি তৈরিতে এই কাঠ ব্যবহার করা হয়। এই কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় ছড়ি, ছাতার বাট ও দাঁড়িপাল্লা। আধুনিক গৃহ নির্মাণের অন্যতম উপাদান ইট তৈরিতে কয়লার পরিবর্তে সুন্দরী কাঠ ব্যবহার করা হয়।[৮৬২]

শহর ঢাকায় জ্বালানী গ্যাস ব্যবহার করার পূর্বে সুন্দরী গাছের বৃক্ষই জ্বালানীর জন্য প্রচুর পরিমাণে ঢাকায় রপ্তানি করা হত। লোহা থামের বিকল্প হিসেবে বৈদ্যুতিক লাইন পরিবহনের জন্য সুন্দরী কাঠের থাম ব্যবহার করা হয়। খুলনা, বাগেরহাট ও যশোর এলাকার বৈদ্যুতিক সংযোগে এই কাঠের থাম ব্যবহার করা হয়েছে। নদীপ্রধান বাংলায় নদী ও খাল দিয়ে যাতায়াতের জন্য সাঁকো তৈরি করা হয় সুন্দরী কাঠ দিয়ে। এছাড়া টাঙ্গাইল (মির্জাপুর হাসপাতাল), রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুর এসব অঞ্চলে সুন্দরী কাঠের চাহিদা ছিল। গাঢ় লাল বর্ণের সুন্দরী গাছের বাকল দিয়ে রং প্রস্তুত করেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন অনেকে।[৮৬৩] সুন্দরী কাঠের নানামুখী ব্যবহার ও চাহিদার কারণে এই কাঠকে সুন্দরবনের কাঠের রাজা বলা হয়।[৮৬৪] সুন্দরী গাছের ফল পরিপক্ক হলে সেটি সিদ্ধ করে ভেতরের কষ আর পানি ফেলে এর শাঁস দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করে থাকে।[৮৬৫] সুন্দরী গাছের ছাল মাথাব্যথায় লাগানো হয়। মুণ্ডারা সুন্দরী গাছের পাতা সারহুল পূজায় ব্যবহার করে।[৮৬৬] সুন্দরী ও গেওয়া ফলের শাঁস হাঁস-মুরগীকে খাওয়ানো হয়। এছাড়া এই গাছে কাপড়ের ভালো রং তৈরি হয়। সুন্দরী গাছ থেকে রং তৈরি সম্পর্কে *সুন্দরবন সমগ্র* সাহিত্যে উল্লেখ আছে-

> *–ঠিকই বলেছিস, ঐ দ্যাখ খালের পাড়েই সুন্দরী গাছের বল্লার পাহাড়পানা। টিনের চালায় সব সার বেঁধে বসে সুন্দরী বাল্লার ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে। ঐ ছালে কি হয় জানিস? রঙ বানায়, চামড়া ট্যান করার রঙ। কতো কি দেখবি! শুধু দেখবি কেন, কতো কি শুনবি–কলকাতার পাড়ার নাম শুনবি বাঘ-বাজার, বাঘমারি, বাঘডোরা, বাঘপোতা, বাঘুইহাটি, হরিণবাড়ি–কলকাতা এক সময়ে যে সুন্দরবনই ছিল।*[৮৬৭]

---

৮৬১. ঐ।

৮৬২. ঐ।

৮৬৩. ঐ।

৮৬৪. ঐ।

৮৬৫. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, পূর্বোক্ত।

৮৬৬. ঐ।

৮৬৭. শিবশঙ্কর মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

উড়িয়্যাম Uriya-Am: ব্যাস ২ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট। নৌকা, তক্তার জন্য এই কাঠ ব্যবহার হয়। এটা সাধারণত বেশি দেখা যায় না। বাকেরগঞ্জে সামান্য পরিমানে পাওয়া যায়। ৫ থেকে ৭ ফুট খণ্ড করে এই কাঠ কিছু পরিমাণে বাজারে আনা হয়।[৮৬৮]

> *ক'দিন পরেই মোকাম হিঙ্গে গাছের কাঠ খুঁজে বেড়ায়। হিঙ্গে গাছের কাঠ ভারি পাতলা। এদেশে পাঙ্গাস বা অন্য মাছ ধরার জাল ঐ কাঠ দিয়ে ভাসিয়ে রাখে। যেন সোলায় মতো হালকা কাঠ। আটি বেঁধে বেঁধে ভেলার মতো বানিয়ে ফেললো। তার ওপর কাঁচা ডালপালা সাজিয়ে দিতেই পুরো ফাঁদ তৈরি হয়ে যায়। জলের ওপর ভেসে চলতে থাকলে, কোন ঝাঁকাল ভাঙা ডাল ভেসে আসছে বলে ভ্রম হবেই হবে।*[৮৬৯]

গর্জন কাঠঃ গর্জন বৃক্ষ (Dipterocarpus turbinatus) থেকে তৈরিকৃত তেল প্রতিমার রং উজ্জল করার জন্য ব্যবহার করে। বলা হয় কুষ্ঠ রোগের জন্য এই তেল খুব উপকারী।[৮৭০]

ওড়া বৃক্ষঃ ওড়া বৃক্ষের ফল স্থানীয় লোকজনের অম্বল আহার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৮৭১]

গোলপাতাঃ সামান্য জল বা কর্দমাক্ত স্থানে জন্ম নেয় দক্ষিণ বাংলার বহুল ব্যবহৃত গাছ গোলপাতা। গোলগাছ নাম হলেও এই গাছটি দেখতে নারিকেল গাছের মত এবং এর পাতাও গোলাকার নয়। নারিকেলের পাতার মত এর পাতাগুলি খুব বড় হয়। খড়ের ন্যায় ঘর ছাইতে এই পাতা খুবই উৎকৃষ্ট উপাদান। এই গোলগাছ থেকে সরকারের যথেষ্ট আয় হয়ে থাকে। সতীশ চন্দ্রের গ্রন্থে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে- *প্রতি সপ্তাহে সুন্দরবন হইতে অসংখ্য নৌকায় গোলপাতা বোঝাই করিয়া লইতেছে।*[৮৭২] এর পাতা দ্বারা বেশিরভাগ গৃহের ছাউনি তৈরি করা হয়। অসহায় ও দরিদ্র লোকজনের জন্য এই পাতাই গৃহ ঢাকার প্রধান উপাদান।[৮৭৩] এছাড়া নৌকার ছাউনি দেয়া হয়। প্রায় ৯০ ভাগ গৃহ গোলপাতা দিয়ে তৈরি। বনবিভাগের অনুমতিতে স্থানীয় পেশাজীবীরা নৌকাভর্তি গোলপাতা সংগ্রহ করে। এই পাতা থেকে বনবিভাগের প্রচুর আয় হয়। গোলপাতা থেকে খেজুর গাছের ন্যায় একপ্রকার মিষ্ট রস পাওয়া যায়। বলা হয় মগ জলদস্যুরা এই রস আবিষ্কার করেছে। বাওয়ালিরা কাঠ সংগ্রহে বনে থাকাকালীন এই রস প্রক্রিয়াজাত করে আহার হিসেবে গ্রহণ করে।[৮৭৪] গোলপাতার ন্যায় বহুল ব্যবহৃত হোগলা পাতা দিয়ে আসন,

---

৮৬৮. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p. 27.

৮৬৯. শিবশঙ্কর মিত্র, *সুন্দরবন সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫।

৮৭০. এফ. এম. আবদুল জলিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।

৮৭১. ঐ।

৮৭২. সতীশ চন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ-৮৮।

৮৭৩. এফ.এম. আবদুল জলিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১।

৮৭৪. ঐ।

নৌকা ও ঘরের ছাউনি, মাথাল, বেড়া ও পাটাতনে ব্যবহার করা হয়। পাটি, মাদুর ও জায়নামাজের জন্য মা'লে গাছ ব্যবহার করা হয়। উলুখড় বহুকাল থেকেই ঘরের ছাউনী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।[৮৭৫]

চিত্র-২৭: গোলপাতা বহন

উৎস The Sundarban, Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, ***Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory,*** *2019, p-71.*

সুন্দরবনের পূর্ণিমা রানীর ভাষায় -

> *সুন্দরবনে সবচাইতি হলো ঐ গাছটাই বেশি লাগে। এই যে ছিটি, গোরানের ছিটি। মানে ঘর বানধা, সবদিক দিয়ে উপকার আছে। গোলপাতাও সবচেয়ে কাজে লাগে।*[৮৭৬]

এসব অবদান ছাড়াও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সুন্দরবনের বিভিন্ন বনজ সম্পদ নানা কাজে ব্যবহার করা সম্ভব।

অন্যান্য বৃক্ষ: সুন্দরবনের আমুর বৃক্ষ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভ্রমণকারীরা জ্বালানির জন্য এই গাছ সংগ্রহ করে।[৮৭৭] পশুরের মত মজবুত কুপে নামক গাছে ভালো খুঁটি হয়। সুন্দরবনের খলসি ফুলের মধু খুব বিখ্যাত। একসময় প্রচলিত পালকির বাটের জন্য পাতলা হিঙ্গের কাঠ ব্যবহার করা হত। এছাড়া মাছ ধরার জন্য ভাসান

---

৮৭৫. ঐ।

৮৭৬. সাক্ষাৎকারদাতার নাম: পূর্ণিমা রানী, পেশা: মৎসজীবী এবং গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম: আরিফ ইন্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪/১০/২০২২, স্থান: ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, গ্রাম: মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, সময়: সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

৮৭৭. এফ.এম. আবদুল জলিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০।

কাঠ, লাঙ্গলের জোয়াল ও মইয়ের জন্য এই কাঠ ব্যবহার করা হয়।[৮৭৮] সুন্দরবনের বিভিন্ন ছোট ছোট গাছ যেমন: শ্বেতবাড়েলা, শ্বেতআকন্দ, শ্বেত বসন্ত, শ্বেত মাথাল, শ্বেতকবরী, কন্টিকেরী এসব গাছ দিয়ে ঔষধ তৈরি করা যায়। বনে বসবাসের সময় অসুস্থ হলে বাওয়ালীরা কন্টকেরী গাছের তৈরি ঔষধ ব্যবহার করে।[৮৭৯] ভেষজ গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয় "এই ধরণের আরো কত আবশ্যকীয় লতাপাতা জঙ্গলে পড়িয়া আছে, অনেকে উহার খবর রাখে না।" বগুলা ও বোরই গাছের ফল ও খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। টক সুন্দরী গাছে জ্বালানী হয়। জানা গাছ দিয়ে গৃহের সরঞ্জাম ও জ্বালানী হয়।[৮৮০]

৪.১০ সুন্দরবনের বিভিন্ন জীব জন্তুর আর্থিক অবদান:

বাঘ: বাঘ বলতেই সাধারণত ভীতির সঞ্চার হলেও মানবজাতির মহাকল্যাণে এই বাঘের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। 'বাঘ শুধু ভক্ষক না রক্ষক ও বটে'।[৮৮১] বাঘের চামড়া দিয়ে জুতা ছাড়াও পশম, গোঁফ, কেশর, দাঁত ও হাড় দিয়ে নানা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করা হয়।[৮৮২] আঞ্চলিক অধিবাসীরা বাঘের দাঁত বা হাড়, মাংস ও জিহ্বা দিয়ে নানা জটিল রোগের ঔষধ তৈরি করা সম্ভব বলে মনে করেন এবং তারা অসুস্থ হলে ঔষধ হিসেবে ব্যবহারও করে থাকেন।[৮৮৩] পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষাকারী সুন্দরবনের স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব ধরে রাখার পেছনে এই বাঘের রয়েছে অপরিসীম ভূমিকা। অসাধু ও বনদস্যুদের অবাধে প্রবেশ ঠেকানো এবং সুন্দরবনের প্রাকৃতিক প্রতিবেশ বজায় রাখার পেছনে এদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।[৮৮৪]

হরিণ: হরিণের চামড়া দ্বারা জুতা, মুসলমানদের জায়নামায ও হিন্দুদের পূজার আসন তৈরি করা হয়।[৮৮৫]

গণ্ডার: সুন্দরবনের বৃহদাকার প্রাণী গণ্ডারের শিং খুব প্রয়োজনীয়। প্রাচীনকালে মিশরীয় রাজারা বিষাক্ত পদার্থ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য গণ্ডারের শিং-কে পানীয় পাত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন।[৮৮৬]

হাঙ্গর: সুন্দরবনের জলাভূমির রাজা হাঙ্গরের তেল খুব মূল্যবান। স্থানীয়দের ভাষায় এই তেলকে বলা হয় কামটের তেল। কুমিল্লা মৎস্য গবেষণাগারের প্রচেষ্টায় হাঙ্গরের তেল দিয়ে শার্ক লিভার অয়েল ক্যাপসুল ও শার্ক লিভার

---

৮৭৮. ঐ।

৮৭৯ . ঐ।

৮৮০. ঐ।

৮৮১. ঐ।

৮৮২. ঐ।

৮৮৩. ঐ।

৮৮৪. ঐ, পৃ. ৯৪।

৮৮৫. ঐ, পৃ. ৯৬।

৮৮৬. ঐ, পৃ. ৯৮।

অয়েল অনসেনট্রেট নামক গবেষণার উদ্ভাবন করা হয়েছে। হাঙ্গরের ভেষজ ও ক্যাপসুল হজমে সহায়ক। চাকমা জনগোষ্ঠীর কাছে হাঙ্গরের শুটকি বেশ প্রিয়। এই শুটকি রপ্তানিও করা হয়। চীনাদের কাছে হাঙ্গরের পাখনা দিয়ে তৈরি স্যুপ খুব প্রিয়।

পাখিঃ আগে কলকাতায় পাখি রপ্তানি করা হতো। কলকাতায় পাখির পালক দিয়ে এক ধরণের টুপি তৈরি করা হত।[৮৮৭] ইউরোপীয়দের কাছে পাখির পয়ার খুবই মুল্যবান বস্তু। এই পয়ার দিয়ে তারা আকর্ষণীয় টুপি তৈরি করে। বলা হয় যে পূর্বে কলকাতায় পাখির পয়ার ওজনে ভরি হিসেবে বিক্রি করা হত। পূর্বে সুবদী অঞ্চল থেকে পাখির পয়ার ও পালক কলকাতায় রপ্তানি করা হলেও বর্তমানে এই ব্যবসা আর নেই।[৮৮৮]

মৌমাছি ও মধুঃ সুন্দরবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান মধু। ঔষধ ও ঔষধের অনুপ্রাণ তৈরি করা হয় মধু দিয়ে।[৮৮৯] এই মধু দেশের চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রপ্তানি করা সম্ভব। জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা প্রয়োজন। মালঞ্চ, তালপাটী, জলঘাটা, আশাশুনী, পাবলাতলা, মাদারবাড়ি, কালকেবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চল দুর্গম ও গহীন হওয়ায় এখনো সেখানে মধু সংগ্রহের সুব্যবস্থা নেই। ফলে এসব অঞ্চলের মধু অনাহরিত থেকে যায়।[৮৯০] সুন্দরবনের মৌমাছিগুলো সুবিধানুযায়ী বিভিন্ন গাছে মৌচাক তৈরি করে থাকে। ডাল বাঁকা, উচ্চতা, খোলা-মেলা পরিবেশ, আয়তনে বড় পরিসর প্রভৃতি বিবেচনায় চাক তৈরির জন্য গাছ নির্বাচন করে। সাধারণত কাকড়া, জানা, পশুর, গেওয়া, বাইন, গরান, হেন্তাল, সুন্দরী, হরগোজার, ধুন্দল প্রভৃতি গাছে মৌচাক দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত কাণ্ড ও আঁকাবাঁকা ডাল থাকায় বড় চাক ও বড় সমাজের জন্য মৌমাছিদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ কাকড়া, জানা ও পশুর গাছ। সুন্দরী গাছের ফুলে মধু না হলেও বেশ উঁচু আর শাখা প্রশাখাহীন হওয়ায় মৌমাছিদের সুন্দরী গাছ বেশ পছন্দ। সাতক্ষীরা রেঞ্জের উঁচু গাছগুলোতে অধিক মৌচাক দেখা যায়। গরানের চাক তুলনায় ছোট হয়ে থাকে। গাছের ডাল সরু থাকায় বনলেবু গাছে মৌমাছির চাক হয় না। চান্দা, গোল এসব গাছেও চাক হয় না।[৮৯১] বিভিন্ন প্রজাতি আর বর্ণের ফুল থেকে আহরিত মধুর রং ও স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। স্বাদ ও সেরা গন্ধ পাওয়া যায় খলশী ফুলের তৈরি মধুতে। অধিকাংশ ফুল থেকে আহরিত মধুর রং সাদা হয়ে থাকে। ব্যতিক্রম হিসেবে ঢালচাকার মধু লালচে, গেওয়া ফুলের মধু সোনালি রঙের, ঝাঁঝালো স্বাদ

---

৮৮৭. ঐ, পৃ. ১০৬।

৮৮৮. ঐ।

৮৮৯. ঐ, পৃ. ১০৭।

৮৯০. ঐ।

৮৯১. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, পূর্বোক্ত, ঢাকা।

ও মিষ্টিযুক্ত গরান ফুলের মধু লাল রঙের। কেওড়া ফলের ন্যায় এর ফুল থেকে আহরিত মধুও কিছুটা টক হয়ে থাকে। বাইন ও গেওয়া ফুলের মধু কিছুটা তেতো স্বাদের হয়ে থাকে।[৮৯২]

সুন্দরবনের শামুক ও সমুদ্রের ফেনায় তৈরি হওয়া 'জোংড়া' দিয়ে চুন তৈরি করা হয়। এই অঞ্চলের এরকম আরো নানা দ্রব্যাদির যথাযথ ব্যবহার ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার অতি দ্রুত স্থাপন করা প্রয়োজন।

সুন্দরবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে রাজিব আহমেদ সম্পাদিত *সুন্দরবনের ইতিহাস* গ্রন্থে। উক্ত তালিকার যথাযথ কোনো উৎস উল্লেখ না থাকলেও সুন্দরবনের জীবন-জীবিকায় সুন্দরবনের অবদানের একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।[৮৯৩]

সারণি-২৩: সুন্দরবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর তালিকা

কাজের ধরণ	শ্রমিকদের পরিচয়	শ্রমিকদের সংখ্যা	বৃহত্তর খুলনা ও বরিশালের নির্ভরশীল জনসংখ্যার সামগ্রিক সংখ্যা
১।	বাওয়ালী	১,৫০,০০০	
২।	বাওয়ালী	৮,০০০	
৩।	জাংড়াখুটা	৩,০০০	বৃহত্তর খুলনায় ৩৫,৫৭,৪১৪ জন
৪।	ছুতোর	২,০০০	বৃহত্তর বরিশালে ৩৯,২৮,৪১৪ জন
৫।	ছুতোর	১,০০০	
৬।	ছুতোর	১৫,০০০	
৭।		১,১৫,০০০	
৮।		১০,০০০ ৩,৫৪,০০০	

জোংড়া: সুন্দরবনের আরেকটি অর্থনৈতিক উৎস হলো জোংড়া। এটি এক ধরণের ঝিনুক জাতীয় প্রাণী। জোংড়া থেকে চুন তৈরি করা হয়। জোয়ারের পানিতে জোংড়া নদীর চরে, গোলফলের ডাঁটা এবং বড় গাছের কাণ্ডে লেগে থাকে। শীতের সময় বেশি জোংড়া পাওয়া যায়। ভাটার সময় জোংড়া সংগ্রহ করা হয়। জোংড়া কাটতে গিয়ে

৮৯২. ঐ।

৮৯৩. রাজিব আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮।

অনেকেই বাঘের আক্রমণের শিকার হয়। জোংড়া সংগ্রহ করে বাড়িতে এনে ধুয়ে শুকিয়ে পোড়ানো হয়। এই পোড়ানো ছাই থেকেই চুন তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী জোংড়া কখনোই বনে পোড়ানো হয় না। কাঁচা জোংড়া পোড়ালে সাঁ সাঁ করে আওয়াজ হয় এবং সেখানে সেটি ভালো করে পোড়ে না।[৮৯৪]

৪.১১ সম্ভাবনাময় বাগদা চিংড়ি ও কাঁকড়া শিল্পঃ

পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ ও সুস্বাদু হওয়ায় সুন্দরবনের কাঁকড়া বিশ্বখ্যাত। চীন, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপান প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশের কাঁকড়া রপ্তানি করা হয়। বিদেশে রপ্তানির প্রায় ৭০ ভাগ কাঁকড়া সুন্দরবনের। রাজস্বের পাশাপাশি এর মাধ্যমে সরকারের অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।[৮৯৫]

১৯৬০ দশকে দেশের দক্ষিণে অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলের ন্যায় খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলাতে জোয়ার ও লোনা পানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ধান উৎপাদনের লক্ষ্যে বেড়িবাঁধ নির্মানের ফলে বিভিন্ন আকারের বহু পোল্ডারের সৃষ্টি হয়। এ সকল পোল্ডারের অভ্যন্তরের জমিতে বৃষ্টি নির্ভর একমাত্র আমন ধান উৎপন্ন হতো এবং পানি সরবরাহের গেটের মাধ্যমে ও বাঁধ কেটে বা বাঁধ ভেঙ্গে জোয়ারের পানি প্রবেশের ফলে প্রাকৃতিক পানির সাথে ভেসে আসা অন্যান্য মাছের পোনার ন্যায় বাগদা চিংড়ির পোনা আটকে পড়তো যা চাষীগণ জাল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে আহরণ করত।[৮৯৬] স্বাধীনতার পর বিশ্ব বাজারে চিংড়ি রপ্তানি ও চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষীগন বৃষ্টি মৌসুমের আগে নদী থেকে বাগদা চিংড়ি পোনা ধরে খালের পানিতে আটকে রেখে ৪-৫ মাস পর বৃষ্টি শুরুর আগেই আহরণ করে তাদের জমিতে আমন ধানের আবাদ করতো। পর্যায়ক্রমে চাষীগন বাগদা চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পানির উর্বরতা বৃদ্ধি ও সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পিত ভাবে বাগদা চিংড়ি চাষ শুরু করে।[৮৯৭] ১৯৯০ সাল থেকে কারখানায় চিংড়ি খাদ্য উৎপাদন শুরু হয়, ১৯৯২ সাল থেকে বাণিজ্যিক ভাবে হ্যাচারিতে বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন শুরু এবং চিংড়ি চাষের উপকরণ প্রাপ্তি সহজলভ্য হওয়ায় এ এলাকার মানুষের মধ্যে একক ও সমাজভিত্তিক চিংড়ি চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ এর দশকে উপজেলায় বাগদা চিংড়ির উৎপাদন ছিল ৩,৫০০ মে.টন, যা ২০১৩ সালে ৫৭২০ মে.টনে উন্নীত হয়।[৮৯৮]

খুলনার পাইকগাছা উপজেলাতে ব্যাপক বাগদা চিংড়ি উৎপাদন হওয়ায় এ এলাকার বিশাল একটি জনগোষ্ঠী বাগদা চিংড়ি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় তাদের আর্থিক আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে বাগদা চিংড়ি উৎপাদন ও ক্রয়-

---

৮৯৪. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, পূর্বোক্ত, ঢাকা।

৮৯৫. সুন্দরবন ফ্লিপ চার্ট, উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা, পৃ. ১২, ২০০৮।

৮৯৬. *ড. আতিক রহমান, সুন্দরবন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দৈনিক সমকাল, ০১ জানুয়ারি ১৫।*

৮৯৭. *ঐ।*

৮৯৮. *ঐ।*

বিক্রয় ভূমিকা রাখে। ধনী-গরীব, অসহায়, বেকার যুবসমাজ, মহিলা সকল স্তরের মানুষ চিংড়ি চাষের উপকার ভোগ করে থাকেন।[৮৯৯] ঢাকাসহ বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই বাগদা চিংড়ি বিক্রি হয়ে থাকে। দেশের বাইরেও বাগদা চিংড়ির অনেক চাহিদা রয়েছে। বাগদা চিংড়িশিল্পে কাজ করে অনেক বেকার যুবক-যুবতী তাদের বেকারত্ব দূর করতে সক্ষম হয়।[৯০০] তবে সুন্দরবনের অস্তিত্ব এবং কৃষি চাষাবাদে এই চিংড়ি চাষ প্রক্রিয়া হুমকি স্বরূপ। তাই এই চিংড়ি চাষে বিকল্প পদ্ধতি উদ্ভাবনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

৪.১২ সুন্দরবনের মৎস সম্পদ: শুরুতে সুন্দরবনের নৌযান চলাচলযোগ্য চ্যানেলগুলোতে মাছ ধরা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং সরকারের পক্ষ থেকে তখনো কোন কর ধার্য করা হয়নি। ১৮৬৬ সালে সরকার পাঁচ বছরের জন্য সুন্দরবনের সব নদীগুলোতে মাছ ধরার জন্য নিলাম ডাকার ব্যবস্থা করে। এতে আরো বলা হয় যে, কেউ চাইলে এই নিলাম পুনরায় নিতে পারবে এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নোটিসের ছয় মাস পর যে কোন সময় আবেদন করতে হবে। পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি এই নিলাম ক্রয় করেছিল কিন্তু ১৮৬৮ সালে জেলে এবং অন্যান্য স্থানীয়দের সাথে বিভিন্ন বিতর্কের কারণে তারা নিলামটি ছেড়ে দেয়। এর ফলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সরকার ব্যক্তিগত কাউকে মাছ ধরার নিলাম অধিকার প্রদান করবে না। সুন্দরবনের ইজারাদাররা নিজ নিজ স্বত্বে মাছ ধরার অধিকার পায়। সুন্দরবন কমিশনারের রিপোর্টে দেখা যায় সে সময় প্রায় ২,৩৩৫ একর ইজারা ভূমির মধ্যে ৭৭ হাজার একর মাছের জন্য ইজারা দেয়া হয়েছিল। আরো উল্লেখ করা হয় যে, একজন ইজারাদার বছরে ৯০ পাউণ্ড আয় করেছে মাছের ব্যবসা থেকে।[৯০১] সুন্দরবনের উত্তরাংশের সকল নদ-নদী এবং এমনকি বনের ভেতরে দূরবর্তী দুর্গম স্থানেও মাছ ধরা হতে থাকে। মাছ ধরার জন্য ইঞ্জিন লাগানো নৌকাও ব্যবহার করা হতো।

মৎস আহরন: সুন্দরবন অঞ্চলে নদীতে পাঙ্গাস (Pangasius pangasius), ইলিশ (Hilsa ilisa), বাগাইর (Bagarius bagarius), চিতল (Notopterus chitala) ও বোয়াল (Wallago attu) প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া বিল ও পুকুরে কালিবাউশ, Calibaus (Labeo calbasu), রুই (Labeo rohita), কাতলা (Catla catla), মৃগেল কার্প (Cirrhinus cirrhosus), বোয়াল (Wallago attu), শোল (Channa striatus), কই (Anabas testudineus), মাগুর (Amblysceps mangois) মাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়া ধানের জমিতে ভেটকি, ভাঙ্গান, টেংড়া ও পার্সেয়া মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর যখন জমির পানি হ্রাস পেতে শুরু করে তখন কৃষকেরা এসব মাছ ধরে থাকে।[৯০২] সুন্দরবনের নদী ও খালগুলোতে প্রায় ১০০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। ভেটকি vetki (Lates calcarifer), জাবা jaba (Siganus

---

৮৯৯. *ঐ।*

৯০০. *ঐ।*

৯০১. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, opcit, p. 19.

৯০২. District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p: 7.

javus) ও বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি (Farfantepenaeus aztecus) পাওয়া যায়।[৯০৩] গোলবনের ভেতরে পায়রা, পারশে, ভাঙ্গান, গলদা ও ছাটি চিংড়ি প্রভৃতি মাছ ঝাঁকবেধে পাওয়া যায়। গোলবনের পাশে তাই অনেক জেলে মাছ ধরার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।[৯০৪]ভেটিক বা ভেকট, ভাঙন, খরকুলা, পায়রা, রুচো, কাইন বা কান, রেখা, তপশে, গুলে, ভ্যাদা, ভোলা, ট্যাপা, ট্যাংরা, চাপড়া (চাকা) হরিনা প্রভৃতি নানা জাতের চিংড়ি মাছ নদী ও খালের নোনা পানিতে পাওয়া যায়। লোনা পানির এলাকার বর্তমানে বিশেষভাবে বাগদা ও গলদা চিংড়ির ব্যাপক চাষ করা হচ্ছে। এছাড়া কাঁকড়া, কচ্ছপ, কুঁচে প্রভৃতি জলজপ্রাণী পুকুর, খাল ও জলাশয়ে দেখতে পাওয়া যায়। শ্যামনগর উপজেলায় বিশাল চাষাবাদের মাধ্যমে জমিচাষ ছাড়াও নদী এবং মৎস্য ঘের এর মৎস্য চাষের মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থ উপার্জন করে চলেছে। এছাড়া আরো অনেক ধরনের চাষাবাদের উপযোগী এই শ্যামনগর উপজেলা।[৯০৫] পানিতে ঝড়ে পড়া কেওড়া আর বাইন ফল সুন্দরবনের পাঙাশ মাছের অন্যতম খাবার। বলা হয় বেশ মোটা তাজা পাঙ্গাশ মাছ দেখে অনুমান করা যায় যে, সে বছর কেওড়ার ফলন বেশি হয়েছে এবং ফুলের আধিক্যের কারণে মধুর পরিমাণও বেশি হবে।[৯০৬] এমনকি এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন মাছের নামে বিভিন্ন স্থানের নামকরণও করা হয়েছে। যেমন- সুন্দরবন সংলগ্ন সাতক্ষীরার শ্যামনগরের বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের এক প্রাচীন গ্রামের নাম দাঁতিনাখালী। সুন্দরবনে সহজলভ্য দাঁতিনা মাছের অনুকরণে এর নাম। এই গ্রামের পাশে দাঁতিনা মাছের আধিক্য ছিল। মালঞ্চ ও চুনো খালে বেমি পাওয়া যেত। এছাড়া পারশেখালী, কৈখালী, দাঁতিনাখালী, ভেটকীখালী, চিংড়িখালী, আমাদি ও জোংড়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলের নাম মাছের নাম থেকে এসেছে। পারশে ভেটকী, চিংড়ি, আমাদী, জোংড়া এসকল মাছ সুন্দরবনের নদী ও খালগুলোতে পাওয়া যায়।[৯০৭]

বনবিভাগের জন্য মাছ একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এটি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব খাত। সুন্দরবনে মাছ ধরার মাধ্যমে অনেক দরিদ্র ও স্থানীয় জেলেদের কর্মসংস্থান হয়। জেলেরা মাছ ধরার ভিত্তিতে সরকারকে ফি প্রদান করে, পণ্য নেয় এবং প্রায়শই খোলা বাজারে বিক্রি করে। এটি সারা বছরই দরিদ্র জেলেদের জন্য স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। শীতকালে (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) চট্টগ্রামের মতো দূরবর্তী অঞ্চল থেকে জেলেরা সুন্দরবনে আসে। মাছ ধরার জন্য, অস্থায়ীভাবে কয়েক হাজার লোককে দুবলার-চর এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সুন্দরবন থেকে বছরে গড়ে প্রায় ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ টন মাছ ধরা পড়ে। ১৯৭৭ সালে মাছ ধরার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু সাম্প্রতিককালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সারা বছরই মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হতো। এটি

৯০৩. ibid.

৯০৪. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, পূর্বোক্ত।

৯০৫. আনোয়ার হোসেন, *সুন্দরবনের অবদান বছরে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা*, পূর্বোক্ত।

৯০৬. পাভেল পার্থ, বাদাবনের বিজ্ঞান, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*, পূর্বোক্ত।

৯০৭. ঐ।

একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ ছিল যে মাছের পরিমাণ কমছিল। ফলে এফডি ১৯৭৬ সালে প্রধান মাছের প্রজননের সময় মাছ ধরা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। মে থেকে জুন পর্যন্ত এই নির্দেশনা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের সাথে সাথে মাছের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।[৯০৮]

৪.১৩ সুন্দরবনের পর্যটনশিল্প: বন অনেকগুলি পরিসেবা প্রদান করে যেমন কার্বন সিঙ্ক হিসেবে কাজ করা, বিনোদন, আশ্রয়স্থল জীববৈচিত্র্য ইত্যাদি। বাংলাদেশের বনও এর ব্যতিক্রম নয়। বন যে পরিসেবাগুলি প্রদান করে, প্রায়ই অ-লক্ষ্য এবং অ-স্বীকৃত হয়। বন ভিত্তিক বিনোদন বৃহৎ আকারের নগরায়নের কারণে কম বিস্তৃত। ১৯৯০ সাল থেকে বন ভিত্তিক বিনোদনে গতি এসেছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুন্দরবন, বিশ্বের বৃহত্তম সংলগ্ন প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ এলাকা, এটি একটি প্রধান আকর্ষণ শুধু স্থানীয় দর্শনার্থীদের কাছে নয়, বিদেশিদের কাছেও। পূর্বে এর সংরক্ষিত অংশে প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সময়ের সাথে সাথে, এফডি ধীরে ধীরে ১৯৯০ সাল থেকে পর্যটনের চাহিদা লাভ করে। এফডি এখন পর্যটকদের টাকা পরিশোধ করে সুন্দরবনে প্রবেশ করতে দেয় ছোট এন্ট্রি ফি'র বিনিময়ে। যেহেতু মোটর লঞ্চের প্রয়োজন হয়, তাই এই ধরনের ভ্রমণ তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল। ২০০২ সালে এফডি করমজলে একটি ছোট 'ভিজিটর সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী বিশেষ করে স্থানীয়রা সেখানে ঘুরতে যায়। ২০০৭ সালে ৯২,০০০ এরও বেশি মানুষ এই উদ্দেশ্যে সুন্দরবন পরিদর্শন করেছিল।[৯০৯]

প্রাকৃতিক সম্পদের লীলাভূমি বাংলাদেশের রয়েছে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা। তাই এদেশের অর্থনৈতিক একটি খাত পর্যটন।[৯১০] বাংলাদেশের দর্শনীয় বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সুন্দরবন অন্যতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ অঞ্চল। অসংখ্য পশুপাখির সমাগম, গাঢ় সবুজের বৃক্ষ সমারোহ, চিত্রল হরিণসহ বিভিন্ন জীবজন্তু, পাখ-পাখালি আর কীট-পতঙ্গের সঙ্গে গোলপাতা, গাছ-গাছালি ও নানা উদ্ভিদের প্রাণবৈচিত্র্য,[৯১১] রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণ এবং পাশাপাশি বনটির রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে পর্যটকদের কাছে এটি একটি আকর্ষণীয় স্থান। সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের অখণ্ড বনভূমি। ১৯৯৭ সালে সুন্দরবন ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বিশ্ব ঐতিহ্য

---

৯০৮. Junaid K. Choudhury and Md. Abdullah Abraham Hossain, BANGLADESH FORESTRY OUTLOOK STUDY, ASIA-PACIFIC FORESTRY SECTOR OUTLOOK STUDY II, Working Paper No. APFSOS II/ WP/ 2011/ 33, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS REGIONAL OFFICE FOR ASIA AND THE PACIFIC, Bangkok, 2011, p. 34

৯০৯. *ibid*, p. 34.

৯১০. প্রকাশ ঘোষ বিধান, *সমাজ প্রকৃতির ভবিষ্যৎ রক্ষার প্রতীক হয়ে উঠুক সুন্দরবন।*
(https://www.sylhettoday24.news/opinion/details/4/402)

৯১১. *পর্যটনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সুন্দরবন*, দেশটিভি অনলাইন, ২৬ জানুয়ারি ২০১৬ (https://desh.tv/special-report/details/32432-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-)

স্বীকৃতি ও প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চার্য নির্বাচনের পর থেকে সুন্দরবন নিয়ে প্রকৃতিপ্রেমীসহ বিশ্ববাসীর সুন্দরবন দেখার আগ্রহের শেষ নেই। যার ফলে দেশি, বিদেশি প্রকৃতি-প্রেমীদের পদচারণায় মুখরিত হয় সুন্দরবন।[৯১২] সুন্দরবনে জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে সামুদ্রিক স্রোতধারা, কাদা চর এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমির লবণাক্ততাসহ ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপমালা।[৯১৩] সুন্দরবনের বিভিন্ন অবদানের পাশাপাশি আর্থিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করছে তার পর্যটনসেবার মাধ্যমে। বাংলাদেশের পর্যটন স্থানগুলোর উন্নয়নের জন্য ২০১৬ সালকে পর্যটন বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আর বাংলাদেশে পর্যটনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সুন্দরবন। বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের সৌন্দর্য দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। বন ও বন্য পশু পাখির আকর্ষণ এবং ধর্মীয় উৎসব রাসমেলা ও বন বিবির মেলা দেখতে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা সুন্দরবন ভ্রমণ করেন। বছরে সুন্দরবনের পর্যটন খাত থেকে আয় হয় ৪১৪ কোটি টাকা। সুন্দরবনের পর্যটন সম্ভাবনা নিয়ে বলা হয়-

> *সুন্দরবন হতে পারে দেশ তথা বিশ্বের অন্যতম পর্যটন শিল্প। সুন্দরের রানী সুন্দরবন ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদলায়। খুব ভোরে এক রূপ, দুপুরে অন্যরূপ, পড়ন্ত বিকাল আর সন্ধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন রুপে সজ্জিত হয়। মধ্য ও গভীর রাতে অন্যএকরূপ। আমাবস্যায় ভয়াল সুন্দর আবার চাঁদনী রাতে নানান রূপ ধারণ করে সুন্দরী সুন্দরবন পর্যটকদের বিমহিত করে। বনের ভয়ংকরতা, বাঘের গর্জন, হরিণের চকিত চাহনি। বানর আর হরিণের বন্ধুত্ব, কুমিরের কান্না, পাখ পাখালির কলতান, শ্রবণ সুখ, বনের বিভিন্ন বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর নৈসর্গিক দৃশ্য। আবার অশান্ত পানির বুকে উত্তাল ঢেউয়ের উন্মাদ নৃত্য অবলোকন করে পর্যটক উল্লাসিত, বিমোহিত ও আপ্লুত হয়।*[৯১৪]

পর্যটন খাত থেকে সুন্দরবনের আয়ের প্রধান খাত হলো দর্শনার্থীদের (পর্যটক, তীর্থযাত্রী ও গবেষক) কাছ থেকে প্রবেশ ফি আদায়। বন বিভাগ এই অর্থ আদায় করে থাকে। এছাড়াও সুন্দরবনের ভেতর ঘোরাফেরা, খাবার ও বাসস্থান বাবদ বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানও আয় করে থাকে।[৯১৫] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় সুন্দরবনের পর্যটন খাতের অবদান নির্ণয়ে জরিপ এলাকার মোট ৪২৫ জন পর্যটক ও তীর্থযাত্রীর সাক্ষাৎকার নিয়ে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে ৮৭ দশমিক ৬ শতাংশ দেশি ও বাকি ১২ দশমিক ৪ শতাংশ বিদেশি পর্যটক। গড়ে এসব পর্যটকের প্রতিজনের কাছ থেকে মাসে আয় হয় ৬৫ হাজার ৭৪৬ টাকা। জরিপে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, পর্যটকদের মধ্যে ৮১ শতাংশই প্রথমবারের মতো সুন্দরবন ভ্রমণে আসেন। ৫৯ দশমিক ১ শতাংশ পর্যটক আসেন

---

৯১২. ঐ।

৯১৩. *জাতীয় অর্থনীতিতে সুন্দরবনের অবদান*, রেজাউল করিম খোকন, *দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ*, ২ জানুয়ারি ২০২৩।

৯১৪. প্রকাশ ঘোষ বিধান, *সমাজ প্রকৃতির ভবিষ্যৎ রক্ষার প্রতীক হয়ে উঠুক সুন্দরবন।*
(https://www.sylhettoday24.news/opinion/details/4/402)

৯১৫. আনোয়ার হোসেন, *সুন্দরবনের অবদান বছরে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা*, পূর্বোক্ত।

শুধু চিত্তবিনোদনের জন্য। আর ১২ দশমিক ৪ শতাংশ আসেন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে।[৯১৬] ২০১৩ সালে সুন্দরবনে দেশি-বিদেশি মিলিয়ে পর্যটক আসেন এক লাখ ৫৫ হাজার ৩১৭ জন। ২০১৪ সালে এক লাখ ৫৪০ জন। আর ২০১৫ সালে এক লাখ ৮১৭ জন।[৯১৭]

অপরিমেয় সৌন্দর্যের এ দেশে বিদেশিদের ভ্রমণে আকৃষ্ট করে বিভিন্ন ধরণের সেবা ও সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। সুন্দরবন হতে পারে দেশ তথা বিশ্বে অন্যতম পর্যটন শিল্প।[৯১৮] সুন্দরবনের সাংস্কৃতিক মূল্য বা পর্যটন খাতে সমৃদ্ধির জন্য সুন্দরবনের ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সমন্বিত উন্নয়ন প্রয়োজন। এছাড়া পর্যটন মতামতে বলা হয় যে-

> *সুন্দরবনে প্রকৃতিনির্ভর স্থিতিশীল পর্যটনের জন্য কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটিসহ (সিএমসি) সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বাংলাদেশ বন বিভাগকে এই উন্নয়নের কাজ করতে হবে। এছাড়াও, পর্যটকদের সংখ্যা ন্যুনতম পর্যায়ে নিতে সুন্দরবনে প্রবেশ ফি বাড়ানো, বন্যপ্রাণী আইন-১৯৭৪ অনুযায়ী বাসস্থান স্থাপনের উদ্দেশ্যে বনের ভেতর কোনও অবকাঠামো নির্মাণ না করা এবং ট্যুর অপারেটরদের মাধ্যমে গ্রাহকদের ভালো সেবা নিশ্চিত করতে খুলনায় একটি 'ইকো ট্যুরিজম ট্রেনিং সেন্টার' স্থাপন*[৯১৯]

তবে উদ্বেগের বিষয় সুন্দরবন কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্প বিকশিত হচ্ছে না। ব্যাঘাতের রাজনৈতিক কারণ সহ বনদস্যু চক্রের উপদ্রব, অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা আর বন বিভাগের উদাসীনতা সুন্দরবন কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্প বিকশিত না হওয়ার অন্যতম কারণ। পর্যটন কর্পোরেশনে নিজস্ব অফিস ও তথ্য কেন্দ্র না থাকায় বিদেশি পর্যটকরা সুন্দরবন ভ্রমণ থেকে বিমুখ হয়ে থাকেন। পর্যটনের জন্য যাতায়াত সুবিধা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়গুলি খুব জরুরি। পর্যটন শিল্পে বিদ্যমান সমস্যা সমূহ সমাধান করা এবং উপযুক্ত পর্যটন পরিবেশ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হতে পারে।[৯২০]

দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা উপেক্ষা করে প্রতি বছরই সুন্দরবনে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য অনেক আগেই পর্যটন নীতিমালা করা হয়েছে। নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে, সুন্দরবন ও কক্সবাজারের জন্য নেয়া হবে মহাপরিকল্পনা। পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে ৪টি আধুনিক পর্যটন কেন্দ্রসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। সুন্দরবনে দেশি বিদেশি

---

৯১৬. ঐ।

৯১৭. *পর্যটনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সুন্দরবন* ,দেশটিভি অনলাইন, ২৬ জানুয়ারি ২০১৬ (https://desh.tv/special-report/details/32432-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-)

৯১৮. প্রকাশ ঘোষ বিধান, *সমাজ প্রকৃতির ভবিষ্যৎ রক্ষার প্রতীক হয়ে উঠুক সুন্দরবন*, পূর্বোক্ত।

৯১৯. আনোয়ার হোসেন, *সুন্দরবনের অবদান বছরে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা*, পূর্বোক্ত।

৯২০. প্রকাশ ঘোষ বিধান, *সমাজ প্রকৃতির ভবিষ্যৎ রক্ষার প্রতীক হয়ে উঠুক সুন্দরবন*, পূর্বোক্ত।

পর্যটকদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় সুন্দরবনের করমজল, হারবাড়িয়া, চাঁদপাই ও শরণখোলা এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নামে একটি প্রকল্প রয়েছে। বিশ্ব প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চার্য নির্বাচনের পর থেকে সুন্দরবন নিয়ে প্রকৃতিপ্রেমীসহ বিশ্ববাসীর সুন্দরবন দেখার আগ্রহের শেষ নেই। যার ফলে দেশি-বিদেশি প্রকৃতিপ্রেমীদের পদচারণায় মুখরিত হচ্ছে সুন্দরবন। সুন্দরবন হতে পারে বিশ্বসেরা সম্পদ। এর ফলে বনের সুরক্ষার কাজ হবে শক্তিশালী। উপকুল এলাকার লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। অবহেলিত জনপদে প্রাণচাঞ্চল্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। বিকশিত হবে পরিবেশবান্ধব পর্যটন শিল্প। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার যে সুযোগ আমাদের হাতের নাগালে রয়েছে সেগুলো কাজে লাগানো জরুরি। যদি এটি সম্ভব হয়, তাহলে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে বদলে যাবে দেশের অর্থনীতি। বিশ্বের পর্যটকদের আগমনে বৃদ্ধি পাবে বৈদেশিক মুদ্রা যা দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।[৯২১] তবে বিভিন্ন কারণে সুন্দরবনও হারাতে বসেছে তার নিজস্বতা। বন এলাকা সংকুচিত হয়ে পড়ছে। মূল আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যাও কমছে।

৪.১৪ সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষিঃ সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতির অবদান তুলনামূলকভাবে নিম্নমুখী। প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে। উজান থেকে পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায়, পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও চাষাবাদ পদ্ধতি প্রক্রিয়ায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েও কাঙ্ক্ষিত ফল ততটা আসেনি যতটা অশস্য অর্থকরী খাতে অর্থাৎ মৎস্য চাষসহ প্রাণিসম্পদ চাষ ও বিকল্প পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে এসেছে। অশস্য খাতে ব্যাপক সাফল্যের ফলে কৃষি থেকে গড়পরতায় জিডিপিতে এখনো সমানুপাতিক হারে অবদান (২৫%-২৩%) রেখে চলেছে এই অঞ্চল। তবে অশস্য খাতের এই সাফল্যকে টেকসই করা যেমন প্রয়োজন একই সঙ্গে শস্য উৎপাদনে, জমির সঠিক ব্যবহারে, উপায় উপাদান সরবরাহে, চাষ পদ্ধতিতে আধুনিক প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটানোয় এবং এমনকি ভূমি প্রশাসনেও সংস্কার আবশ্যক।[৯২২]

৪.১৫ উপসংহারঃ

সম্ভাবনাময় সুন্দরবন দেশের অন্যতম অর্থনৈতিক খাত। এর জন্য প্রয়োজন দেশের সঠিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। সুন্দরবনে গড়ে তোলা যায় পরিবেশবান্ধব ইকো ট্যুরিজম। এছাড়া সুন্দরবন রক্ষায় জাতীয় তহবিল গঠন করা, বনের ওপর নির্ভরতা কমাতে আশপাশের জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক বিকল্প জীবিকার উদ্যোগ গ্রহণ করা, পর্যটনভিত্তিক গ্রাম গড়ে তোলা, তাদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা, পর্যটকদের প্রবেশ ফি

৯২১. প্রকাশ ঘোষ বিধান, *সমাজ প্রকৃতির ভবিষ্যৎ রক্ষার প্রতীক হয়ে উঠুক সুন্দরবন।* (https://www.sylhettoday24.news/opinion/details/4/402)

৯২২. ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সুন্দরবনঃ পারস্পরিক প্রভাব, দৈনিক ভোরের কাগজ, শুক্রবার, ২৭ জানুয়ারি ২০২৩, ১৩ মাঘ ১৪২৯।

বাড়ানো, নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া স্পর্শকাতর প্রতিবেশ ও পরিবেশের এলাকাগুলোতে পর্যটকদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা, ধারণের অতিরিক্ত পর্যটক যাতে সুন্দরবনের পর্যটন স্পটগুলোতে প্রবেশ করতে দেওয়া না হয় তার ব্যবস্থা করা, কৃত্রিম অবকাঠামো না বানিয়ে বনের আকার বাড়ানো, চিংড়ির ঘের বাড়তে না দেওয়া এবং বনাঞ্চল রক্ষায় বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ করা প্রয়োজন।[৯২৩] তাই বলা হয় *জাতীয় অর্থনীতিতে সুন্দরবনের অসামান্য অবদানকে কাজে লাগাতে হবে। সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলায় সুন্দরবন নানাভাবে রসদ জোগাবে-*[৯২৪]

এছাড়া লক্ষণীয় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চল, এর অবকাঠামো এবং বসবাসকারী জনগণের অর্থনৈতিক জীবন নানা দৈব-দুর্বিপাক, বৈষম্য, অবহেলা আর অমনোযোগিতার শিকার।[৯২৫] জাতিসংঘের নেতৃত্বে ২০১৫ সালে পৃথিবীর ১৯৫টি দেশ ১৭টি স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমালা নির্ধারণ করেছে। এটাকে এখন 'এজেণ্ডা-২০৩০' বলা হচ্ছে। সমাজের সবস্তরের উন্নয়নের মাধ্যমে একটি ন্যায়বিচার ও সাম্যভিত্তিক পৃথিবী গড়ার দিকে অগ্রসর হওয়াটাই হল স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন। প্রাণ-প্রকৃতি, প্রতিবেশ-পরিবেশ সম্পূর্ণ অক্ষত রেখে এই উন্নয়ন হতে হবে। এখানে প্রথমত গুরুত্ব পাবে পরিবেশ; দ্বিতীয়ত, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য; আর তৃতীয় হল উন্নয়ন।[৯২৬] টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমালার ১৭টি গোল (লক্ষ্য) রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৩ নম্বরে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার পরিকল্পনা থাকতে হবে। ১৪ নম্বর লক্ষ্যে বলা হয়েছে, সমুদ্রের নিচের জলজ প্রাণীদের আমরা রক্ষা করব। ১৫ নম্বরে বলা হয়েছে স্থলবাসী প্রাণীদের সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করার কথা। ১৬ নম্বর লক্ষ্যটি বেশ আগ্রহোদ্দীপক। এতে বলা হয়েছে, বিশ্বে শান্তি ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা। ১৭ নম্বরে বলা হয়েছে, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে আমরা বন্ধুত্ব ও অংশীদারত্বমূলক সম্পর্ক দৃঢ় করব।[৯২৭]সুন্দরবন প্রসঙ্গটিও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমালার সঙ্গে যুক্ত। কারণ স্থল ও জলজ প্রাণী রক্ষা ও পরিবেশের বিষয়টি এর সঙ্গে জড়িত। সুন্দরবন একটা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট (বাদাবন)। ম্যানগ্রোভ বনকে বলা হয় সবচেয়ে বেশি জৈবিকভাবে উৎপাদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র।[৯২৮] তাই দেশের অন্যতম অর্থনৈতিক খাত এবং বাস্তুতন্ত্রের আধার এই সুন্দরবন রক্ষায় এবং টেকসই স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য যথাযথ রাজনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। যদিও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' বা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি হলো ২১০০ সালকে সামনে রেখে, আগামী ৮৫ বছর ধরে বাংলাদেশের সব ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনার মহাপরিকল্পনা। 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০'এ বলা আছে যে, এটি হবে

---

৯২৩. রেজাউল করিম খোকন, *জাতীয় অর্থনীতিতে সুন্দরবনের অবদান*, *পূর্বোক্ত*।

৯২৪. *ঐ*।

৯২৫. ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সুন্দরবন*: পারস্পরিক প্রভাব, পূর্বোক্ত।

৯২৬. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন এবং সুন্দরবনের ভবিষ্যৎ*, বিডিনিউজ, ২২ মার্চ ২০১৭।

৯২৭. *ঐ*।

৯২৮. *ঐ*।

অংশীদারিত্বমূলক অর্থাৎ সকলকে সঙ্গে নিয়ে বাস্তবায়ন করা হবে। সুন্দরবন নিয়ে ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় যেসব কথা আছে, তা মূলত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা। কোথায় পোল্ডার বসাতে হবে, কোথায় বাঁধ দিতে হবে, কোথায় নদী খনন করতে হবে- এসব বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।[৯২৯] ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় বাংলাদেশকে ছয় বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হল সচল ব-দ্বীপ বা উপকূলীয় এলাকা, সুন্দরবনও এর মধ্যে পড়ে।[৯৩০]

বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা আমাদের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, দারিদ্র্য পরিস্থিতি এবং মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে জড়িত। একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রম, শিল্পায়ন, নগরায়ন, কৃষির আধুনিকায়ন, পানির অব্যবস্থাপনা ও সেচ প্রযুক্তি তথা রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নানা প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভাণ্ডারকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা-বাণিজ্য, অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্প বর্জ্য নির্গমন এবং মাত্রাতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ বাংলাদেশের পরিবেশ সমস্যাগুলোকে গভীরতর করেছে। উপযুক্ত জাতীয় নীতি, আইনের অভাব এবং এগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়কে আরও ত্বরান্বিত করেছে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত (বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, খরা, উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা তথা ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ) পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু বিপন্ন দেশগুলোর অন্যতম করেছে।[৯৩১]তাই সুন্দরবন অঞ্চলকে কীভাবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা যায়, বনের বৈচিত্র্য রক্ষা করে তাকে ব্যবহার করে কীভাবে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়, এ সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পরিবেশের ক্ষতি করে আয় বাড়িয়ে নয়; বরং সুন্দরবনকে রক্ষা করে আয় বাড়ানো উচিত।[৯৩২]

---

৯২৯. ঐ।

৯৩০. ঐ।

৯৩১. ড. আতিক রহমান, *সুন্দরবন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা*, পূর্বোক্ত।

৯৩২. *ঐ।*

অধ্যায়-পাঁচ

উপসংহার

৫.১ প্রাককথন: সুন্দরবন শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে না; বরং এটি এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকেও রক্ষা করে। একই সঙ্গে স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকার জোগান দেয় এ বন। একারণেই এ অনন্য অরণ্য রক্ষার জন্য বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ব্যাপক হারে বন ও বনজ সম্পদ ক্ষয় হচ্ছে। ইউনেস্কো ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক পরিচালিত জরিপে ১৯৭৬ ও ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ মোট ভূখণ্ডের যথাক্রমে ১০.৫ শতাংশ ও ৯.০ শতাংশ। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং ইউএনইপি'র তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতিবছরে গড়ে প্রায় ০.৮৩ শতাংশ হারে বন উজাড় হচ্ছে।[৯৩৩]

অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও বন উজাড় হচ্ছে শত শত বছর ধরে। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দেশের বন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু বন এলাকা পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা সীমিত। যদিও ২০০০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে গাছের ছাউনির আচ্ছাদন সামান্য বৃদ্ধি পেলেও প্রাকৃতিক বন এলাকা দ্রুত হ্রাস পেয়েছে।[৯৩৪] বনজ এলাকা বৃদ্ধি, বনজ পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বিশালাকার ব্যবধান রয়েছে।[৯৩৫] বৃক্ষ ও বনজ সম্পদের অবস্থা সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে খুবই সীমিত তথ্য রয়েছে। মানুষের বসতি, কৃষি, শিল্প, কাঠ ও জ্বালানি কাঠ এবং জমির ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন বন উজাড় এবং বন ধ্বংসের জন্য মূলত দায়ী। অধিকাংশ অতিরিক্ত জনসংখ্যা, দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব এবং অভাবের কারণে সৃষ্ট শিল্পায়ন এবং কৃষির জন্য অনিয়ন্ত্রিত দখল, অবৈধ লগিং বনের ক্ষতির কারণ তথা বন উজাড়ের অন্যতম কারণ। সুন্দরবন এবং উপকূলীয় অঞ্চলের বন চিংড়ি চাষ, কীটনাশক এবং তেল ছড়িয়ে পড়া সংক্রান্ত দূষণের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে টিকে আছে। পণ্যবাহী জাহাজ থেকে তেল ছড়িয়ে পড়ার কারণে সুন্দরবন হুমকির মুখে পড়েছে। বিভিন্ন কারখানা, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, বর্জ্য এবং দূষণ জলের গুণমানকে প্রভাবিত করে এবং ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলছে নিয়মিত।[৯৩৬]

---

৯৩৩. Banglapedia, forest and forestry, cited 16-12-2019

৯৩৪. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, 2019, p: 9-10.

৯৩৫. '38 tigers died in 20 years in Sundarbans', Prothom Alo English, 14 Jul 2020. (https://en.prothomalo.com/environment/38-tigers-died-in-20-years-in-sundarbans)

৯৩৬. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, opcit, p: 9-10.

সুন্দরবনকে ঘিরে আলোচনা, বিতর্কের ঝড় বইছে অনেকদিন থেকেই। ২০০৭ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডর সুন্দরবনের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেছিল। ইউনেস্কোর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সিডরে সুন্দরবনের শতকরা ৪০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে অনেক পশু-পাখি প্রাণ হারায়। প্রচুর গাছপালা নষ্ট এবং ধ্বংস হয়েছে। ২০১৪ সালে তেলবাহী ট্যাংকার সুন্দরবনের শ্যালা নদীতে ডুবে গেলে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল শ্যালা নদী দিয়ে সমগ্র সুন্দরবনে ছড়িয়ে পড়ে। এতে করে সুন্দরবনের জীববৈচিত্রের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে।[৯৩৭]

বন উজাড় এবং বন উজাড়ের প্রভাব প্রায়ই প্রকৃতির উপর পড়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত লগিংয়ে স্থগিতাদেশ থাকা সত্ত্বেও,পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃক্ষ নিধনের ফলে বনভূমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাতের সাথে সাথে মাটির ব্যাপক ক্ষয় ও ভূমিধ্বস হয়েছে। ঝড় ও ঘূর্ণিঝড়ের সংমিশ্রণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক বিরূপ প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, মিঠা পানির প্রবাহ কমে যাওয়া, বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের কারণে জলজ উদ্ভিদ ও মানুষ বিশুদ্ধ জল সরবরাহ থকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশে সুন্দরবনের হুমকির সম্মুখীন এরকম গাছ চিহ্নিত করার জন্য IUCN ২০১৮ সালে লাল তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল (IUCN)।[৯৩৮] নিম্নে সে তালিকা উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি-২৫: হুমকির সম্মুখীন বৃক্ষপ্রজাতির ঘনত্ব

Common name	Scientificname	Global Red List status	Bangladesh status	Density (stem/ha)	Distribution by zone (stem/ha)				
					CZ	HZ	SZ	SuZ	VZ
Boilam	*Anisoptera Scaphula*	Endangered	Conservation Dependent[3]	0.01		0.07			
Sundri	*Heritiera Fomes*	Endangered		52.49		1.54		1743.57	
Titpasing	*Aglaia Chittagonga*	Vulnerable	Conservation Dependent[3]	1.07	4.08	1.72	3.28		0.75
Telsur	*Hopea Odorata*	Vulnerable	Least Concern[3]	0.12		0.90			0.01

Source: Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, **Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory,** 2019, p: 93.

৯৩৭. রেজাউল করিম খোকন, দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ, ০২ জানুয়ারি ২০২৩. https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/editor-choice/37354

৯৩৮. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, opcit, p: 91.

এছাড়া বন বিভাগের আর্থ-সামাজিক সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ৭৮% বনভূমি এবং ৫৬% অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাঘাত ঘটে। উপকূলীয় অঞ্চলে, ঘূর্ণিঝড় ৫৭.৭% ভূমিকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে উত্তরণের জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে গাছের আচ্ছাদন উপকূলীয় অঞ্চলে বৃক্ষ রোপন বৃদ্ধি করা হচ্ছে।[৯৩৯]

৫.২ সুন্দরবন সীমা হ্রাসে মানব সৃষ্ট কারণ: বনভূমি হ্রাসে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ক্যানোপি রোগ, মিঠা পানির প্রবাহ কমে যাওয়া, এবং প্রাকৃতিক ব্যাঘাত প্রত্যক্ষ কারণ। পাশাপাশি উপকূলীয় বন, সুন্দরবনের বা সকল ধরনের বনের উজাড় এবং বন ধ্বংসের কিছু পরোক্ষ কারণ কার্যকর থাকে। অকার্যকর শাসন এবং দুর্বল নীতিগত সিদ্ধান্ত, অতিরিক্ত জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, জমি ব্যবহারের পরিকল্পনার অভাব, অনিশ্চিত জমির মেয়াদ, বন বিভাগের অপর্যাপ্ত তহবিল ও দুর্বল নীতি অন্তর্ভুক্ত। সিদ্ধান্ত, ক্রস-সেক্টরাল (আন্তঃ এজেন্সি) যোগাযোগ এবং পরিকল্পনার অভাব, এবং টপ-ডাউন ম্যানেজমেন্ট বনাম আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থাপনা নীতি যা সরকারের রাজস্বের ক্ষেত্রে কম করের ভিত্তির দিকে পরিচালিত করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রতি সরকারের উদাসীনতা, এর পরিবর্তে শিল্প বিকাশের প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রভৃতি দায়ী। নিম্নে এসব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

অত্যধিক জনসংখ্যা: এর ফলে বনের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। কারণ প্রান্তসীমায় বসবাস করা সাধারণ জনগণ বাস্তুতন্ত্রের ন্যূনতম পরিসেবার সন্ধান করে থাকে। সাধারণত তাদের প্রতি সরকারের অবমূল্যায়নের ফলে, বিশুদ্ধ জল, জ্বালানী কাঠ, আশ্রয়, এবং জীবিকা নির্বাহ। নগদ বিক্রির জন্য খাদ্য ও কাঠের পণ্যের জন্য তারা বনের উপর নির্ভর করে থাকে। জীবিকার জন্য বন নির্ভরতার বিকল্পের অভাব বন উজাড় ও অবক্ষয়কে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বেশিরভাগ বনাঞ্চলে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত বসবাসের জমির অভাবের কারণে, লোকেরা অনিয়ম করে এবং জমি দখল করে, এবং এটি বন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সংরক্ষিত এলাকা কর্মসূচি এবং লগিং নিষিদ্ধের ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ।[৯৪০] তাই, বন শাসনকে আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা, ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনা, ইকোসিস্টেম পরিসেবার মূল্য এবং বন পরিবর্তন এড়াতে ভূমি মেয়াদ ব্যবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে। একই সাথে একটি সঠিক টেকসই বনব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। নারীদের সাধারণত জমির উপর মালিকানা থাকে না (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ২০১৪) এবং তাদের প্রায়ই জমির উপর পর্যাপ্ত আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয় না যদিও তারা অনেক পণ্য ব্যবহার করে (আগুন কাঠ, অ-কাঠ বন পণ্য)। সংক্ষেপে, তারা পুরুষদের

৯৩৯. *ibid*, p: 150.

৯৪০. UN-REDD, Bangladesh National Program. 2016, Drivers of Deforestation and Forest Degradation in Bangladesh: Final report. UN-REDD Bangladesh National Program, 10 January 2017, P.75-78.

মতো একই ভূমিকা পালন করে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় না এবং আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় না। এটিও পরিবর্তিতভাবে, সংরক্ষণ বা পুনঃবনায়নে বাধা হিসাবে কাজ করতে পারে।[৯৪১]

> *The very high population and low ratio of land to people remains a critical indirect driver of unsustainable forest resources use in Bangladesh, and has been recognized by the Government and numerous authors. Overpopulation is manifested in extreme poverty, unsustainable resource use, subsistence living, lack of education, and illegal activities, among a host of other social problems related to government services. Past migration policies to alleviate overpopulation in some places, by encouraging people to move to less-populated regions, have resulted in severe damage to the forest ecosystems in the Chittagong and Hill Tracts region.* [৯৪২]

দারিদ্র্যঃ দারিদ্র্য একইভাবে বনায়নে অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করে। নিরক্ষরতা দরিদ্র জনগণের জন্য বিকল্প জীবিকার সন্ধানের পথ সীমিত করে কারণ তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যান্য অর্থনৈতিক বিকল্প অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সরঞ্জামগুলির অভাব রয়েছে।[৯৪৩] তাদের সামাজিকভাবে নির্ধারিত ভূমিকা এবং বিধি নিষেধ এমনকি বাংলাদেশের নারীরা দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসের জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। তারা শ্রমবাজার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ভূমি ও অর্থের মতো সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণে সীমিত প্রবেশের সম্মুখীন হয়।[৯৪৪] খুব দরিদ্র মানুষ, শিক্ষা এবং বিকল্প জীবিকার অভাবে, জীবিকা নির্বাহের জীবনযাপনের জন্য বনাঞ্চলে চলে যায়। লাখ লাখ বাংলাদেশি তাদের বেঁচে থাকার জন্য, খাদ্য, জ্বালানি কাঠ এবং অবৈধভাবে কাটা গাছের নগদ অর্থের উৎস হিসেবে সরাসরি বনের ওপর নির্ভরশীল। যাই হোক না কেন, বনে বসবাসকারী অসংখ্য মানুষ এখনও তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে পারে না।[৯৪৫] বনবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় বলা হয়-

> *Poverty is manifested in the same ways that is overpopulation. Illiteracy limits the options for poor people because they lack the fundamental tools required to pursue other economic alternatives to subsistence living. And because of their socially prescribed roles and norms, women in Bangladesh are particularly vulnerable to*

---

৯৪১. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, opcit, p: 14.

৯৪২. *ibid,* p: 14.

৯৪৩. UN-REDD, Bangladesh National Program. 2016, Drivers of Deforestation and Forest Degradation in Bangladesh: Final report, opcit, P.75-78.

৯৪৪. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, opcit, p: 9-10.

৯৪৫. ibid, p: 15.

living in poverty. They face large inequalities in the labour market, decision making processes, education and health as well as have limited access to control over resources, such as land and finances. Very poor people, in the absence of any possibility for education and alternate livelihoods, move to forested areas to live a subsistence lifestyle, all the while continuing to degrade the very resources they moved there to obtain. Millions of Bangladeshis are dependent directly on forests for their survival, for foods, fuelwood, and as a source for cash for trees illegally cut. Regardless, numerous people living in forests still cannot meet their nutritional requirements. [৯৪৬]

জনসংখ্যার ঘনত্ব বা রাস্তা ও জলপথের পার্শ্ববর্তী বনসীমা: রাস্তা এবং জলপথের চারপাশের বনাঞ্চলে প্রধান সড়ক এবং নৌ-পথের উভয় পাশে এক কি.মি. এলাকা অবৈধ লগারদের জন্য খুব সহজলভ্য বলে বিবেচিত হয়। কারণ এর ফলে লগের চলাচল এবং পরিবহন সহজ হয়। যদিও এই চলাচলের সুবিধা বনবিভাগের কর্মকর্তাদের টহল এবং পর্যবেক্ষণের সহজতা প্রদান করে, তবে প্রয়োগকারী ক্ষমতার অভাব অবৈধ লগারদের জন্য যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করে।[৯৪৭] বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে ৩০ শতাংশেরও বেশি বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার ৭২.৬৫% বড় জনপদ এবং রাস্তার ১ কিলোমিটার বাফার থেকে দূরে। *population density (in 2015) was negatively correlated with percent tree cover, meaning that more populated areas have lower tree cover.* সুন্দরবন অরণ্য উজাড় এবং অবক্ষয় উভয়েরই প্রধান পরোক্ষ চালক ছিল দুর্বল প্রশাসন (ব্যবস্থাপনা) এবং নীতি, যা অত্যধিক অবৈধ কাঠ কাটা, দখল (বা জমি দখল) উভয়ের কারণেই বন উজাড়ের এবং বনভূমির ক্ষয় দিকে পরিচালিত করে। বর্ধিত লবণাক্ততা (মিঠা পানির প্রবাহ হ্রাস) এবং সুন্দরবনের বাইরে চিংড়ির খামার ও খামার থেকে দূষণ এবং অবৈধ লগিং প্রভৃতি সুন্দরবনের অস্তিত্বেও জন্য হুমকিস্বরূপ।[৯৪৮]

টেকসই বন ব্যবস্থাপনার অভাব: সরকার দৃশ্যত টেকসই বন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হয়েছে। পরিবেশবিদদের মতে ম্যানগ্রোভ বনের জন্য বিশেষ কর্মীদের অভাব, কার্যকরভাবে বনগুলি পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ক্ষমতার অভাব বনের সীমাকে আরো হ্রাস করে। বন ব্যবস্থাপনা নীতি, কারিগরি জ্ঞানের অপর্যাপ্ত প্রয়োগ এবং বন বিভাগের জন্য বরাদ্দ অপর্যাপ্ত বাজেট, যথেষ্ট কর্মীর অভাব এবং প্রভৃতি টেকসই বন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাধা প্রদান করে থাকে।[৯৪৯]

---

৯৪৬. *ibid*, p: 15.

৯৪৭. *ibid*, p: 9-10.

৯৪৮. *ibid*, p: 9-10.

৯৪৯. UN-REDD, Bangladesh National Program. 2016, Drivers of Deforestation and Forest Degradation in Bangladesh: Final report, opcit, P:55.

The government has apparently been unable to institute sustainable forest management, according to many of the published studies, including the lack of an implemented criteria and indicators framework. Further, the lack of specialised staff, such as marine and freshwater ecologists for mangrove forests, severely limits the technical capacity required to effectively manage the forests. Insufficient application of forest management policy and technical knowledge is coupled with an inadequate budget allocated to the Forest Department, resulting in not enough staff and an inability to implement sustainable forest management, despite the good policies in place. Nevertheless, top-down rather than inclusive forest management planning has led to forest plan implementation problems and local resentment.

ক্রস-ডিপার্টমেন্ট সেক্টরাল বা আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শের অভাব: ক্রস-ডিপার্টমেন্ট সেক্টরাল পরামর্শের অভাব বাংলাদেশে বন সংরক্ষণকে প্রভাবিত করে। এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং গুরুতর সমস্যা। অনেক সরকারী নীতি, যেমন অতীতের জনসংখ্যার স্থানান্তর, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন এবং রাস্তা বসানো, বন কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ ছাড়াই বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে বনাঞ্চলের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।[৯৫০] উদাহরণস্বরূপ, পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে, সরকারী স্থানান্তর নীতির অধীনে জনগণের আগমনের ফলে জুম চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা যথেষ্ট পরিমাণে বনাঞ্চল হ্রাস করেছে এবং ইকোসিস্টেম পরিসেবাগুলিকে হ্রাস করেছে। পার্বত্য বনাঞ্চলে বাঁধ, সাল বনাঞ্চলের রাস্তা, সামরিক স্থাপনা এবং প্রভৃতি বনাঞ্চলে পানির প্রবাহ কমিয়েছে, দূষণের ফলে বনজ এলাকা বৃদ্ধিও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এমন প্রকল্পসহ অনেক উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে সুন্দরবনের উপর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একারণে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন সংরক্ষিত এলাকাটিকে তার 'সবচেয়ে বিপন্ন স্থানের' তালিকায় রাখারও উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে।[৯৫১]

The lack of cross-department sectoral consultation is a long-standing and serious problem affecting forest conservation in Bangladesh. Many government policies, such as past population relocations, establishment of military bases, and road placement, implemented without consultation with forestry officials, have had a tremendous impact on forest area. [৯৫২]

৯৫০. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, opcit, p: 13.

৯৫১. UN-REDD, Bangladesh National Program. 2016, Drivers of Deforestation and Forest Degradation in Bangladesh, opcit, P.60-62.

৯৫২. ibid, P.81.

সঠিক ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনার অভাব: সঠিক ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনার অভাবকে অসংখ্য গবেষক একটি প্রধান পরোক্ষ কারণ হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন। দুর্বল ভূমি ব্যবস্থাপনার ফলে বনের ক্ষতি এবং অবক্ষয় ঘটে। অপর্যাপ্ত এবং অনুপযুক্ত ভূমি রেকর্ড ভূমির মেয়াদ এবং জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অসুবিধা বাড়ায়। বর্তমানে, দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয় (ভূমি, এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক) এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের সাথে জড়িত সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় পর্যাপ্ত নয়, এমনকি বন বিভাগের সাথে সহযোগিতা লক্ষণীয় নয়, পরামর্শের পরিবর্তে বিভিন্ন বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে।[৯৫৩] ফলস্বরূপ, অপরিকল্পিত কৃষি রূপান্তর, চিংড়ি চাষ এবং বনাঞ্চলে শিল্প দখলের ফলে বন উজাড় হয়। কিছু উন্নয়ন প্রকল্প, যেমন 'টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্পদ সংগঠিতকরণ' এবং 'ভূমির অধিকারের সমীক্ষা' সাহায্য করছে তবে একটি সঠিক ভূমি তথ্য ব্যবস্থার জন্য জাতীয় ডিজিটাল, জিপিএস এবং ম্যাপ করা সম্পত্তি রেকর্ড বেস প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বনের উপর অনিবার্য ক্রমাগত চাপ কমানোর জন্য জোনিং সহ ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনা ব্যবস্থা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।[৯৫৪] জোনেশন নিশ্চিত করে যে সঠিক প্রয়োগের অনুমান কওে, যে কোনো প্রদত্ত জমির সর্বোত্তম ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি উচ্চ জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও, পরিষ্কার জমির মেয়াদ এবং জোনেশন বনের উপর প্রভাব কমাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাণিজ্যিক বনায়ন, অন্যান্য বাস্তুতন্ত্র পরিসেবা এবং সংরক্ষণের জন্য উৎপাদনশীল বন জোনিং করে এবং উপযুক্ত জমিতে রাস্তা, কৃষি এবং শিল্প সম্প্রসারণ সীমিত করে।[৯৫৫]

কাঠ, সামুদ্রিক খাবার, এবং কৃষি পণ্যের জন্য বিশ্বব্যাপী চাহিদা: এসকল ক্ষেত্রে বনের উপর অত্যধিক বা অযৌক্তিক ব্যবহার বনের সীমা পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে, এবং বনভূমি অবক্ষয়ে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। বাংলাদেশ থেকে কৃষিপণ্যের রপ্তানি মূল্য বার্ষিক ৳৩.৫ বিলিয়ন ছাড়িয়েছে (২০১৬) এবং শুধুমাত্র চিংড়ির জন্য হল ৳৩৪০ মিলিয়ন। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক খাদ্য উৎপাদনের চাহিদা, বিশেষ করে সামুদ্রিক খাদ্য (চিংড়ি) এবং নির্দিষ্ট কৃষিপণ্যের (পাট, তামাক) জন্য, বিশেষ করে সাল বন, উপকূলীয় বন এবং সুন্দরবনে বন উজাড় ও অবক্ষয় ঘটেছে। সুন্দরবন এবং উপকূলীয় বনাঞ্চলে চিংড়ির চাষ গত ২০ বছরে ৮ গুণ বেড়েছে, খামারের জন্য একটি বিশাল এলাকা পরিষ্কার করা হয়েছে। বৈশ্বিক এবং স্থানীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অনেক দেশে বিশেষ করে ইইউ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

> *The export value of agricultural goods from Bangladesh exceeds $3.5 billion annually (MIT/OEC 2016) and for shrimp alone is>$340 million. As the global and local population rises and with non-tariff exporting to many countries, especially the EU and the USA, the demand for shrimp will continue to grow.*

---

৯৫৩. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, opcit, p: 20.

৯৫৪. UN-REDD, Bangladesh National Program. 2016, opcit, 80.

৯৫৫. Forest Department, opcit, p:24.

There is also global demand for tropical wood products and the Bangladesh furniture industry exports about $50 million/year. Other wood products amount to another $35 million/year (World Bank 2016). These numbers may pale in comparison to other exports such as clothing, but nevertheless, the international demand for wood products is an indirect driver for excessive forest harvesting and for replacement of natural forests with plantations.[৯৫৬]

এছাড়াও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কাঠের পণ্যের বৈশ্বিক চাহিদা রয়েছে এবং বাংলাদেশ ফার্নিচার শিল্প বছরে প্রায় ৳৫০ মিলিয়ন রপ্তানি করে। অন্যান্য কাঠের পণ্যের পরিমাণ আরও ৳৩৫ মিলিয়ন/বছর। কাঠের পণ্যের আন্তর্জাতিক চাহিদা অত্যধিক। যদিও পামকে একটি গাছ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। ২০১৪ সালে ১.০১ বিলিয়ন মূল্যের পাম তেল রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশের একটি প্রধান রপ্তানি পণ্য এবং প্রায়শই পূর্বের বনাঞ্চলে রোপণ করা হয়।[৯৫৭]

বনের অতিরিক্ত ফসল কাটা: বাংলাদেশের সকল ধরণের বনভূমির ক্ষেত্রে প্রধান প্রত্যক্ষ চালক, বনের অতিরিক্ত ফসল কাটা (আইনি এবং অবৈধ), জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, জীবিকা নির্বাহ, বাণিজ্যিক কৃষি (পার্বত্য বনাঞ্চলে স্থানান্তরিত চাষ সহ), এবং শিল্প এবং/অথবা বসতিগুলির দ্বারা দখল। ২০০৬ পর্যন্ত, আনুমানিক ৮৯,০০০ হেক্টর বনভূমি বিভিন্ন বনাঞ্চলে দখল করা হয়েছে। যা জাতীয় বনের অপর্যাপ্ত সীমানা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলেছে। উপরন্তু, ১৯৭১ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ২০,০০০ হেক্টরেরও বেশি বনভূমি বন-বহির্ভূত উদ্দেশ্যে অন্যান্য সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সুন্দরবন এবং উপকূলীয় বনে, সামুদ্রিক পণ্যের একটি বৈশ্বিক চাহিদার ফলে চিংড়ি চাষের জন্য বন উজাড় হয়েছে। যদিও সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভের এলাকা স্থিতিশীল হয়েছে, অতীতে বন উজাড় উল্লেখযোগ্য ছিল এবং অন্যান্য উপকূলীয় বনে ম্যানগ্রোভ কভারের অবক্ষয় ও ক্ষতি অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে চিংড়ির উৎপাদন আট গুণ বেড়েছে, যার ফলে সুন্দরবনের বনভূমির ক্ষতি হয়েছে এবং চিংড়ি-খামারের উপকূলীয় বনের ক্ষতি হয়েছে। সুন্দরবন এবং অন্যান্য উপকূলীয় ম্যানগ্রোভের হ্রাসের একটি প্রধান কারণ হল লবণাক্ততা বৃদ্ধি। উত্তরে চিংড়ি এবং ধান চাষের জন্য ১৯৬০-এর দশকে পোল্ডার উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত। এর ফলে, প্রায় ৯,৫০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংস হয়েছে বেশিরভাগ উপকূলীয় বনে, যা বনজ পণ্যের উৎপাদন হ্রাস করেছে। বেশিরভাগ পোল্ডার মূলত ধান চাষের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, তবে এর মধ্যে অনেকগুলি চিংড়ির খামারে রূপান্তরিত হয়েছিল। এটি সুন্দরবনের

৯৫৬. UN-REDD, Bangladesh National Program. 2016, opcit, P.75.

৯৫৭. ibid, P.70.

ম্যানগ্রোভ প্রজাতিগুলিকেও প্রভাবিত করেছে, যার মধ্যে 'শীর্ষ-মৃত্যু' রোগ সহ লবণাক্ততা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত মিঠা পানির প্রবাহ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।[৯৫৮]

ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সরঞ্জামগুলির উপর কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব:

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ বন থেকে মধু আহরণ করে। বর্তমান ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সরঞ্জামগুলির উপর কর্মীদের জন্য উপলব্ধ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। বনবিভাগের কর্মীদের বন জেলাগুলির মধ্যে ভ্রমণের অক্ষমতা অধিকন্তু, বর্তমান নীতি ও আইনগুলি (যদিও সংশোধনের অধীনে) বন ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে সমসাময়িক চিন্তাভাবনাকে ভালভাবে প্রতিফলিত করে না, এবং এই নীতিগুলি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং ভূমির মেয়াদের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়েছে।[৯৫৯]

আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতার অভাব: সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতার অভাব, যার ফলে বন ব্যবস্থাপকদের সাথে কোন পরামর্শ না করে অপরিকল্পিতভভাবে স্থাপন করা রাস্তা, সামরিক ঘাঁটি, রেলপথ এবং অন্যান্য অবকাঠামো থেকে বন উজাড় হয়। দুর্নীতি হল আরেকটি সাধারণভাবে রিপোর্ট করা শাসন সংক্রান্ত সমস্যা, বিশেষভাবে যা বন বিভাগের কাজ করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। স্পষ্টতই সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, তবে রাজনীতিবিদ এবং সামগ্রিকভাবে বন বিভাগকে খারাপভাবে প্রতিফলিত করতে শুধুমাত্র কিছু অসাধু ব্যক্তি যথেষ্ট।[৯৬০]

Driver pathways for forest change by forest types for deforestation and forest degradation

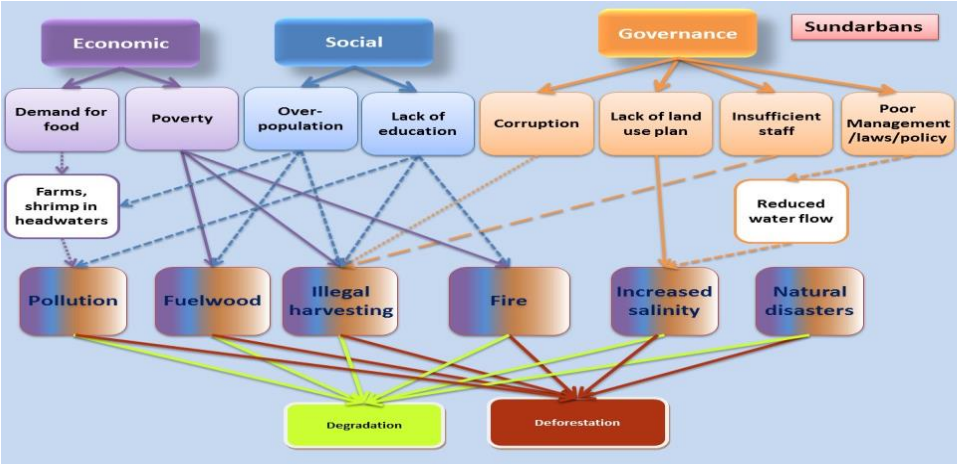

৯৫৮. Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, ibid, p: 15.

৯৫৯. UN-REDD, Bangladesh National Program. 2016, opcit, P.75-78.

৯৬০. ibid, P.75-78.

এই বিশ্লেষণগুলি থেকে এটি স্পষ্ট ছিল যে বনের কাছাকাছি গ্রামে বসবাসকারী এবং শিক্ষার সাথে বসবাসকারী শহর বা শহরে বসবাসকারী বন সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। বন-নিবাসীরা মানতে নারাজ যে অবৈধ গাছ কাটা বনের মানের উপর যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, একই সাথে মনে করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন বনের ক্ষতি করছে। বনের গুণমান হ্রাস এবং এর কারণ সম্পর্কে মতামতের মধ্যে প্রজন্মগত পার্থক্যও রয়েছে, বয়স্ক লোকদের তুলনায় কম বয়সী লোকেরা মনে করে যে বনের অবনতি হচ্ছে।[৯৬১]

৫.৩ সুপারিশঃ

বন বিভাগের কার্যকর ভূমিকাঃ বহুমাত্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা যেমন, বন সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য এবং জলাশয় সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা উচিত। বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, অধ্যাদেশ, বিধি ও প্রবিধান প্রয়োগ করে দেশের বন ও বন্যপ্রাণী সম্পদের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা। বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মৌলিক চাহিদা পূরণের সুবিধার্থে বনের টেকসই ব্যবস্থাপনা, বন ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশের পরিবেশগত ভূমিকার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ; ক্ষয়প্রাপ্ত বনভূমির সমৃদ্ধি ও পুনর্বাসন; অংশগ্রহণমূলক বন ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, প্রান্তিক, উপ-প্রান্তিক এবং সদ্য সংগৃহীত জমি এবং খাস জমি সহ অ-শ্রেণিভুক্ত রাজ্য বনাঞ্চলে জনমুখী বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দ্রুত বর্ধনশীল এবং উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির বৃক্ষের আচ্ছাদনের আনুভূমিক সম্প্রসারণ প্রয়োজন। রাজস্ব আদায়, বাজেট প্রণয়ন, নিরীক্ষা, হিসাব নিকাশ ইত্যাদি সরকারি ও বেসরকারি খাতে বনায়ন কার্যক্রমে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে। বৃক্ষ-রোপণ এবং কৃষি বনবিদ্যা অনুশীলনে প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান; উষ্ণায়ন ও মরুকরণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ এবং বনায়ন সম্পর্কিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রোটোকল এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কনভেনশনের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার প্রতি জাতীয় বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হবে। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত বনভূমি ও জলাশয়ের পুনর্বাসন করা দরকার। এইসকল ভূমিকা বজায় রাখার জন্য, তহবিল এবং কর্মী উভয়ই বর্তমানে অপর্যাপ্ত। শুধুমাত্র ২০১০ সাল থেকে, বন বিভাগের মোট কর্মী ৫০০০ এরও বেশি (২৯%) কমেছে।[৯৬২]

বিদ্যমান আইন ও নীতির বাস্তবায়নঃ বিদ্যমান আইন ও নীতির বাস্তবায়নের পাশাপাশি সংশোধন করা, কেননা ভাল বন ব্যবস্থাপনার জন্য উন্নত আইন প্রয়োগ অপরিহার্য। পাস বা পারমিটের ব্যবস্থা প্রয়োগ করে বনজ পণ্য অপসারণকে সীমাবদ্ধ করণ। বিদ্যমান আইন ও নীতি যথাসম্ভব সর্বোত্তম পর্যায়ে প্রয়োগ করা উচিত। বনের ১০ কিলোমিটার সীমানার মধ্যে কোন শিল্প বা অন্যান্য অবকাঠামোর অনুমতি না দেওয়ার জন্য ECA নিয়মগুলি

৯৬১. ibid, P.80.

৯৬২. ibid, P.80.

কঠোরভাবে অনুসরণ করা উচিত। বন সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের একটি জীববৈচিত্র্য নীতি প্রণয়ন করা উচিত। করাতকল ও ব্রিকফিল্ড নিয়ন্ত্রণ করা এবং বর্তমানে যেগুলি অবৈধভাবে কাজ করছে তা সরিয়ে দেওয়া। বনভূমির সীমানা নির্ধারণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বন সংক্রান্ত মামলার সময়মতো মোকদ্দমা করার জন্য একটি উন্নত ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং প্রচার করা, যেমন জেলা বন অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা (যেখানে প্রয়োজন) দ্রুত মামলা করার জন্য একটি ভাল বিকল্প হতে পারে। নতুন নীতি বা আইন সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণকে সচেতন করা। বন নীতি ও আইনের উন্নতি, নীতি প্রণয়ন, যেমনঃ বনের সহ-ব্যবস্থাপনা, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং লিঙ্গ প্রতিক্রিয়াশীল হতে হবে। মনোনীত বন কর্মকর্তাদের (অন্তত DFO স্তরের) আইনগতভাবে বনের মামলাগুলি সমাধান করার ক্ষমতা থাকতে হবে। কাঠ কাটার উপর বর্তমান আরোপিত স্থগিতাদেশের বৈধতা এবং প্রভাব পর্যালোচনা করা উচিত। নতুন আইন এবং/অথবা নীতি গ্রহণ করে দখলদারদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে জঙ্গলে দখলকৃত জমি পুনরুদ্ধার করা। জাতীয় বৃক্ষ-রোপণ আন্দোলনকে উৎসাহিত করা উচিত এবং এর জন্য আইনি ও নীতিগত সহায়তার প্রয়োজন। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMCs) কে একটি আনুষ্ঠানিক আইনি ভিত্তি দেওয়া উচিত। স্থানীয় নেতা/সম্ভ্রান্তদের থেকে সামাজিক বনায়ন অংশগ্রহণকারীদের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ (যেমন, ৫%) নির্বাচন করা। বন এবং সম্প্রদায় উভয়কে সমর্থন করার জন্য বন ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ইকোট্যুরিজমকে অন্তর্ভুক্ত করণ। জমি লিজিং নির্দেশিকা তৈরি করা।

সক্ষমতা উন্নয়ন (প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তি উভয়): টেকসই বন ব্যবস্থাপনার দিকে প্রচেষ্টা উন্নত করন (যেমনঃ মানদণ্ড এবং সূচক), ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনা, ইত্যাদি সহ একটি পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বনের স্থিতিস্থাপকতার জন্য একটি অভিযোজন প্রোগ্রাম তৈরি করা। বন পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন এবং যাচাইকরণ কর্মসূচী বিকাশ ও বাস্তবায়ন করা।[৯৬৩]

সমন্বয় (আন্তঃবিভাগীয়, IGO, NGO, ইত্যাদি): প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবহন, মৎস্য, পর্যটন, ইত্যাদি সহ FD এবং সরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় উন্নত করতে হবে যাতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে বনকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বনের সহ-ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য FD এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার যেমন বন নির্ভর সম্প্রদায়, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, এনজিও, CSO-এর মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তার আরও সুবিধা নেওয়া যা অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন ITTO, FAO এবং বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে পাওয়া যায়।[৯৬৪]

---

৯৬৩. ibid, p. 86-102.

৯৬৪. ibid.

বিকল্প জীবিকা: স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে মেলে এমন বিকল্প জীবিকার কৌশল এবং কর্মসূচির মাধ্যমে বন-নির্ভর সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষদের ন্যায়সঙ্গতভাবে সমর্থন করা। বনের ১০ কি.মি. বাফার জোনের মধ্যে শিক্ষা এবং জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্পগুলি শুরু করা, বিশেষ করে সুন্দরবনের মতো সংরক্ষিত এলাকার কাছাকাছি এলাকায়।[৯৬৫] বাংলাদেশে বন পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হল উচ্চ জনসংখ্যা যার ফলশ্রুতিতে কাঠের পণ্য, বিশেষ করে কাঠের জ্বালানির উচ্চ চাহিদা বিদ্যমান। জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা থাকলেও, শহুরে জনসংখ্যার প্রতি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বনভূমিতে প্রভাব হ্রাস করতে পারে। এশিয়ার অন্যত্রও অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নগরায়নের এই প্রবণতা রান্নার জন্য কাঠ ছাড়া অন্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে বনের উপর প্রভাব আরও কমিয়ে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সিলেট অঞ্চল থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন এবং বঙ্গোপসাগরের সম্ভাব্য মজুদ, অদূর ভবিষ্যতে আপেক্ষিকভাবে কাঠের জ্বালানীর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে। এছাড়াও ইতিবাচক দিক থেকে, ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বাংলাদেশি জনসাধারণের জন্য শহুরে কেন্দ্রগুলি থেকে দূরে চিত্তবিনোদনের জন্য বন বাস্তুতন্ত্র পরিসেবাগুলির আরও ভাল সুরক্ষা প্রয়োজন। অন্যদিকে, ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক বাণিজ্য বাজার এবং বিদেশি পুঁজির আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভকে চিংড়ির খামারে রূপান্তরিত করতে এবং ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কাঠের আসবাবপত্র সরবরাহ করার জন্য চাপ অব্যাহত রাখবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়া আরও বিশৃঙ্খল হতে পারে, বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতার জন্য। এই ধরনের বিপর্যয়কর ঘূর্ণিঝড়ের ফলে বনের ক্ষতি হতে পারে, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে। তাই ম্যানগ্রোভ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে উক্ত জমিগুলিকে স্থিতিশীল করা গুরুত্বপূর্ণ হবে।[৯৬৬]

> *However, any alternative livelihoods program needs to be realistic, gender-responsive, relevant to local people, and approached with a well-articulated business plan including a market survey. A large list of possible alternate livelihoods can be compiled, for example mushroom culture, apiculture (honey), agroforestry, improved woodstoves, seaweed farming, duck farming, small-scale furniture making, vegetable farming, cattle fattening and milking, backyard poultry, handloom weaving, raising seedlings, fishnet making, pisciculture, fishing, goat farming, horticulture (e.g., papaya, banana, mango, litchi, lemon), tailoring and embroidery, agro-food processing, muri (puffed-rice), candy, spice powder, banana chips, cap making, mat making (e.g., Sital pati of Sylhet region), silk products, coir production, handicrafts (bag, sital pati), pottery, baskets, wall hanging, carpet, embroidered quilt, bracelet, wood works, dresses, cushion, pillow-cover, bedspreads, woven cloth, traditional jewelry, candles, terracotta, hand-*

---

৯৬৫. ibid.

৯৬৬. ibid, p.104.

made paper items, etc., but it will be important to consult with women, men and youth in local communities in project areas which ones may be most feasible and relevant to local conditions. Below are some possibilities that could potentially be useful in the Bangladesh context in hill or Sal forests, especially. [৯৬৭]

বাংলাদেশে বন হ্রাসের একটি প্রধান পরোক্ষ চালক হল দারিদ্র্য, যার ফলশ্রুতিতে অনেক স্থানীয় ক্রিয়াকলাপ যা বন উজাড় করে এবং বনকে ধ্বংস করে। যার মধ্যে রয়েছে দখল, জ্বালানি কাঠ কাটা এবং অবৈধ কাঠ কাটা। বিকল্প জীবিকার সহায়তার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গতভাবে নারী, পুরুষ ও যুবক সহ বন-নির্ভর মানুষের দারিদ্র্য হ্রাস করা স্থানীয় দারিদ্র্য বিমোচন এবং বনে কার্বন বৃদ্ধির দ্বৈত উদ্দেশ্য সাধন করে। যাইহোক, যেকোন বিকল্প জীবিকার কর্মসূচিকে বাস্তবসম্মত, লিঙ্গ-প্রতিক্রিয়াশীল, স্থানীয় জনগণের সাথে প্রাসঙ্গিক এবং বাজার সমীক্ষা সহ একটি সুস্পষ্ট ব্যবসায়িক পরিকল্পনার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। সম্ভাব্য বিকল্প জীবিকার একটি বড় তালিকা সংকলন করা যেতে পারে, যেমন মাশরুম চাষ, এপিকালচার (মধু), কৃষিবন, উন্নত কাঠের স্টোভ, সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, হাঁস চাষ, ছোট আকারের আসবাবপত্র তৈরি, সবজি চাষ, গবাদি পশু মোটাতাজাকরণ এবং দুধ, বাড়ির উঠোন হাঁস, তাঁত। বুনন, চারা উত্থাপন, ফিশনেট তৈরি, মৎস্য চাষ, মাছ ধরা, ছাগল পালন, উদ্যানপালন (যেমন, পেঁপে, কলা, আম, লিচু, লেবু), সেলাই এবং সূচিকর্ম, কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মুড়ি (ফুড-ভাত), মিছরি, মশলা গুঁড়া , কলার চিপস, টুপি তৈরি, মাদুর তৈরি (যেমন, সিলেট অঞ্চলের শিতল পাটি), রেশম পণ্য, কয়ার উৎপাদন, হস্তশিল্প (ব্যাগ, সিতাল পাটি), মৃৎপাত্র, ঝুড়ি, দেয়ালে ঝুলানো কার্পেট, এমব্রয়ডারি করা কুইল্ট, ব্রেসলেট, কাঠের কাজ, পোষাক, কুশন, বালিশের কভার, বেডস্প্রেড, বোনা কাপড়, ঐতিহ্যবাহী গয়না, মোমবাতি, পোড়ামাটির, হাতে তৈরি কাগজের আইটেম ইত্যাদি, তবে প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের মহিলা, পুরুষ এবং যুবকদের সাথে পরামর্শ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে কোনটি তা খেয়াল রাখতে হবে। কৃষি নিবিড়করণের মাধ্যমে, কৃষি বনায়ন খাদ্য ও পশুখাদ্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। বিদ্যমান বনকে রক্ষা করে যেখানে বেকার এবং দরিদ্র মানুষ বাজার চালিত, স্থানীয়ভাবে পরিচালিত গাছ চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের জীবিকা উন্নত করতে পারে। এটি তাদের আয় ও সম্পদ তৈরি করে। বিকল্প জীবিকা বিকাশের প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সমাধান করা যেতে পারে। FAO (২০০৩) পরামর্শ দিয়েছে যে বনভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচনের তিনটি প্রধান উপায় রয়েছেঃ সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হলো বন সম্পদ সংকুচিত হওয়া থেকে রোধ করা; বনকে সহজলভ্য করা এবং সম্পদ ও ভাড়া পুনঃবণ্টন করা; এবং বন উৎপাদনের মূল্য বৃদ্ধি।[৯৬৮]

৯৬৭. ibid, p.108.

৯৬৮. ibid.

সহব্যবস্থাপনা: প্রাকৃতিক বনগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কমপক্ষে ৫ থেকে ১০ বছরের জন্য কোনও মানুষের হস্তক্ষেপ বা হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং উৎপাদনের উদ্দেশ্যে জোনিংয়ের মাধ্যমে ভূমি পরিকল্পনা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ। অংশগ্রহণমূলক বা সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম রাস্তার ধার, রেলওয়ে ট্র্যাক, নদীর তীর, বন্যা/ঘূর্ণিঝড় সুরক্ষা বাঁধ ইত্যাদি সহ সমস্ত উপলব্ধ স্থানগুলিতে সম্প্রসারিত করা হবে। বন উজাড় এবং বন উজাড় বন্ধ করতে সারা দেশে ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচারণা প্রয়োজন।[৯৬৯]

সুশাসন: বন আইনী মামলা যত দ্রুত সম্ভব নিষ্পত্তি করতে হবে এবং মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। স্থানীয় বন ব্যবহারকারীদের দ্বারা নিয়ম-প্রণয়নের স্বায়ত্তশাসনের একটি নির্দিষ্ট স্তরের গুরুত্ব স্বীকার করা একটি সহ-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বন সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু সহনশীল ব্যক্তিগত বৃক্ষ বাড়ানোর প্রচেষ্টায় জনগণকে, বিশেষ করে নারী, যুবক এবং আদিবাসীদের সহায়তা করা, বনের দখল বন্ধ করতে এবং বন উজাড় রোধ করতে বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ, এবং সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এনজিওগুলির সাথে উদ্ভাবনী সংরক্ষণ অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।[৯৭০] পরিবেশ সংরক্ষণে সুশাসন অপরিহার্য। যা সরকার, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকারসহ সবাইকে আরও বেশি দায়বদ্ধ ও দায়িত্বশীল করবে। শহরের পরিবেশ রক্ষায় নদী বাঁচাও আন্দোলন ছাড়াও পানি ও বায়ু দূষণ হ্রাস করার লক্ষ্যে নাগরিক সমাজের কিছু কার্যক্রম রয়েছে। এসব পরিবেশ আন্দোলন দেশের বড় বড় শহরে এবং প্রতিবেশ অঞ্চলে সম্প্রসারিত করতে হবে। সচেতন নাগরিক সমাজের সঙ্গে গণমাধ্যম এ বিষয়ে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে ।[৯৭১] এক দিকে যেমন গণতান্ত্রিক, আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য দরকার তেমনি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠাও অতি আবশ্যক। আবার পরিবেশ দূষণ রোধ, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও সুশাসন দরকার। এক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যেমন নীতি কৌশল ও আইনগত ভিত্তি দরকার; একই সঙ্গে সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে শক্তিশালীকরণ ও নিষ্ঠাবান দক্ষ জনবলও প্রয়োজন।[৯৭২] সুশাসনের অন্যতম স্তম্ভ হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। বাংলাদেশে বহু প্রকল্প হয়ে থাকে, সেগুলোর প্রতিটি স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার নিরিখে মূল্যায়ন একান্তই প্রয়োজন।[৯৭৩]

---

৯৬৯. ibid, p.108.

৯৭০. ibid.

৯৭১. *ড. আতিক রহমান, সুন্দরবন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পূর্বোক্ত।*

৯৭২. *ঐ।*

৯৭৩. *ঐ।*

বন সংরক্ষণের অঙ্গীকার: সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের রাজনৈতিক স্তরে বন বাস্তুতন্ত্র পরিসেবাগুলির জন্য একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। যতদূর সম্ভব বিদ্যমান বনে (রাস্তা, রেলপথ, ইত্যাদি) অবকাঠামোগত উন্নয়ন এড়িয়ে চলা বা সীমিত করা এবং কিছু অবশিষ্ট প্রাথমিক বন রক্ষা করা। বন সংরক্ষণের জন্য প্রণোদনা প্রদান এবং বন সম্পদ আহরণের উপর প্রগতিশীল কর আরোপের কথা বিবেচনা করা।[৯৭৪]

গবেষণা ও উন্নয়ন: বন, পরিবেশ, জীবিকা, এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন সম্পর্কিত গবেষণা বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় উন্নত করা। ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে শক্তিশালী করা এবং এটিকে FD এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা যাতে গবেষণার অগ্রাধিকারগুলি প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।[৯৭৫]

টেকসই বনব্যাবস্থাপনা:

> *Article 18A of the Bangladesh Constitution states that "The state shall endeavor to protect and improve the environment and to preserve and safeguard the natural resources, biodiversity, wetlands, forests and wildlife for the present and future citizens." However, until the Forest Department can overcome a vast array of deficiencies, forest management will not be improved.*

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকবে।' বিগত ১০০ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া জাতীয় বনাঞ্চল থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন গবেষণা এবং FAO দ্বারা কাঠের পণ্যের চাহিদা ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ, একটি শক্তিশালী বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং সমসাময়িক টেকসই বন ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রামের প্রয়োজন, যার মধ্যে একটি সক্ষম মনিটরিং সিস্টেম সহ ইকোসিস্টেম পরিসেবাগুলিতে ফোকাস রয়েছে, যার বিরুদ্ধে সাফল্য পরিমাপ করা যায় এমন মানদণ্ড এবং সূচকগুলি ভবিষ্যতে আরও বেশি প্রয়োজনীয় হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন: বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থান, ঘন জনসংখ্যা, বিস্তৃত উপকূলরেখা এবং দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তাই অন্তত এই দিকটি বিবেচনায় রেখে বনভূমি রক্ষায় কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

---

৯৭৪. UNREDD Report, p.86-102.

৯৭৫. UNREDD Report, p.110.

শিক্ষাক্ষেত্রে: বন বিষয়ক শিক্ষা স্থানীয় জনগণের বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং আগ্রহ তৈরি করে। প্রথমদিকে বনবিদ্যা সংক্রান্ত শিক্ষা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল এবং এটি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল না। কেবল সরকারি নিয়োগপ্রাপ্তরা বনবিদ্যা পড়ার সুযোগ পেত। ইনস্টিটিউট অফ ফরেস্ট্রি মূলত ছিল। উচ্চ স্তরের বনবিদ্যা শিক্ষা প্রদানের জন্য চট্টগ্রামে ও সিলেটে বনবিদ্যা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। তবে বনবিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। বনায়ন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে সবার জন্য উন্মুক্ত। চট্টগ্রাম বনায়ন ইনস্টিটিউটকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। খুলনা ও সিলেট দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বন ও পরিবেশ নামে বিভাগ চালু করা হয়েছে। এভাবে বন ও পরিবেশ শিক্ষা সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে। ফলে এর মাধ্যমে দেখা যায় যে যোগ্য বন ও পরিবেশ কর্মী পাওয়া যাচ্ছে।[৯৭৬]

৫.৪ উপসংহার: বন বাস্তুতন্ত্র হল গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত এবং আর্থ-সামাজিক সম্পদ যা বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মঙ্গলের জন্য সংরক্ষণ করা উচিত। কারণ তারা কার্বনের জলাধার সহ বাস্তুতন্ত্রের পরিসেবা প্রদান করতে পারে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং বিরোধপূর্ণ ভূমি ব্যবহারের চাপের জন্য একটি সুষম বন খাতের কৌশল প্রয়োজন যা আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি, জাতীয় উন্নয়ন দৃষ্টান্ত এবং পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সাথে স্থানীয় আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনীয়তার সাথে সাড়া দেয়। বনক্ষয়ের কারণগুলো জ্বালানী, ভবন এবং আসবাবপত্রের জন্য কাঠ, কারুশিল্প এবং খাবারের জন্য কাঠবিহীন বনজ পণ্য এবং জাতীয় ব্যবহার বা রপ্তানির জন্য কৃষিজাত পণ্য এবং চিংড়ি সহ বনজ পণ্যগুলির জাতীয় এবং বৈশ্বিক চাহিদার সাথে সম্পর্কিত। প্রায়শই দারিদ্র্য, বেকারত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হয়, কারণ লোকেরা নিজেদের এবং তাদের পরিবারকে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করার জন্য বনে চলে যায়। যার মধ্যে রয়েছে অবৈধ কাঠ কাটা এবং জ্বালানী কাঠ কাটা, যা বন উজাড় এবং অবনতি উভয়েরই সাধারণ চালক।

উপকূলীয় স্থলব্যবহারের সুষম পরিকল্পনা তৈরির পাশাপাশি সুন্দরবন থেকে কাঠ চুরি বন্ধ করতে হবে। জমি ও বনের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। নাগরিক সমাজ ও ঐ অঞ্চলের শিল্প-কারখানার সমন্বয়ে বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হতে পারে।[৯৭৭]তবে তার আগে সুন্দরবনকেন্দ্রিক মানুষের ভরণপোষণের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে বননির্ভর জীবিকায়ন বন্ধ হবে না। এক্ষেত্রে প্রশাসন ও স্থানীয়

---

৯৭৬. Junaid K. Choudhury and Md. Abdullah Abraham Hossain, BANGLADESH FORESTRY OUTLOOK STUDY, ASIA-PACIFIC FORESTRY SECTOR OUTLOOK STUDY II, Working Paper No. APFSOS II/ WP/ 2011/ 33, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS REGIONAL OFFICE FOR ASIA AND THE PACIFIC, opcit, p. 36-37.

৯৭৭. রাজু নুরুল, সুন্দরবনকে বাঁচানো কেন জরুরি? জুলাই ১১, ২০২১ বণিক বার্তা।

অধিবাসীদের সমান দায়িত্ব রয়েছে। সুন্দরবনের নানা সমস্যা নিয়ে এলাকার মানুষকে সচেতন করতে হবে। বিশেষ করে বনের জমি উজাড় করার মতো মানবসৃষ্ট সমস্যা দূর করতে হবে।[৯৭৮] এ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বিনিয়োগ করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা, এনজিও ও ব্যাংকগুলোর অনুদানকে কাজে লাগানো যায়; যা স্থানীয় মানুষের জীবিকায়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।[৯৭৯] উপকূলীয় অঞ্চল পরিচালনা, উন্নয়ন কৌশল এবং উপকূলীয় অঞ্চল নীতির অংশ হিসেবে সুন্দরবনকে বিবেচনা করতে হবে। সুন্দরবনকে বাঁচাতে সবচেয়ে বড় কাজ হলো, কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করে এ বনকে তার মতো থাকতে দেয়া। এক্ষেত্রে সরকারের প্রধান কাজ হবে মানুষের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। এর মধ্যে রয়েছে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোকে দূষণমুক্ত রাখা, প্রাণী ও পাখিদের বিরক্ত না করা, ক্ষতিকারক পদার্থ থেকে নদী দূষণমুক্ত রাখা এবং পণ্যবাহী নৌযান প্রবেশ বন্ধ করা। গাছপালা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। রামপাল বিদুৎকেন্দ্র নিয়ে সরকারের অবস্থান বিবেচনা করার সুযোগ এখনো রয়েছে। সরকার একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণ করতে চায়, একই সঙ্গে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে যথেষ্ট আগ্রহী। কিন্তু মূল সমস্যা হলো নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের দুর্বলতা। সরকার ইতোমধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন করেছে, কিন্তু আইন প্রয়োগে এখনও যথেষ্ট বাধা রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল এবং আইনি কাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করা অতীব জরুরি।[৯৮০]

---

৯৭৮. ঐ।

৯৭৯. রাজু নুরুল, সুন্দরবনকে বাঁচানো কেন জরুরি?, পূর্বোক্ত।

৯৮০. *ড. আতিক রহমান, সুন্দরবন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ০১ জানুয়ারি ১৫।*

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. মৌলিক উৎস:

১. (ক) রিপোর্ট/ ডকুমেন্টস/ স্ট্যাটিসটিক্যাল/ গেজেটিয়ার:

A Report Prepared by the Government of Bangladesh Assisted by the International Development Community with Financial Support from the European Commission, Cyclone Sidr in Bangladesh: Damage, Loss and Need Assesment For Disaster Recovery and Reconstruction, April 2008.

B.C. Allen, *Gazetteer of Bengal and North-East India*, Mittal Publications, New Delhi, India, 1857.

Compendium of Environment Statistics of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics, 2009.

Districts Statistics 2011: Khulna, Bangladesh Bureau of Statistics, June 2013.

Districts Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013.

Districts Statistics 2011: Bagerhat, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013.

F.D. Ascoli, Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report 1812, Oxford, Clrendon Press, 1917.

Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory, 2019.

Fredrick Eden Pargiter, *A Revenue History of Sundarbans*, Vol-I: 1765-1870, West Bengal District Gazetteers, Government of west Bengal, 2002 (1st pub. 1934)

H. Beveridge, B. C. S., *The Districts of Bakarganj: Its History and Statistics*, Trubner and C0. Ludgate Hill, London, 1876.

IUCN, *Communities and forest Management in South Asia*, Asia Forest Network, Switzerland, 2015.

O'Malley, L. S. S., (1914), *Bengal District Gazetteers, 24-Parganas, Calcutta*, India, 1992.

Population and Housing Census 2011, Bureau of Statistics, December 2012.

Regional Specialized Metrological Centre, Report of the Committee of the Bengal Chamber of Commerce for the year of 1931, Calcutta, 1932.

The Calcutta Review, *Famines in Bengal and the Reclamation of Sundarban as a Means of Mitigating Them*. Vol. LIX, 1874, p. 332-350.

UN-REDD, Bangladesh National Program. 2016, Drivers of Deforestation and Forest Degradation in Bangladesh: Final report. UN-REDD Bangladesh National Program, 10 January 2017.

World Bank Report 2007, *Need assessment and detailed planning for a harmonious hydrometeorology system for the Sundarbans*, USA, 2007.

W. W. Hunter, A statistical Account of Bengal, VOLUME V. DISTRICTS OF DACCA, BÁKARGANJ, FARÍDPUR, AND MAIMANSINH, TRÜBNER & Co., LONDON 1875.

W. W. Hunter, A statistical Account of Bengal, VOLUME 1. DISTRICTS OF THE 24 PARGANAS AND SUNDARBANS, TRÜBNER & Co., LONDON 1875.

W. W. Hunter, A statistical Account of Bengal, VOLUME VII. DISTRICTS OF MALDAH, RANGPUR, AND DINÁJPUR, TRÜBNER & Co., LONDON 1876.

W. W. Hunter, A statistical Account of Bengal, Vol-1, part-II, Statistical Account of Sundarbans, Trubner and Co. London, 1876, reprint by W. Bengal Govt. India, 1998

W. W. Hunter, A statistical Account of Bengal, VOLUME VI, CHITTAGONG HILL TRACTS, CHITTAGONG, NOÁKHÁLÍ, TIPPERAH, HILL TIPPERAH, Trubner and Co. London, 1876.

WW Hunter, *Statistical Account of Bengal, vol-2, Nadiya and Jessor,* 1876, London.

Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh 2011, District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013.

উপজেলা পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, আগস্ট ২০১৪।

১. (খ) সংবাদপত্র (জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয়):

দৈনিক ইনকিলাব

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

৩১ মে ২০২০।

দৈনিক কালের কণ্ঠ

৯ নভেম্বর ২০১৯।

১৮ জুলাই ২০২১।

৩ ডিসেম্বর, ২০২১।

দৈনিক নয়াদিগন্ত

১৮ জুলাই ২০২০।

দৈনিক প্রথম আলো

২০ অক্টোবর ২০১৭।

২৯ জানুয়ারি ২০১৮।

৩ এপ্রিল ২০১৯।

১১ জুলাই ২০১৯।

৪ এপ্রিল ২০১৯।

২৬ আগস্ট ২০১৯।

২৭ মে ২০২০।

২৮ অক্টোবর ২০২০।

২ জুন ২০২১

২ এপ্রিল ২০২১

৩ এপ্রিল ২০২১।

Prothom Alo English

15 November 2019.

22 May 2020

দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ

২ জানুয়ারি ২০২৩।

দৈনিক বণিক বার্তা

জুলাই১১, ২০২১ ।

দৈনিক ভোরের কাগজ

২৭ জানুয়ারি ২০২৩।

দৈনিক যুগান্তর

২১ মে ২০২০।

১৮ জুলাই ২০২১।

দৈনিক সমকাল

০১ জানুয়ারি ২০১৫।

India Climate Dialogue, Kolkata 13 November 2019

The Daily Star

14 December 2007.

1 December 2015.

28 December 2016.

17 November, 2019

5 June 2020.

The Independent

19 November 2019.

17 April 2020.

The New York Times

15 November 1970

16 November, 1970

The Statesman

2 January, 2020,

বিবিসি বাংলা,

৮ নভেম্বর ২০১৯

১০ নভেম্বর ২০১৯

১৬ নভেম্বর ২০১৯

দেশটিভি অনলাইন, ২৬ জানুয়ারি ২০১৬

সময় টেলিভিশন নিউজ সম্প্রচারঃ

সম্পচারিত সময় নিউজ, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা, ০৯-১১-২০২০

১১ নভেম্বর ২০১৯, একুশে টিভি।

অনলাইন পত্রিকাঃ

বাংলা নিউজটুয়েন্টিফোর.কম

৩০ ডিসেম্বর২০১৬

৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

বিডিনিউজ, ২২ মার্চ ২০১৭

জাগো নিউজ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

রাইজিং বিডি, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪

১. (গ) সাক্ষাৎকারঃ

গবেষক কর্তৃক পরিচালিত সাক্ষাৎকারঃ

কাঞ্চন সরদার, পেশাঃ গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ ০৪/১০/২০২২, স্থানঃ বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়ন। গ্রামঃ বনবিবিতলা, উপজেলাঃ শ্যামনগর, জেলাঃ সাতক্ষীরা, সময়ঃ সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

গোপাল সানা, পেশাঃ মৎসজীবী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ ০৪/১০/২০২২, স্থানঃ ৯ নং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, গ্রামঃ কলবাড়ি, উপজেলাঃ শ্যামনগর, জেলাঃ সাতক্ষীরা, সময়ঃ সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

জনি সরদার, পেশাঃ কাঁকড়া শিকার, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ ০৪/১০/২০২২, স্থানঃ ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, গ্রামঃ মুন্সিগঞ্জ, উপজেলাঃ শ্যামনগর, জেলাঃ সাতক্ষীরা, সময়ঃ সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

নীলকান্ত মুণ্ডা, শন্তষ মুণ্ডা, কল্যাণী মুণ্ডা, বিনোদিনী মুণ্ডা, কৌশল্যা মুণ্ডা, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ ০৬/১০/২০২২, স্থানঃ ৯ নং বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪ নং ওয়ার্ড, গ্রামঃ খাগড়াঘাট। উপজেলাঃ শ্যামনগর। জেলাঃ সাতক্ষীরা, সময়ঃ সকাল ১ টা ২৭ মিনিট।

পূর্ণিমা রানী, পেশাঃ মৎসজীবী এবং গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ ০৪/১০/২০২২, স্থানঃ ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, গ্রামঃ মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা শ্যামনগর, জেলাঃ সাতক্ষীরা, সময়ঃ সকাল ১০ টা ১৫ মিনিট।

মহেন্দ্র, পেশাঃ মৎসজীবী, কাঁকড়া শিকারি ও চাষী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ ০৫/১০/২০২২, স্থানঃ ৯ নং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামঃ চুনা। উপজেলাঃ শ্যামনগর। জেলাঃ সাতক্ষীরা, সময়ঃ সকাল ১২ টা ৪৮ মিনিট।

মিলন সরদার, পেশাঃ মৌয়াল, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ ০৪/১০/২০২২, স্থানঃ ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামঃ মুন্সিগঞ্জ। উপজেলাঃ শ্যামনগর। জেলাঃ সাতক্ষীরা, সময়ঃ সকাল দুপুর ১২ টা ১০ মিনিট।

রাজ প্রসাদ মুণ্ডা, পেশাঃ গ্রাম্য ডাক্তার, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ ০৯/১০/২০২২, স্থানঃ ৮ নং ইশ্বরীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামঃ খাগড়াঘাট। উপজেলাঃ শ্যামনগর। জেলাঃ সাতক্ষীরা, সময়ঃ সকাল ১২ টা ১৯ মিনিট।

সঞ্জয় কুমার, পেশাঃ মৌয়াল, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ ০৪/১০/২০২২, স্থানঃ ২ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামঃ মুন্সিগঞ্জ। উপজেলাঃ শ্যামনগর। জেলাঃ সাতক্ষীরা, সময়ঃ সকাল ৯ টা ৪৮ মিনিট।

সাহেব মণ্ডল, পেশাঃ বাওয়ালী, মৎস শিকারি, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ আরিফ ইস্তিয়াক পাভেল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ ০৪/১০/২০২২, স্থানঃ ৯নং বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়ন। গ্রামঃ বনবিবিতলা, উপজেলাঃ শ্যামনগর, জেলাঃ সাতক্ষীরা, সময়ঃ সকাল ১১ টা ৪১ মিনিট।

আদিবাসী গবেষণা সংস্থা সামস কর্তৃক গৃহিত সাক্ষাৎকারঃ

আজগর আলী শেখ (৪৫), বাওয়ালি, মা কাঞ্চন বিবি ও বাবা মোসলেম শেখ, টেকেরমাথা, গাবুরা ইউনিয়ন, শ্যামনগর সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ৯ জানুয়ারি ২০১০। সুন্দরবনের বিখ্যাত শিকারি মেজ শেখের নাতি।

আজিজুল হক গাজী (৫৫), কৃষক ও মৌয়াল দলের সঙ্গেও মাঝেমধ্যে বনে যান, মা লাইলা খাতুন ও বাবা রহমান গাজী, নারানপুর, বাগালী ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ৩ এপ্রিল ২০১১।

আজিবর মোল্লা (২৫), জেলে, মা সায়রা খাতুন ও বাবা কাদের বক্স মোল্লা, মালঞ্চ নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধের ওপর থাকেন, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১১ জানুয়ারি ২০১০

আন্না বালা সর্দার (৫০), মেলে মাদুর কারিগর, মা লক্ষ্মী দাসী ও বাবা হাজেরা সর্দার, বালিয়াডাঙ্গা, ১ নম্বর আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ২ এপ্রিল ২০১১

আবদুর রহিম (৫০), মৌয়াল, মা আছিয়া বেগম ও বাবা মুন্সী চাঁদ আলী সর্দার, বালিয়াডাঙ্গা, ১ নম্বর আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১ এপ্রিল ২০১১।

আবদুল জব্বার (৭০), জেলে, মা অমেত্ত বিবি ও বাবা সুখচাঁদ কয়ার, টেংরাখালী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১৪ জানুয়ারি ২০১০।

আরশাদ আলী গাজী (৭০), মৌয়াল, মা উমেলা খাতুন ও বাবা সুলতান গাজী, বালিয়াডাঙ্গা, ১ নম্বর আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১ এপ্রিল ২০১১।

আশরাফুল শিকারি (৫০), বাওয়ালি, মা সোনাভানু ও বাবা শহিদুল শিকারি, নারানপুর, বাগালী ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তার দাদা অজেত শিকারি সুন্দরবনের 'বিখ্যাত শিকারি'। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ৩ এপ্রিল ২০১১।

খদিজা বিবি (৫০), কবিরাজ, মা লাইলা খাতুন ও বাবা মান্দার গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ৫ জুন ২০১০

গণেশ সরকার (৬৮), মৌয়াল, মা মধু দাসী ও বাবা বিজয় সরকার, চণ্ডীপুর, ১ নম্বর আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ৪ এপ্রিল ২০১১।

নটবর মণ্ডল (৭৪), মৌয়াল ও মুক্তিযোদ্ধা, মা পঞ্চমী বালা মণ্ডল ও বাবা সতীশ চন্দ্র মণ্ডল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১৫ মে ২০১১।

নাছিমা বেগম (৩০), দিনমজুর ও জেলে, মা নবিছা বিবি ও বাবা জিয়াদ গাজী, ছোট ভেটখালী (যতীন্দ্রনগর), মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১৫ মে ২০১০। পরের দিন তিনি বাঘের কামড়ে মারা যান।

নূরুল ইসলাম (৫০), জেলে, মা সায়রা খাতুন ও বাবা কাদের বক্স মোল্লা, মালঞ্চ নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধের ওপর থাকেন, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১১ জানুয়ারি ২০১০

পীরালি গাজী (৭৫), সাজুনী, মা ছবিজান বিবি ও বাবা নেসের গাজী, বালিয়াডাঙ্গা, ১ নম্বর আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ২ এপ্রিল ২০১১।

প্রণব কুমার বিশ্বাস (৪০), চিংড়িঘের মালিক, মা পার্বতী বিশ্বাস ও বাবা দেবীরঞ্জন বিশ্বাস, গোলাখালী, রমজাননগর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১৫ জানুয়ারি ২০১০।

ফরমান গাজী (৯০), সুন্দরবনের নৌকার কারিগর, মা হেলি বিবি ও বাবা মান্দার গাজী, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১৫ মে ২০১১।

বদরুল দেওয়ান গাজী (৪৫), মৌয়াল, মা পারভীন ও বাবা হবি গাজী, পানখালী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১৮ ডিসেম্বর ২০১০। ২২ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে তিনি বাঘের কামড়ে মারা যান।

বসুদেব গায়েন (৪০), মৌয়াল ও বাওয়ালি, মা লক্ষবালা দাস ও বাবা কেদার গায়েন, গোলাখালী, রমজাননগর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১৫ জানুয়ারি ২০১০

বাসন্তী দাসী (৫৭), জেলে, মা দীন দাসী ও বাবা পাগলা সানা, মুন্সিগঞ্জ জেলেপাড়া, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১১ জানুয়ারি ২০১১।

মিজানুর রহমান (৩০), জেলে, মা নূরজাহান ও বাবা আবদুর রব, খেওড়াঘাট, ঈশ্বরীপুর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১১ জানুয়ারি ২০১০।

মোকসেদ আলী (৫৭), সাজুনী, মা সলুক বিবি ও বাবা দুর্লভ গাজী, বালিয়াডাঙ্গা, ১ নম্বর আমাদি ইউনিয়ন, কয়রা, খুলনা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ৩১ মার্চ ২০১১।

মো. মুজিবর রহমান গাজী (৪৭), মধুকাটা মৌয়াল, মা কিনে বিবি ও বাবা আবদুল কাদের গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ২৬ জুলাই ২০০৯।

মো. শামসুর রহমান গাজী (৪৬), আড়িটানা মৌয়াল, মা কিনে বিবি ও বাবা আবদুল কাদের গাজী, দাঁতিনাখালী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ২৬ জুলাই ২০০৯।

রবীন্দ্র মুণ্ডা (৫০), দিনমজুর ও জেলে, মা বাহামনি মুণ্ডা ও বাবা নিতাই মুণ্ডা, দাঁতিনাখালী হুলো, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ২৯ মার্চ ২০১০

রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল (৫০), মৌয়াল ও জেলে, মা বামনী বালা মণ্ডল ও বাবা হারান চন্দ্র মণ্ডল, গোলাখালী, রমজাননগর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১৫ জানুয়ারি ২০১০।

শহীদুল মোড়ল (৪০), জেলে, মা আমেনা বেগম ও বাবা ম, মালঞ্চ নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধের ওপর থাকেন, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১১ জানুয়ারি ২০১০।

সন্তোষ গাইন (৫০), জেলে, মা জংগুরী গাইন ও বাবা গৌরপদ গাইন, সিংহরতলী, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ২৩ জুলাই ২০০৯।

সীতা রানী সর্দার (৪৫), জেলে, মা বালা চৌকিদার ও বাবা অমূল্য চৌকিদার, সিংহরতলী, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ২৩ জুলাই ২০০৯।

সুবল চন্দ্র দাস (৬৫), মৃশিল্পী, মা প্রিয়বালা দাসী ও বাবা নরেন চন্দ্র দাস, আনুলী পালপাড়া, আশাশুনি, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ২ এপ্রিল ২০১১। খুলনার কয়রার আমাদী বাজারে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মেলায় আলাপ হয়।

হরিপদ মণ্ডল (৪৮), সাজুনী, মা বৃন্দেবালা মণ্ডল ও বাবা অনন্ত মণ্ডল, মীরগাঙ, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১৫ মে ২০১১।

হরিপদ মণ্ডল (৬০), কৃষক ও জেলে, মা সুভদ্র মণ্ডল ও বাবা ফকির চান মণ্ডল, ঠাকুরঘেরি, রমজাননগর ইউনিয়ন, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ১৪ জানুয়ারি ২০১০।

২. দ্বৈতয়ীক উৎসঃ

২. (ক) কোষ গ্রন্থঃ

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলাপিডিয়া*, ১-১০ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকা, ২০১২।

দূর্যোগকোষ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৫।

২. (খ) বাংলা গ্রন্থঃ

এ, এফ, এম আব্দুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৬।

কমল চৌধুরী, *চব্বিশ পরগণা উত্তর-দক্ষিণ সুন্দরবন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯।

গোলাম মাওলা ও মোহাম্মদ ওমর ফারুক, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, গ্রন্থকুটির, ঢাকা।

গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই, কলকাতা, ১৯৯৫।

ঘোষাল, ইন্দ্রানী, *সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন*, *তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য*, সলিল ঘোষাল কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রথন, দক্ষিণগড়িয়া, কলকাতা, ২০০৬।

ড. দিলীপ কুমার নাহা, *প্রান্ত সুন্দরবনের কথ্যভাষা*, সাহিত্যশ্রী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০।

ড. দেবব্রত নস্কর, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবীঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯।

ড. সুব্রত কুমার সাহা ও ড. রেজাউল করিম, *বাংলাদেশের পরিবেশ ও সমাজ*, মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ. ২৮৬-২৮৭।

তুষার কান্তি কাঞ্জিলাল, *সুন্দরবনের প্রকৃতি, মানুষ ও উন্নয়ন; পশ্চিববঙ্গ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলাসংখ্যা*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৬।

দাস, মলয় দাস, *সুন্দরবনের জনজীবন ও সংস্কৃতি*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

ধুর্জটি, নস্কর, *সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ*, প্রথম খণ্ড, শ্যামলী পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৭।

নির্মলেন্দু দাস, *সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি*, জ্ঞানপ্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৬।

নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১২ (৫ম সংস্করণ)।

ম ইনামুল হক, *বাংলাদেশের নদনদী*, অনুশীলন, ঢাকা, ২০১৭।

মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক, *বাংলাদেশের নদনদী: বর্তমান গতি প্রকৃতি*, ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ২০১৫।

রাজিব আহমেদ (সম্পা.) *সুন্দরবনের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১২।

শিবশঙ্কর মিত্র, *সুন্দরবন সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, ভারত, ১৯৮৮।

সরকার, প্রদ্যুত, সুন্দরবনের নৌ-নির্মাণশিল্প, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, ষষ্ঠসংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৫।

সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুল্‌নার ইতিহাস*, খণ্ড-১, গতিধারা, ১৯১৪ (প্রথম সংস্করণ)।

সিরাজুল ইসলাম, *'পত্তনী প্রথা ও মধ্যস্বত্ব সমস্যা*, *'বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা.

রত্নাংশু বর্গী, *সুন্দরবন*, কথাশিল্প, কলকাতা, ১৯৮৪।

২. (গ) ইংরেজি গ্রন্থ:

Ajay S. Rawat, *History of Forestry in India*, New Delhi: Indus Publishing Company, 1998.

A.M. '*Choudhury, Cyclones in Bangladesh'* K. Nizamuddin (ed.), *Disaster in Bangladesh: Selected Readings*, Disaster Research Training and Management Centre (DRTMC), University of Dhaka, 2001.

B.E. Fernow, Forest Policies and Forest Mangement in Germany and British India, Government Printing Office, Washington, 1899.

Eaton, R.M. *Human settlement and colonization in the Sundarbans,* 1200-1750. Agriculture and Human Values, 7(2), 1990.

Gautam Kumar Das, System of Reclamation and Salt Preparation in Sunderbans, Frontier Weekly, 2018.

Haroun Er Rashid, *Geography of Bangladesh,* UPL, Dhaka, 1977.

K.C. Choudhury, The History and Economics of the Land System in Bengal,
Sri Gauranga Press, Calcutta, 1927.

R, Samasastri, *Kutilya`s Arthasashtra,* Oriental Rsearch Institute, Mysore, 1915.

Wise, James, *Notes on the races, castes and trades of Eastern Bengal,* 2 vols. London: Harrison and Sons, 1883.

২. (ঘ) এম.ফিল. ও পিএইচডি অভিসন্দর্ভ:

Islam, M.S. 2011. "Biodiversity and livelihoods: A case study in Sundarbans Reserve Forest, World Heritage and Ramsar Site (Bangladesh)," A Master thesis submitted of the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) in Management of Protected Areas at the University of Klagenfurt, Austria.

Barlow, Adam C. D. 2009, "The Sundarbans Tiger Adaptation, Population Status, and Conflict Management," A Thesis Submitted to The Faculty of The Graduate School of The University of Minnesota, In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy.

Khan, Mohammad Monirul Hasan. 2004, "Ecology and conservation of the Bengal tiger in the Sundarbans mangrove forest of Bangladesh," A dissertation submitted to the

University of Cambridge in partial fulfilment of the conditions of application for the degree of Doctor of Philosophy, Wildlife Research Group Selwyn College, Department of Anatomy Cambridge, University of Cambridge.

২. (ঙ) প্রবন্ধঃ

Aditya Ghosh, Susanne Schmidt, Thomas Fickert and Marcus Nüsser, *The Indian Sundarban Mangrove Forests: History, Utilization, Conservation Strategies and Local Perception,* Diversity, 22 May 2015.

A. H. M. Raihan Sarker, Mohammad Nur Nobi , Eivin Røskaft, David J. Chivers & Ma Suza, Value of the Storm-Protection Function of Sundarban Mangroves in Bangladesh, Journal of Sustainable Development; Vol. 13, No. 3;, Canadian Center of Science and Education, 2020.

Anamitra Anurag Danda, *SURVIVING IN THE SUNDARBANS: THREATS AND RESPONSES An analytical description of life in an Indian riparian commons*, the doctor´s degree at the University of Twente, 2007.

A K Siddique, A Eusof, *'Cyclone deaths in Bangladesh, May 1985: who was at risk, Comparative Study'*, National Center for Biotechnology Information, 1987.

Bandaranayake WM, 1998, "Traditional and medicinal use of mangroves," Mangroves and Salt Marshes 1998, 2:133-148.

Cyclone Sidr Impacts on the Sundarbans Floristic Diversity Avit Kumar Bhowmik1 & Pedro Cabral, Earth Science Research; Vol. 2, No. 2; 2013 ISSN 1927-0542 E-ISSN 1927-0550 Published by Canadian Center of Science and Education.

Danda, A. A. Institutional inadequacies to attaining sustainability in the Sundarbans. Journal of the Indian Anthropological Society, 38, 2003.

Das, Gautam, System of Reclamation and Salt Preparation in Sunderbans, 2018.

Giri, Chandra; Bruce Pengra; Zhiliang Zhu; Ashbindu Singh and Larry L. Tieszen., "Monitoring mangrove forest dynamics of the Sundarbans in Bangladesh and India using multi-temporal satellite data from 1973 to 2000," Estuarine, Coastal and Shelf Science 73 (2007) 91-100, 2007

Guha, Ramachandra, An early environmental debate: the making of the 1878 Forest Act. Indian Economic and Social History Review 27(1), 1990.

Haque, Mohammad Zahirul; Mohammad Imam Hasan Reza; Md. Mahmudul Alam; Zahir Uddin Ahmed; Md. Wasiul Islam. "Discovery of a potential site for community based sustainable ecotourism in the Sundarbans reserve forests, Bangladesh," International Journal Conservation Science 7, 2, APR-JUN 2016: 553-566.

Herring, R. J. *The Commons and its "Tragedy" as Analytical Framework: Understanding environmental degradation in South Asia*. In J. Seidensticker, R. Kurin, & A.K. Townsend (Eds.) *The commons in South Asia: Societal pressures and environmental integrity in the Sundarbans*, The International Centre Smithsonian Institution, Washington, D.C, 1991.

Huq, Khandaker & Rahman, Shafiqur, Importance of the Sundarban mangrove forest as a fisheries resource. 10.1079/AC.79235.20203483469, 2020.

Iqbal Hossain, 'Sundarbans mangrove forest protects Bangladesh from the worse of Cyclone Amphan', Forests, Lifegate, Italy**,** 2020.

IUCN Bangladesh, *Bangladesh Sundarban Delta Vision 2050: A first Steps in its Formulation, Document-1 & 2, The Vision,* Dhaka, Bangladesh, 2014.

Joydeep Gupta, Jayanta Basu, and Zobaidur Rahman Soeb, 'Bangladesh: Sundarban Mangroves Save Bengal from Cyclone Bulbul' India Climate Dialogue, India, 13 November 2019.

Khan, Zakir, DISASTER IMPACT ON SUNDARBANS -A CASE STUDY ON SIDR AFFECTED AREA, International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences, 2016.

Khondaker Hasibul Kabir, Effects of Embankments on the Habitation of the South-western Coastal Region of Bangladesh Article, Asian Journal of Environment and Disaster Management, Vol. 5, No. 1, March 2013.

Prasanta Kumar Pandit, *PAST MANAGEMENT HISTORY OF MANGROVE FORESTS OF SUNDARBANS, Indian Journal of Biological Sciences, Vol-19,* Kolkata, *2013.*

Madhav Gadgil, "*Deforestation: Problems and Prospects,*" in Ajay S. Rawat, *History of Forestry in India,* New Delhi: Indus Publishing Company, 1993.

Madhu, Nithar & Sarkar, Bhanumati & Acharya, Chandan, Traditional fishing methods used by the fishermen in the Sundarban region, West Bengal. 7. 1-8. 10.48001/veethika.2021.07.03.0010.48001/veethika.2021.07.01.006, 2020.

Mark Poffenberger (ed.), *Communities and Forest Management in South Asia: A regional Profile Of The Working Group On Community Involvement In Forest Management,* IUCN, September 2000.

Md. Millat-e-MUSTAFA, *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh Bangladesh Forest Policy Trends*, Policy Trend Report, IGES, 2002.

Miah, MD. Danesh; Romel Ahmed and Sheikh Jahidul Islam., “Indigenous Management Practices of Golpata (Nypafruticans) in Local Plantations in Southern Bangladesh,” Palms 47(4): 185–190, 2003

Mohammed M. Rahman, M. Motiur Rahman, and Kazi S. Islam, The causes of deterioration of Sundarban mangrove forest ecosystem of Bangladesh: conservation and sustainable management issues, AACL Bioflux, Volume 3, Issue 2, 2010.

Mohiuddin Sakib, *Sundarban as a Buffer against Storm Surge Flooding*, World Journal of Engineering and Technology 3(03):59-64 · October 2015.

Mr. Michael Burgett, An illustrated Manual for Honey Hunters, International Notes in No.59, ARCADIS Euroconsult Netherlands, Winrock International, USA & Nature conservation Management Bangladesh, March 2002.

Mukherjee, A.K. and Tiwari, K.K. Mangrove Ecosystem Changes Under Induce Stress: The Case History of the Sundarban, 1984, West Bengal, India; E. Soepadmo, A. N. Rao, & D. J. Macintosh (Eds.) Proceedings of the Asian Symposium on Management Environment – Research and Management Kuala Lumpur: University of Malaya and UNESCO, 1990.

Natural Calamities and Diseases of Sundarban Mangrove Forests, https://www.slideshare.net/rnsImran/natural-calamities-and-diseases-of-sundarbans-mangrove-forest.

Ray, Dr. Tapan, "Traditional Honey Collecting: Emerging Livelihood Problems and Socio-economic Uplift of Mawallis Community in Sundarbans," Pratidhwani the Echo, A Journal of Humanities & Social Science, Published by: Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India, 2013, Website: www.thecho.in.

Roy, Tapan. 2014, "Customary use of mangrove tree as a folk medicine among the Sundarban resource collectors," Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL), Vol. 2, Issue 4, April 2014.

Roy, S.,Women entrepreneurs in conserving land: An analytical study at the sundarbans, bangladesh. Canadian Social Science, 8(5), 2012. Retrieved from http://ezproxy.loyno.edu/login?url=http://search.proquest.com/docview/1321090017?acco untid=12168.

Richards, J.F. and Flint, E.P., *Long-term transformations in the Sundarbans wetlands forests of Bengal. Agriculture and Human Values,* 7(2), 1990.

Russell Kabir, Hafiz T. A. Khan, Emma Ball and Kay Caldwell, Climate Change Impact: The Experience of the Coastal Areas of Bangladesh Affected by Cyclones Sidr and Aila, ournal of Environmental and Public Health, Volume 2016.

Sakib, Mohiuddin & Sarkar, Md Fatin Nihal & Haque, Anisul & Rahman, Munsur & Jisan, Mansur Ali. Sundarban as a Buffer against Storm Surge Flooding. World Journal of Engineering and Technology. 3, 2015.

Siddique, A.K. & Eusof, A. Cyclone deaths in Bangladesh, May 1985: who was at risk? Tropical and geographical medicine, 1987.

Sarker, A.H.M. & Nobi, Mohammad Nur & Røskaft, Eivin & Chivers, David & Suza, Ma. , Value of the Storm-Protection Function of Sundarban Mangroves in Bangladesh. Journal of Sustainable Development. 13. 128. 10.5539/jsd. v13n3p128, 2020.

Sheikh Mahabub Alam, Bangabandhu – The Great Philosopher, Nature Lover and Tourist Champion will glorify Tourism in Bangladesh as “Father of Tourism Industry”, Bangladesh Tourism Consultants Society Limited (BTCS), Bangladesh, 2016.

Sujit Mandal, Natural Calamity - Storm in the Sundarbans: A Geo-Historical Study, [VOLUME 5 I ISSUE 2 I APRIL – JUNE 2018] E ISSN 2348 –1269, PRINT ISSN 2349-5138 68 IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews Research Paper.

Yule, Henry and Burnell, A. C. Hobson-Jobson, *A Glossary of Colloquial AngloIndian Words and Phrases, and of Kindred Terms, Etymological, Historical, Geographical and Discursive*, Delhi, 1968.

<u>২. (চ) জার্নাল/ সাময়িকী:</u>

খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, দূর্যোগকোষ, সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি, ঢাকা, ২০০৯।

তথ্য কনিকা ২০২০, বন অধিদপ্তর: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ২০২০।

পাভেল পার্থ, *বাদাবনের বিজ্ঞান*, *প্রতিচিন্তা: সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক*।

সুন্দরবন ফ্লিপ চার্ট, উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা, ২০০৮।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯ উপলক্ষে প্রকাশিত ম্যাগাজিন, ২০১৯, ঢাকা.

আন্তর্জাতিক দূর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত ম্যাগাজিন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৫।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৯ উপলক্ষে প্রকাশিত ম্যাগাজিন, পরিবেশ অধিদপ্তর, ২০১৯।

<u>৩. (ছ) ওয়েবসাইট/ইন্টারফেস:</u>

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন।

খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

বন অধিদপ্তর।

পরিবেশ অধিদপ্তর।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

জাতীয় বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ অভিযান মেলা ২০১৯, বন অধিদপ্তর: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়।

https://en.banglapedia.org/index.php/Cyclone.

Food And Agriculture Organization of the United Nations.

National Oceanic and Atmospheric Administration" National Ocean Service website (https://oceanservice.noaa.gov/podcast/july17/nop08-historical-maps-charts.html, accessed on 8/13/17)

https://studypress.org/news/details

Food and Agricultural Organization of the United Nations

http://www.fao.org/forestry/country/61580/en/bgd

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/
http://foresteast.bagerhat.gov.bd/site/page
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3763.pdf

https://www.slideshare.net/rnsImran/natural-calamities-and-diseases-of-sundarbans-mangrove-fores

http://www.bforest.gov.bd/site/page/6ec068d0-f8ad-4092-8212-39f5bd733c35

https://www.researchgate.net/publication/283290748_Sundarban_as_a_Buffer_against_Storm_Surge_Flooding

https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment

https://portals.iucn.org/library/node/44953

http://www.bbs.gov.bd

https://www.risingbd.com/risingbd-special/news/84193

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/176546/8/08_chapter%204.pdf

https://ulab.edu.bd/wp-content/uploads/2015/09/Social-Water-chapter-3.pdf

https://lokfolk.blogspot.com/2010/03/lady-of-legend.html

পরিশিষ্ট-১

মানচিত্র: বাংলাপ্রদেশ, ১৯০৭

-

পরিশিষ্ট-২

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা

Sl. No	**Working/ management Plan Period**	**Working/Management Plan written**	**Working/ Management Plan observations**	**Working/ Management Plan (Prescriptions/ recommendation)**
	1863-1869	Dr. Brandis	Forests were considered as valuable resource for revenue generation.	The Port Canning Land Reclamation and Rehabilitation Private Company was given the lease to collected toll from 24 forest blocks from the forest produce.
	1871-1872	A. L. Home	i. Forests were found to be dense, impenetrable ii.Under growth primarily consists of *Ceriops*. iii. Each square mile of forest could produce 700 quintals of usable timber.	i. Government took over the lease of forest land in 1869 ii. Started collection of revenue from the forest produce.
	1873-1874	Sir R. Temple & Dr. S. Schlich	i. 40 different species of trees and herbs were found in the forest. ii. *Heritiera fomes* was the most economically valuable species which was confined to the North - Eastern corner and in the areas farthest from the sea.	*i.* *Heritiera fomes* required protection *ii.* Forests were declared protected in 1878 *iii.* A Forest Division was established for the protection & management of forest.

			iii. Forests adjoining rivers got depleted iv. Due to unregulated felling no good quality forest was remained.	
	1893-1903	Heining (1893)	i. Forests were depleted due to unregulated felling. ii.Most affected species was *Heritiera fomes* iii. It was worst affected in the present Bangladesh areas due to relatively high population pressure.	i.The Annual Coupes were established in Bangladesh part of Sundarbans. Felling girth limit of *Heritiera fomes* was restricted to > 90 cm for protection of younger one.
	1903-1908 1906-1912	Lloyd's Working Scheme Farrington's Working Scheme (Annon,1952)	i. Forests were tremendously subjected under increased anthropogenic pressure ii. Stringent transportation rules and silviculture practices need to be implemented. i. Forests were found to be under increased anthropogenic pressure ii. Strong transportation rules and silvi-culture practices need to be implemented.	i. Rules was prescribed for felling of *Heritiera fomes, Sonneratia* spp. and *Xylocarpus mekongensis* in 24 Parganas District of present India. ii. Staff strength was increased for intensified patrolling & protection. i.Felling girth for *Heritiera fomes* was raised to 105 cm ii. Impression of Government Hammer marks were prescribed

				prior to felling iii.Harvesting of *Amoora sp*, *Bruguiera sp.*, *Heritiera fomes*, *Sonneratia spp.* and *Xylocarpus mekongensis* were strictly prohibited. iv. The rules to control the transport of forest produce was first introduced vide Notification No.- 2821-For, 8th November, 1906.
				iv. Heritiera fomes required protection *v.* Forests were declared protected in 1878 *vi.* A Forest Division was established for the protection & management of forest.
	1912-1932	Trafford's Working Plan (1912)	i. It was felt that a single Management Practice cannot be applicable for the entire Sundarbans. ii. Based on salinity two circles as western with more salinity (Indian part)	i.In the western circle (Indian part) the felling girth were restricted for *Amoora sp.* (60 cm), *Bruguiera sp.* (60 cm), *Heritiera fomes* (105 cm), *Sonneratia spp.*

			and eastern with less salinity having fresh water (Bangladesh part) inflow to be designated.	(120 cm) and *Xylocarpus mekongensis* (60 cm). ii. In both the circles five felling blocks were laid which to be worked on rotation for extraction of fuel wood.

পরিশিষ্ট-৩

সুন্দরবনের নিকটস্থ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ধর্ম ভিত্তিক বসবাসকৃত জনসংখ্যা

সাতক্ষীরা

Upazila	Muslim	Hindu	Christian	Buddhist	Others	Total
Assasuni	196026	71122	1342	1	263	268754
Debhata	101776	23573	8	0	1	125358
Kalaroa	223459	12363	1812	0	358	237992
Kaliganj	231610	43027	242	1	9	274889
Satkhira Sadar	400126	59419	885	10	452	460892
Shyamnagar	252545	64816	30	3	860	318254
Tala	220240	77231	1859	3	487	299820
Total	**16,25,782**	**3,51,551**	**6,178**	**18**	**2,430**	**19,85,959**

Source: District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013

খুলনা

Upazila/city corporation	Muslim	Hindu	Buddhist	Christian	Others	Total
Batiaghata	109591	61708	6	386	0	171691
Dacope	63334	86113	0	2869	0	152316
Dighalia	97860	17210	0	508	7	115585
Dumuria	188619	116451	9	339	257	305675
Khulna City Corporation	676412	74047	82	9204	132	759877
Koyra	152980	40197	0	476	278	193931
Paikgachha	166564	80332	0	1087	0	247983
Phultala	74271	955	0	13	2	75241
Rupsa	152641	26494	0	345	39	179519
Terokhada	94477	22220	0	12	0	116709
Total	**17,76,749**	**5,25,727**	**97**	**15,239**	**715**	**23,18,527**

Source: District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-19.

বাগেরহাট

Upazila	Muslim	Hindu	Buddhist	Christian	Others	Total
Bagerhat Sadar	219207	46547	561	4	70	266389
Chitalmari	92739	46003	58	2	8	138810
Fakirhat	104951	32628	57	0	153	137789
Kachua	78645	18347	19	0	0	97011
Mollahat	104335	26302	89	0	152	130878
Mongla	102298	29426	4837	21	6	136588
Morrelgonj	263332	31136	34	2	72	294576
Rampal	123250	31253	448	10	4	154965
Sarankhola	109836	9232	12	4	0	119084
Total	**11,98,593**	**2,70,874**	**6,115**	**43**	**465**	**14,76,090**

Source: District Statistics 2011: Satkhira, Bangladesh Bureau of Statistics, December 2013, p-19.

পরিশিষ্ট-৪

বাংলাশের বনভূমির আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধির (২০০০ থেকে ২০১৫) চিত্র

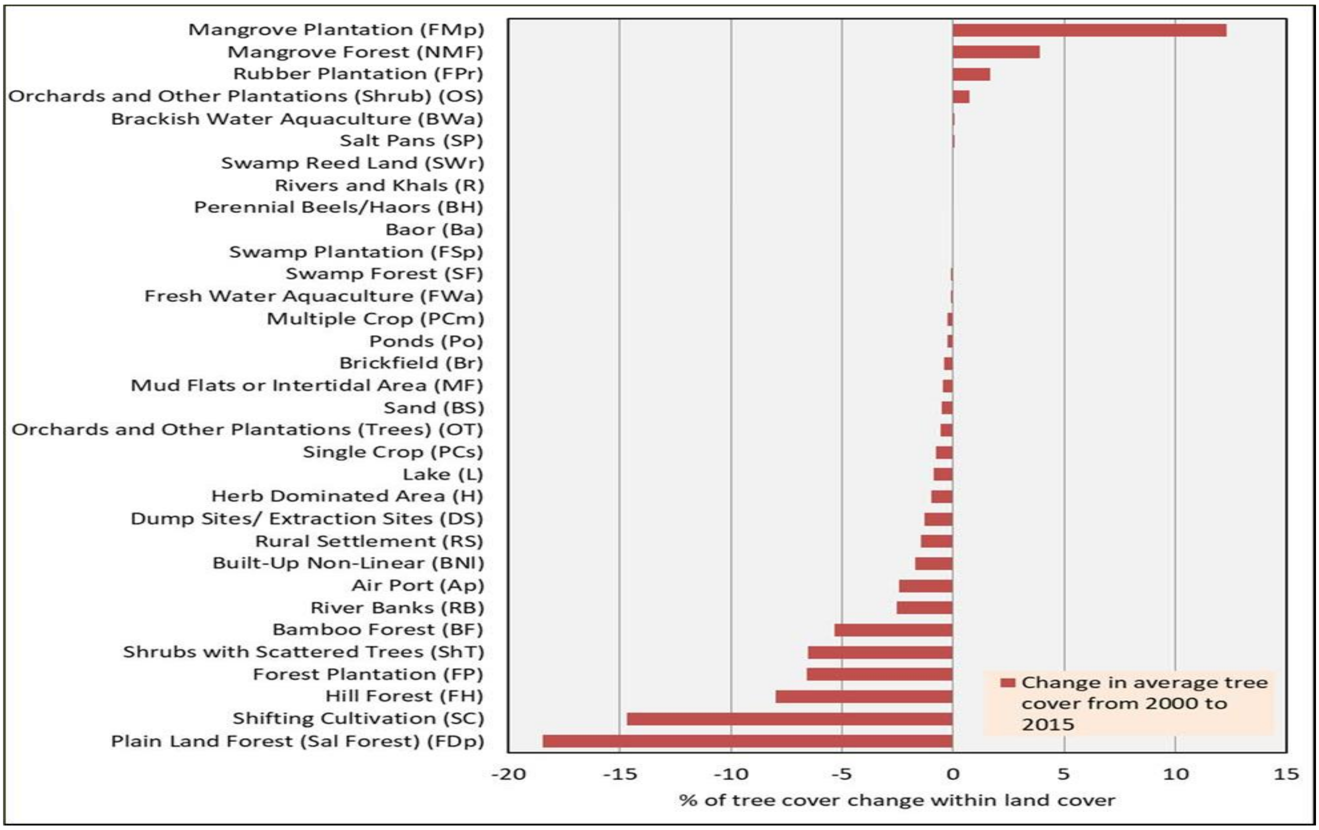

Source: Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, **Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory,** 2019, p-65.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫

বাংলাশের বনভূমির আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধির (২০০০ থেকে ২০১৪) চিত্র

Zone	Tree Cover in 2000, ha	Tree Cover in 2014, ha	% Change
Coastal	16,638	18,089	14.60
Hill	232,541	208,734	-10.30
Sal	25,108	21,671	-13.70
Sundarban	10,681	11,891	0.68
Village	9,698	10,088	3.00
National	2,468,716	2,388,622	-3.20

পরিশিষ্ট-৬

সম্প্রতি বাংলাশের বনভূমির আয়তন বৃদ্ধির কারণসমূহ

Zone	Reasons for increased tree cover	% respondents
Coastal Zone	More tree plantation	45.31
	Proper management	17.81
	Fewer natural disturbances	10.50
	Profitability	8.53
	Less salinity	4.24
Sundarban periphery	More tree plantation	34.12
	Proper management	24.25
	Fewer natural disturbances	16.89
	Less salinity	8.00
	Profitability	6.44

Source: Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change: **Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory,** 2019, p-156.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

১৯৬০-২০১৭ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়সমূহে তালিকা

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
BANGLADESH METEOROLOGICAL DEPARTMENT
METEOROLOGICAL COMPLEX,
E-24 AGARGAON, DHAKA-1207.

Subject: List of Major Cyclonic Storms from 1960 to 2017.

Date of Occurrence	Nature of Phenomenon	Landfall Area	Maximum Wind Speed in km/hr.	Direction of the Max. Wind Speed	Tidal Surge Height in ft.	Central Pressure (mbs)
1	2	3	4	5	6	7
11.10.60	Severe Cyclonic Storm	Chittagong	160	South-East	15	-
31.10.60	Severe Cyclonic Storm	Chittagong	193	South-East	20	-
09.05.61	Severe Cyclonic Storm	Chittagong	160	South-East	8-10	-
30.05.61	Severe Cyclonic Storm	Chittagong (Near Feni)	160	South-South-East	6-15	-
28.05.63	Severe Cyclonic Storm	Chittagong- Cox's Bazar	209	South-East	8-12	-
11.05.65	Severe Cyclonic Storm	Chittagong-Barisal Coast	160	South-South-East	12	-
05.11.65	Severe Cyclonic Storm	Chittagong	160	South-East	8-12	-
15.12.65	Severe Cyclonic Storm	Cox's Bazar	210	South-East	8-10	-
01.11.66	Severe Cyclonic Storm	Chittagong	120	South-East	20-22	-
23.10.70	Severe Cyclonic Storm of Hurricane intensity	Khulna-Barisal	163	South-West	-	-
12.11.70	Severe Cyclonic Storm with a core of hurricane wind	Chittagong	224	South-East	10-33	-
28.11.74	Severe Cyclonic Storm	Cox's Bazar	163	South-East	9-17	-
10.12.81	Cyclonic Storm	Khulna	120	South-West	7-15	989
15.10.83	Cyclonic Storm	Chittagong	93	South-East	-	995
09.11.83	Severe Cyclonic Storm	Cox's Bazar	136	South-East	5	986
24.05.85	Severe Cyclonic Storm	Chittagong	154	South-East	15	982
29.11.88	Severe Cyclonic Storm with a core of hurricane wind	Khulna	160	South-West	2-14.5	983
18.12.90	Cyclonic Storm (crossed as a depression)	Cox's Bazar Coast	115	South-East	5-7	995
29.04.91	Severe Cyclonic Storm with a core of hurricane wind	Chittagong	225	South-East	12-22	940
02.05.94	Severe Cyclonic Storm with a core of hurricane wind	Cox's Bazar-Teknaf Coast	220	South-East	5-6	948
25.11.95	Severe Cyclonic Storm	Cox's Bazar	140	South-East	10	998
19.05.97	Severe Cyclonic Storm with a core of hurricane wind	Sitakundu	232	South-East	15	965
27.09.97	Severe Cyclonic Storm with a core of hurricane wind	Sitakundu	150	South-South-East	10-15	-
20.05.98	Severe Cyclonic Storm with core of hurricane winds	Chittagong Coast near Sitakunda	173	South-South-East	3	
28.10.00	Cyclonic Storm	Sundarban Coast near Mongla	83	South-South-West	-	-
12.11.02	Cyclonic Storm	Sundarban Coast near Raimangal River	65-85	South-South-West	5-7	998
19.05.04	Cyclonic Storm	Teknaf-Akyab Coast	65-90	South-East	2-4	990
15.11.07	Severe Cyclonic Storm with core of hurricane winds (SIDR)	Khulna-Barisal Coast near Baleshwar river	223	South-West	15-20	942
25.05.09	Cyclonic Storm (AILA)	West Bengal-Khulna Coast near Sagar Island	70-90	South-South-West	4-6	987

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৮

Income from primary forest products by zone and product type.

Primary tree and forest products	Unit	Sundarban periphery	Coastal	Hill	Sal	Village	National
Timber	BDT/hh/year	1,561.90	2,519.65	2,683.22	580.03	1,698.45	1,612.14
	million BDT/year	598.39	2,370.95	2,335.44	2,298.03	45,693.28	53,296.09
Poles	BDT/hh/year	17.13	3.84				0.31
	million BDT/year	6.56	3.61				10.17
Bamboo	BDT/hh/year	201.11	200.50	995.24	355.40	711.79	656.07
	million BDT/year	77.05	188.67	866.25	1,408.06	19,149.26	21,689.28
Brooms	BDT/hh/year	8.28	0.67	104.70		0.87	3.58
	million BDT/year	3.17	0.63	91.13		23.33	118.26
Nypa	BDT/hh/year	36.79					0.43
	million BDT/year	14.10					14.10
Medicinal plants	BDT/hh/year	1.01		3.94	0.45		0.17
	million BDT/year	0.39		3.43	1.77		5.58
Murta	BDT/hh/year		22.15			4.91	4.63
	million BDT/year		20.84			132.12	152.96
Tree seedlings	BDT/hh/year	14.17	52.67				1.66
	million BDT/year	5.43	49.56				54.99
Fodder	BDT/hh/year				0.28		0.03
	million BDT/year				1.11		1.11
Seeds	BDT/hh/year			3.32			0.09
	million BDT/year			2.89			2.89
Fuelwood	BDT/hh/year	56.74	102.26	221.16	0.21	56.22	55.17
	million BDT/year	21.74	96.23	192.50	0.83	1,512.53	1,823.82
Leaves	BDT/hh/year	13.66	17.39		1.31	4.95	4.84
	million BDT/year	5.23	16.37		5.18	133.21	159.99
Fruits	BDT/hh/year	3,564.28	4,810.95	3,220.09	4,274.38	2,996.76	3,213.96
	million BDT/year	1,365.53	4,527.03	2,802.72	16,934.57	80,621.58	106,251.42
Bamboo	BDT/hh/year			6.82			0.18

Dhaka University Institutional Repository

shoots	million BDT/year			5.94			5.94
Mushroom	BDT/hh/year			3.54			0.09
	million BDT/year			3.08			3.08
Root tubers	BDT/hh/year	2.75		8.08			0.24
	million BDT/year	1.05		7.03			8.09

Forest Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, **Tree and forest resources of Bangladesh Report on the Bangladesh Forest Inventory,** 2019, p: 182-184

পরিশিষ্ট-৯

Percentage of HH receiving different services/benefits from tree and forest.

Services/benefits	% of HHs
Shade	94.51
Natural windbreak	86.93
Pollution control	65.33
Medicinal	53.29
Soil quality and fertility	51.26
Erosion control	40.09
Livestock grazing	25.16
Tourism	12.14
Recreation	15.09
Aesthetic	14.26
Religious/ spiritual	7.18
Freshwater/ water conservation	5.88
Others	21.47

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১০

Household's total annual income from tree and forest products.

Zone	**Income**[1]		**Income excluding fisheries**[1]	
	Average income (BDT/HH/year)	Total income (million BDT/year)	Average income (BDT/HH/year)	Total income (million BDT/year)
Sundarban periphery	29,275	11,216	6,893	2,641
Coastal	12,362	11,632	9,191	8,649
Hill	14,703	12,797	13,447	11,704
Sal	9,347	37,032	9,345	37,024
Village	8,554	230,135	7,791	209,601
National	9,160	302,812	8,156	269,644